আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম



আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-৭

অনুবাদ
মাওলানা আবু সাকী মাহবুব
মুহাদ্দিস, সম্পাদক ও সাহিত্যিক
ফাযেলে হাটহাজারী

বই ঘর বইঘর
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১৭৫৫৪৭২৭, ০১৭১১৭১১৪০৯
e-mail: boighorbd@gmail.com; boighor2008@gmail.com
web: www. boighorbd.com

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম–৭
কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

© সংরক্ষিত

দ্বিতীয় প্রকাশ
জানুয়ারী ২০১৭

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১৫

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0058-0

KHOTOBAT-E-HAKIMUL ISLAM : Translate by Abu Saki Mahbub
Published by : S M Aminul Islam, BhoiGhor : Islami Tower Ground floor
11/1 Banglabazar. Dhaka-1100 First Edition : September 2015 © by the pablisher

Price : 400 Taka only

হযরত কারী ফাতাহ মুহাম্মাদ সাহেবের মূল্যবান পত্র

মদীনা মুনাওয়ারা ১৪৪৩ হি.
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।
স্নেহের কারী মুহাম্মাদ ইদরীস সাহেব [দা. বা.]

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। অসুস্থতা বাড়েওনি, কমেওনি। আল্লাহ তায়ালার শাহী দরবারে দোস্ত-আহবাবের ইখলাসপূর্ণ দোয়ার উছিলায় সুস্থতা ও শক্তি বৃদ্ধির আশাবাদী।

আলহামদুলিল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ সকল নফল ও সুন্নত নামায হারাম শরীফে পড়তে পারছি। কখনও কখনও ওমরা পালন করতে পারছি। আন্তরিক প্রশান্তি ও মানবিক প্রফুল্লতা বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও শুকরিয়া যে, আপনার প্রচেষ্টার ফসল 'খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম'-এর ১ম খণ্ডটি সম্পূর্ণ শুনেছি এবং অনেক আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করেছি।

দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. ও সকল সংকলককে প্রত্যেকের শান অনুযায়ী উভয় জগতে উত্তম প্রতিদান দান করেন। তাঁরা একটি মোবারক ও আজিমুশ্বান কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। আর এই মাওয়ায়েজ ও খুতুবাতের আসল উদ্দেশ্য রুজু ইলাল্লাহ ওয়া রাসূলিহী। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেজামন্দী সঠিক অর্থে সকল উম্মতে মুসলিমাকে দান করুন।

হে প্রিয় ও স্নেহের পুত্র! কুরআনুল কারীমের আয়াত ও হাদিস শরীফের ইবারত ইরাববিহীন [যবর, যের ও পেশমুক্ত] দেখতে পেয়েছি। পরবর্তী সংস্করণে সঠিক ইরাব লাগিয়ে দেবেন। কেননা, পাঠকগণ সবাই আলেম, হাফেজ নন।

বর্তমানে আমি ২য় খণ্ডটি শ্রবণ করছি। 'রাহে ইতিদালা' ওয়াজের ৪র্থ পৃষ্ঠায় هن ام الكتاب এর তরজমা মনে হয় লেখা হয়নি। দ্বিতীয় সংস্করণে তাও পুরা করে দেবেন।

সকল দোস্ত-আহবাবের প্রতি অগণিত সালাম এবং ছোটদের জন্য স্নেহ ও দোয়া রইল। আল্লাহ তায়ালা এই পত্রের সকল দোয়া সবার জন্য কবুল করে নিন।

সফলতার দোয়া

আল্লাহপাক আপনাকে, পুরা খান্দানকে ও সারা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে পূর্ণ সুস্থতা, আরাম ও প্রশান্তিতে রেখে সকল প্রয়োজনাদি নিজ গায়েবি খাজানা হতে পুরা করতে থাকুন। আর এখন থেকে জীবনের সর্বশেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অগণিত, হালাল, বরকতপূর্ণ ও সুপ্রশস্ত রিজিক আপনার ও সারা জাহানের উম্মতে মুসলিমার জন্য দান করতে থাকুন। সাথে সাথে আমাদের ও আপনাদের সকলকে দুনিয়ার ফিকির ও ভালোবাসার তুলনায় আখেরাতের ফিকির ও ভালোবাসা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিন এবং আমাদের মৃত্যু ও শেষ নিঃশ্বাসের দিনকে কোটি ঈদের আনন্দ উৎসব হতে বেশি আনন্দময় করে দিন। আমাদের কবরগুলোকে আপন রহমত ও অনুগ্রহে জান্নাতের বাগিচা বানিয়ে দিন, জাহান্নামের গর্ত যাতে না বানান। আমাদের সকলের পেরেশানিসমূহকে আরাম ও সুখ দ্বারা, রোগ ও অসুস্থতাকে আজীবন সুস্থতা দ্বারা, সকল কষ্টকে সহজতা ও আসানি দ্বারা, দুঃখ-কষ্টকে খুশি-আনন্দ দ্বারা, ঋণীদেরকে দায়মুক্তি দ্বারা এবং দারিদ্র্য ও অভাবগুলোকে প্রশস্ততা ও সচ্ছলতা দ্বারা মধ্যে পরিবর্তন করে দিন।

اٰمِيْن يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

بِجَاهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আব্দুল কাদির ইবনে মুহাম্মদ মুত্তাকী গুফিরা লাহু

৫/৬/১৪০৬ হিজরী,
মোতাবেক ১/৩/১৯৮২ ঈসায়ী
বাদ আসর হারামে নববী শরীফ।

বরকতপূর্ণ অভিমত

যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ হযরত মাওলানা
মুফতি আবদুস সাত্তার সাহেব দা. বা.
প্রধান মুফতি, জামিয়া খাইরুল মাদারিস, মুলতান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِ الرُّسُلِ وَخَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব নানুতবী রহ. এর লেখনি ও কথায় ইলম ও হিকমতের যে সমুদ্র প্রবাহিত হয়েছিল, তার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব দীর্ঘকাল পর্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ ছিল।

তাফসীর, হাদিস, তাসাওউফ ও আকাঈদসহ যে কোন বিষয় বা শাস্ত্রই হোক, তাঁর ক্ষুরধার কলম ও ভাষ্য দ্বারা এমন এমন বিষয়বস্তু প্রকাশ পেত, যা কেউ কখনও শুনেনি। হুজ্জাতুল ইসলামের এমন কিছু পুস্তিকা রয়েছে, যেগুলো বুঝতে ও অনুধাবন করতে বড় বড় আলেমগণও অপারগ।

যখন তিনি শুরু করতেন, তখন মনে হতো কেমন যেন প্রকৃত অর্থ, সূক্ষ্ম বিষয় ও মারেফাতের বিশাল একটি সমুদ্র উথলে পড়ছে। অনবরত বের হচ্ছে। লোকমুখে শ্রবণ করেছি, তিনি বয়ান করার সময় কখনও একটু পর পর থেমে যেতেন। এতে খাদেমগণ আশ্চর্য হতেন। হযরতের এহেন অবস্থাকে প্রকাশ করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, কখনও এমন হয় যে, একটি দাবি ও বিষয়ের জন্য বিশিষ্ট দলিল-প্রমাণ মস্তিষ্কে এসে পড়ে। সেগুলোকে বিন্যাস করার জন্য সামান্য সময় চুপ থাকি। মোটকথা, চুপ থাকা বিষয়বস্তু হারিয়ে ফেলার কারণে নয় বরং অন্তরে অধিক দলিল-প্রমাণ এসে যাওয়ার কারণে। হযরত নানুতবী রহ. এর ইলম ও হিকমতের ফয়জান [প্রবাহ] উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁরই নাতি হযরত মাওলানা কারী তৈয়ব সাহেব রহ. এর প্রতি স্থানান্তরিত হয়েছিল। কুরআন ও হাদিসের সমুদ্র এবং তার তলদেশে বিদ্যমান অমূল্য মণি-মুক্তাকে

হৃদয়ঙ্গম করে সহজ ও সাবলীল ভাষায় শ্রোতা ও পাঠকদের দিল-দেমাগে দৃঢ়ভাবে বসিয়ে দেওয়া তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল।

তাঁর ওয়াজ ও বয়ানসমূহ ইলম ও হিকমতের বিশাল এক ঊর্মি ধারণ করে সমুদ্র হয়ে যেত। নির্ভরযোগ্য সূত্রে শুনেছি, জালান্ধরে অবস্থিত খাইরুল মাদারিসের বার্ষিক মাহফিলে যখন তিনি বয়ান করতেন, তখন সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ বোখারী রহ.-এর ন্যায় প্রসিদ্ধ বক্তা স্টেজে আসন গ্রহণ না করে সাধারণ শ্রোতাদের সাথে নিচে বসে তাঁর ওয়াজ শুনতেন আর বয়ানের প্রভাবে আন্দোলিত ও আত্মহারা হয়ে বারবার প্রশংসাধ্বনি দিতেন এবং বলতেন– 'কারী তৈয়ব নয় বরং মাওলানা কাসেম-এর আত্মা কথা বলছেন।'

ভারত-পাকিস্তান ব্যতীত আরো অগণিত দেশেও হযরতের বয়ান হয়েছে। হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ ইদরীস সাহেব-এর উম্মাতে মুসলিমার উপর বিরাট ইহসান ও অনুদান হলো যে, তিনি অজানা বিভিন্ন স্থান থেকে কারী তৈয়ব সাহেবের অমূল্য মাওয়ায়েজ ও বয়ানসমূহকে একত্রিত করে অত্যন্ত মেহনত ও কুরবানী করে শিরোণাম কায়েম করে উন্নত লেখা ও মুদ্রণ উম্মতের সামনে পেশ করেছেন।

ইতঃপূর্বে আরো কিছু খণ্ড জনাব কারী সাহেবের প্রচেষ্টায় পাঠক সমাজে প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলো হাতে হাতে বিক্রিও হয়ে যাচ্ছে। দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন এ খণ্ডটিকেও ব্যাপকভাবে কবুল করে সমাজ বিশুদ্ধের কারণ বানান। সাথে সাথে সম্মানিত গ্রন্থকার (দা. বা.)কেও যেন প্রশান্তিদায়ক আত্মা, শারীরিক সুস্থতা, আনুগত্যে তাওফিক (যোগ্যতা), পরিপূর্ণ ইখলাস, বিশেষ নৈকট্য এবং নিজ রেজামন্দি ও কবুলিয়্যাতে কামিলার মতো আরো উত্তম ও সুন্দর সুন্দর গুণে গুণান্বিত করেন। আমীন।

মুবারক অভিমত

হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী সাহেব রহ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব রহ. [সাবেক মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ] হিকমতে কাসেমীর যোগ্য উত্তরাধিকারী ও আমানতদার। তিনি তাঁর খুতবা ও বয়ানসমূহে ইলম ও হিকমতের মণিমুক্তা ছড়াতেন। তিনি এমন এমন আশ্চর্য ও দুর্লভ সূক্ষ্ম বিষয় এবং মারেফতের সমুদ্র প্রবাহিত করতেন, যা সাধারণ কোন কিতাবে পাওয়া যেত না। এ কারণে তাঁকে 'হাকীমুল ইসলাম' খেতাবে ভূষিত করা হয়।

মাওলানা হাফেজ কারী মুহাম্মাদ ইদরিস সাহেব হুশিয়ারপুরী سلمه الله تعالى-কে আল্লাহ তায়ালা হাকীমুল ইসলামের হিকমতপূর্ণ খুৎবাসমূহকে একত্রিত ও সংকলন করার উৎসাহ-আগ্রহ নসীব করেছেন। তিনি মরহুম হযরতের বয়ানের ক্যাসেট অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন। মাশাআল্লাহ, তিনি নিজ মিশনে সফলতা লাভ করেন। তিনি 'খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম' নামে ৬ খণ্ড কিতাব প্রকাশ করতে সক্ষম হন। এরই ধারাবাহিকতায় সপ্তম খণ্ডটি আপনাদের হস্তগত হতে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতে আরো উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি দান করুন। তাঁর মেহনত ও চেষ্টাকে কবুলিয়াতের মর্যাদা দান করে উভয় জাহানে ফলপ্রসূ বরকত দান করুন এবং এ খুতবাসমূহের পাঠক-পাঠিকাগণকেও উক্ত সাদকায়ে জারিয়া দ্বারা উপকৃত করুন। আমীন।

بحرمة سيّد المرسلين وخاتم النبيّين سيدنا محمد ن النبى الامى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وبارك وسلم. و اخر دعوانا ان الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن.

মুহাম্মাদ ইউসুফ عفا الله عنه
১৭/৪/১০ হিজরী

মুবারক অভিমত

হযরাতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান সাহেব

সদস্য, ইসলামিক মিশন সংযুক্ত আরব-আমিরাত, দুবাই; প্রধান উপদেষ্টা, জমিয়তে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, সংযুক্ত আরব-আমিরাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَبَعْدُ.

দীনে ইসলাম তথা ইসলাম ধর্ম হলো দাওয়াত ও তাবলিগের ধর্ম। কারণ, এই দীন তামাম পৃথিবীকে কুফর, শিরক এবং গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার বিভিন্ন প্রকার অন্ধকার থেকে, তাওহীদ [একত্ববাদ] ও সুন্নাতের আলোতে এবং সত্য পথে পরিচালিত করার জন্য এসেছে।

এ কারণেই আল্লাহর তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যভাবে হকের তাবলিগ করার আদেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۭ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ۭ

হে রাসূল! পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। [সূরা মায়েদা আয়াত- ৬৭]

আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন--

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً

পৌঁছে দাও আমার পক্ষ হতে যদিও তা একটি আয়াত হয়।

এ কারণে উম্মতে মুসলিমাকে উম্মাতে দাওয়াত ও তাবলিগ বলে। যুগ যুগ ধরে এমন কিছু পূত-পবিত্র ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব অতিবাহিত হয়েছেন, যাঁরা দাওয়াত ও তাবলিগের ময়দানে উল্লেখযোগ্য কর্ম আঞ্জাম দিয়েছেন। এমন মুকাররাম ও মুহতারাম ব্যক্তিত্বদের মধ্য হতে একজন ব্যক্তিত্ব হলেন হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব সাহেব রহ. [সাবেক মুহতামিম দারুল দেওবন্দ, ভারত], যাকে কুদরতি ফয়েজসমূহে অতুলনীয় ইলম ও ফজল দান করার পাশাপাশি, ভাষা ও বয়ানের জাদুকরী মিষ্টতা ও তীক্ষ্ণতা বিশেষভাবে প্রদান করেছেন। তাঁর বয়ান দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল মাহফিলে জাদুর প্রভাবের

ন্যায় প্রভাব ছেয়ে যেত। একটি নীরবতাভাব বিরাজ করত। এ ছাড়াও তাঁর ইখলাস ও সততার কারণে তাঁর সকল বয়ান ও খুৎবা ক্যাসেট আকারে সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছে।

দুবাই শহরে হিন্দুস্তানের কিছু নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সংকলককে জানালেন, বোম্বাই শহরে মরহুম কারী তৈয়ব সাহেবের ক্যাসেট হেফাজত ও প্রচার করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাতে মরহুম হযরতের ১৭০০০ সতের হাজার ক্যাসেটের এক বিশাল ভাণ্ডার জমা করা হয়েছে।

সুবহানাল্লাহ! এতটুকু ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও এমন সংরক্ষণ মনে হয় উপমহাদেশের অন্য কোন বক্তা ও খতিবের ভাগ্যে জোটেনি। এটি তাঁর ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের উজ্জ্বল প্রমাণ। সাম্প্রতিককালে মুলতান সফরে মুহতারাম মাওলানা কারী মুহাম্মাদ ইদরীস সাহেব হুশিয়ারপুরী [দা. বা.] জানালেন, হযরত এখন সপ্তম খণ্ডের বিন্যাস দিচ্ছেন আর তা এখন শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ কথা শ্রবণে আমি আন্তরিকভাবে অনেক খুশি হলাম আর মনে মনে অনুভব করলাম, যে হযরত কারী সাহেব রহ.-এর হিকমতপূর্ণ খুতুবাতগুলো কিভাবে গ্রহণযোগ্য ও সংরক্ষিত হয়েছে! সংকলক সাহেব আমাকে এ ব্যাপারে কিছু লেখার জন্য বললেন। তখন আমি যথাসম্ভব অতিদ্রুত কিছু বিক্ষিপ্ত শব্দ-বাক্য হযরত কারী সাহেব রহ. এর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক ও মিল থাকার কারণে আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কলমের মাধ্যমে কাগজে লিখে দিলাম। আল্লাহ তায়ালা যেন কবুল করে নেন। আর জনাব সংকলক সাহেব ও তার সম্মানিত সাথীবর্গের সকল প্রচেষ্টার প্রতিদান দান করেন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ

মুহাম্মাদ ইসহাক খান عفا الله عنه وعافاه

মুলতান, পাকিস্তান।

১৮/১১/১৪০৯ মোতাবেক ২২/৬/১৯৮৯ ঈসায়ী

বৃহস্পতিবার রাত পৌনে এগারটা।

পূর্বকথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَامِدًا لِلّٰهِ الْعَظِيْمِ وَمُصَلِّيًا عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ

আলহামদুলিল্লাহ। 'খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম' প্রকাশনা সিরিজের সপ্তম খণ্ডটি আপনাদের সামনে এসেছে। এই কিতাবগুলোর উপকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা যা গায়েবিভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমার অযোগ্য ব্যক্তি তো ভেবে পায়নি যে, প্রত্যেক খণ্ড শেষ করার পর সাধারণত নতুন খণ্ডের উপকরণ সহজলভ্য হয় না। কিন্তু যখন নতুন খণ্ডের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে, তখনই উপকরণ অর্জন হয়ে যেত এবং আল্লাহ তায়ালার ফজল ও অনুগ্রহে অতিদ্রুত শেষ প্রান্তে পৌঁছে যেত। তাই শুকরিয়া আল্লাহ তায়ালার। আর খুতুবাতের পাঠকবৃন্দ যাঁরা আহলে ইলমও এবং দোস্ত-আহবাবও, তাঁদের নেক দোয়া সবসময় ছিল। জমিন

আলহামদুলিল্লাহ খুতুবাতগুলো এমন ইজ্জত, সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে যেমনটি স্বয়ং খুৎবাপ্রদানকারীর ছিল। পাকিস্তানে তার প্রচার-প্রসার দিন-দিন উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে আমার একজন দোস্ত যিনি কিতাবগুলোর প্রচার-প্রসারে ও মুদ্রণের অনেক আগ্রহী তিনি ভারত গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে জানালেন, সেখানকার চারটি প্রকাশনা থেকে 'খুতুবাত' প্রকাশ হচ্ছে আর চাহিদা দিন-দিন বেড়ে চলছে।

এ কাজটি যেমনভাবে হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর জন্য সদকায়ে জারিয়া এবং তার দীনি সাওয়াব তাঁর সম্মানিত আত্মা পাচ্ছেন, তেমনিভাবে তার সংগ্রহকারীর জন্যও এটি একটি সৌভাগ্যের কর্ম। আশা করি পরকালেও আল্লাহ তায়ালা আপন ফজল ও করম দ্বারা দুনিয়ার তুলনায় অনেক বেশি কবুলিয়াতের মুআমালা করবেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুনিয়ায় অনেক মাকবুল ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে তো আখেরাতে দুনিয়া অপেক্ষা অনেক গুণ বেশি মাকবুল হবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালার ফজল ও করম

প্রকাশ হওয়ার বাস্তব স্থান হল আখেরাত। দুনিয়া তো হলো তার প্রতিচ্ছবি ও নমুনামাত্র। আল্লাহর নিকট কোন কিছু কঠিন নয়।

পবিত্র মাওয়ায়েজের বক্ষমাণ খণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ খুৎবা হলো দারুল উলুম দেওবন্দের শতবর্ষপূর্তি ও পাগড়ি প্রদান মাহফিলের স্বাগত ভাষণ, যা এই দিক থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রাখে যে, সেটি দারুল উলুম দেওবন্দের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রতিষ্ঠার কারণ ও উদ্দেশ্য, কর্ম ও আন্দোলন, খিদমত ও কারগুযারী ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট। অপর দিকে সেটি আকাবিরে উলামায়ে কেরাম ও সালেহীনে উম্মত যাঁরা আহলে ইলম হওয়ার পাশাপাশি সাহেবে তাকওয়াও ছিলেন এমন আন্তর্জাতিক সম্মেলন জাতির ইতিহাসে বারবার অনুষ্ঠিত হবে না। এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও সম্মানিত ব্যক্তিদের সামনে তা পড়া হয়েছিল।

এ খুৎবার বিশেষত্য শুধু উক্ত খুৎবাসমূহেই নয় বরং স্বয়ং হাকীমুল ইসলাম রহ. এর সম্মানিত সত্তা জীবনে লাখ মাহফিলে খুৎবা বা বয়ান করেছেন। কিন্তু 'সদসালাহ'য় উপস্থিত শ্রোতারা হলেন ভিন্ন। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে, সকল খণ্ডের বিদ্যমান বিষয় বস্তুর অধিকাংশ ক্যাসেট থেকে সংগৃহীত। ক্যাসেট সংগ্রহে যিনি অবিরাম চেষ্টা ও পরিশ্রম করেছেন, তিনি হলেন আমার সম্মানিত ভ্রাতা জেদ্দা প্রবাসী মুহতারাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ রফিক সাহেব (মা. জি.)। বাস্তবতা হলো, ক্যাসেট সংগ্রহের কাজটি সম্পূর্ণরূপে তিনিই আঞ্জাম দিয়েছেন। আর এটি তাঁর তায়াল্লুক (সম্পর্ক) ও মহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ, যা তিনি সাধারণভাবে উলামায়ে দেওবন্দ এবং বিশেষভাবে হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর পবিত্র সত্তার সাথে রাখেন। ক্যাসেট সংগ্রহের কর্ম ব্যাপক হওয়ার পর আরো অনেক দোস্ত-আহবাব বন্ধু-বান্ধব ক্যাসেট সংগ্রহ করে অনুগ্রহ করেছেন, যেগুলো সামগ্রিকভাবে প্রকাশনার ক্ষেত্রে খায়ের ও বরকত হয়েছে বা সহযোগিতা হয়েছে। 'ইফাদাতে ইলম ও হিকমত' নামে একটি আলোচ্য বিষয় আপনাদের দৃষ্টিগোচর হবে। সেটি ক্যাসেট থেকে সংগৃহীত। সেটি হযরত হাকীমুল ইসলামের করাচি আগমনের স্মারক।

তার স্থান ও তারিখ সম্পর্কে তো জানা যায়নি। তবে কোন এক সফরে তিনি পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন। তখন বাদ মাগরিব মজলিস কায়েম হতো। তাতে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত হতে উলামায়ে

কেরাম এবং ইলমি দোস্ত-আহবাবগণ অংশগ্রহণ করতেন। তাঁদের কেউ প্রশ্ন করতেন আর হাকীমুল ইসলাম রহ. আল্লাহপ্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইলম ও হিকমতের মণি-মুক্তা বিবরণ করতেন। প্রশ্নকারী মজলিসের মধ্যস্থলে থাকতেন। তাই তার প্রশ্ন রেকর্ড করা সম্ভব হয়নি। শুধু ক্ষীণ আওয়াজে কিছু একটা শোনা যায়, যা স্পষ্ট নয়। তাই প্রশ্ন-উত্তরের ধারাবাহিকতা রাখা হয়নি। বরং শুধু জ্ঞানগর্ভ উত্তর যা হাকীমুল ইসলাম রহ. এর মোবারক যবান থেকে বের হয়েছে, সেগুলোই কিতাবে সংযোগ করা হয়েছে এবং শিরোণাম কায়েম করে দেওয়া হয়েছে। ফলে উত্তর পাঠ করার পর প্রশ্ন আপনা থেকে পরিস্কার ও সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রশ্ন জানার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে না। ইফাদাতে ইলম ও হিকমতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সপ্তম খণ্ডে সংযোগ করা হচ্ছে। আর বাকি অংশটুকু ইনশাআল্লাহ ৮ম খণ্ডে সংযোজন করা হবে।

যদিও এটি এমন ওয়াজন নয়, যাকে খুতুবাতে শামিল করা যায়; কিন্তু কয়েকটি কারণে তা সংযোজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে আসল ও মূল উদ্দেশ্য হলো খুতুবাতের আশিক ও প্রেমিকদের নিকট এ সকল ইলমও পৌঁছে দেয়া। নতুন কিতাব সাজিয়ে পেশ করা হলেও এতটুকু উপকারী হতো না, যতটুকু খুতুবাতে মিলানোর কারণে হচ্ছে।

আরেকটি কারণ হলো, কিছু প্রশ্নের উত্তর এত দীর্ঘ যে, সেগুলো স্বস্থানে পৃথক খুৎবা হওয়ার মর্যাদা ও যোগ্যতা রাখে। অপর আরেকটি কারণ হলো, উত্তরসমূহের যে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তাতে অনুমান হয় যে, পাঠকদের প্রতি খেয়াল করে সেগুলো সংযোগ করা হয়েছে। কারণ, সেগুলো ইলমি হওয়ার পাশাপাশি জ্ঞান বৃদ্ধিকারকও, যা বয়ান ও বক্তৃতায় কাজে আসবে।

অতএব, 'ইফাদাতে ইলম ও হিকমত' শিরোণামে সকল বিষয়বস্তু যা বিন্যস্ত আকৃতিতে আপনাদের সামনে রয়েছে আশা করি আপনারা মূল্যায়ন করবেন। এ ছাড়া অন্য তাকরিরগুলো নিয়মানুযায়ী একত্রিত করে শিরোণাম কায়েম করা হয়েছে। এই মুহূর্তে খুতুবাতের ৮ম খণ্ডের বিন্যাসের কাজ চলছে। এখন পর্যন্ত আনুমানিক একশত পৃষ্ঠার বেশি লেখা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা হলো অষ্টম খণ্ড পূর্ণ করে অতিদ্রুত আপনাদের হাতে পৌঁছে দেয়া। কিন্তু এতে আপনাদের দোয়ার শক্তি অত্যন্ত

প্রয়োজন। এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে, তার সবটুকু পাঠকবৃন্দের দোয়ার বরকতে হয়েছে। পরিশেষে আল্লাহর মহান দরবারে আরজ হলো, তিনি যেন সম্পূর্ণরূপে কবুল করে নেন এবং এই খুতুবাতকে আমাদের সকলের জন্য শুদ্ধতা, কল্যাণ এবং খায়ের ও বরকতের উছিলা বানান। আমীন। ছুম্মা আমীন।

بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم ، والسلام

অধম ও অযোগ্য বান্দা
মুহাম্মাদ ইদরীস হুশিয়ারপুরী
২৬ রবিউল আউয়াল ১৪১০ হি.
২৭ অক্টোবর ১৯৮৯ ঈসায়ী
রোজ শুক্রবার।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

কালিমাতে তাবাররুক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِوَلِيِّهٖ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّهٖ

বারাকাতুস সালফ [পূর্ববর্তীদের বরকত] হুজ্জাতুল খালফ [পরবর্তীদের দলিল] হাকীমুল ইসলাম হযরাতুল আল্লাম মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব [মা. জি.] এর নামে প্রকাশ হওয়া মাওয়ায়েজ ও খুতুবাত গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। উলুম ও মারেফাতসম্বলিত এই মর্যাদাপূর্ণ খুতুবাতসমূহ, আহলে ইলম, আইম্মায়ে মাসাজিদ, বক্তা ও মুবাল্লিগদের জন্য ইলম ও হিকমতের বিরাট পুঁজি।

শিরোণাম বৃদ্ধির কারণে বিষয়বস্তু হৃদয়াঙ্গম করা অতি আসান ও সহজসাধ্য হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করেছি এবং বেশ কিছু স্থানে 'প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর জ্ঞানী আছে' এ ভিত্তিতে শুদ্ধকরণের নিয়তে চিহ্ন লাগিয়েছি।

আমার স্নেহের মৌলবী হাফেজ কারী মুহাম্মাদ ইদরীস [ফাযেলে জামিয়া খাইরুল মাদারিস, মুলতান] সাহেব দিন-রাত অবিরাম মেহনত ও অনুসন্ধান করে এটি সাজিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার ফজল ও করমে, দয়া ও অনুগ্রহে পরিশেষে কিতাব আকারে পাঠক মহলে এসেছে। অন্তর থেকে দোয়া করি প্রিয় সংকলকের এই মেহনত ও কুরবানীকে রেজামন্দীর মাধ্যম বানান এবং নিজ পক্ষ হতে তাঁকে অগাধ প্রতিদান প্রদান করুন। সাথে সাথে ইলম ও আমলে, সুস্থতা ও জীবনে বরকত দান করে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের সাথে দীনের আরো অধিক শক্তিশালী ও মজবুত সেবা করার তাওফিক দান করুন আর আমাদের সকলকে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

جَزَاكَ اللّٰهُ يَا اِدْرِيْسَ خَيْرًا

عَلٰى مَا صَنَعْتُ لِاَهْلِ الدِّيْنِ خَيْرًا

দীনদারদের জন্য কল্যাণকর বস্তু আঞ্চিারের জন্য আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন।

মুহাম্মাদ শফী عفا الله عنه

১০/৪/১৪১০ হিজরী

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

অকৃতজ্ঞতা হবে যদি পূর্বের ছয় খণ্ডের ন্যায় এই সপ্তম খণ্ডেও শত বর্ণের সমষ্টির মূল উৎসস্থল ও কেন্দ্রবিন্দু ঐ বুযুর্গ ও মেহেরবান ব্যক্তিত্বকে স্থির না করি, যিনি এই কিতাবকে সাজানো ও সংকলনে আমাকে তাঁর শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেছেন আর এই কষ্টসাধ্য ও কঠিন কর্মকে আমার জন্য সহজ করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও উপকার স্বীকারের জযবা প্রকাশ করাও একটা কঠিন ও অসম্ভব কাজ। কিন্তু সাহায্য ও সহযোগিতা যদি এমন ব্যক্তিত্বের পক্ষ হতে করা হয়, যিনি বহুগুণের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে সম্মানিত পিতৃতুল্য হন এবং মর্যাদাবানও হন, তাহলে জযবা প্রকাশে যে দুর্বলতা কাজ করে, তার মানসিকতা কোথা হতে নিবে?

বাস্তবতা হলো এই যে, সম্মানিত পিতৃতুল্য কিবলায়ে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ শফী সাহেব [দা. বা.]-এর ইলমি রাহনুমা এবং আমলি অনুগ্রহ ও দানের দ্বারাই এতটুকু যোগ্যতা পয়দা হয়েছে যে, ফুলের গুচ্ছের ন্যায় নসিহত ও হিকমত একত্রিত করতে পেরেছি।

হাত তুলে দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উছিলায় এই স্নেহের ছায়াকে আমাদের মাথার উপর দীর্ঘকাল অবশিষ্ট রাখেন, নিজ পক্ষ হতে তার শান অনুযায়ী আজর ও সাওয়াব প্রদান করে খুশি ও সন্তুষ্ট করেন আর আমার ব্যর্থ কর্মকে সফল ও স্বার্থক চেষ্টা দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। আমীন।

সূ চি প ত্র

বয়ান : ১

দারুল উলুম দেওবন্দের শতবর্ষ মাহফিলের স্বাগত ভাষণ / ৩৩
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও অভিনন্দন / ৩৪
দেওবন্দ একটি ঐতিহাসিক ও মারকাযি জনবসতি / ৩৫
দারুল উলুম প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ও কারণ / ৩৬
দারুল উলুম দেওবন্দ এবং বিশ্বব্যাপী দীন পুনর্জীবনের আন্দোলন / ৩৮
জামিয়া দারুল উলুমের বুনিয়াদি ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্য / ৩৯
দারুল উলুমের রচনার খেদমত / ৪১
দারুল উলুম দেওবন্দের তালিমী বৈশিষ্ট্য শিক্ষার স্বকীয়তা / ৪৪
দারুল উলুমের সনদের ধারা / ৪৪
জামিয়া দারুল উলুমের ইন্তেজামি কর্মপদ্ধতি / ৪৪
জাতীয় ও সামাজিক অঙ্গনে জামিয়া দারুল উলুমের ঐতিহাসিক খেদমত / ৪৫
বাতিল প্রতিরোধে দারুল উলুমের অবদান / ৪৭
সমকালীন আন্তর্জাতিক চাহিদা / ৪৮
বিশ্বব্যাপী দাওয়াত ও তাবলিগের জন্য তালিমি জামিয়াগুলোর মাঝে
পরস্পর যোগাযোগ ও সম্পর্ক অতি জরুরি / ৫১

বয়ান : ২

তাওহীদের বুনিয়াদ / ৫৩
মানবজীবনের ভিত্তি / ৫৫
বিশ্বজগতের সাথে মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই / ৫৬
পৃথিবী ও মানবসৃষ্টির মাঝে পরস্পর সম্পর্ক / ৫৭
বিশ্বজগতে মানবজাতির মর্যাদা / ৫৯
জগৎস্রষ্টার সাথে মানুষের বিশেষ আচরণ / ৬০
জগতের খাদেমগণ / ৬১
দুনিয়ার মাখদুমদের নির্বুদ্ধিতা / ৬১
ইবাদাতের মাপকাঠি / ৬৪
হায়াতদাতা / ৬৫
সুস্থতাদাতা / ৬৫

অতিরিক্ত চিকিৎসাসামগ্রী ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা / ৬৬
উপকরণের প্রতিক্রিয়ার রহস্য / ৬৬
শিরকের আশঙ্কা আছে এমন বিষয় হতে বেঁচে থাকার তাকিদ / ৬৭
তাওহীদ ও তাসাররুফের পরিচয় / ৬৭
আল্লাহর দরবারে প্রার্থনার পদ্ধতি / ৬৮
হালাল উপার্জনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া / ৭১
হারামের অকল্যাণ বা অশুভ পরিণতি / ৭৩
হালাল খাবারের ইলমি ও আমলি বরকতসমূহ / ৭৩
লোক দেখানো ইলম বা প্রদর্শনযোগ্য ইলম / ৭৭
ইলম বেশি আমল কম / ৭৭
ইলমের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া / ৭৮
গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ / ৭৮
হালাল রিজিক কম হয়; তবে বরকত হয় / ৭৯
ইবাদাতের বুনিয়াদ / ৭৯
মুশরিকরা ধোঁকায় পড়েছে / ৮০
কারিগরি বা শিল্পযন্ত্রের পূজা / ৮১
তাওহীদের দাবি / ৮১
ইবাদাতের হকদার / ৮২

বয়ান : ৩

হজ : একটি আন্তর্জাতিক ইবাদাত / ৮৫
সাম্যের নমুনা বা মডেল / ৮৬
কেবলা বিশ্বব্যাপী হেদায়েতস্থল / ৮৭
মানবজাতির নেতা ও তাদের মার্কায / ৮৭
আন্তর্জাতিক সাম্য / ৮৯
বন্দেগিতে একতা / ৮৯
অন্তর ও দেহকাঠামোর একতা / ৯০
সাম্য ও ইবাদাতে একতা-সমতা / ৯১
আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব / ৯১
হজে আধ্যাত্মিক উন্নতির মর্যাদা স্তর / ৯২
আন্তর্জাতিক সদ্ব্যবহার বা হুসনে সুলুক / ৯২
হজে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য / ৯৩
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা / ৯৫
সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও সমতার দাবি / ৯৪

আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের কেন্দ্রীয় সূক্ষ্ম বিষয়াবলি / ৯৫
বিশ্বস্ততা ও অকপটতা প্রদর্শন বা অন্বেষণ / ৯৫

বয়ান : ৪

তাযকিয়ার গুরুত্ব / ৯৭
ভাল-মন্দের সংমিশ্রণে গঠিত সৃষ্টিজীব / ৯৯
মানুষের উন্নতির রহস্য / ৯৯
ভাল ও মন্দ উভয় জযবার আন্দোলন / ৯৯
ভালো ও মন্দের যুদ্ধ এবং তাদের সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া / ১০১
আদেশ ও নিষেধের রহস্য / ১০১
নাওয়াহির অগ্রগামিতা / ১০২
ওসায়েলে মানহিয়াতকে পরিহার করা / ১০৩
হিজাব বা পর্দার রহস্য / ১০৫
নারী-পুরুষের মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতায় নিষেধাজ্ঞা / ১০৫
মদিনার মসজিদে মহিলাদের জামাতে শরিক হওয়ার আবেদন / ১০৬
তারবিয়াতের পদ্ধতি / ১০৮
বর্তমানকালের মহিলাদের কৃষ্টি-কালচার / ১০৯
পোশাকের উলঙ্গপনা / ১১০
মুনকারাত বস্তু থেকে বেঁচে থাকার তাগিদ / ১১১
সামাজিক ব্যবস্থা ধ্বংসের কার্যাবলি / ১১২
চারিত্রিক দৃঢ়তা ব্যতীত অন্যায়ের মূলোৎপাটন সম্ভব নয় / ১১২
কানুনের আধিক্য দ্বারা অপরাধ হ্রাস পায় না / ১১৩
তাকওয়ার অভ্যাসই অপরাধ থেকে বাঁচাতে পারে / ১১৩
অপরাধ বন্ধে পার্লামেন্টের বিফলতা / ১১৫
অপরাধ বন্ধে ইসলামের কর্মপদ্ধতি / ১১৬
রাষ্ট্রীয় আইন ও আল্লাহর আইনের পার্থক্য / ১১৮
গুনাহের হাকিকত / ১১৮
তারবিয়াতের কেন্দ্রস্থল / ১২০
কলব পবিত্রকরণ / ১২১
গুনাহের স্তর / ১২২
তাওবার স্তর / ১২২
আইনি শাস্তি / ১২৩
পবিত্রতার ব্যবস্থাপত্র / ১২৪
সর্বাবস্থায় জিকির / ১২৪

সার্বক্ষণিক জিকির / ১২৬
জিকিরের অনুশীলন / ১২৬
সার্বক্ষণিক জিকিরের ফলাফল / ১২৭
কবর ও হাশরে জিকির সংরক্ষকের ভূমিকায় থাকবে / ১২৮
মুহাফেযের পরিসীমা / ১২৯
যিকরুল্লাহর দুটি অংশ / ১২৯
সতর্ক বাণী / ১৩১

বয়ান : ৫

মানবসৃষ্টির মৌলিক উপকরণ / ১৩৩
সীরাতুন্নবীর ব্যাপকতা / ১৩৪
মানবচরিত বা সীরাত / ১৩৫
মানবসত্তার সৃষ্টিগত স্তরসমূহ / ১৩৬
মানবসৃষ্টির প্রথম স্তর / ১৩৭
মানবসৃষ্টির দ্বিতীয় স্তর / ১৩৮
মানবসৃষ্টির তৃতীয় স্তর / ১৩৮
মানবসৃষ্টির চতুর্থ স্তর / ১৩৯
মানবসৃষ্টির প্রথম অন্ধকার ঘাঁটি / ১৩৯
মানুষ সৃষ্টির দ্বিতীয় অন্ধকার রুম / ১৪০
মানবসৃষ্টির তৃতীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান / ১৪০
মর্যাদা না লাঞ্ছনা; ইজ্জত না বেইজ্জত / ১৪০
মানুষ ধোঁকায় পড়েছে / ১৪১
মানুষের আসল পরিচয় / ১৪১
সাত্তারুল উয়ুব আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ / ১৪২
বাহ্যিক সৌন্দর্যের হাকিকত / ১৪৩
আকলের বিভ্রান্তি / ১৪৪
নাপাকের প্রেমিক / ১৪৪
সীরাতের মহব্বত / ১৪৬
সীরাতের নেতৃত্ব / ১৪৭
রূপ লাবণ্য ফেতনার কারণ আর সীরাত মুক্তির কারণ / ১৪৭
আভিজাত্যের মাপকাঠি / ১৪৮
কামালের (পূর্ণতার) মাপকাঠি / ১৪৯
মেহনতের কেন্দ্রস্থল / ১৫১
উলুমের মাযার / ১৫৩

আহলে হকদের সংশ্রবে কাশফ লাভ হয় / ১৫৪
মহান আল্লাহর তাজাল্লির কেন্দ্রস্থল / ১৫৭
মানবচরিত্রের প্রথম ভিত্তিমূল / ১৫৮
ইলমে জরুরির পরিমাণ কতটুকু / ১৫৯
কলবের স্বতন্ত্র অনুভূতি / ১৬০
ইলমের হাকিকত / ১৬১
ইলমুল ফুরকান / ১৬১
ফতওয়া চাওয়ার শ্রেণীবিন্যাস / ১৬২
মানবসীরাতের দ্বিতীয় জাওহার / ১৬৩
তাজাম্মুলে ইলম-এর চেতনা / ১৬৪
মানবসীরাতের তৃতীয় জাওহার / ১৬৫
রেজায়ে খালকের পথ / ১৬৫
মালিকের সুদৃষ্টির মর্যাদা / ১৬৬
সকল সৃষ্টিজীব বশীভূত হওয়া / ১৬৭
মুশরিকদের অন্তরের দোদুল্যমানতা / ১৬৮
একত্ববাদীর কলবের বিশ্বাস / ১৬৯
আমলের প্রাণশক্তি / ১৬৯
মানবচরিত্রের চতুর্থ জাওহার / ১৭১
মুকাররাবদের আল্লাহর নিকট গ্রেফতার হওয়ার কারণ / ১৭২
আমলের তাওফিক হওয়া ফজলের নিদর্শন / ১৭৬
কৃতজ্ঞতার আত্মা / ১৭৬
শুকরের সনদ / ১৭৭
ইতিবাচক আমল দ্বারা নেতিবাচক আমল হয় / ১৭৮
ইজ্জতের পথ ও পন্থা / ১৭৯
আমলের পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রাখার ফলাফল / ১৮০
তাফাক্কুরের দৌলত বা চিন্তার উপকারিতা / ১৮১
রূহানিয়াতের চার মৌলিক উপাদান / ১৮১
নববী ইলমই পূর্ণ ইলম / ১৮২
নবী সা.-এর পূর্ণ আমল / ১৮৪
আমলের মানদণ্ড / ১৮৫
আমলের সঠিক ও বাস্তব বিষয় / ১৮৬
নবী সা.-এর পরিপূর্ণ ইখলাস / ১৮৮
ফিকরে নববীর পূর্ণতা / ১৮৯
ঈমানের প্রাণ / ১৯০

ফিকরে আজীম / ১৯১
জীবনের সংবিধান / ১৯৩
কিতাব ও সুন্নাতের বিশাল পাথর / ১৯৩
উসওয়ায়ে সাহাবা বা সাহাবাদের আদর্শ / ১৯৫
সাহাবাগণ সত্যের মাপকাঠি / ১৯৫
সাহাবা জামাতের পবিত্রতা বর্ণনাকরণ / ১৯৬
সন্তুষ্টির ঘোষণা / ১৯৭
আমলে সাহাবার প্রশংসাকরণ / ১৯৯
সাহাবাদের পরিপূর্ণ মারেফাত লাভ / ১৯৯
সাহাবা অন্তরের প্রশংসাকরণ / ২০০
ফেরকায়ে নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত জামাত / ২০১
ইজতিহাদী ভুল / ২০১
সীরাতে নববীর তাকদিস / ২০২
মুকাম্মাল সীরাত / ২০২

বয়ান : ৬

মুসলিম জাতির ট্র্যাজেডি ও তার প্রতিকার / ২০৫
সত্যিকার আবেদন / ২০৬
ব্যাপক দুর্ভাবনা / ২০৬
হযরত মুয়ায রা.-এর হাদিস / ২০৭
একাধিকবার ডাক / ২০৮
মাকামে ইশতিবাহ বা সন্দেহের স্থান / ২০৯
উদ্দেশ্যের প্রতি মন আকর্ষণের জন্য / ২০৯
আগ্রহ-উৎসাহ সৃষ্টির অপেক্ষায় / ২১০
নসিহতের পদ্ধতি / ২১২
হিকমতপূর্ণ তারবিয়াত / ২১৩
তারবিয়াতের বৈশিষ্ট্য / ২১৬
আল্লাহ ও বান্দার পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া / ২১৭
বদল বা প্রতিদানের বিধান / ২১৮
বান্দার চুক্তিভঙ্গ ও অবাধ্যতা / ২১৯
মাথা ও চৌকাঠের আযমত / ২২১
ওয়াদা ভঙ্গের লাঞ্ছনা / ২২২
ইসলামি আইনের কার্যকরী অনুসরণ আবশ্যক / ২২৪
ইজ্জত ও কর্তব্য-নেতৃত্ব অর্জনের কৌশল / ২২৫

ইসলামি রাষ্ট্রগুলো বিধর্মী নির্ভরশীল / ২২৬
স্বাধীনতা, ক্ষমতা ও নেতৃত্ব / ২২৬
দলাদলির অশুভ পরিণতি / ২২৭
জাতীয় অনীহা / ২২৮
জীবনের জরিপ নেওয়া জরুরি / ২২৯
সর্বনিম্ন হিম্মত / ২৩০
মজবুত ও দৃঢ় হিম্মতের প্রয়োজন / ২৩১
উপকরণ ব্যতীত দোয়ার তাসির হয় না / ২৩২
ইজ্জত ও ক্ষমতা লাভের সাধারণ বিধিবিধান / ২৩৩
যিকরুল্লাহর বৈশিষ্ট্য / ২৩৫
যিকরুল্লাহ ও স্টালিন / ২৩৫
কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অর্জনের মাপকাঠি / ২৩৭
মুসলমানদের কর্তৃত্ব লাভের উপকরণ / ২৩৯
দুশমনের সাথে আল্লাহর মুয়ামালা / ২৪০
আমলের তদবির বা কৌশল / ২৪০
দুনিয়াদার আলেম / ২৪১
চেষ্টা ও মেহনতের ফলাফল / ২৪৩
ঈমানের জন্য স্বর্ণের প্রয়োজন / ২৪৪

বয়ান : ৭

নারীশিক্ষা / ২৪৭
উন্নতির প্রথম ধাপ / ২৪৮
দুনিয়াটা একটা শিক্ষাকেন্দ্র / ২৪৯
মহিলাদের তালিমী দায়িত্ব এবং তার প্রভাব ও ফলাফল / ২৫০
রানীর তাকওয়ার প্রভাব তার সন্তানের উপর / ২৫২
হযরত আয়েশা রা.-এর ইলমি মাকাম / ২৫৩
মহিলা ও ইফতার মর্যাদা / ২৫৪
ইলমের মাকসাদ / ২৫৪
তালিম ফিতরাত ও আকল উভয়ের হক / ২৫৫
মহিলার যোগ্যতা / ২৫৬
মহিলাদের নবুওয়াত / ২৫৬
মহিলাদের দীনি উন্নতি / ২৫৭
মহিলাদের বিশেষ তালিম / ২৫৭
ইলম ও হিকমতের উপকারিতা / ২৫৮

আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার মূলনীতি / ২৫৮
বাতেনি মুজাহাদার দৃষ্টান্ত / ২৬০
যোগ্যতার ভিন্নতা / ২৬২
অঙ্গ প্রতিস্থাপন / ২৬২
দীনের বুনিয়াদ মাসয়ালার উপর– মাসলেহাতের উপর নয় / ২৬৪
জন্মনিয়ন্ত্রণ / ২৬৫
সন্তান কম নেওয়ার সাধারণ প্রক্রিয়া / ২৬৬
আসল মাকসাদ জন্মহার বৃদ্ধিকরণ : নিয়ন্ত্রণকরণ প্রাসঙ্গিক বিষয় / ২৬৬
তামাদ্দুনিক জটিলতা / ২৬৭
ওয়াজ-নসিহত দ্বারা ব্যক্তিগত পরিবর্তন আসে / ২৬৭
খিলাফতে আখলাকি / ২৬৮
ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের আলামত / ২৬৯
বিশ্বাসের মাধ্যমসমূহ / ২৬৯
রাসূল সা.-এর ব্যক্তিগত অভিমতের বিধান / ২৭০
তামাদ্দুনিক বিষয়ে রাসূল সা.-এর রায়ের শরয়ী বিধান / ২৭১
নবুওয়াত মানবগুণ ও ফেরেশতাগুণের সমষ্টি / ২৭২
হযরত আলী রা.-এর জিয়াফতের হাদিস / ২৭৩
ইফতা পদের নাজুকতা / ২৭৭
তাদরিস ও তাবলিগের দায়িত্ব / ২৭৮
ইলম ও আমলের পার্থক্য / ২৭৮
হায়াতুন্নবী একটি সর্বসম্মত বিষয় / ২৭৯
হায়াতে কামিল / ২৮০
আত্মা কবজ করার বৈশিষ্ট্য / ২৮০
নবী সা.-এর হাত মোবারকের বৈশিষ্ট্য / ২৮০
নবীজি সা.-এর যবানের বৈশিষ্ট্য / ২৮২
সিয়ামে নবীর বৈশিষ্ট্য / ২৮৩
নবীজির চোখের বৈশিষ্ট্য / ২৮৪
হায়াতে নবীর বৈশিষ্ট্য / ২৮৪
ইন্তেকালের পর হায়াতের বৈশিষ্ট্য / ২৮৪
হায়াতের কিছু নিদর্শন / ২৮৫
হায়াতে শুহাদা / ২৮৭
হায়াতে সালেহীন / ২৮৮
প্রকৃত মৃত্যু কাফিরদের জন্য / ২৮৯
হায়াতের স্তর / ২৮৯

নবীজন্মের বৈশিষ্ট্য / ২৯১
শিশুকালের স্বাতন্ত্র্য শান / ২৯১
হায়াতে বরযখের বৈশিষ্ট্য / ২৯১
হায়াতের প্রকারভেদ বা ধরন / ২৯২
নিরাপদ মত / ২৯৪
বরযখ উন্মুক্ত হওয়া / ২৯৫
সিজ্জিন উন্মুক্ত হওয়া / ২৯৬
আলমে মানাম বা স্বপ্নের জগৎ / ২৯৬
মাইয়েতের মাকাম উন্মুক্ত হওয়া / ২৯৭
একাধিক আসমান ও জমিন / ২৯৯
মাইয়েতের জ্ঞান ও বোধশক্তি / ৩০০
ইল্লিইন ও সিজ্জিনের অবস্থান / ৩০১
কাশফের দলিল ও প্রমাণ / ৩০২
জান্নাত ও জাহান্নামের ভৌগোলিক অবস্থান / ৩০২
রূহের অবস্থান মাকাম / ৩০৪
জিন্নাতের সাথে বিবাহের বিধান / ৩০৪
হযরত হাকীমুল ইসলামের সাথে এক জিনের সাক্ষাত / ৩০৫
মহব্বতের প্রকার / ৩০৬
মিলাদ, কিয়াম ও ওরসের প্রমাণ / ৩০৮
মুসলিম মিল্লাতের পুরাতন ক্ষত, দূষিত ক্ষত / ৩১০
ঐতিহাসিক ধ্বংসাত্মক ফেরকা / ৩১১
দীনি রুচির অভাব / ৩১২
ঈমানের প্রকাশভঙ্গি / ৩১২
মাকামি কাইফিয়াত / ৩১৩
বরযখের কাইফিয়াত / ৩১৪
কাইফিয়াতের ব্যাখ্যা অসম্ভব / ৩১৫
মানুষের বর্ণনাশক্তির দুর্বলতা ও অক্ষমতা / ৩১৬
আল্লাহর প্রশংসা শেষ না হওয়ার কারণ / ৩১৭
অপারগতা ও অক্ষমতা মেনে নেওয়াই শুকরিয়া জ্ঞাপন / ৩১৮
ইয়াজুজ-মাজুজের আসল পরিচয় / ৩২০
ইউরোপিয়ানদেরকে কি ইয়াজুজ-মাজুজ বলা যাবে /৩২০
সিকান্দার বাদশাহর বাধ / ৩২১
কুদরতের নিদর্শন / ৩২১
হযরত কাশ্মীরি রহ.-এর অভিমত / ৩২২

ইউরোপিয়ান জাতির মূল ব্যক্তির নাম / ৩২২
খাতামুদ্দাজ্জাল প্রকাশ হওয়ার নিদর্শন / ৩২৩
খাতামুল আম্বিয়া সা.-এর সাথে দাজ্জালের মোকাবেলা / ৩২৩
বিপরীত বস্তু রাখার রহস্য / ৩২৪
দাজ্জালের অস্বাভাবিক কর্ম / ৩২৫
দাজ্জাল হত্যার পদ্ধতি / ৩২৫
হযরত মসীহ্ আ.কে দাজ্জালের হত্যাকারী বানানোর হিকমত / ৩২৬
খাতিমিয়্যাত গুণে সাদৃশ্য / ৩২৬
রহমতগুণে সাদৃশ্য / ৩২৭
তারবিয়াতে আতবায়ের সাদৃশ্য / ৩২৮
যুহুদ ও শওকতের জীবনীতে সাদৃশ্য / ৩২৯
হযরত ঈসা আ.-এর জন্মে মুহাম্মাদী সাদৃশ্যর দখল / ৩৩৩
হযরত মরিয়ম আ.-এর বৈবাহিক সম্পর্ক / ৩৩৫
হযরত ঈসা আ.-এর সংস্কারক মাকাম / ৩৩৫
ইসলামের বিজয় / ৩৩৬
পরিপূর্ণ দীনের প্রকৃত অবস্থান / ৩৩৭
ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয় / ৩৩৮
হযরত ঈসা আ.কে আকাশে তুলে নেওয়ার রহস্য / ৩৩৯
ইসলামের শানে খাতিমিয়্যাত / ৩৪০
দাজ্জাল থেকে বাঁচার দোয়া করার হিকমত / ৩৪১
হযরত ঈসা আ.-এর আবদিয়াত বা দাসত্ব / ৩৪২
হযরত ঈসা আ.-এর সমাধি / ৩৪২
হযরত মাহদীর আত্মপ্রকাশের আলামত / ৩৪৩
মিনায় ঘোরতর যুদ্ধ / ৩৪৩
শামের বিশ্বযুদ্ধ / ৩৪৪
পশ্চিমা শক্তির পরাজয় /৩৪৫
মুশরিকদের সাথে ইসলামের মোকাবেলা / ৩৪৫
অগ্নিপূজারিদের ইসলামের মোকাবেলা / ৩৪৬
ইয়াহুদিদের সাথে ইসলামের মোকাবেলা / ৩৪৬
খ্রিস্টবাদের সাথে সর্বকালীন মোকাবেলা এবং তার পরিণাম / ৩৪৭
হযরত মাহদী আ.-এর মুজাদ্দিদী মাকাম / ৩৪৮
হযরত ঈসা আ.-এর ন্যায়পরায়ণতা / ৩৪৮
ইনসাফের বাহ্যিক বরকত / ৩৪৯
হযরত ঈসা আ.-এর সাতজন খলিফা / ৩৫০

দাব্বাতুল আরদ বা বিশেষ প্রজাতির প্রাণী / ৩৫০
যাদের উপর কেয়ামত সংঘটিত হবে / ৩৫১
পৃথিবীর বুনিয়াদ বা ভিত্তি / ৩৫১
সংখ্যার গ্রহণযোগ্যতা / ৩৫১
দুনিয়াবাসী কি আকাশেরও উপরে যেতে পারবে / ৩৫২
গ্রহ-উপগ্রহের সম্পর্ক দুনিয়াবাসীর সাথে / ৩৫৩
যখন তাওবার দরজা বন্ধ হবে / ৩৫৪
হাকিকতের প্রতি মনোযোগী হওয়া ইসলামের আলোচ্য বিষয় / ৩৫৫
ভারতে মুসলিমদের একতায় ধর্মীয় উপকারিতা / ৩৫৫
দেওবন্দি ও বেরলভীদের মধ্যকার সম্পর্কের উপকারিতা / ৩৫৫
পরস্পর ঘৃণা ইসলামের রুচিবোধ নয় / ৩৫৬
রসূমের প্রাধান্য / ৩৫৭
ইখতেলাফী মাসায়েলের সহজ সমাধান / ৩৫৭
বেরলভী আলেমদের মানহানি করা উচিত নয় / ৩৫৮
মাওলানা আহমদ রেজা খান রহ. দেওবন্দিদের ফয়েজপ্রাপ্ত আলেম / ৩৫৮
নিজ-নিজ কাজে ব্যস্ত / ৩৫৮
মসজিদ ধৌত করার ঘটনা / ৩৫৯
উলামায়ে দেওবন্দ ও পীর মহর আলী সাহেব রহ. / ৩৫৯
একজন বেরলভী বুযুর্গের সাথে সাক্ষাতের প্রতিক্রিয়া / ৩৬০
সুন্নাত ও বিদয়াতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ভিন্ন-ভিন্ন / ৩৬০
ভারত বিভক্তির ব্যাপারে উলামায়ে দেওবন্দের মতানৈক্য / ৩৬১
মুসলমানদের পরস্পর মতানৈক্য অমুসলিমদের বিজয়ী করে / ৩৬২
হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রা.-এর রুমী কুকুরের প্রস্তাবের উত্তর / ৩৬৩
অমুসলিম জাতির পররাষ্ট্রনীতি / ৩৬৩
শতবর্ষ সম্মেলন / ৩৬৪
গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য দাওয়াত দেওয়ার ক্ষতি / ৩৬৪
একতার উপায় ও মাধ্যম / ৩৬৫
দশ রুপীর ফান্ড / ৩৬৫
রাহমাতুল্লিল আলামীনের দান / ৩৬৭
প্রিয় বস্তু দান করার প্রয়োজনীয়তা / ৩৬৭
জান্নাতের নেয়ামতরাজি / ৩৬৭
মানুষ সর্বদিক থেকে নেতিবাচকে বেষ্টিত / ৩৬৮
হাকিকী ওয়াজুদ : অনন্তকাল বিদ্যমান যে সত্তা / ৩৬৯
ইসলামে আমীর নির্বাচন করার পদ্ধতি / ৩৭০

খলিফা নির্বাচনের পশ্চিমা নীতি / ৩৭০
ভিন্ন পন্থা গ্রহণকারী খলিফা / ৩৭১
ক্ষমতার রশি টানাটানির কারণ / ৩৭২
জনতার রায়ের সমতা বিধান করা জরুরি / ৩৭২
খলিফার ভুল-ভ্রান্তির বিধান / ৩৭৩
বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি ফেরকাবন্দির বুনিয়াদ / ৩৭৩
ওরসের মাসয়ালা / ৩৭৫
ইসলামের নামে প্রচলিত প্রথা / ৩৭৭
যিকরে মিলাদ বা জশনে মিলাদ / ৩৭৭
দেওবন্দি, বেরলভী কোনো ফেরকার নাম নয় / ৩৭৮
ইংরেজদের প্রতিশোধ / ৩৭৯
বিদয়াত পরিহার ও সুন্নাতের অনুসরণ / ৩৭৯
পূর্বপুরুষদের অনুসরণ / ৩৮০
শরীয়তের আদবকে প্রাধান্য দেওয়া / ৩৮১
আবুলহাল ও ইবনুলহাল / ৩৮৩

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

বয়ান : ১

দারুল উলুম দেওবন্দের শতবর্ষ মাহফিলের স্বাগত ভাষণ

দারুল উলুম দেওবন্দের রীতি, কাসেমী চিন্তাধারার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান ও দীনি মাদারিসের মাধ্যমে উপমহাদেশে দীন ও ইসলাম কায়েম-দায়েম ও হেফাজতের মাধ্যম প্রমাণিত হয়েছে ও হচ্ছে। এই চিন্তাধারার সফলতার উপর বিগত শতাব্দির প্রতিটি দিন ও রাত তার প্রমাণ দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে দেওবন্দী চিন্তাধারার হাজারো মাদরাসা রয়েছে। সেগুলোতে দেওবন্দী চিন্তাধারার আলেমগণ ইলমি, তাবলিগি ও গ্রন্থরচনার কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। তালিম, তারবিয়াত তথা শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়া দীনের হেফাজত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত পথে মুসলমানদের পরিচালিত করার অন্য কোন পন্থা নেই।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ. وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ!

সদরে মুহতারাম! সম্মানিত সুধি, উলামায়ে কেরাম, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ও উপস্থিত ভ্রাতাগণ!

আমি এই ঈমানি ও ঐতিহাসিক মাহফিল, যা উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহৎ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ-এ দেশীয় আন্দাজে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যাতে ইসলামি বিশ্বের প্রায় সকল ভূখণ্ড হতে উলামা, ফুযালা ও বুদ্ধিজীবিগণ অংশগ্রহণ করেছেন। সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তিনি এ ছোট্ট একটা বস্তিতে বড় বড় ব্যক্তিদের একত্রিত করে একে অপরের সাক্ষাত, পরস্পর সুসম্পর্ক এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতিকে পুনরায় সতেজ করার সুযোগ দান করেছেন। আমি এই সুযোগে অস্বাভাবিক আনন্দ ও খুশি প্রকাশ না করে পারছি না যে, আজ জাতির বড় বড় ব্যক্তিরা উম্মতের ছোট ছোট ব্যক্তির সাথে কাঁধে কাধ মিলিয়ে বসে আছেন। শুধু শারিরীকভাবেই নয় বরং আন্তরিকভাবে একে অপরের সাথে মিলে পরস্পর ইসলামি ভ্রাতৃত্ব, সমতা এবং সম্প্রীতির কার্যকরী দৃশ্যর প্রমাণ দিচ্ছেন, যা শুধু আল্লাহ তায়ালার ফজল এবং তার ইনআম– অন্য কিছু নয়।

لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু জমিনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। *[সূরা আনফাল ৬৩]*

এতে যতই শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, তা কমই হবে। আমি অন্তরের অন্তস্তল হতে দোয়া করছি, আহলে ইলমদের হিম্মত বৃদ্ধি ও মিল্লাতে ইসলামিয়ার ইজ্জত ও সম্মান বাড়ানোর জন্য আপনারা এই ইলমি অঞ্চলে বারবার পদভারে মূখরিত করবেন। আমীন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও অভিনন্দন

অতঃপর আমার সবচেয়ে জরুরী এবং সবচেয়ে বড় কর্তব্য হলো, আমি জামিয়ার খাদেম হিসেবে আমার মজলিসে শুরা, জামিয়ার আসাতিজাহ, শায়খগণ, প্রিয় ছাত্রবৃন্দ, সম্মানিত ফারেগীন, হিন্দুস্তানের মুসলমান, জামিয়ার মেম্বার এবং বিশেষ করে সদসালা মাহফিলের ইস্তেজামিয়া কমিটির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি, যাঁরা পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম তথা অনেক দূর-দূরান্ত থেকে বহু কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে শুধু আল্লাহর রেজামন্দীর তালাশে জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি ইসলামি ঐক্য ও একতার কারিশমাহ যে, আমাদের ন্যায় গরীবদের মাঝে কউমের বড়দের এবং রাষ্ট্রের সম্মানিতদের দেখতে পাচ্ছি। আর তাঁদের সম্প্রীতি ও ভ্রাতত্বের উজ্জ্বল চেহারা দর্শনে নিজেদের চোখের পাওয়ার বা আলো এবং অন্তরের খুশি ও আনন্দ বেড়ে যাচ্ছে। তাঁদের মাঝে শরীয়ত ও মারিফাত উভয় স্তরের আলেমগণ বিদ্যমান। হাদিস ও তাফসীরবিশারদ আছেন। আছেন ফিকাহ ও উসূলবিদরা, রয়েছেন ফালসাফা ও ইলমে কালামা (তর্কশাস্ত্র) এ পারদর্শী ব্যক্তিরা, আরো আছেন ইলমে শরীয়তের মাশায়েখগণ। আছেন আধুনিক জ্ঞানের অধিকারী বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ। রয়েছেন দেশ ও জাতির সর্দারগণ এবং আছেন রাষ্ট্র ও জাতির বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন একেকটি ইউনির্ভার্সিটির মর্যাদা রাখে। তাঁরা নিজেদের সম্মানিত খেদমত ও সেবা দ্বারা মানবতার সঠিক ও শুদ্ধ রাহনুমায়ি করছেন। আমি এই ভেবে হয়রান ও পেরেশান যে, এমন সম্মানিত

ব্যক্তিত্বদের শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা কোন ভাষা ও বাক্যে আদায় করব বা প্রকাশ করব বাক্য যখন এহসান ও কৃতজ্ঞতা অনুপাতে অধিক উঁচু মানের হওয়া দাবি করে। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বদের উচ্চ মর্যাদা পর্যন্ত হাজারো চেষ্টা করে পৌঁছা সম্ভব নয়।

دامان نگاہ تنگ گل حسن تو بسیار

দৃষ্টিসীমা তো সংকীর্ণ; কিন্তু ভূমি তো অনেক বিস্তৃত।

আমার যবান ও বয়ান এমনকি আকাশ এবং ভূমি হতেও সুপ্রশস্তের অধিকারী। ঈমানি তাকাজা এবং দীনি রূহে ভরপুরদের উপর ইখলাসপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জযবাকে দোয়ার আকারে পরিবর্তন করে আপনাদের ভক্তি-শ্রদ্ধাকে অগ্রাধিকার দিয়ে পেশ করছি–

جَزَاكُمُ اللهُ فِي الدَّارَيْنِ خَيْرًا وَأَبْقَاكُمْ فِيْ عِزٍّ عَلَى الدَّوَامِ. امين

আল্লাহ তায়ালা আপনাদের উভয় জগতে উত্তম প্রতিদানে ধন্য করুন এবং ইজ্জত ও মর্যাদার সাথে দীর্ঘ হায়াত দান করেন। আমীন।

দেওবন্দ একটি ঐতিহাসিক ও মারকাযি জনবসতি

মুহতারাম উপস্থিতি! এই জনপদ (দেওবন্দ) যেথায় আপনারা সমবেত হয়েছেন, এটি একটি পুরাতন ও প্রাচীন জনপদ। ইতিহাস অধায়নে জানা যায়, আনুমানিক আড়াই, তিন হাজার বছর পূর্ব থেকে এখানে মানুষ বসবাস করে আসছে। প্রাচীনকাল হতে এ জনপদ দেশীয় ভাইদের মর্যাদাপূর্ণ তীর্থস্থান হওয়ার সুবাদে (এটি 'দেবীকন্ড' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আজও সেই নামে সেখানে বার্ষিক মেলা বসে।) মারকাজ বা কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই 'দেবীকন্ড' নামের কারণে এই জনপদের প্রাচীন নাম ছিল 'দেবীবন' যা পরবর্তীতে অধিক ব্যবহারের ফলে 'দেওবন্দ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই ছোট্ট জনপদে যেখান প্রায় বিশ হাজার মুসলমানের বসবাস, সেখানে একশতের বেশি মসজিদে রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু মসজিদ শাহী আমলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আদিনী মসজিদে (অর্থাৎ প্রাচীন জামে মসজিদ) পাঁচশত বছর অন্য বর্ণনায় আটশত বছরের পুরাতন মসজিদ। এই মসজিদের পাথরের গম্বুজে বাহলুল শাহ আমলের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মসজিদে খানকাহ, বাদশাহ আকবার এর স্মৃতিচিহ্ন। মসজিদে 'সারায়ে পীর যাদগান' বাদশাহ জাহাঙ্গীর যুগের স্মৃতি বহন করে। এই জনপদটি উত্তর ভারতে উপস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ২৯ ডিগ্রী ৫৮ সেন্টিমিটার আর দৈর্ঘ্য ৭৭ ডিগ্রী ৩৫ সেন্টি.। এটি দিল্লী হতে ৯২ মাইল উত্তরে ইউ, পি প্রদেশে অবস্থিত। তার পাশ দিয়ে চলে গেছে শের শাহ বিশ্বরোড, যা পেশোয়ার থেকে কলিকতা গিয়ে মিলিত হয়েছে। এই বসতি প্রাচীনকাল হতেই মারকাজ বা কেন্দ্রের মর্যাদা পেয়ে আসছে। কিন্তু কুদরতের ফয়সালা হলো, এই প্রথাগত মারকাজ হতে শরয়ী ও ইলমি মারকাজ হিসেবে কাজ নেয়া এবং এখানে এমন একটি আন্তর্জাতিক ইলমী ঝর্ণনাধারা চালু করা, যা শুধু ভারতকে নয় অন্যান্য দেশকেও উলুমে নবুওয়াত দ্বারা পিপাসা নিবারণ করবে।

চক্ষুষ্মাণ ও আহলে দিল আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিরা পূর্ব হতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। (যার বিস্তারিত আলোচনা 'তারিখে দারুল উলুম' কিতাবে করা হয়েছে) উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে এ জনপদটি আলেম, ফাযেল, আরবী সাহিত্যিক, স্বাধীনতাপ্রিয় জানবাজদের এবং দীনি ময়দানের নেতৃত্ব দানকারীদের বসতি হওয়ার ছিল। অথবা প্রকাশ্য কারণ হিসেবে এ এলাকার প্রাচীন মসজিদগুলোর প্রকাশ্য কারণ হিসেবে এ এলাকার প্রাচীন মসজিদগুলোর আযান, তাকবীর, যিক্‌র ও তেলায়াতের মাহফিলসমূহ এবং ব্যাপকহারে নামাযিদের বরকতে দীনি রংগে রঙ্গীন হওয়ার ছিল।

দারুল উলুম প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ও কারণ

১৮৫৮ ঈসায়ীর হাঙ্গামা ও গোলযোগের পর, দেওবন্দের নবযুগ সূচনা হয়। এমন মুহূর্তে সেখানে ইলমি ও মারেফাতি জগতের তারকা উদিত হলো, যখন হিন্দুস্তানের তথা ভারত উপমহাদেশের কর্তৃত্ব ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠীর হাতে চলে গিয়েছিল। আর ইসলামি শক্তির প্রদীপে শুধু ধোঁয়ার বাতাস বের হচ্ছিল, যা একেবারে নিভে যাওয়ার পূর্ব ঘোষণা ছিল। দিল্লীর মোগল শাসনের পতন ঘটেছিল। ইসলামি নিদর্শনগুলো ধীরে ধীরে বিলীন হচ্ছিল। দীনি শিক্ষা কেন্দ্র ও ইলমি আমলি খানকাগুলো বিরান হয়ে পড়েছিল। ধর্মীয় অনুভূতি বিদায় নিচ্ছিল। মূর্খতা ও গোমরাহীর ঘাঁটি হিন্দুস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল বা বিস্তৃত হয়েছিল। সুন্নাতে আম্বিয়ার স্থলে জাহেলী প্রথা ও শিরকমিশ্রিত বিদয়াত ও অশ্লীল কথা-কাজ এবং আত্মপূজা খুব জোরেশোরে চলছিল। ফলে সর্বত্রই নাস্তিকতা, ধর্মদ্রোহীতা, ব্যক্তিপূজা, স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তা এবং অপসংস্কৃতি ও

নৈরাজ্যের ব্যাধি ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামি বাগিচা সুরেলা ধ্বনিওয়ালা পাখিদের সংগীতের পরিবর্তে জাঁকজমকপূর্ণ হারাম বাদ্য-যন্ত্রে ভরে যায়। সমগ্র মুসলিম সমাজ বিহবল ও দিশেহারা এবং নিরাশা ও হতাশায় হাবুডুবু খাচ্ছিল আর আলেম সমাজের জন্য ফাঁসির মঞ্চ অথবা নির্বাসনের কষ্ট প্রস্তুত ছিল।

এহেন সংকটময় মুহূর্তে গুটিকয়েক পবিত্রাত্মা নিজেদের আলোকিত অন্তরে এমন ব্যাকুলতা ও যন্ত্রণা অনুভব করলেন যে, নির্যাতিত, পদদলিত মুসলমানদের জাতিসত্তার হেফাজত এবং ইলমে নবুওয়াত ও ইসলামি সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। তাদের মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি এবং ধর্মীয় ও রাজনীতির চিন্তাধারাকে কিভাবে নতুনভাবে জাগানো যায়? তখন সেই ভয়াবহ মুহূর্তে উম্মাতের সালেহীনরা পাহাড়সম হিম্মত নিয়ে ময়দানে আবির্ভূত হন। যাঁরা কোন প্রকার রাজনৈতিক লিডার বা নেতা ছিলেন না বরং আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ ও যুগের অলি ছিলেন। তাঁরা গায়েবি ইঙ্গিত পেয়ে ওঠে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আগে বেড়েছিলেন। তাঁদের প্রধান রাহবার ছিলেন হুজ্জাতুল ইসলাম হযরাতুল ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী রহ.। তিনি আল্লাহ তায়ালার গায়েবি ইশারাকে বুঝতে পেরে তাকে প্রস্তাবাকারে পেশ করলেন যে, একটি দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে তাতে শিক্ষা, তারবিয়াত এবং ইলম ও আমলের মাধ্যমে নিমজ্জিত মুসলিম জাতিকে ভরসা ও শক্তি দিয়ে অন্তরমরা ভূমিকে পুনরায় জীবিত করতে হবে।

১৫ মুহাররামুল হারাম ১২৮৩ হিজরী মোতাবেক ৩০শে মে ১৮৬৬ ঈসায়ীতে বিশ্বব্যাপী দীন পুনর্জীবনের আন্দোলনের বৃক্ষচারাটি ছাত্তা মসজিদে ঐতিহাসিক আনার বৃক্ষের নিচে শুধু দুজন ব্যক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তঁদের উভয়ের নাম মাহমুদ। তাঁদের একজন হলেন উস্তাদ আর অপরজন ছাত্র। সেই ছাত্রই পরবর্তীতে বিশ্বসেরা শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সে সময় এই অপরিচিত মাদরাসাটির না ছিল ঘর, না ছিল ঘরের আসবাব। ছিল না কোন ভবন। ছিল না কোন প্রকার প্রচার প্রসারের খেয়াল। শুধু তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ-এর পুঁজি ছিল। যার প্রশিক্ষণ ও তাগিদ স্বয়ং বানিয়ে দারুল উলুম হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতভী রহ. উসূলে হাশতেগানার মূল উসূলে বারবার উল্লেখ করেছেন।

দারুল উলুম দেওবন্দ এবং বিশ্বব্যাপী দীন পুনর্জীবনের আন্দোলন

চিন্তা ও অনুভব করার বিষয় যে, যেমনিভাবে ভারত উপমহাদেশ থেকে ইসলামি শান ও শক্তিমত্তা নিঃশেষ করার দুর্ঘটনা ও মহামারী শুধু স্থানীয় ও দেশীয় পর্যায়ের ছিল না; বরং আন্তর্জাতিক ছিল, তার নষ্ট প্রভাব অন্যান্য দূরবর্তী ইসলামি দেশেও পড়েছিল। সুতরাং অল্প কদিন পরেই সারা উপমহাদেশে রাষ্ট্রপরিচালক ও লিডারগণ গোলামে পরিণত হন।

তেমনিভাবে ঈমানি ও ইলমি রঙের দীন জিন্দার এই আন্দোলন, যা দুই মাহমুদ দ্বারা যাত্রা করেছে প্রথম পর্যায়ে শুধু এটা দুর্বল মুকুলের আকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু চক্ষুষ্মানদের দৃষ্টিতে এই মুকুল বা কলি নয় বরং তার বীজের মধ্যেই একটি আলোকিত পবিত্র মজবুত বৃক্ষ মিশে আছে, তা তাঁদের নিকট অনুভূত হয়েছিল, যার মিষ্ট-মধুর ফল দ্বারা শুধু হিন্দুস্তান নয় বরং অন্যান্য দেশসমূহও পরিতৃপ্ত ও পপিুষ্ট হওয়ার ছিল আর সেটি দীন ও ইসলামের দ্বিতীয় উৎসস্থল ও কেন্দ্রস্থল হওয়ার ছিল।

এ কারণে যেখানে গোলাম ও দাস বানিয়ে দেশ ধ্বংস করা বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্র ছিল, সেখানে শিক্ষা-দিক্ষা কার্যক্রমের আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠার চিন্তাধারাও বিশ্বব্যাপী তথা আন্তর্জাতিক ছিল। সেটি শুধু ইলমে দীনের প্রচার-প্রসার হিসেবে বিশ্বব্যাপী ছিল না; বরং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি হিসেবেও বিশ্বব্যাপী প্রমাণিত হয়েছে। ফলে এই আন্দোলনের লালনকারীগণ শত বছর পর হিন্দুস্তানকে গোলামি হতে স্বাধীন করেছেন। তারই স্বভাবগত পরিণাম অবগত করিয়ে যে সমস্ত রাষ্টপ্রধান ও রাজনীতিবিধরা দাসত্বের শিকলে জড়িয়ে গিয়েছিল বা আটকে পড়েছিল, তারাও আস্তে আস্তে স্বাধীনতার নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেন। তাদের ধ্বংসযজ্ঞ ব্যাপক ছিল। তার প্রতিরোধে এই আন্দোলনও বিশ্বব্যাপী ছিল। এ আন্দোলনের ইলমি ও আমলি ঝর্ণাধারা অল্প হাতে গোনা কয়েক বৎরের ভিতর এশিয়া মহাদেশ থেকে আফ্রিকা মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে আর বর্তমানকালে ইউরোপ, আমেরিকাসহ সকল মহাদেশে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছে। বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতার পিছনে নীরব রাহনুমায়ির ভূমিকা পালন করেছিল দারুল উলুম দেওবন্দ।

দারুল উলুমের ফারেগীনরা দরস ও তাদরিসের (শিক্ষা-দিক্ষা) পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার জাতীয় ও রাজনীতি এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার হৃদপিণ্ড ফুঁকে দেন। আর তা শুরু করে ছিলেন

১৮৫৭ সাল থেকে। যখন দেশের আরেকটি জাতিসত্তা তথা হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ভীত-সন্ত্রস্ত ও নীরব ছিল। তাদের কেউ কেউ তোষামোদি কাজে ব্যস্ত ছিল। তখন উক্ত বুযুগর্রা তথা উলামায়ে দেওবন্দরা প্রথম পর্যায়ে দখলদার ইংরেজ বেনিয়াদের মোকাবেলা করেন তলোয়ার দ্বারা। অতঃপর শান্তি ও ইলমি অপরাজেয় শক্তি দ্বারা নীরব জিহাদ চালিয়ে যান। তাঁদের এ জিহাদ দূরদর্শিতার প্রমাণ বহন করেন এবং স্বাধীনতার উত্তাল তরঙ্গ অনেক দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠাতাবর্গ, ফারেগীন এবং আলোকিত অন্তরওয়ালাদের সোনালী ইতিহাসে ভরপুর।

জামিয়া দারুল উলুমের বুনিয়াদি ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্য

এই জাতীয় ও কেন্দ্রীয় জামিয়ার তালিমের (শিক্ষার) বুনিয়াদি উদ্দেশ্য হলো কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ ও ইসলামি ফিকহের তালিম-প্রচলন এবং সেগুলোর বাস্তব ও কার্যকরী অনুশীলন এবং ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার ঘটানো। সাথে সাথে গোষ্ঠীগত ভেদাভেদ, মতপার্থক্য দূরীভূত করে মুসলমানদের ভিতর ঐক্য সৃষ্টি করা। ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রাথমিক রিচার্স সেন্টার হিসেবে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যেক মুসলিম তবকার প্রতি বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতার হাত বাড়িয়েছে। অথবা জামিয়া (ভার্সিটি) হিসেবে তার শিক্ষার সিলেবাস এমন পরিপূর্ণ ও ব্যাপক রেখেছে যে, যাতে কোন মুসলমান তবকা তা থেকে বাইরে না থাকে। নিসাবনামায় হিফজুল কুরআন থেকে শুরু করে তাফসীর, উসূলে তাফসীর (তাফসীরের মূলনীতি), হাদিস, উসূলে হাদিস, ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ, ইলমে বালাগাত ও বয়ান তথা অলংকারশাস্ত্র, ইলমে হাকায়েক ও আসরার তথা রহস্যবিদ্যা এবং মানকুলাত (বর্ণিত)-এর সাথে সাথে ইলমে মাকুলাত (বুদ্ধিগত), মানতিক, ফালসাফাহ্, গণিতশাস্ত্র, উরুয ও ইলমে কাফিয়াহ্, (কবিতার মিল)সহ উন্মুক্ত ঐচ্ছিক বিষয়, সাধারণ জ্ঞান, ডাক্তারী বিদ্যা, প্রকৌশল ও কারীগরি বিদ্যা এবং সুন্দর হাতের লেখা অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়াবাল উক্ত পাঠ্যসূচীতে সন্নিবেশিত ছিল, যাতে সকল ইলমি, আমলি, আখলাকি ও কারিগরি ইত্যাদি তবকার লোকেরা তাকে অপরিচিতি না ভাবে।

শুধু তা-ই নয় বরং তাতে ইলমে দীনের প্রতিটি বুনিয়াদি শাখাকে একেকটি ভিন্ন ভিন্ন মাদরাসা ও কলেজের সমমান রূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। যেমন মাদরাসাতুল কুরআন, মাদরাসাতুত তাজভীদ, মাদরসায়ে ফারসী রিয়াযী, কুল্লিয়াতুত তিব-মেডিকেল কলেজের, কুল্লিয়াতুস্ সানাইয়া-কারিগরি কলেজ,

কুল্লিয়াতুল লুগাতুল আরাবিয়া- আরবী ভাষা শিক্ষা কলেজ, কুল্লিয়াতুল ফিকহ্ ওয়াল ইফতা- ইসলামি ফতওয়া কলেজ ইত্যাদি। তেমনিভাবে সেটি একটি ধর্মীয় ও জাতীয় ইউনিভার্সিটি ও কলেজ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত জামিয়া হতে প্রত্যেক বিষয়ের আলাদা আলাদা বিশেষজ্ঞ ১৬ হাজারের মত তৈরি হয়েছে। আর জামিয়া প্রতিটি বছর উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে চলছে। উক্ত ষোল হাজারের মধ্যে শিক্ষক রয়েছে, মুবাল্লিগও রয়েছে, খতিব ও লেকচারার আছে। আছে চিন্তাবিদ-গবেষক। আরো আছে লেখক ও ইতিহাসবিদগণ। রয়েয়ে শারীরিক ও রুহানী ডাক্তারগণ।

দারুল উলুমের উল্লেখিত সংখ্যা হলো কোন মাধ্যম ছাড়া। আর মাধ্যমওয়ালা ফুযালা বা ফারেগীন অগণিত, যারা দেওবন্দের ফারেগীন দ্বারা তৈরিকৃত তাঁদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। আজ তা কয়েক কোটিতে পৌঁছেছে। তার কোন নির্দিষ্ট হিসাব নেই। এ ইলমি ফোয়ারার লাখ-লাখ উপকার গ্রহণকারী শুধু ভারত উপমহাদেশে নয় বরং এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপসহ সারা আমেরিকায় মূল্যবান দীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। ১৮৫৭ সনের হাঙ্গামার পর হযরত নানুতবী রহ.সহ সকল বুযুর্গানে দেওবন্দের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতি ছিল দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের সঠিক সহযোগিতা করা। সুতরাং হযরত নিজে স্বশরীরে উপস্থিত হযে মাদরাসা স্থাপন করেছেন এবং মুরিদ-মুতাকিদগণের নিকট চিঠি-পত্র পাঠিয়ে বহু মাদরাসা-মক্তব কায়েম করেছেন।

দারুল উলুম দেওবন্দের নমুনা ও কাসেমী চিন্তাধারার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান ও দীনি মাদরাসাই ভারত উপমহাদেশে বাস্তব ক্ষেত্রে দীন প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের মাধ্যম প্রমাণিত হয়েছে ও হচ্ছে। এ কাসেমী চিন্তাধারার সফলতা বিগত শতাব্দির প্রতিটি দিন ও রাতে দৃঢ় সত্যতার সাথে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকায় দেওবন্দী চিন্তাধারার হাজারো মাদরাসা রয়েছে। সেগুলোতে উলামায়ে দেওবন্দরাই ইলমি, তাবলিগি ও তাস্নীফি (রচনায়) ইত্যাদি বিষয়ে নিরলস খেদমত করে যাচ্ছেন। তালিম ও তারবিয়াত ব্যতীত দীন ও ইসলামের হেফাজত এবং ইত্তেবায়ে সুন্নাতে নববী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম])-এর পথে মুসলমানদের পরিচালনা করা ও তাদের কয়েম-দায়েম রাখা অন্য কোন প্রক্রিয়া নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রেরণের ভিত্তি ও উদ্দেশ্য তালিম ও তারবিয়াতে আখলাকেই প্রকাশ করেছেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

আমাকে উস্তাদ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। এবং

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

আখলাকে হাসানা বা উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

অর্থাৎ বিধানবলীর সম্পর্ক তালিমের সাথে, যা প্রথম হাদিসের মর্ম। আর আহকাম অনুযায়ী জীবন-যাপন করার সম্পর্ক তারবিয়াত ও তাযকিয়ায়ে আখলাক (চরিত্র শুদ্ধিকরণ) এর সাথে, যা দ্বিতীয় হাদিসের মর্ম। এ কারণে উলামায়ে দেওবন্দ এ দুটি বিষয়বস্তুকে নিজেদের জীবনের বুনিয়াদি উদ্দেশ্য স্থির করেছেন এবং সফলতার সাথে সেই মনযিল জয় করেছেন।

تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتَ رَسُوْلِهِ (ابن ماجه)

দারুল উলুমের রচনার খেদমত

দারুল উলুমের দ্বিতীয় কর্মধারা হলো গ্রন্থরচনা ও সংকলন। এ কর্মধারাতেও উলামায়ে দেওবন্দের ক্ষুরধার কলম পাঁচ হাজারোর্ধ কিতাব রচনা করে বিশাল রচনাভাণ্ডার উর্দু, ফার্সী, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় লিখে জমা করেছেন, যা উপমহাদেশের সকল ইসলামি গবেষণাগারের অপেক্ষা অধিক ও সুবিশাল প্রাপ্তি। রচনা ও সংকলনের কর্মধারা দারুল উলুমের সূচনালগ্ন হতেই শুরু হয়েছিল। স্বয়ং হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম সাহেব নানুতবী রহ.-এর রচনা পঁচিশোর্ধ্ব, যেগুলোকে ইলমে কালাম, আকাঈদ এবং ইলমে ফিকাহ ইত্যাদির আকলি (যুক্তিগত) ও অনুভবযোগ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত করা হয়েছে। তাঁর পর তাঁর শাগরেদ ও ছাত্ররা রচনার জগতকে নদী থেকে সাগর-সমুদ্রে পরিণত করেছেন। অর্থাৎ রচনার জগত বিশালাকার দান করেছেন। দারুল উলুমের প্রসিদ্ধ রচয়িতা ও প্রাবন্ধিকগণ যাঁরা ফুনুনে দীনিয়্যাহ তথা দীনি বিষয়ে হাদিস, তাফসীর, ফিকাহ, কালাম, ইহসান ইজতেমায়্যিত (সামাজিকতা) রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস ও জীবনচরিত ইত্যাদি বিষয়ে রচনার ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানুভী

রহ.। তাঁর রচিত কিতাবের সংখ্যা এক হাজারের বেশি। তিনি প্রত্যেক ইলম ও ফন্নে, গদ্য ও পদ্যে, আরবী ও ফার্সী এবং উর্দু ভাষায় সংকলন করেছেন।

হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান উসমানী সাহেব দারুল উলুমের ৬ষ্ঠ মুহতামিম, হযরত মাওলানা আব্দুল আযীয সাহেব মুহাদ্দিস গাওজরানাওয়ালাহ, পাকিস্তান। হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহেব, সাবেক মুদাররিস দারুল উলুম দেওবন্দ ও মুহাদ্দিস মাদরাসা মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর। হযরত আল্লামা শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব রহ. মুহাদ্দিস দারুল উলুম দেওবন্দ, অতঃপর তাঁর শাগরেদ ও ছাত্রদের মধ্যে হযরত শায়খুল ইসলাম পাকিস্তান আল্লামা শিব্বির আহমাদ উসমানী সাহেব রহ. 'ফাতহুল মুলহিমের' রচয়িতা হযরত আল্লামা মুফতি কিফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ. মুহাদ্দিস মাদরাসায়ে আমিনিয়্যাহ দিল্লী ও সভাপতি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, হযরত মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী সাহেব সম্পর্কে 'আল কাসিম' ও 'আর রশিদ' পত্রিকা দেওবন্দ। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইযায আলী সাহেব রহ. শায়খুল আদব ওয়াল ফিকহ, দারুল উলুম দেওবন্দ, হযরত মাওলানা মুফতি মাহদী হাসান সাহেব সাবেক প্রধান মুফতি দারুল উলুম দেওবন্দ, হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ সাহেব কাশ্মীরি রহ. মুহাদ্দিস দারুল উলুম দেওবন্দ, শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. মুহাদ্দিস দারুল উলুম দেওবন্দ।

অতঃপর আল্লামা কাশ্মীরি রহ. এর শাগরেদ ও ছাত্রদের মধ্য হতে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব বিন্নূরী রহ. মাওলানা বদরুল আলম সাহেব মিরাঠী রহ., মুফতিয়ে আযম মাওলানা মুহাম্মাদ শফী সাহেব রহ. পাকিস্তান, হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ সাহেব আকরাবাদি, সম্পাদক বুরহান পত্রিকা দিল্লী, হযরত মাওলানা মানযুর আহমাদ নুমানী সাহেব রহ., সম্পাদক 'আল ফুরকান' লক্ষ্ণৌ, হযরত মাওলানা ইদরীস কান্দলুভী শায়খুল হাদিস জামিয়া আশরাফিয়া লাহোর এবং শাহ সাহেবের শাগরেদের মধ্য হতে আমিও একজন নগণ্য রচয়িতা। আমার রচনাকৃত কিতাব সংখ্যা একশ'র বেশি।

তাঁদের পর হযরত মাদানী রহ. এর শাগরেদ ও ছাত্রদের মধ্যে হতে হযরত মাওলানা আব্দুল হক সাহেব প্রতিষ্ঠাতা দারুল উলুম, আকুড়াখটক, পাকিস্তান। হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ মিয়া সাহেব মুহাদ্দিস মাদরাসায়ে আমিনিয়্যাহ দিল্লী। হযরত মাওলানা মান্নতুল্লাহ সাহেব রহমানী, মহাপরিচালক মাদরাসায়ে রাহমানিয়া মুংগীর। হযরত মাওলানা হামিদ আল আনসারী গাজী সাহেব প্রমুখ ছাড়া আরো হাজারো এমন ফুযালা ও ফারেগীন রয়েছেন, যাঁদের ক্ষুরধার লিখনি দ্বারা হাজারো রচনা প্রকাশ পেয়েছে।

এমনিভাবে দেওবন্দের কিতাব রচনার ধারাও উপমহাদেশের সকল রিচার্স সেন্টার হতে অগ্রগামী রয়েছে। দেওবন্দওয়ালারাই দীনের প্রতিটি শাখাকে আলোকিত করেছেন এবং কালের চাহিদা অনুপাতে দীতি মাসয়ালাগুলোকে ইলমি ধাঁচে সমাজের সামনে পেশ করেছেন।

পাশাপাশি দারুল উলুম শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয় বরং তা একটি আমলি তারবিয়াত তথা কার্যকরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও, যেখানে ইলম ও তালিমের সাথে সাথে আমলে সালেহ, আখলাকে ফাযিলাহ্ উন্নত চরিত্র এবং কাসরাতে যিক্‌র অধিক যিকরের রুহ ও ছাত্রদের অন্তরে সংযুক্ত করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে ইদারায়ে হুসনে সুলুক ও ইহসানের অধীনে ব্যক্তিগত তারবিয়াত ছাড়াও উসূলি (বিধানসম্মত) এবং ইলমিভাবে প্রতিটি বিষয়ের মাসয়ালাসমূহকে কিতাব-সুন্নাহ দ্বারা সাজিয়ে এমন উদ্ভাবিত তাসাউফের উপর প্রভাব বিস্তারকারী আঘাত হানলেন, যা সেই যুগে তাসাউফ নামে কিছু বদরুসম, বিদয়াত ও নব উদ্ভাবিত বিষয় দ্বারা পূর্ণ ছিল। এ কারণে এ ইদারা থেকে যাঁরা ফারেগ হন, তাঁদের ইলমের সাথে সাথে ইজ্জত-সম্মান, গাম্ভীর্য, অমুখাপেক্ষিতা, আত্মসম্মানবোধের পাশাপাশি বিনয়-নম্রতা, দুনিয়া বিরাগতা, তাকওয়া এবং শুদ্ধতা ও দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ পায়। এমন হালত তার শাখা মাদরাসাগুলোতেও ছড়িয়ে আছে।

দারুল উলুম দেওবন্দ উপমহাদেশের সকল মাদরাসা ও জামিয়ার জন্য উম্মুল মাদারিস হিসেবে গণ্য। এ কারণে তাকে আযহারুল হিন্দও বলা হয় বা (হিন্দুস্তানের ফল) তার ফয়েয ও বরকতে হাজারো মাদরাসা ও প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে এবং লাখো অন্তরে ঈমানের হেফাজত হচ্ছে। আর অগণিত মানুষ সুন্নাত তরিকায় জীবন যাপন করছে। তেমনিভাবে এ যুগে যুক্তিবিদ্যা পছন্দকরণ এবং ইন্দ্রীয় অনুভবের অভ্যাস যেহেতু মানকুলি দীন (বর্ণনাকৃত) মেনে নিতে বাধা সৃষ্টি করে, সে কারণে ফুযালায়ে দেওবন্দগণ কাসেমী চিন্তাধারায় দার্শনিক আন্দাজে হাজারো রচনা লিখে প্রকাশ করেছেন। ফলে নামকরা আক্‌লি সন্দেহ ও দ্বিধা সংকোচ, সামাজিক ও সংস্কৃতিক অপব্যাখ্যা, পুঁজিবাদের আন্দোলনের পর্দা পরিপূর্ণরূপে স্পষ্টভাবে খুলে যায়।

সম্মানিত ফুযালাদের এ যুগে তো পাগড়ি ও সনদপত্র দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু তারা অনেক দিন পূর্ব হতেই নিজেদের খেদমত ও তালিমের মাধ্যমে তাদের বিশুদ্ধ সনদ প্রমাণিত।

দারুল উলুম দেওবন্দের তালিমী বৈশিষ্ট্য শিক্ষার স্বকীয়তা

দারুল উলুম দেওবন্দে হাদিসের দরস ও তাদরিসের প্রতি বিশেষভাবে নজর প্রদান করা হয়েছে। হাদিস হলো কুরআনুল কারীমের প্রথম ব্যাখ্যা এবং ইসলামি ফিকহের প্রথম উৎসস্থল। এ কারণেই ফন্নে হাদিসকে পূর্ণ করার দ্বারা কুরআনে মুবীন ও ইসলামি ফিকাহ্ উভয়টা হৃদয়ঙ্গম করার সঠিক যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। এ ইদারার নিসাবের বুনিয়াদি অংশ হলো তাফসীর, হাদিস, ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ, ইলমে কালাম, ইলমে বালাগাত ও মায়ানী, আরবী আদব বা আরবী সাহিত্য এবং ইলমে সারফ ও নাহ্ব। আর অবশিষ্ট বিষয়গুলো মাবাদী বা মূলনীতি ও আসবাব হিসেবে অথবা ভিত্তি মজবুত ও ভালো ফলের জন্য পড়ানো হয়।

দারুল উলুমের সনদের ধারা

এ দারুল উলুমের সনদের ধারা। তার ওস্তাদদের সনদের সিলসিলা হযরতুল ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী পর্যন্ত পৌঁছে। অতঃপর তাঁর থেকে সূত্র পরম্পরার সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে। দারুল উলুমের এ জামাত খালেস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, যাদের বুনিয়াদ ও ভিত্তি কুরআন, হাদিস ও ফিক্হে আইম্মা তথা চার মাযহাবের ফিকাহের উপর প্রতিষ্ঠিত তার আসল উসূল বা মূলনীতি হলো তাওহীদ ও আযমাতে রিসালাত, যাতে সকল নবীর দীন অন্তর্ভুক্ত। তার রুচির কারণে সকল মাসয়ালায় প্রথম স্তর হলো নকল ও রেওয়ায়েত এবং সালফে সালেহীনদের আসার বা কউল রয়েছে। এ কারণে সকল ফুযালা কিতাব-সুন্নাহর অর্থ ও উদ্দেশ্য গ্রহণ করেন। সাল্ফদের অভিমত ও তাঁদের বংশপরম্পরা আমল এবং তাদের রুচি পরিচয়ের সাথে সাথে আসাতিজা, শায়েখদের তারবিয়াত ও সুহবত এবং তাঁদের সাহচর্য ও দীর্ঘ দিন সেবা করে অর্জন করেন। কিন্তু এ চিন্তাধারা তার সাথে সাথে আকল ও রেওয়ায়েত ও তাফাক্কুহ ফিদ্দীনকেও কুরআন-সুন্নাহ বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন মনে করেন।

জামিয়া দারুল উলুমের ইন্তেজামি কর্মপদ্ধতি

দারুল উলুমের তালিম ও ইন্তেজাম, শিক্ষা, শৃঙ্খলা, পরিচালনার জন্য নিগরানে আলা হিসেবে একটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মজলিসে শুরা রয়েছে, যাতে দেশের

প্রভাবশালী উলামা এবং চিন্তাবিদ ও দূরদর্শী ফুযালাগণ রয়েছেন। তাঁদের কয়েকজন আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত। ইদারা পরিচালনার অধীনে চব্বিশটি ইন্তেজামি বিভাগ রয়েছে। ষাটজন ওস্তাদ এবং বিভাগওয়ারী দায়িত্বে দু'শতের বেশি কর্মচারী রয়েছেন। যাঁরা নিয়মমাফিক কাজ করে যাচ্ছেন এ সকল বিভাগের আসল উদ্দেশ্য হলো আসাতিজা ও তালাবাদের প্রয়োজন মিটানো এবং শিক্ষার শৃঙ্খলা ও পরিবেশ অটুট রাখা। এতে বৎসরে ত্রিশ লাখ রুপী ব্যয় হয়। এগুলোর জোগান দেওয়ার দায়িত্ব হিসাব বিভাগের উপর ন্যস্ত। তাদের দ্বারা প্রতি বছর বাজেট তৈরি করে মজলিসে শুরা থেকে অনুমোদন করানো হয় এবং তাদের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক অডিট করানো হয়।

জাতীয় ও সামাজিক অঙ্গনে জামিয়া দারুল উলুমের ঐতিহাসিক খেদমত

দারুল উলুম দেওবন্দের কার্যক্রম শুধু দরস ও তাদরিসে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং জাতীয় রাজনীতির অঙ্গনে শরীয়তের অভ্যন্তরীণ সীমারেখাকে বাড়িয়ে ও উন্নত করে নেতৃত্বের অংশীদার হয়েছে ও হচ্ছে। তার আকাবরিদের কারগুযারি ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী রহ. উভয়ে মিলে জিহাদ ও ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহর যে মানচিত্র নিজেদের পবিত্র রক্ত দ্বারা এঁকেছেন, তা সর্বদা উলামায়ে দেওবন্দের নজীর হয়ে থাকবে।

১৮৫৭ সালে হযরত নানুতুবী রহ. বানিয়ে দারুল উলুম এবং যুগের কুতুব মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. প্রধান পৃষ্ঠপোষক দারুল উলুম দেওবন্দ তাঁরা দুজন শামেলীর প্রান্তরে তলোয়ার উত্তোলন করে দখলদার ইংরেজদের সাথে জিহাদ করেছেন। সে যুদ্ধে হযরত নানুতভী রহ. মুজাহিদ বাহিনীর সিপাহসালার ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শাগরেদ হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ. সাবেক সদরুল মুদাররিসীন (প্রধান শিক্ষক) দারুল উলুম দেওবন্দ তিনি একাই নেতৃত্ব নিয়ে দাঁড়ান এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য রেশমি রুমান আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাঁর আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল আফগানিস্তান। তাছাড়া অনেকগুলো সেন্টার ছিল বিভিন্ন দেশে। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্দী রহ. মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া ডাক নাম মাওলানা মানসুর আহমাদ আনসারী রহ., মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এঁর ন্যায় বীর ও জানবাজরা মুজাহিদদের ডান হাত ও সাহায্যকারী ছিলেন। এ পথে হাজারো ঈমানদার শহীদ হয়েছেন এবং হাজারো ঈমানদার

গাজী উপাধি পেয়েছেন। স্বয়ং হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. দীর্ঘ পাঁচ বছর পর্যন্ত ইংরেজ বেনিয়াদের তৈরি করা কয়েদখানা মাল্টা দ্বীপে ছিলেন। সেখান থেকে মুক্তি লাভ করার পর হিন্দুস্তানে এসে জিহাদি জোশে জমিয়তে উলামা ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব পালন করেন। হযরতের পরে এ জামাতটি ফুযালায়ে দারুল উলুমের অধীনে দেশ ও জাতির খেদমত আঞ্জাম দিতে থাকে।

১৯২০ সালের খেলাফত আন্দোলন এবং তারপর ১৯৩০ সালের আযাদি আন্দোলনে অনেক উলামায়ে কেরামগণ অংশগ্রহণ করেছেন এবং নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। এটি ছিল তাদের ওয়ারিসসূত্রে প্রাপ্ত জযবা ও আমলের প্রভাবে যে যখন সম্মানিত বাদশাহ আব্দুল আযীয আলে সাউদ রহ. আরব ভূখণ্ডে প্রকৃত ইসলামি মিশন ব্যবস্থা কায়েম করার সূচনা করেন। তখন উলামায়ে দেওবন্দ সর্বপ্রথম তাঁকে সাহায্য করেন এবং দেওবন্দ হতে বেশ কিছু আলেম তাঁকে সহযোগিতা ও সমর্থন প্রকাশ করার জন্য আরব ভূমিতে গিয়েছিলেন। তেমনিভাবে নিকট অতীককালে যখন বাইতুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিন আযাদির আন্দোলন শুরু হয়, তখন সর্বপ্রথম ইহুদীবাদী ও বৃটেন সম্রাটের বিরুদ্ধে দেওবন্দের ফতুয়া প্রকাশ পেয়েছিল এবং এ ব্যাপারে দারুল উলুমই সকল মুসলিমের মতভেদের উর্ধ্বে উঠে সবাইকে এক ময়দানে ঐক্যবদ্ধ করেন ও বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের ঐক্যের প্রমাণ দেন।

তেমনিভাবে হিন্দুস্তানে মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও তাদের অপদস্থ করার জন্য অথবা অনৈক্য সৃষ্টির জন্য যখনই ঝগড়া-ফাসাদ দাঁড় করানো হয়েছে, তখনই তাঁদের এক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য উলামায়ে দেওবন্দ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সুতরাং মুসলমানদের মাঝে শৃঙ্খলা ও দলভিত্তিক একতা সৃষ্টির জন্য ভারতবাসী মুসলমানরা মজলিসে শুরা প্রতিষ্ঠা করেন। তার মহাপরিচালক ছিলেন হযরত মাওলানা মুফতি আতিকুর রহমান উসমানি সাহেব রহ., ফাযেলে দেওবন্দ ও তাঁর মজলিসে শুরার সদস্য। এ কারণে দারুল উলুম দেওবন্দ যদি এহেন খায়েশ হয় যে, মুসলিম জাহানের রাহনুমা, তালিমি (শিক্ষাক্ষেত্রে) ইলমি, তাহযিব-তামাদ্দুন এবং একতা ও সামাজিকতার ময়দানে উলামায়ে দেওবন্দ ও ভারতবর্ষের মুসলমানদের দ্বারা সাহায্য সহযোগিতা করাবেন, তাহলে তার সর্বদিক থেকে উজ্জ্বল ইতিহাসের আলোকে নিঃসন্দেহে খায়েশ পুরা করা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত।

মোটকথা, যখনই কোন রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ফেতনার আবির্ভাব ঘটেছে, যা দ্বারা মুসলমানদের সামাজিক অথবা ধর্মীয় বিষয়ে আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা করা

হতো। তখনই উলামায়ে দেওবন্দ বহির্বিশ্বেও ফেতনা প্রতিরোধে তেমনি বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন যেমনটি নিজ দেশে সর্বদায় তাদের জন্য অগ্রগণ্য ছিল।

বাতিল প্রতিরোধে দারুল উলুমের অবদান

ইংরেজ হুকুমাতের ইঙ্গিত ও ইন্ধনে ভারতবর্ষে অনেক পথভ্রষ্টকারী; রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যাদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের বাসিন্দা বিশেষ করে মুসলিম সমাজে সঠিক পথ থেকে টলায়মান করার জন্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার ফুযালাগণ অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তাদের প্রতিহত ও প্রতিরোধ করেন। আলহামদুলিল্লাহ তাঁদের চেষ্টার বদৌলতে মুসলিম জনগণ ইংরেজ হুকুমাতের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড হতে অনেক হেফাজতে রয়েছেন। কিছু বাতেল ও গোমরাহ আন্দোলন হযরত নানুতবী রহ. জীবন্তকালে খুব বাহ্যাড়ম্বর ও জাঁকজমকের সাথে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাঁর পক্ষ হতে ইসলামি আহকাম ও মাসাঈলের উপর কিছু ভুল ও অজ্ঞতাপূর্ণ আপত্তি প্রচার করা হয়। কিন্তু স্বয়ং দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠা ও তাঁর শাগরেদ ও ছাত্ররা মুনাজারা ও কিতাব রচনার মাধ্যম তাদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিবন্ধক রচনা করে তাদের নিঃশেষ করে দেন।

হাদিস অস্বীকার ফেতনা প্রকাশিত হলে তাকে ফুযালায়ে দেওবন্দরা তথা হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব আযমি রহ. হযরত মাওলানা মানাযির আহসান সাহেব গিলানী রহ. এবং স্বয়ং কিতাবওয়ালা অত্যন্ত দলিল প্রমাণ সম্বলিত কিতাব রচনা করে তাদের প্রতিরোধ করা হয়। তেমনিভাবে যখন কাদিয়ানিয়্যাত ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে মুসলমানদের মুরতাদ বানানোর স্কিম তৈরি করা হয়, তখন দারুল উলুম তার পঞ্চাশোর্ধ্ব ফুযালাকে তাদের মোকাবেলায় ময়দানে পাঠিয়ে তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র লণ্ডভণ্ড ও মূলোৎপাটন করা হয়। ইসলামি ফিকাহ শাস্ত্রে যখন ফেতনার আবির্ভাব ঘটে, তখন দারুল উলুম 'কাযায়ে শরয়ী' (শরয়ী আদালত) কায়েম করার আন্দোলন শুরু করে। হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মাদ আহমাদ সাহেব রহ. দারুল উলুমের পঞ্চম মুহতামিম। তিনি পাঁচশত আলেমের দস্তখত নিয়ে বৃটেন তথা ইংরেজ হুকুমাতের দরবারে শরয়ী আদালত বিভাগের অনুমতি চেয়ে আবেদনপত্র পেশ করেন। ফলে বাতেল আন্দোলন ও আন্দোলনকারীরা দুর্বল হয়ে পড়ে। এখন কিছু দিন পূর্বে পুনরায় ঐ ঘৃণ্য জঘন্য আন্দোলন ফিকাহ শাস্ত্র সংস্কার ও সংশোধন রূপ ইখতিয়ার করে আত্মপ্রকাশ করে এবং পার্সোনাল 'ল' ও ফিকহের মধ্যে সংস্কার করার আওয়াজ উঁচু করতে

থাকে। তখন দারুল উলুমের আন্দোলনের ফলে বোম্বাই শহরে সকল মুসলিম ফেরকার কাউন্সিল আহবান করা হয় এবং ইন্ডিয়াবাসীর জন্য মুসলিম পার্সোনাল 'ল' বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়, যে বোর্ডের সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান নির্বাচিত হন তখনকার দারুল উলুমের মুহতামিম সাহেব। আর বোর্ডের ঐক্যবদ্ধ মত প্রকাশের ফলে হুকুমাত ঘোষণা করে, নিজস্ব মুসলিম ল-এর মধ্যে কেউ সংস্কার করতে পারবে না।

মোটকথা, উপমহাদেশে দারুল উলুমের উলামায়ে রাব্বানী ও সালেহীগণ দরস-তাদরিসে লিপ্ত থাকার পাশাপাশি ধর্মীয় ও দীনি পরিবেশকে কখনও কাদাযুক্ত ও বিষাক্ত হতে দেননি। বরং অন্তর ও দেমাগকে আলোকিত করার জন্য দালিলিক রচনা-প্রবন্ধ ও কিতাব এবং বয়ান ও খুতবার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী প্রাচীর নির্মাণ করে তাদের সয়লাবকে প্রতিরোধ করেন। তেমনিভাবে উপমহাদেশের শিরকযুক্ত পরিবেশে দারুল উলুম দেওবন্দ দীনে তাওহীদকে তার আসল আকৃতিতে কায়েম ও স্থির রেখেছে।

আর আজ জামিয়া জাতীয় মাহফিলে আপন খেদমত ও কার্যাবলির উপর বিশাল এক অনুভবযোগ্য দলিল হিসেবে তার হাজারো ফুযালা তৈরি করায় শুকরমিশ্রিত গৌরব অনুভব করছে, যাদের সেবার ফলে পৃথিবী জুড়ে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে এবং করে চলছে।

সমকালীন আন্তর্জাতিক চাহিদা

দারুল উলুমের ঐ ইলমি ও আমলি ফলাফল তখনকার সময়ের, যখন দুনিয়া বিক্ষিপ্তভাবে ছিল, প্রত্যেক দেশের কার্যাবলি নিজ দেশে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ পরিবহন ও স্থানান্তর মাধ্যম এবং ইলম ও সংবাদ প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা সহজ হওয়ার কারণে সারা পৃথিবী ছোট হয়ে একটি খান্দান ও বংশের ন্যায় ছোট হয়ে গেছে। কোন রাষ্ট্রই শুধু নিজেদের ভিতরগত রাজনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি দ্বারা কার্যাবলি চালাতে পারে না যতক্ষণ অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে মজবুত সুসসম্পর্ক না থাকে। এই হিসেবে আজ সারা দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহ এক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছ এবং পুরা দুনিয়া একটা কেন্দ্রের অধীনে চলে এসেছে। ফলে রাজনৈতিক বিষয় হোক বা শৃঙ্খলজনিত বিষয় হোক সবগুলোই আন্তর্জাতিক রংয়ে প্রতীয়মান হচ্ছে। এ কারণে আমাদের আজ স্থানীয় ও দেশীয় গণ্ডি হতে অগ্রগামী হয়ে আন্তর্জাতিক সীরারেখায় পা রাখার প্রয়োজন অনুভব হচ্ছে। আর দারুল উলুম তো শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক মেজায অবলম্বন করে আসছে। কখনও দেশীও

এবং আন্তর্জাতিক ইসলামিক আন্দোলন ও একতায় অংশগ্রহণ থেকে পশ্চাদপসরণ করেনি। আলমে ইসলামি কনফারেন্স মিশর, রাবেতা আলমে ইসলামি মক্কা, সিরাত ও সুন্নাহ কনফারেন্স দোহা-কাতার, মুতামার আল জুগরাফী রিয়াদ ইত্যাদি সংগঠনের কনফারেন্সে দারুল উলুমের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছে। আর বর্তমানকালে সদসালাহ জলসার পরিচিতি ও প্রচার-প্রসারের কাজেও দারুল উলুম তার প্রতিনিধিদল কুয়েত, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাঠিয়েছে। ইদানীং রাবেতা আলমে ইসলামির আহ্বানে দারুল উলুম হতে শিশুদের শিক্ষা-দিক্ষা ও লালন-পালন সম্পর্কি কিছু রচনা-প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন কলম সৈনিকেরা। আজও দারুল উলুমের এমন জযবা ও আগ্রহ রয়েছে যে, ঐ ইলমি ও তাহযিব-তামাদ্দুনিক উদ্দেশ্যগুলোকে একতার রঙয়ে রঙিন করে আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্যে রূপান্তর করবে। ইসলামি শিক্ষাকে ইজতিমায়ী শক্তি দ্বারা আন্তর্জাতিক হিসেবে প্রকাশ করবে। আর ইসলাম ধর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী সন্দেহ ও সংশয়ের পর্দাকে ইজতিমায়ী রংয়ে রঙিন করে কর্তন ও খণ্ডন করবে।

নিঃসন্দেহে উক্ত কাজের জন্য প্রয়োজন ছিল, দেশীয়ভাবে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি ইসলামি জাহানের জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিদের কষ্ট দেওয়া, অংশগ্রহণ করানো এবং দারুল উলুমের খেদমতের রূপরেখা পেশ করে তাদের মূল্যবান পরামর্শ হতে উপকৃত হওয়া। মনে রাখবেন, উক্ত খেদমত পেশ করার বাসনা কখনও জামিয়ার বড়ত্ব প্রকাশ বা জামাতবদ্ধভাবে আত্মপ্রকাশের জন্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, অতীতের ধারণা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য আপনাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে ঐ তাবলিগ (প্রচার) তালিমী, তাহযিবী ও সংস্কৃতির উদ্দেশ্যগুলোর শিক্ষার কোন এমন উজ্জ্বল কর্মপদ্ধতি তৈরি করা, যার সাহায্য সমগ্র মুসলিম জাহানের একতা শক্তির কার্যকারক হতে পারে। ফলে এ দীনি মাকসাদগুলো আন্তর্জাতিক ও ঐক্যবদ্ধভাবে পৃথিবীতে প্রকাশ পাবে এবং সাধারণ মুসলমানদের জীবনে কোন কার্যকরী প্রভাব ফেলতে পারে। আর তারা ঈমানি ভ্রাতৃত্ব, পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা, ইলমি অংশিদারিত্ব এবং চিন্তাধারার একতার হিম্মতের সাথে ঐক্যবদ্ধ সংকল্প ও খেদমতে কাজে লাগে আর তাদের মাঝে এমন দীনি আগ্রহ পয়দা হয়, যা প্রথম শতাব্দি মুসলমানদের মূলনীতি ছিল! এমন পরিস্থিতি ছাড়া তাদের হীনমন্যতা দূর করা সম্ভব নয়, যা আজ তাদের মধ্যে ছেয়ে গেছে।

ইসলামের বাস্তব মাকসাদ যদি এই হয় যে, দুনিয়ার সকল জাতি-গোষ্ঠীকে সংশোধন এবং তাদেরকে আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত করা, তাহলে ইসলাম

গ্রহণকারীদেরও এ মাকসাদ না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। এ কথা তো স্পষ্ট যে, বর্তমানকালে এ মাকসাদ ইজতিমায়ী (ঐক্যবদ্ধ) স্লোগান, ইজতিমায়ী বুদ্ধি, ইজতিমায়ী চিন্তা-গবেষণা এবং ইজতিমায়ী সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতীত সমাধান হতে পারে না। এর বাস্তবতা বুঝানোর জন্য আজ কোন দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই যে, আজ কোন স্লোগান ঐ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, যতক্ষণ-না তা বিশ্বব্যাপী ও আন্তর্জাতিক হয় এ কারণে আজ সকল বিষয় আন্তর্জাতিক। ধরা যাক, রাজনীতির কথা। তা আন্তর্জাতিক। তাহজিব-তামাদ্দুন ও সামাজিকতা; তাও আন্তর্জাতিক। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরি পেশা; তাও আন্তর্জাতিক। সন্ধি ও যুদ্ধ; তাও আন্তর্জাতিক। এমনকি খেলাধুলাও আন্তর্জাতিক। এ কারণে কুদরতিভাবে মন-মানসিকতায় এ জযবা পয়দা হওয়া উচিত যে, দীনের দাওয়াত ও ইসলাহী স্লোগানও আন্তর্জাতিক হবে। বিশেষ করে ইসলাম যেহেতু নিজেই জাতিগতভাবে আন্তর্জাতিক হয়ে দুনিয়ায় এসেছে। ইসলাম সারা পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠীর জন্য বার্তাস্বরূপ। বরং ইসলামই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূচনাকারী। এ কারণে আমরা বুঝে নিচ্ছি–

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

'সকল দীনের উপর বিজয়ী করার জন্য'

এর ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়ার সময় এসে গেছে।

আর সেটি ঐ সময় যখন ফিতরাতে (প্রকৃতি) ইসলাম আহ্বান করতে থাকে যে, এ দীন আন্তর্জাতিক দীন এবং তার মানবিক কল্যাণ ও সফলতার জিম্মাদার, আন্তর্জাতিক মাকসাদ ও তার সর্বব্যাপী তামাদ্দুন ও আন্তর্জাতিক রংয়ে দুনিয়ার আবির্ভাব হয়েছে। তাওহীদ ও সুন্নাতবাহী দিল গঠন করার পর বর্তমান পরিস্থিতি সামনে রেখে জামিয়া দারুল উলুমের এমন খায়েশ নিঃসন্দেহে উপযুক্ত ও সময়োপযোগী যে, এই আধুনিক ও নতুন শতাব্দিতে উম্মাতে মুসলিমার ইসলামের আন্তর্জাতিক মাকসাদসমূহকে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করে এগিয়ে নিযে যাওয়া। আর সেই কর্মগুলো এখনও ব্যক্তিগত বা একক প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিতে হচ্ছে, সেগুলোকে ইজতিমায়ী বানানো, যাতে সমগ্র পৃথিবী ইসলামের সঠিক রূপরেখা সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

বিশ্বব্যাপী দাওয়াত ও তাবলিগের জন্য তালিমি জামিয়াগুলোর মাঝে পরস্পর যোগাযোগ ও সম্পর্ক অতি জরুরি

আমাদের নিকট চিন্তাযোগ্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিশ্বব্যাপী ইসলামি দাওয়াত এবং মুসলমানদের সামাজিক অনৈক্য দূরীভূত করা। আর অনুসন্ধান করা যে, তাদের মধ্যে কী কী কারণে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তা দূর করার কী পদ্ধতি হতে পারে। সাধারণত মূর্খ ও নিরক্ষর শ্রেণীর অনৈক রসুম (প্রথা) রেওয়াজ এবং অন্ধ বিশ্বাস ও অনুসরণ দ্বারা ক্রমবিকাশ হচ্ছে, যা দাওয়াত ও তাবলিগ দ্বারা দূর করা সম্ভব। আর নেতা ও লিডার পার্সনের অনৈক্য পদমর্যাদা লাভ এবং নফসের খায়েশ দ্বারা মুকুলিত হচ্ছে, বেড়ে চলেছে। যার সমাধান তাদের সাথে হামদর্দীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে দাওয়াতের কাজে লাগানো। এ কারণে তাদের জন্য আত্মার জ্ঞানে জ্ঞানী এমন নিষ্ঠাবান, চিন্তাশীল, মুসলেহীন (সংশোধনকারী)দের প্রয়োজন, যারা প্রত্যেক দেশের নেতৃত্বস্থানীয় পার্সনকে তাদের নেতৃত্ব বহাল থাকার আশ্বাস ও বিশ্বাস প্রদান করেন, তাদের ব্যক্তিগত সংশোধনের পাশাপাশি ঐ বিশ্বব্যাপী দাওয়াত ও তাবলিগের জন্য উৎসাহ প্রদান করে তাদের থেকে কাজ নিবেন।

অতএব কর্মবন্টন বিধান অনুপাতে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য ইসলাহী ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিন্তা-ফিকির প্রয়োজন। সাথে সাথে এ বিষয়ে ব্যয়ের খাতসমূহ এবং জাতীয় অংশীদার ভিত্তিক ফান্ড গঠনের প্রতিও মনোযোগী হওয়া জরুরি। এই মহান দীনি ও জাতীয় মাকসাদ এবং খেদমতের জন্য এ কেন্দ্রীয় জামিয়া সার্বিকভাবে ইলমি ও কাযকরী সেবা প্রদান করার জন্য সর্বদায় প্রস্তুত রয়েছে আমরা আশাবাদী যে, সম্মানিত আলেম ও চিন্তাবিদগণ এ ব্যাপারেও মূল্যবান সুপরামর্শ প্রদান করে উপকৃত করবেন যে, এ কেন্দ্রীয় জামিয়া মুসলিম জাহানের সকল জামিয়া ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যথাসম্ভব এক পদ্ধতিতে শিক্ষার সাথে সাথে এমন নিকটতর সম্পর্ক সৃষ্টি করা যার ফলে শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন ও সনদ সংগ্রহ সহজসাধ্য হয়। আর সারা বিশ্বে দীনি খেদমত করার পথ সুগম হয়। চিন্তা করলে দেখা যাবে বর্তমানকালে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি একটি বড় শক্তি, যা আমরা পরস্পরে একে অপরের সাথে তালিম, তাহযীব ও তাবলিগি মাপকাঠিতে জুড়তে পারি, সংঘবদ্ধ হতে পারি। তার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হবে যেখানে প্রতিষ্ঠান একে অপরের খেদমত সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য মাধ্যম সরবরাহ করবে, সেখানে ইসলামের দুশমনদের পক্ষ হতে প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একে অপরকে অবগত

করাবে এবং তৎক্ষণাত তা প্রতিরোধ ও বন্ধ করার জন্য নিজেদের প্রচার মাধ্যমগুলোকে পুরাপুরি ব্যবহার করবে।

এ হলো দারুল উলুমের অতীত খেদমতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। ভবিষ্যৎ প্রাণ-পরিকল্পনা পেশ করে কিছু পরামর্শনামা পেশ করা প্রয়োজন মনে করছি, যাতে এ উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্মেলনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আগত প্রজন্মের জন্য স্থায়ী ও সুন্দর মনে হয়।

পরিশেষে শ্রবণশক্তিকে কষ্ট প্রদানের কারণে ক্ষমা প্রার্থনার সাথে সাথে সদরে জলসা ও সম্মানিত মেহমান এবং সম্মানিত উপস্থিতিদের আগমনে অন্তর থেকে আবারো শুকরিয়া জ্ঞান করে স্বাগত বয়ান এখানেই শেষ করছি।

والحمد لله كثيرا اولا واخرًا

দোয়ার মুহতাজ

মুহাম্মাদ তৈয়ব

মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ

২৫ রবিউল আউয়াল ১৪০০ হিজরী

মোতাবেক ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০

বয়ান : ২

তাওহীদের বুনিয়াদ

ইসলামী শরীয়তের দাবি হলো, ইবাদাতের বুনিয়াদ উপকার ও অপকার বা লাভ-ক্ষতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ লাভ-ক্ষতি একজন মালিকের আয়ত্তে রয়েছে বিধায় পার্থিব উপকরণাদির লাভ-ক্ষতি তাদের আয়ত্তে নেই। ঐ মালিকেরই ইচ্ছায় লাভ বা ক্ষতি সাধিত হয়। হাতুড়ি নিজের ইচ্ছায় উপকার বা অপকার করতে পারে না, বাতাস স্বেচ্ছায় কারো মঙ্গল বা অমঙ্গল সাধন করতে পারে না– সবকিছুই মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। মূলত লাভের চাবিকাঠি আল্লাহ তায়ালার কুদরতি হাতে, যিনি কারণ বা উপকরণের স্রষ্টা। উপকরণের হাতে উপকার বা অপকার সাধনের সামর্থ্য নেই। তাই ইবাদাত করতে হবে শুধু ঐ সত্তার, যাঁর কুদরতি হাতে লাভ-ক্ষতি নিহিত রয়েছে; এমন কিছুর নয় যা লাভ-ক্ষতি মাধ্যম মাত্র। না সেগুলো লাভ-ক্ষতির আবিষ্কারক, না সৃষ্টিকর্তা। তারা শুধুই উপকার বা অপকার লাভের মাধ্যম হয়ে থাকে। সুতরাং মাধ্যম হওয়া আবিষ্কারক ও সৃষ্টিকর্তা হওয়াকে আবশ্যক করে না।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ•

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّ لَا يَضُرُّكُمْ ۝ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

সে বলল, তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত করছ, যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক্ তোমাদের জন্য এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করছ, তাদের জন্যে! তোমরা কি বোঝ না? *[সূরা আম্বিয়া আয়াত- ৬৬-৬৭]*

মানবজীবনের ভিত্তি

সম্মানিত সুধী

পৃথিবীতে জমিনসহ যত মাখলুক রয়েছে এবং যত বস্তু আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন, তার সব কিছুই আল্লাহ মানবজাতির জন্য সৃষ্টি করেছেন। সব কিছুই মানুষের কাজে লাগে। কোনো বস্তু এমন নেই, যার সাথে মানুষের উপকার বা ক্ষতির সম্পৃক্ততা নেই।

মানবজীবনের ভিত্তি এ সকল জাগতিক বস্তুর উপর। জমিন না থাকলে মানুষ কিসের উপর থাকবে, কোথায় জীবন-যাপন করবে? যদি আকাশ, আকাশে তারকা, চাঁদ, সূর্য না থাকে, তাহলে আলো কিভাবে হবে? সূর্যের তাপ না থাকলে ফসল পাকবে কিভাবে? চাঁদের স্নিগ্ধতা না হলে ফলে রস কিভাবে সৃষ্টি হবে? হাড়ে ক্যালসিয়াম কিভাবে পয়দা হবে? তারকা না থাকলে আঁধার রাতে রাস্তা কিভাবে নির্ণয় করতে? জাহাজ কিভাবে নদী-সাগরের বুকে চলত? দিক কিভাবে জানা যেত?

মোটকথা, জমিন থেকে আকাশ পর্যন্ত এমন কোনো জিনিস নেই, যা মানুষের জীবনে কোনো প্রকার কাজে আসে না।

প্রাণীজগত; তাও মানুষের কাজে ব্যবহার হয়। কোনোটা তাদের আরোহণের কাজ দেয়, কোনোটা মানুষের আহারের কাজে আসে। কোনো প্রাণীর হাড় তাদের কাজে লাগে, কোনো প্রাণীর চামড়া কাজে লাগে। আবার কোনোটার চামড়ার উপরের লোম মানুষের কাজে ব্যবহার হয়। মোটকথা, কোনো প্রাণী এমন নেই, যার সাথে মানুষের উপকার সম্পৃক্ত নেই।

কোনো গাছ বা শিকড় এমন নেই, যা মানুষের উপকারে আসে না। যেসব বস্তু মানুষ ঘৃণা করে ফেলে দেয়– যেমন উচ্ছিষ্ট, পচা-গান্ধা ও নাপাক বস্তু; এগুলোও মানুষের কাজে আসে। যদি গোবর না থাকে, তাহলে মানুষের ফসল উৎপন্ন হবে কী করে? তো গোবর নাপাক বস্তু; তাও কাজে আসে, তারও দুনিয়াতে মূল্য আছে। সুতরাং গোবর জৈবসার হিসেবে হাজার-হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে এবং মানুষের কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

পাক হোক নাপাক হোক উভয় বস্তুই মানুষের কাজে আসছে এবং মানুষের জীবন ঐ সকল বস্তুর উপর আটকে আছে, ঝুলে আছে। এদের মধ্যে যদি একটি জিনিস না থাকে, তাহলে মানুষের জীবন তিক্ত হয়ে যাবে। সূর্য না হলে জীবন শেষ, চাঁদ না থাকলেও জীবন খতম হয়ে যাবে, বাতাস না থাকলেও খতম, জমিন না থাকলেও খতম। খাদ্য না থাকলেও খতম, ঔষধ না থাকলেও খতম। সুতরাং কোনো বস্তু এমন নেই, যার উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল নয়।

বিশ্বজগতের সাথে মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই

পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই যে, তার জীবন মানুষের উপর নির্ভরশীল। যদি সকল মানুষ নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে সূর্যের কোনো অংশ অকেজো হবে না। চাঁদের কোনো কিছু বিকৃত হবে না। একজন মানুষও অবশিষ্ট না থাকলে

জমিনের কোনো ক্ষতি হবে না, আকাশের কোনো ক্ষতি হবে না। পাহাড় তার স্বস্থানে টিকে থাকবে। বৃক্ষরাজি ও তার শিকড়-ডাল স্বস্থানে বহাল থাকবে। এতে ফলাফল এই বের হলো যে, কোনো বস্তু এমন নেই, যা মানুষের কাজে আসে না আর মানুষ কোনো জিনিসের কাজে আসে না। এখন প্রশ্ন জাগে, তাহলে মানুষকে কী অহেতুক সৃষ্টি করা হয়েছে? যখন সে জমিনের কাজে আসে না, আকাশের কাজে আসে না, চাঁদ-সুরুজের কাজে আসে না, তাহলে মানুষকে কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? মানুষ তো কারো প্রয়োজনে আসে না, কারো জীবন তো তাদের উপর নির্ভরশীল নয়।

যদি বলা হয়, মানুষকে অহেতুক সৃষ্টি করা হয়েছে, তাহলে তাতে আল্লাহর হিকমত দোষযুক্ত হয়ে পড়ে। অথচ আল্লাহ তায়ালা দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। যখন গোবরের ন্যায় পচা-গান্ধা জিনিসকে বেকার সৃষ্টি করা হয়নি, তাহলে মানুষের মতো আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীবকে আল্লাহ অনর্থক সৃষ্টি করবেন কেন? এটা কোন রোগের ঔষধ? মোটকথা, পৃথিবীতে যেহেতু কোনো বস্তু বেকার নেই, তাহলে মানুষও বেকার হতে পারে না। কারণ, সে তো সবচেয়ে উত্তম ও সম্মানিত।

পৃথিবী ও মানবসৃষ্টির মাঝে পরস্পর সম্পর্ক

তো মানুষ যখন পৃথিবীর কোনো বস্তুর কাজের জন্য নয়, তাহলে মানুষকে কী কর্মের জন্য সৃষ্টি করা হলো? উক্ত আলোচনা থেকে ফলাফল প্রকাশ হলো যে, যখন সৃষ্টিজীবের কারো কাজের জন্য নয়, তাহলে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার কাজের জন্য হবে, অন্য কারো কাজের জন্য হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, সৃষ্টিকর্তার কোন কর্মটি মানুষের উপর আটক থাকে? তাঁর সৃষ্টজীবের কোনো কাজ বাধাগ্রস্ত হয় না, আটকে থাকে না। তাহলে সৃষ্টিকর্তা যিনি প্রত্যেক মন্দ ও পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত, তাঁর কোন কর্মটি আটকে থাকবে? তাঁর ভাণ্ডারে কোন জিনিসের ঘাটতি রয়েছে, যা মানুষের নিকট হতে চাওয়া হচ্ছে?

বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তায়ালার ভাণ্ডারে সবই আছে। তাঁর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। কিন্তু তাঁর ভাণ্ডারে একটি বস্তু নেই। সেটি মানব থেকে চাওয়া হচ্ছে। আল্লাহর খাজানায় ইলম আছে, পূর্ণতা আছে, আছে মর্যাদা ও উচ্চতা। রয়েছে ধন-সম্পদ ও স্বনির্ভরতা। কিন্তু তাঁর নিকট মুখাপেক্ষিতা নেই, বে-ইজ্জতি নেই, উত্তরাধিকারী নেই। মানবজাতিকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তারা তাঁর

সামনে মাথা নত করবে, নিজেদের জিল্লতি তাঁর সামনে পেশ করবে এবং নিজেদের মুখাপেক্ষিতা তাঁর নিকট পেশ করবে, যাতে তাঁর ইজ্জত-সম্মান ও বড়ত্ব দুনিয়ায় জাহির হয় এবং তাঁর উচ্চতা ও মহত্ম জগতের উপর প্রকাশ হয়।

সুতরাং মানবজাতিকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তারা ইবাদাত করবে, মাথা নত করবে। ইবাদাত অর্থ হলো সর্বোচ্চ জিল্লতি গ্রহণ করা। মানুষকে এ জন্য বানানো হয়েছে যে, সে আল্লাহর সামনে নিজের সর্বোচ্চ জিল্লতি ও হীনতা প্রদর্শন করবে, যাতে আল্লাহ তায়ালার সর্বোচ্চ ইজ্জত-সম্মান সবার সামনে প্রকাশ হয়ে যায়। সে এমন আরজি-আবেদন পেশ করবে যে, হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের যেমন সীমারেখা নেই, আমি তোমার সামনে এমন জিল্লতি পেশ করছি, যে জিল্লতিরও কোনো পরিসীমা নেই। আমি তোমার সামনে সর্বোচ্চ হীনতা প্রকাশ করছি।

মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত বস্তু হলো তার নাক আর কপাল। যদি কেউ বেইজ্জতি হয়, তাহলে বলা হয়, অমুকের নাক কেটে গেছে, অর্থাৎ সে লজ্জিত হয়েছে। অমুকের কপালে কলংকের দাগ লেগেছে অর্থাৎ সে লজ্জিত হয়েছে। তাই নাসিকা ও ললাট অপেক্ষা বেশি দামি ও সম্মানিত আর কোনো অঙ্গ মানুষের মাঝে নেই। এগুলোকে আল্লাহর সম্মুখে জমিনে ঘর্ষণ করা হয়, যাতে মানুষের সর্বোচ্চ জিল্লতি ও হীনতা প্রকাশ পায়।

মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা একচ্ছত্র ইজ্জতের অধিকারী। তাঁর সামনে যে সৃষ্টিজীব একচ্ছত্র জিল্লতি পেশ করে, সে হলো মানুষ। মানুষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও কারণ হলো, সে আল্লাহর সামনে মাথা নত করবে আর সমস্ত সৃষ্টিজীব তার সামনে মাথা নত করবে। সকল বস্তু তার সামনে চাকর, গোলাম হয়ে যাবে আর মানুষ আল্লাহর চাকর-গোলাম হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াবে।

إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ (الحديث)

সমগ্র জগতকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর তোমাদেরকে পরকালের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

তোমাদেরকে দুনিয়ার জন্য বানানো হয়নি, দুনিয়াকে তোমাদের উপকারে বানানো হয়েছে। তোমরা বৃক্ষ-পাথরের জন্য নয় বরং বৃক্ষ-পাথর তোমাদের চাকরি করার জন্য। তোমরা চাঁদ-সুরুজের জন্য নও; বরং চাঁদ-সুরুজকে তোমাদের সেবা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

দুনিয়ায় যা কিছু আছে সব মানুষের জন্য আর মানুষ পরওয়ারদেগারের জন্য।

বিশ্বজগতে মানবজাতির মর্যাদা

পৃথিবীতে মানবজাতির মর্যাদার দৃষ্টান্ত এরূপ যে, একজন ব্যক্তি শানদার বাড়ি নির্মাণ করে কেন? কারণ, সে একজন সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করতে চায়, যাকে সে অত্যন্ত ভালোবাসে। বিবাহ করে সে তার প্রয়োজনে একটা আলিশান বাড়ি নির্মাণ করে, যাতে সে আরামে থাকতে পারে, জীবন-যাপন করতে পারে।

বাড়িতে সে কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছে, বিছানা রেডি করার লোক, ঝাড়ুদার ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ দিয়েছে, যাতে বাড়িটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তার স্ত্রীর যাতে কোনো প্রকার কষ্ট না হয়। সে বাবুর্চি ঠিক করেছে, যাতে স্ত্রী ক্ষুধায় না মরে, সে তার জন্য খাবার পাকাবে। লাইটিংয়ের ব্যবস্থা করেছে, যাতে রাতের বেলা বাড়ি আলোকিত থাকে। ফলে রাতের অন্ধকারে তার কষ্ট ভোগ না করতে হয়। মোটকথা, আরামের যত উপকরণ হতে পারে, তার সবই যোগাড় করেছে এবং প্রত্যেক খেদমতের জন্য পৃথক-পৃথক সেবক নিয়োগ করেছে। এ সকল কিছু করেছে সে তার স্ত্রীর জন্য। কিন্তু স্ত্রী কার জন্য? স্ত্রী খাদেমদের জন্য কিংবা শয্যা রচনাকারী বা বাবুর্চির জন্য নয়। মালিক স্ত্রীকে রেখেছেন নিজের জন্য। সকল প্রয়োজন ও সেবা স্ত্রীর জন্য আর স্ত্রী আমার কাজের জন্য।

যদি স্ত্রী স্বামীর সেবাকে অস্বীকার করে বসে অথবা অহংকার ও গর্ব দেখাতে থাকে বা স্বামীকে গরম চোখ প্রদর্শন করতে থাকে, তাহলে ফলাফল এমন হবে যে, সে বিবিকে তালাক দিয়ে দেবে। সে বাড়ি ছেড়ে দেবে, স্ত্রীকে বাড়ি হতে বের করে দেবে, খাদেমদের তাড়িয়ে দেবে। যার প্রয়োজনে তাদের রেখেছিল, যখন সে আমার অনুগত হলো না, তখন আমার বাড়ির প্রয়োজন নেই, খাদেমের প্রয়োজন নেই, শয্যা রচনাকারীর দরকার নেই। আমি তাকে তিন তালাক দিলাম; সে এখানে থাকার যোগ্য নয়। বরং এখান থেকে সে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যোগ্য।

জগৎস্রষ্টার সাথে মানুষের বিশেষ আচরণ

উপরে বর্ণিত কার্যকলাপ মানুষের বেলাও প্রযোজ্য। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নিজের প্রিয় ও মহব্বতের সৃষ্টজীব বানিয়েছেন। তাদের সাথে মহব্বতের ব্যবহার করেছেন যেমনটি পৃথিবীর অন্য কোনো সৃষ্টির সাথে করেননি। তাদের ইজ্জত-সম্মান দিলেন, পানাহারের বস্তু দিলেন। সমুদ্র, পাহাড়, পর্বত তাদের জন্য বানালেন। আকাশ, জমিন, বিল্ডিং বানালেন তাদের জন্য। তাতে চাঁদ ও সূর্যের ল্যাম্পপোষ্ট লাগালেন আলো দেওয়ার জন্য। আকাশে মেঘ সৃষ্টির করলেন পানি বর্ষণের জন্য। বাতাস রাখলেন পৃথিবীর ময়লা পরিষ্কারের জন্য। এসব কিছু করলেন মানবজাতির জন্য। আর তারা হলো মালিকের জন্য। যদি তারা মালিকের কাজে না লাগে, তাহলে মানুষ গুলি খাওয়ার উপযুক্ত। যদি সকলে মিলে অহংকারী ও অবাধ্য হয়ে যায়, তাহলে এ তাঁবুকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে। তখন না আকাশের প্রয়োজন, না জমিনের। যখন তারা-ই হত্যাযোগ্য হয়ে যায়, তখন তাদের খাদেমদের প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না। তাই মানুষের বাস্তব চিত্র প্রমাণ করে, তাদেরকে আল্লাহর জন্য আর বিশ্বজগৎকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ

দুনিয়াটা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর তোমরা সৃষ্ট হয়েছ আখেরাতের জন্য।

এখন যদি ঐ ব্যক্তি, যার জন্য বিল্ডিং বানানো হয়েছিল, সেবক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, স্বামীর খেদমত না করে, তাহলেও হত্যাযোগ্য ছিল। এখন যদি তার সীমালঙ্ঘন আরো বৃদ্ধি পায় যে, সে এমন কাজ করতে থাকে যে, কোনো খাদেমের সাথে চোখ মিশাতে শুরু করে, কোনো শয্যা রচনাকারীর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলে, কোনো বাবুর্চির সাথে প্রেমালাপ শুরু করে, তাহলে তাকে গুলি করে মেরে ফেলবে। সে খারাপ ও চরিত্রহীনা নারী, সে জীবিত থাকার উপযুক্ত নয়। যতক্ষণ আমার খেদমত করা পরিত্যাগ করে ছিল, সে অন্যায় করেছিল, তা মেনে নেওয়ার মতো। কিন্তু যখন আমাকে ছেড়ে অন্যের সাথে বন্ধুত্ব গড়া শুরু করল, তাও আবার আমার চাকর-গোলামের সাথে, এখন সে জীবিত থাকার উপযুক্ত না।

মানুষেরও একই অবস্থা যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য বিল্ডিং নির্মাণ করলেন, খাদেম রাখলেন। এখন তারা অবাধ্য হলে কিভাবে দুনিয়া রাখবেন, খাদেম রাখবেন?

জগতের খাদেমগণ

শয্যা রচনকারী রাখা হয় বাড়ি পরিষ্কার রাখার জন। বাতাস হলো পৃথিবীর শয্যা রচনাকারী। বাতাস প্রবাহিত না হলে পৃথিবীর ময়লা-আবর্জনা দূর হবে না। পৃথিবী নামক বিল্ডিং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আল্লাহর তায়ালা বাতাস সৃষ্টি করেছেন, যাতে তা বিছানা রচনাকারীর কাজে আসে আর বাড়িকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে।

এই সূর্যটা কী?

সূর্য হলো আমার-আপনার বাবুর্চি। সে আপনার ফসল পাকায়। তার গরম তাপের দ্বারা আপনাদের শস্যদানা পাকে, ফল পাকে। এটা বোঝা উচিত যে, বাস্তবে সূর্য হলো একজন বাবুর্চি, যাকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য নিয়োজিত করেছেন।

এই মেঘ কী?

মেঘ হলো পানির বাহন। সে পানি ভরে-ভরে এনে আপনাদের পৃথিবীকে শীতল করে, পিপাসা নিবারণ করে। নির্ধারিত একটা সময়ে এসে আপনাদের পুকুরগুলো ভরে দেবে, নদীগুলো প্রবহমান করবে। কূপসমূহকে ভরে দেবে, যাতে সেগুলোতে সারা বছর পানি থাকে। ফলে মানুষের পিপাসার কারণে কষ্ট না হয়। তো দুনিয়া আল্লাহর সৃষ্টি কোনোটা পানি বহনকারী কর্মচারী, কোনোটা রান্নার বাবুর্চি আবার কোনোটা বিছানা বিছানোর কাজে লিপ্ত। এখন যদি মানুষেরা মালিককে ছেড়ে কেউ বাবুর্চির সাথে চোখাচোখি করে, সূর্যের সামনে, বাবুর্চির সামনে মাথা নত করতে থাকে, বিছানা রচনাকারী বাতাসের সামনে সিজদা করতে থাকে, বাতাসের পূজা করতে থাকে, বৃষ্টি বর্ষণের জন্য কখনও মেঘ দেখা দিলে তার সামনে দাঁড়িয়ে তার কাছে প্রার্থনা করতে থাকে, তাহলে তা এমন হবে যেমন স্ত্রী পানি বাহকের সাথে প্রেমে লিপ্ত হলে, শয্যা রচনাকারীর সাথে প্রেমালাপ শুরু করলে, তখন সে গুলির উপযুক্ত হয়, তখন সে বিল্ডিংয়ে বসবাসের যোগ্য থাকে না।

দুনিয়ার মাখদুমদের নির্বুদ্ধিতা

বরং যখন সে এহেন নির্লজ্জ পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তখন এই বিল্ডিংটিও অকল্যাণকর হয়ে যায়, তাকেও গুড়িয়ে দাও। সুতরাং মানুষের কাজ হলো,

সকল জিনিস তাদের জন্য আর তারা আল্লাহর জন্য; তারা গাইরুল্লাহর সামনে মাথা নত করবে না। মানুষের জন্য এর চেয়ে বেশি হীনতা ও জিল্লতি হতে পারে না যে, তারা আগুনের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকবে, পানির সামনে মাথা ঝোঁকাবে, চাঁদ-সুরুজের সামনে মাথা নত করবে। যাদের গোলাম-বাদী ও সেবক বানানো হয়েছে, তাদের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী কর্ম যে, যে মাখদুম (যার সেবা করা হয়) ছিল, সে খাদেম হয়ে গেল আর যে খাদেম ছিল, তাকে মাখদুম বানানো হলো। মানুষ তার আকল-বুদ্ধিকে উল্টে দিল যে, যাকে নিজের সামনে মাথা নত করানো উচিত ছিল, তার সামনে সে নিজেই মাথা নত করল। আল্লাহওয়ালাদের যখন প্রয়োজন হয়, তখন তারা এই খেদমত করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করলেন তো চাঁদ দুটুকরো হয়ে গেল, তাতে ফাটল ধরে গেল।

হযরত ইউশা ইবনে নূন আ.-এর জন্য যুদ্ধের ময়দানে সূর্যকে আটকে দেওয়া হলো, যাতে দিনাদিন তিনি বিজয় লাভ করেন। তো আল্লাহ দিনকে থামিয়ে দিলেন। সুর্য খাদেম ছিল; তাকে থামিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু ইউশা ইবনে নূন আ.-এর কর্মকে থামানো হলো না। কারণ, সেটি ছিল মাকসাদ আর সূর্য ছিল উছিলা বা মাধ্যম। তাই উছিলার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলো-মাকসাদকে করা হলো না।

মোটকথা, মেঘমালা তাদের জন্য আসে, সূর্য তাদের খেদমতের জন্য আসে, চাঁদ তাদের সামনে আনুগত্য প্রকাশ করে, পৃথিবীর ক্ষুদ্র বস্তুরা আনুগত্য করে।

মানুষ সমুদ্রসমূহ ব্যবহার করছে, পাহাড়গুলোকে ব্যবহার করছে আর ভূমি তার সেবায় নিয়োজিত। তাতে ইচ্ছা করলে খনন করতে পারছে, সড়ক-রাস্তা নির্মাণ করতে পারছে। বলা হয়-

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ

তিনি তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ করো এবং তাঁর দেওয়া রিজিক আহার করো। তারই কাছে পুনরুজ্জীবিত হবে। *[সূরা আল-মূলক আয়াত ১৫]*

তিনি ঐ সত্তা, যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য সুগম করেছেন। তোমরা তাতে চাষাবাদ করো, বীজ বপন করো, সড়ক নির্মাণ করো, কূপ খনন করো; জমিন

তাতে টু শব্দটিও করে না, মানুষের সামনে উফ করতে পারে না। কিন্তু মানুষ কিসের জন্য?

وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

মানুষের স্মরণ রাখতে হবে যে, তার মালিকের সামনে উপস্থিত হতে হবে, তার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। অতএব, মানুষের কাজ হলো, সে হাশর-নশর নিয়ে চিন্তা করবে, কেয়ামত দিবস নিয়ে চিন্তা করবে আর ঐ সকল বস্তুর দায়িত্ব হলো, তারা মানুষের চাকরি করবে, তাদের সেবা করবে, কষ্ট-ব্যথায় উফ করবে না– নীরবে আপন কাজে ব্যস্ত থাকবে।

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন–

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ۭ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۭ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

[৫] চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্য শীতবস্ত্রের উপকার আছে। আরো অনেক উপকার রয়েছে এবং কিছুসংখ্যককে তোমরা আহার্যে পরিণত করে থাক। [৬] এদের দ্বারা তোমাদের সম্মান হয় যখন বিকালে চারণভূমি থেকে নিয়ে আস এবং সকালে চারণভূমিতে নিয়ে যাও। [৭] এরা তোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভূ অত্যন্ত দয়ালু। [৮] তোমাদের আরোহণ ও শোভার জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা জান না। *[সূরা আন-নাহল আয়াত ৫-৮ ব্যাখ্যামূলক তরজমা]*

এই চতুষ্পদ জন্তু ও গবাদি خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। فِيْهَا دِفْءٌ কতক থেকে তোমরা গরম তাপ অর্জন করতে পার, পশমের কাপড় তৈরি করে তা দ্বারা গরম নিতে পার। وَمَنَافِعُ এবং বিভিন্ন প্রকার উপকারও লাভ করতে পার, وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ আর কিছু প্রাণীর গোস্ত তোমাদের আহার্য বানাতে পার।

وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ

কতক প্রাণী দ্বারা তোমরা প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদা প্রদর্শন কর, যখন হাতি-ঘোড়াকে জুলফি পরিধান করিয়ে র‍্যালী বের করে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রদর্শন কর এবং নিজেদের শান-শওকত ও মান-মর্যাদা দেখাও।

তিনি আরো বলেন–

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ

কতেক পশু এমন রয়েছে যে, তার পিঠে মাল বহন করে এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে নিয়ে যাও।

এ কারণে অনেক উপকারের কথা বলা হয়েছে–

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

এগুলো আজ বাহন হয়ে গেছে। তিনি বলেন, তোমাদের জানা নেই, ভবিষ্যতে আমি নতুন-নতুন বাহন সৃষ্টি করে দেব, যার উপর আরোহণ করে মানুষর পথ অতিক্রম করবে। সুতরাং এর সাইকেল, উজোজাহাজ, পানিজাহাজ, লঞ্চ ইত্যাদি নানা ধরনের বাহন তৈরি হয়ে গেছে।

সারকথা, বিভিন্ন প্রকার বাহন বের হবে, যাতে তারা আরামের সাথে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবে। চতুষ্পদ প্রাণী ও পশুকে এমন ইজ্জত দেওয়া হয়নি। তারা যেখানেই যাবে পায়ে হেঁটে যাবে। আর মানুষ আরোহণ করে যাবে। কখনও চতুষ্পদ পশুর পিঠে, কখনও ধাতব পদার্থের পিঠে, কখন উটের পিঠে আরোহণ করে। প্রতিটি বস্তুকে মানুষের জন্য আরোহী বানিয়ে দেওয়া হবে। সারকথা হলো, মানুষ আল্লাহর জন্য আর পৃথিবী মানুষের জন্য।

ইবাদাতের মাপকাঠি

মানুষ আল্লাহর জন্য কেন? তার কারণ হলো, ইবাদাত করা হয় লাভ-ক্ষতির মানদণ্ডে। যাঁর আয়ত্তে মানুষের উপকার ও অপকার, তাঁর সামনে তারা নত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালার কুদরতি হাতে মানুষের লাভ-ক্ষতির রশি। উপকার দেবে তাঁর হাতে, ক্ষতি পৌঁছাবে তাও তাঁরই হাতে। চাই নেয়ামত প্রদান করুক, চাই মসিবত। নেয়ামত দিয়ে ছিনিয়ে নিন বা ছিনিয়ে নেওয়া নেয়ামত ফেরত দিন সবই তার দস্তে কুদরতে।

হায়াতদাতা

জগতে যত প্রকার নেয়ামত রয়েছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় ও প্রধান নেয়ামত হলো মানুষের জীবন। তাতে মানুষের কোনো কর্তৃত্ব নেই। তা শুধু আল্লাহ তায়ালার কুদরতি হাতে। তিনি যখন চান জীবন দেন, যখন চান মরণ দেন, জীবন কেড়ে নেন। যতক্ষণ জীবন না আসবে, ততক্ষণ কেউ ইচ্ছা করলেই সন্তান জন্ম দিতে পারবে না। কারণ জীবন-হায়াত তার হাতে নয় যে, সে ইচ্ছা করলে জন্ম দিতে পারবে। তিনি দিতে চাইলে দিয়ে দেবেন, অন্যথায় মানুষ তো আশা করতে করতে এবং উপকরণ প্রস্তুত করতে-করতে বছর চলে যাবে তবুও সন্তান হবে না। কারণ, জীবন তার হাতে নেই।

সারকথা, জীবন ও হায়াতের নেয়ামত তাঁর কুদরতি হস্তে। যখন ছিনিয়ে নেওয়ার সময় হয়, মৃত্যুর সময় আসে, তখন মানুষ সারা পৃথিবীর ধনভাণ্ডার ব্যয় করলেও এক মিনিটের জন্যও জীবনকে আটকে রাখতে পারবে না। যখন যাওয়ার সময়, তখন চলে যাবেই। ফিরিয়ে রাখতে পারবে না।

মোটকথা, মানুষের হাতে জীবন গ্রহণ করার শক্তি নেই, আটকে রাখারও শক্তি নেই। আবার পুনরায় ফিরিয়ে আনারও ক্ষমতা নেই। এ সবের ক্ষমতা যার হাতে তিনি বড়ই উপকারী। উপকার ও লাভের চাবি তাঁর হাতে।

সুস্থতাদাতা

এখন আপনি জীবিত। হায়াত বা জীবনের পর সবচেয়ে উত্তম ও বড় নেয়ামত হলো সুস্থতা। তা আপনার কর্তৃত্বে নয়। যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা সুস্থ রাখেন, বান্দা ততক্ষণ সুস্থ থাকতে পারে। আবার নিতে চাইলে কেউ বাধা দিতে পারে না। মানুষ সুস্থতার উপকরণ প্রস্তুত করতে পারে এবং সুস্থতাকে সংরক্ষণও করতে পারে। কিন্তু তার শক্তি নেই যে, তা অর্জন করে ফেলবে। বর্তমানকালে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসজনিত জ্বর ছড়িয়ে পড়েছে। তা প্রতিরোধে সরকার চেষ্টা করছে। পৌরসভা কর্তৃপক্ষও চেষ্টা করে যাচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে ডাক্তাররা ক্লিনিক খুলে বসেছে। সাধারণ জনতাও আনেকে অপরের সেবা-শুশ্রুষা করে চলছে। তারা চাচ্ছে, এক মিনিটে এই ভাইরাস দূর হয়ে যাক। কিন্তু তা তাদের আয়ত্তে নেই। যখন মালিকের হুকুম হবে, তখনই তা ফিরে যাবে। রোগীকে যতই সেবা যত্ন করা হোক রোগ তার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত স্থায়িত্ব পাবে– সামান্যও আগ-পিছ হবে না।

অতিরিক্ত চিকিৎসাসামগ্রী ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

হযরত আলী রা. বলেন, যখন কোনো মসিবত আসে, তখন তা একটা নির্ধারিত সময় বা বয়স নিয়ে আসে। যখন সময় ফুরিয়ে যাবে, তখন তা দূর হয়ে যাবে। বান্দার কাজ বা দায়িত্ব হলো, সে উপকরণ হিসেবে সংক্ষিপ্তাকারে বাঁচার চেষ্টা-তদবির করবে। চিকিৎসাসামগ্রী ব্যবহারে অতিরঞ্জিত করবে না। অন্যথায় জটিল হয়ে মসিবতের বয়স ও সময়সীমা বেড়ে যেতে পারে। মোটকথা, এই ভেবে বাঁচার উপকরণ গ্রহণ করতে থাকবে যে, আমি হলাম বান্দা; আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমি চিকিৎসা গ্রহণ করি।

وَاَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوْا عَلَيْهِ

সংক্ষিপ্তভাবে উপকরণ ও মাধ্যম গ্রহণ করো এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখো।

উপকরণের উপর ভরসা করো না। সংক্ষিপ্তভাবে মানুষ বাঁচার মাধ্যম গ্রহণ করতে থাকবে। ঔষধ সেবন করবে, ডাক্তার দেখাবে; কিন্তু ডাক্তার-ঔষধের উপর ভরসা করা, কোনো ঔষধ সম্পর্কে মনে-মনে বিশ্বাস করে নেওয়া যে এ ঔষধ নিরাময় দিতে পারে এমনটা ভুল। ঔষধে কোনো নিরাময়-ক্ষমতা নেই, ডাক্তারের হাতে সুস্থতার ক্ষমতা নেই, তারা শুধু উসিলা ও মাধ্যমমাত্র। তাদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া রাখা মুসাব্বিবুল আসবাব তথা আল্লাহর হাতে।

উপকরণের প্রতিক্রিয়ার রহস্য

এ আগুন, পানি, বাতাস ও মাটি ইত্যাদি হলো উপকরণ। আগুনের তাসির হলো পোড়ানো। কিন্তু তা তার নিজস্ব তাসির নয়। আল্লাহ তায়ালা তার মধ্যে এ তাসির রেখেছেন। আগুন আল্লাহর রাখা তাসির প্রকাশ করছে; কিন্তু তা মালিকের আয়ত্তে। আগুনের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। যদি তিনি আগুনের ক্ষমতা নিয়ে নেন আর আগুন জ্বালাতে চায়, তাহলে সে জ্বালাতে পারবে না। কারণ, জ্বালানোর ক্ষমতা তার আয়ত্তে নেই।

হযরত ইবরাহীম আ.কে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। আগুনের ক্ষমতা রহিত করা হলো। ফলে আগুন বোকার মতো বসে রইল। আগুন তাঁকে কিছুই করতে পারল না। সারকথা, আগুন জ্বালাতে পারে না আল্লাহর হুকুম ব্যতীত। যখন আল্লাহ চান তখন আগুন জ্বালাতে পারে।

পানির ঠাণ্ডা ও শীতল করার ক্ষমতা নেই। পানি আল্লাহর ইচ্ছায় ঠাণ্ডা করতে পারে। যদি পানি থেকে ঠাণ্ডার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া, হয় আর পানি নিজে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করতে থাকে, তাহলে সফল হবে না। যতক্ষণ আল্লাহ তার তাসির না দেখান। প্রত্যেক বস্তুর কর্মক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য আল্লাহর সৃষ্টি। যখন তিনি চান প্রকাশ পায় আর না চাইলে প্রকাশ পায় না। এজন্য মানুষ আসল তাসিরকারীকে ছেড়ে ঐ বস্তুর পিছনে ছুটছে যে, এগুলো আমাকে শিফা দিতে পারে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা।

শিরকের আশঙ্কা আছে এমন বিষয় হতে বেঁচে থাকার তাকিদ

এমনিভাবে শরীয়ত অনেক বিষয় ও ভূমিকাকে সংশোধন করেছে। উদাহরণস্বরূপ মানুষ সন্তান 'সৃষ্টি' করতে চায়। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এমন শিরোণাম গ্রহণ করা শুদ্ধ নয়। এ ধরনের ভূমিকা হঠকারিতা ও বেয়াদবিমূলক কাজ। সন্তান সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তার কাজ। মাতা-পিতার কাজ নয় সন্তান পয়দা করা। মাতা-পিতার দায়িত্ব এতটুকু যে, তারা সন্তান জন্মের মাধ্যম সঙ্গম করবে এবং সন্তানের জন্য আল্লাহর সকাশে দোয়া করবে। যদি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা না থাকে, তাহলে স্বামী-স্ত্রী হাজারোবার মিলিত হলেও সন্তান হবে না। চাইতে হবে তাঁর কাছে, ভরসা করতে হবে তাঁর নিকট, মিলবেও তার কাছ থেকে। যখন তিনি উপকরণ ও মাধ্যমের মধ্যে সন্তানের ভ্রূণ প্রবেশ করান, তখন প্রবেশ হয়ে যাবে। আর যদি মানুষ শুধু উপকরণের উপর নির্ভর করে, তাহলে তা তাদের অহেতুক চেষ্টা করা হবে এবং ব্যর্থতার মুখ দর্শন করতে হবে।

তাওহীদ ও তাসাররুফের পরিচয়

নবী-রাসূলগণ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ ও তাসাররুফ (অধিকার)কে পুরোপুরিভাবে বুঝতেন। তাঁরা কোনো কিছু চাইলে আল্লাহর নিকট চাইতেন। কিছু প্রার্থনা করলে তাঁর সকাশেই করতেন। মসিবতে পড়ে অভিযোগ তাঁরই নিকট করতেন। তারা প্রত্যেক বিষয়কে আল্লাহর দিকে রুজু করতেন।

আল্লাহর দরবারে প্রার্থনার পদ্ধতি

হযরত যাকারিয়া আ.-এর ঘটনা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে। তাঁর নবুওয়তি মিশনকে চালু রাখার জন্য এবং উন্নতির জন্য আল্লাহর নিকট ছেলে সন্তান প্রার্থনার প্রয়োজন দেখা দেয়। তিনি আল্লাহর নিকট পুত্রসন্তান চাইলেন। হযরত যাকারিয়া আ.-এর পুত্র সন্তান চাওয়াকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কালামে পাকে উদ্ধৃত করলেন যে, প্রার্থনা করা সকলের কাজ নয়। প্রার্থনা করার ঢং ও তরিকা প্রকৃতপক্ষে নবীরা জানতেন। তাঁদের বলার দ্বারা অন্যরা জানতে পেরেছে। মোটকথা, হযরত যাকারিয়া আ. পুত্রসন্তান চাইলেন? তাঁর দোয়াকে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে নকল করেছেন। বাস্তবে এভাবে প্রার্থনা করা নবীদের জন্য যথাযথ। অন্যরা তো এভাবে চিন্তাও করতে পারবে না।

إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا

স্মরণ করো ঐ সময়কে যখন যাকারিয়া চুপি-চুপি মনে-মনে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে আরম্ভ করল।

নিম্ন আওয়াজে সন্তান চাইলেন, যা তিনি শুনছিলেন আর তাঁর আল্লাহ শুনছিলেন। অন্য কেউ টের পাচ্ছিল না। এভাবে তিনি প্রার্থনা করছিলেন।

এতে প্রমাণিত হলো, দোয়ার প্রথম আদব হলো মানুষ দোয়ায় আওয়াজকে অধিক উঁচু করবে না।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

'আল্লাহর সামনে প্রার্থনা করো চুপিসারে আস্তে-আস্তে।'

মোটকথা, তিনি নিম্ন আওয়াজে দোয়া করতে লাগলেন।

কিভাবে প্রার্থনা করলেন?

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ

তিনি বললেন, হে আমার রব! আমার হাড় শুকিয়ে গেছে।

এতটুকু বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছি যে, হাড় শুকিয়ে গেছে, তাতে ক্যালসিয়াম অবশিষ্ট নেই। স্পষ্ট কথা হলো, যখন ক্যালসিয়াম অবশিষ্ট নেই, তাহলে হাড়ে তরলতা ও চর্বি নেই। হাড় শুকিয়ে গেছে, তো গোস্ত কিভাবে অবশিষ্ট থাকবে? সারকথা এই প্রকাশ পেল যে, হাড়ের সাথে চামড়া মিশে গেছে। আমার ভিতর সন্তান জন্ম দেওয়ার মতো কোনো শক্তি অবশিষ্ট নেই।

তিনি আরো বললেন–

وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا

এবং বার্ধক্যে আমার মাথাটা সাদা হয়ে গেছে। যেমনভাবে আগুন জ্বালিয়ে ফেলে।

অর্থাৎ দেহের ভিতর অংশেও বার্ধক্য ছড়িয়ে পড়েছে যে, হাড়ে চর্বি অবশিষ্ট নেই, উপর অংশেও বার্ধক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, চুল কাজলতা হারিয়েছে। মোটকথা, উপর অংশ সাদা হয়ে গেছে এবং ভিতর অংশ শুকিয়ে গিয়েছে। আমার অবস্থা হলো এমন। অর্থাৎ তিনি সন্তান প্রার্থনা করছেন এবং অবস্থা প্রকাশ করছেন যে, সন্তান হওয়ার উপকরণ বা মাধ্যম এমন পর্যায়ে যে, সন্তান হওয়া অসম্ভব।

যখন বার্ধক্য এত বৃদ্ধি পায় যে, ভিতরে তৈলাক্ত পদার্থ অবশিষ্ট না থাকে, হাড় শুকিয়ে যায়, তাহলে সন্তান হবে কিভাবে? কিন্তু এটি প্রার্থনার পদ্ধতি যে, ঐ উপকরণ যার মাধ্যমে সন্তান হয়, তা নেই তা তিনি নিজেই প্রকাশ করছেন যে, সন্তান হওয়ার উপযোগিতা আমার মধ্যে কোনোটাই নেই। যাতে প্রার্থনার উত্তর এমন না আসে যে, যদি এভাবে চাওয়া হয় যে, হে আল্লাহ! আমাকে পুত্র সন্তান দাও, তাহলে হতে পারে উত্তর আসবে, তুমি বৃদ্ধ হয়ে গেছ; এমনটি আল্লাহর নিয়মের খেলাফ, বৃদ্ধাবস্থায় সন্তান দেওয়া হয় না। সুতরাং চুপ হয়ে যাও। তাই প্রথমে ঐ বিষয়গুলো পেশ করে পরবর্তী সম্ভাব্য উত্তর রদ করলেন। আমি তার উত্তর নিজেই দেব, যাতে মাকসাদ পূর্ণ হয়। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমার হাড়গুলো শুকিয়ে গেছে, মাথার চুল সাদা হয়ে বার্ধক্য চলে এসেছে। তিনি প্রার্থনার মাঝে এও বললেন–

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

হে আল্লাহ! আমি কখনও আপনার কাছে প্রার্থনা করে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাইনি।

যখনই গিয়েছি কিছু না কিছু নিয়ে গিয়েছি, পেয়েছি। কখনও নিরাশ ও বিফল হইনি। সারকথা হলো, সন্তান হওয়ার কোনো মাধ্যম বিদ্যমান নেই আর আপনার কাছ থেকে কখনও খালি হাতে ফিরে যাইনি। এ কারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যা দাবি করব পাব। যেমনটি হাদিস শরীফে এসেছে যে, দোয়া এভাবে করো। اَلْحُوْا ইলহাহ্ করো।

অর্থাৎ অনুনয়-বিনয় করো, কান্না-কাটি করো। নাছোড় হয়ে প্রার্থনা করো যে, না নিয়ে এখান থেকে নড়ব না। কথাগুলো হবে অসহায়ের মতো, মাথা নত করবে

অসহায়ভাবে, বসবে অসহায়ের মতো। তাহলে কোনো কারণ নেই যে, কারীমের দরজায় আসব আর রিক্তহাতে ফিরে যাব। আমি নিয়েই তবে ফিরব। তারপর তিনি আরজ করলেন–

وَاِنِّیْ خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَّرَآئِیْ

'আমি ভয় করি, আমার পর আমার আত্মীয়-স্বজনকে।'

তাদের প্রতি আমার কোনো ভরসা নেই যে, তারা আমার মিশন জারি রাখবে বা সামনে বাড়াবে। বরং তারা আমার উদ্দেশ্যকে নষ্ট ও বরবাদ করে ফেলবে।

তারপর তিনি বললেন–

وَكَانَتِ امْرَاَتِیْ عَاقِرًا

হে আল্লাহ! শুধু আমিই বৃদ্ধ নই, পাশাপাশি আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। তার সন্তান হওয়ার কোনো পন্থা নেই।

সাথে সাথে এও বললেন যে, আমি বৃদ্ধ; আমার সন্তান হওয়ার কোনো যোগ্যতা নেই, আবার স্ত্রীও বন্ধ্যা; তাঁর মধ্যে সন্তান হওয়ার যোগ্যতা নেই। অপরদিকে আত্মীয়দের উপরও কোনো ভরসা রাখতে পারছি না যে, তারা আমার দাওয়াতি মিশনকে চালু রাখবে। তাহলে হবে কী?

فَهَبْ لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِیًّا

হে আল্লাহ! অতএব, আপনার পক্ষ হতে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী পুত্র সন্তান দান করুন যে, আমার কামালাতের ওয়ারিস হবে এবং আমার দাওয়াতী মিশনকে জারি রাখবে। *[সূরা মারয়াম আয়াত- ২-৪]*

তো বাস্তবে দোয়া ও প্রার্থনার ঢং নবীদেরই অর্জিত হয়। তাঁরা জানেন, আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়। যেমনটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার আদব ইরশাদ করেছেন যে, দোয়া করো তার আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

সুতরাং কোনো ব্যক্তি আবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ দোয়া করে; কিন্তু কবুল হয় না। হাত উত্তোলন করে চায়; কিন্তু তারপরও কবুল হয় না এবং কবুল হওয়ার আলামাত প্রকাশ পায় না। তিনি বললেন–

مَطْعَمُهٗ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهٗ حَرَامٌ يَقُوْلُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ اِنِّیْ يُسْتَجَابُ لَهٗ

তার খাবার হারাম, পোশাক হারাম, উপার্জন সন্দেহযুক্ত আর সে বলছে يَا رَبِّ يَا رَبِّ হে আমার রব, আমার রব! اَنّٰى يُسْتَجَابُ لَهٗ তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে? এটা তো দোয়া নয় বরং তামাশামাত্র।

পবিত্র হয়ে আল্লাহর দরবারে এলে দোয়া শোনা হয়। নাপাক হয়ে এলে দোয়া কেন শ্রবণ করা হবে?

রাজা-বাদশাহর দরবারে যখন কেউ খেতে চায়, তখন পরিষ্কার কাপড় পরিধান করে যায়, আতর সুগন্ধি মেয়ে সুগন্ধিযুক্ত হয়ে যায়। তখন তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়, রাজদরবারে আসন দেওয়া হয়। যদি দরবারে কোনো আবেদন-নিবেদন করে, তবে তা রাজা-বাদশাহকে শোনানো হয়। আর যদি কেউ ময়লাযুক্ত কাপড় পরিধান করে, গায়ে নাপাকি লাগিয়ে রাজদরবারে যায়, তাহলে দারোয়ানরা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে যে তুমি এখানে দাঁড়ানোরও যোগ্য নয়। আসন দেবে তো অনেক দূরের কথা। তার কথা তো শ্রবণই করা হবে না; বরং তাকে বের করে দেবে এবং বলবে, এমনটা দরবারের আদবের খেলাফ। তো হারাম আহার ভক্ষণ করে, অবৈধ বস্ত্র পরিধান করে হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! করা এমন যেমন কেউ নাপাক মেখে বাদশাহর দরবারে গেল এবং তাঁর সামনে আবেদন-নিবেদন করল। তখন তার কথা কি রাজার নিকট পেশ করা হবে, না তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হবে?

হালাল উপার্জনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

মোটকথা, দোয়ার আদবসমূহ থেকে উল্লেখযোগ্য ও সর্বোত্তম আদব হলো মানুষ পবিত্র হয়ে যাবে। প্রথমে নিজের ভিতরকে পবিত্র করবে যে, আমি আজ থেকে হারাম আহার থেকে তাওবা করছি। সন্দেহযুক্ত উপার্জন হতে তাওবা করছি। যদি উপার্জনে সন্দেহ থাকে, তাহলে অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হবে। তার থেকে তাওফিক নামক নেয়ামত ছিনিয়ে নিবে। আর হালাল উপার্জনের ফলে অন্তরে নূর পয়দা হবে, তাওফিক পয়দা হবে। হারাম উপার্জনের ফলে অন্তর থেকে তাওফিক [ভালো কাজের যোগ্যতা] বের হয়ে যায়।

আমি বড়দের নিকট হতে শ্রবণ করেছি, শাহজরী আব্দুল্লাহ নামে দেওবন্দে একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি সাধারণ জনতার মধ্যে গণ্য হতেন; কিন্তু তিনি সাহেবে নেসবত বুযুর্গ ও দরবেশ ছিলেন। তাঁর উপার্জনের নিয়ম এমন ছিল,

তিনি ঘাস বিক্রি করে তা দ্বারা জীবন-যাপন করতেন। তিনি সম্পর্কযুক্ত বুযুর্গ ছিলেন। সময়ের পাবন্দী করতেন। তাঁর ঘাসের গাড়ির মূল্য ছয় পয়সা নির্ধারিত ছিল। দেওবন্দ এলাকায় যারা ঘাস ক্রয় করত, তারা তাঁর ঘাস ক্রয়ের জন্য লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত যে, শাহজরীর ঘাস আমরা খরিদ করব। প্রত্যেকে আগে বাড়ার চেষ্টা করতেন যে, যদি আমি শাহজরীর ঘাস খরিদ করতে পারি, তাহলে আমার পশুতে বরকত হবে, ঘরে বরকত হবে।

এ কারণে যখনই শাহজরী ঘাস আনতেন, তখনই লোকেরা দৌড়াতে থাকত। যে ব্যক্তি আগে ধরতে পারত, তিনি সেখানেই ঘাস ফেলে দিতেন এবং ছয় পয়সা নিয়ে নিতেন। গ্রীষ্ম হোক, বর্ষা হোক বা শীতকাল হোক সর্বাবস্থায় ছয় পয়সা। সাত পয়সাও না, পাঁচ পয়সাও না। সর্বদাই নির্ধারিত মূল্য ছয় পয়সা। যখন তিনি ছয় পয়সা গ্রহণ করতেন, তখন তা ব্যয় করার কী পদ্ধতি ছিল? দুই পয়সা সাথে সাথে গরীব-মিসকীনদের দান করে দিতেন। তখনকার যুগে কড়ি ব্যবহার হতো। চার কড়িতে এক গাণ্ড হতো। পাঁচ গণ্ডায় এক পয়সা হতো। তিনি দু-পয়সা গরীব, মিসকিন, ইয়াতীম ও বিধবাদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। আর দু-পয়সা পরিবারের জন্য ব্যয় করতেন। তা দ্বারা কিছু লবণ, কিছু তেল, কিছু তরকারি ও অন্যান্য খাবার সামগ্রী কিনে নিতেন। সস্তায় সওদাপাতি কেনা যেত। এমন সস্তা ছিল যে আজ সেই সদায় কিনতে দু-রুপী বা তার চেয়ে বেশি লাগবে। দু-পয়সার বাজার সদায় সংসার চলে যেত বিধায় তিনি দু-পয়সাই ব্যয় করতেন। অতিরিক্ত করতেন না।

আর দু-পয়সা প্রতিদিন জমা করতেন। দু-পয়সা করে জমা করে যখন সাত-আট রুপী হতো, তখন তা দ্বারা খাবার তৈরি করে আমাদের পূর্বসূরী-আকাবির বুযুর্গদের দাওয়াত করতেন, যাঁরা দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্টা করেছেন। হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভী রহ., রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ., হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর মতো বুযুর্গদের একত্র করে দাওয়াত দিতেন। আমি আমার বুযুর্গদের হতে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব রহ.-এর অভিমত শুনেছি। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের সর্বপ্রথম সদরুল মুদাররিস ছিলেন এবং বড় সাহেবে নেসবাত কামেল অলি ছিলেন। 'সারা বছর আমরা অপেক্ষায় থাকতাম, কবে ঐ দিনটি আসবে যে, আমরা শাহজরীর ঘরে দাওয়াত খাব।'

তিনি বলেন, যে দিন খাবার খাওয়া হতো, তখন থেকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অন্তরে নূর থাকত। ফলে মন চাইত, নামায পড়ি, তেলাওয়াত করি। অন্তরে আনুগত্য, ইবাদাত, যুহুদ ও রিয়াযতের আসক্তি, কামনা সৃষ্টি হতো। এটি তাঁর হালাল

উপার্জনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া। তাই উপার্জন যতটুকু পবিত্র ও হালাল হবে, ততই অন্তরে ভালো কাজের তাওফিক সৃষ্টি হবে।

হারামের অকল্যাণ বা অশুভ পরিণতি

যত পরিমাণ নাপাক, অবৈধ ও সন্দেহযুক্ত উপার্জন হবে, নেক কাজের তাওফিক তত পরিমাণ ছিনিয়ে নেওয়া হবে। মানুষ জানে, এ কাজটি নেকের; কিন্তু করতে মনে চায় না। তা করার প্রতি আসক্তি হয় না। যেমনটি গালিব বলেছেন-

جانتا ہوں ثواب طاعت وزہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی

জানি, এ কাজটি পুণ্যের আনুগত্য ও যুহ্দ, কিন্তু মন-তবিয়ত সেদিকে আকৃষ্ট হয় না।

জানা আছে এ কর্মটি ভালো, না মন্দ। ভালো কাজ করতে চাই; কিন্তু মন ও তবিয়ত করতে চায় না। যখন অন্তরে ভিতর যখন নাপাকি-হারাম প্রবেশ করে, তখন ভালো কর্ম করার জন্য উৎসাহ জাগে না।

আজ আমরা যে গুনাহে লিপ্ত, তা অজ্ঞতার কারণে নয়। দীনি ইলম তো অনেক বিস্তার লাভ করেছে, হালাল-হারামের পার্থক্য, ভালো-মন্দের তফাৎ এত পরিমাণ পরিচিত হয়েছে যে, প্রতিটি মানুষ শরীয়তের ব্যাপারে মত প্রকাশের জন্য প্রস্তুত। যারাই অল্প-স্বল্প লেখা-পড়া করেছে, তারাই কুরআন ও হাদিসের ব্যাপারে মত প্রকাশ করতে থাকে। ভাব দেখে মনে হয়, সে একজন মুজতাহিদ পর্যায়ের লোক। অতএব জ্ঞান-ইলম কম থাকার কারণে পাপ কাজে লিপ্ত নয়। ইলম আছে; তার পরও পাপে লিপ্ত ভালো তাওফিক ছিনিয়ে নেওয়ার কারণে। আর তাওফিক ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এ কারণে যে, আমাদের উপার্জন সন্দেহযুক্ত, হালাল আহার পেটে পৌঁছে না। পাকস্থলী হলো শরীরের হাউজ, যা সেখানে ভরা হবে শরীরের রগ ও চর্বিতে সেই বস্তুই ছড়িয়ে পড়বে। যদি পবিত্র ও হালাল বস্তু পড়ে, তাহলে পবিত্র ও হালালের প্রভাব রগ ও চর্বিতে পড়বে। আর নাপাক ভরলে নাপাকের ক্রিয়া পড়বে।

হালাল খাবারের ইলমি ও আমলি বরকতসমূহ

হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর ঘটনা। তিনি হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর শাগরেদ ছিলেন। তিনিও একজন বড় মাপের ইমাম ছিলেন। বড় ইমাম হলেন চারজন, যাঁদের ফিকহ্ আজ সারা বিশ্বের মুসলমানরা অনুসরণ

করছে। তাঁরা হলেন হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.। এ ছাড়া ফিকাহের আরো অনেক ইমাম ছিলেন, যাঁদের ফিকহ্ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ চারজন ইমামের ফিকহ্ আল্লাহর পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। কোটি-কোটি মানুষ তাঁদের ফিকাহের অনুসরণ করছে। হিন্দুস্তান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও তুর্কিস্তান এলাকার মুসলমানগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাঁদের মাঝে হানাফী মাযহাবের ফিকহ্ প্রচলিত। মিশর ও হিজরাজবাসীরা অধিকাংশই ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মাযহাবের অনুসারী। নাজদ্সহ অন্যান্য দেশগুলোর মানুষ ইমাম হাম্বলীর অনুসারী। তারা তাঁর ফিকহের অনুসরণ করে। পশ্চিমা দেশগুলোতে মালেকি মাহাবের লোক বেশি।

তো দুনিয়ার অধিকাংশ এলাকায় এই চারজন ইমামের মাযহাব প্রচলিত, তাঁদের ফিকহ্ বা তরিকার উপর লোকেরা আমল করে। তাদের ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল অত্যন্ত বড় মাপের একজন ইমাম। কিন্তু তিনি ইমাম শাফিঈ রহ.-এর শাগরেদ। হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ. মিশরে বাস করতেন। তিনি ইমাম আহমদ রহ.কে পত্র লিখলেন, অনেক দিন হয় মুলাকাত হয়েছিল। এখন যদি মুলাকাতের সুযোগ হয়, তাহলে চেষ্টা করে এসে যাও। মিশরে মুলাকাত হবে তোমার জন্য আলেমগণ অপেক্ষায় আছেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. লিখলেন, আমি অচিরেই আপনার মুলাকাতে আসব, তিনি পত্রে দিন-তারিখ উল্লেখ করে দিলেন এবং বললেন, তারিখ অনুযায়ী মিশর পৌঁছব।

ইমাম আহমাদ রহ. নির্ধারিত তারিখে মিশর পৌঁছলেন। তখন ইমাম শাফেয়ী রহ. তাঁকে স্বাগত জানাতে শহরের বাইরে গেলেন। তখনকার মিশর অধিপতিও– যিনি ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর অনুসারী ছিলেন– ইমামকে ইস্তেকবাল করার জন্য শহর থেকে বের হলেন। তার দেখাদেখি মন্ত্রীগণ, প্রাদেশিক আমিরগণ, উলামাগণ, সরকারী উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণসহ সারা মিশরবাসী ইমামকে ইস্তেকবাল করার জন্য শহর থেকে বের হলেন। তারা অত্যন্ত সম্মানের সাথে ইমামকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মিশর নিয়ে এলেন। হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর বাড়িতে ঈদের ন্যায় আনন্দ বিরাজ করছিল। তাঁর সন্তানরা আনন্দে নাচছিল যে, বর্তমানকালের ইমাম আমাদের ঘরে মেহমান হচ্ছেন। তাদের মাঝে আশ্চর্য ধরনের খুশি বিরাজ করছিল। মোটকথা, এমন খুশি ও আনন্দঘন পরিবেশে ইমাম মিশর আগমন করলেন। তখন উলামা, আমির-উমারাসহ সকল আকাবিরে উম্মতগণ মুলাকাত করতে এলেন।

খাবারের সময় হওয়ার পর ইমাম শাফেয়ী রহ.দস্তরখান বিছালেন। ইমাম আহমাদ রহ.কে দস্তরখানে বসানো হলো। সাথে আরো অনেককে বসানো হলো। হযরত ইমাম আহমাদ রহ. যখন আহার শুরু করলেন, তখন এমনভাবে আহার করতে লাগলেন যেমনভাবে একজন লোভাতুর মানুষ আহার করে থাকে। যেমনভাবে সাতদিনের ক্ষুধার্ত মানুষর আহার করে থাকে। তো তিনি অনেক আহার করলেন এবং অনেক তাড়াতাড়ি আহার করলেন।

খাবার শেষে যখন ইমাম শাফেয়ী রহ. ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর সন্তানরা প্রশ্ন করে বসল, আপনি আমাদের বলেছিলেন, তিনি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় ইমাম। তিনি কেমন ইমাম, যিনি সাধারণ মানুষের মতো পেট ভরে আহার করেন। মুত্তাকী-পরহেযগারদের কাজ তো হলো, তারা কম আহার করেন আর বেশি ইবাদাত করেন। পেট ভরে আহার করা এমনকি নাক পর্যন্ত আহার করা তো সাধারণ মানুষের কর্ম। বিশেষ মানুষের কর্ম তো এমন নয়। বিশেষদের মধ্যে যিনি ইমামের মর্যাদা লাভ করেছেন, তাঁর কাজ এমন হবে না যে, সে বেমাপা আহার করবে। এটি উচ্চ পর্যায়ের মানুষের কাজ নয়, যারা আমানত-দিয়ানতে সর্বোচ্চ মাকাম (স্থান) লাভ করেছেন।

হযরত শাফেয়ী রহ. উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি তাদের বললেন, এ বিষয়টি আমিও অনুভব করেছি; কিন্তু বলতে পারিনি। কারণ, আমি তো মেজবান। যদি আমি বলি, তুমি এত বেশি আহার করছ কেন, তাহলে এমন অপবাদ আসতে পারে যে, আমি মনে হয় মেহমানদের থেকে নিজের খাবার বাঁচাতে চাচ্ছি। এ কারণে আমার কিছু বলার সুযোগ হয়নি। কিন্তু আমি অনুভব করছিলাম, তাঁর হলো কী যে, তিনি এভাবে পেট ভরে আহার করছেন?

اندروں از طعام خالی دار # تانورِ معرفت در وبینی

পেটকে খালি রাখার চেষ্টা করতে হবে, যাতে মারেফাতের নূর সৃষ্টি হবে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি সন্তানদের প্রশ্নে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। ইমাম আহমাদ রহ. ইশার নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গেলেন। হযরতের চলে যাবার পর ছোট-ছোট বাচ্চারা এসে তাঁর বিছানা রচনা করল এবং বদনা ভরে পানি রাখল, যাতে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য অজু করতে পারেন। ইমাম আহমাদ রহ. যখন শয্যা ত্যাগ করে ফজরের নামাযের জন্য গেলেন, তখন বাচ্চারা ঘরে প্রবেশ করল বিছানা উঠানোর জন্য। তারা দেখতে পেল, পানির পাত্র যেভাবে ভরা ছিল, সেভাবে ভরা-ই রইল। তা দেখে

তাদের রাগ আরো বহুগুণে বেড়ে গেল যে, এ কেমন ইমাম যে, পেট ভরে ভোজন করলেন, সারা রাত ইবাদাত করার ভাগ্য হলো না, ওযু করলেন না, তাহাজ্জুদ পড়লেন না! শুধু-ই সারা দুনিয়া জুড়ে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছেন যে, তিনি বর্তমান যুগের ইমাম। ইমাম শাফেয়ী রহ. যখন ঘরে এলেন, তখন সন্তানেরা তাঁকে ঘিরে ধরল, আপনি আমাদেরকে ভুলের মধ্যে লিপ্ত রেখেছেন যে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. মুত্তাকীদের সরদার। ইনি কেমন ইমাম? তিনি নাক পর্যন্ত আহার করেন, তাহাজ্জুদ পড়া তাঁর কপালে জোটে না। রাতভর নাক ডেকে ঘুমান।

এ কথা শ্রবণের পর ইমাম শাফেয়ী রহ. আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি বাইরে এসে ইমাম আহমাদ রহ.কে বললেন, হে আহমাদ ইবনে হাম্বল! কখন থেকে এমন পরিবর্তন হয়ে গেলে? আমি তো এমনটা আশা করিনি। তোমার অবস্থা কবে থেকে পরিবর্তন হয়েছে? তুমি পেট ভরে আহার কর, তোমার তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফিক হয় না। তুমি রাতে ওঠনি, ওযু করনি। তোমার ভিতর এমন পরিবর্তন কখন থেকে এল?

ইমাম আহমাদ রহ., মৃদু হাসলেন এবং আবেদন করলেন, হযরত ঘটনা এমন নয়, যা আপনি অনুভব করছেন, বুঝছেন। তিনি বললেন, তাহলে ঘটনাটা কী? তিনি নিবেদন করলেন, ঘটনা হলো, আজ আমার ইশার ওযু দ্বারা তাহাজ্জুদ ও ফজর নামায আদায় করার সুযোগ হয়েছে। তিনি আরো বললেন, ঘটনাটি এমন যে, যখন দস্তরখানায় খাবার পরিবেশন করা হলো, তখন আমি দুনিয়াতে এমন হালাল উপার্জনের খাবার দেখিনি। সেই খাবারের উপর আকাশ থেকে এত পরিমাণ নূর ও বরকত নাযিল হচ্ছিল যে, ঘরটা আলোকিত হয়ে গেল। খাবারের প্রতি নযর দেওয়ার সাথে সাথে অন্তরে যিকরুল্লাহর হালত সৃষ্টি হয়ে গেল।

আমি এত পরিমাণ বিশুদ্ধ ও হালাল উপার্জনের খাবার আজ পর্যন্ত দেখিনি। তাই আমি সংকল্প করি, যতটুকু আহার করতে পারি করে নেব। চাই তার ফলে সাতদিন আমাকে ক্ষুধার্ত থাকতে হয় হোক। পরে আমি এমন নূরানী খাবার কোথায় পাব। তাই আমি বেশি করে খেয়ে নিলাম। উক্ত খাবারে দুটি বরকত প্রকাশ পেয়েছে। ১. ইলমি বরকত ২. আমলি বরকত। আমলি বরকত হলো, ইশার ওযুর দ্বারা আমি ফজরের নামায পড়েছি। তাহাজ্জুদ নামায পড়েছি। আমার নতুন করে ওযু করতে হয়নি।

আর ইলমি বরকত এমন হয়েছে যে, এ খাটে শুয়ে আজ আমি কুরআনের একটি আয়াত থেকে একশত মাসয়ালা আবিষ্কার করেছি, যা আমার ইতঃপূর্বে বুঝে আসতো না।

আমার অন্তরে ইলমের দরজা খুলে গেছে। তাই একটিমাত্র আয়াত দ্বারা শত মাসয়ালা আবিষ্কার করতে পেরেছি।

তখন আনন্দে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মুখ খুলে গেল। তিনি হাসতে ও বলতে লাগলেন, দেখলে তো, আমি তোমাদের বলিনি যে, তিনি জমানার ইমাম! ঘটনা শ্রবণের পর সন্তানরা সান্ত্বনা পেল।

উক্ত ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হলো, হালাল উপার্জনের প্রভাবে মারেফাত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহপ্রদত্ত ইলমে বরকত পয়দা হয়। আমলের তাওফিক হয়। আজ আমাদের আমলের ঘাটতি এ কারণে নয় যে, আমাদের মাসায়েলের ইলম নেই। এখন সবাই মাসয়ালা জানেন। ইলমের মাধ্যম এত ব্যাপকতা লাভ করেছে, যা পূর্ব যুগে ছিল না। কিতাব মুদ্রিত হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশ করা হচ্ছে, ছোট-ছোট রিসালা প্রকাশ করা হচ্ছে। এসব দ্বারা শরীয়ত চর্চা হচ্ছে। সবধরনের মাসয়ালাকে বাহাসের আলোচ্য বিষয় বানানো হচ্ছে। মতভেদপূর্ণ মাসয়ালাগুলো তাদের মস্তিষ্কে না থাকলেও মৌখিক ইলম যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু তারপরও হাত-পা আমলের জন্য পরিচালিত হয় না।

লোক দেখানো ইলম বা প্রদর্শনযোগ্য ইলম

ইলমকে মানুষ ব্যবহার করছে ঐ আন্দাজে যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অমূল্য হাদিসে ইরশাদ করে গেছেন। শেষ যুগে ইলম গৌরব-জৌলুস প্রকাশের জন্য থাকবে। যেমনভাবে মানুষ দামি-সুন্দর কাপড় পরিধান করে সৌন্দর্য প্রকাশ করে, মনোরম ভালো আলিশান বিল্ডিং নির্মাণ করে গৌরব অর্জন করে, তেমনিভাবে ইলম দ্বারা নিজের সৌন্দর্য ও গৌরব প্রকাশ করবে। বলবে, আমিও পড়া-লেখা করেছি, আমিও একজন আলেম, আমিও মাসয়ালার ব্যাপারে গভীর জ্ঞান রাখি। তখন ইলম আমলের জন্য থাকবে না, শুধু প্রদর্শনের জন্য থাকবে। তা দ্বারা নিজেদের সৌন্দর্য, যোগ্যতা বা পরিপক্বতা প্রদর্শন করবে।

ইলম বেশি আমল কম

সারকথা, ইলমের কমতি নেই। কমতি হলে আমলে হচ্ছে। যদি অধিক ইলম দ্বারা আমল নসীব হতো, তাহলে বর্তমান পৃথিবী সবচেয়ে বেশি আমলকারী হিসেবে গণ্য হতো। কারণ, এখন ইলমের কমতি নেই। কিন্তু যত ইলম বাড়ছে

সাথে সাথে আমল তত কমছে। কেননা, ইলম তো সৌন্দর্য-গৌরব অর্জনের জন্য। ইলম অর্জনের মাধ্যম ও উপকরণ বেড়ে চলছে; কিন্তু অন্তর থেকে ইলমের হাকিকত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এক হাদিসে এসেছে, শেষ জমানায় ইলম কমে যাবে। অন্য এক হাদিসে এসেছে, শেষ জমানায় ইলম বেড়ে যাবে।

হাদিসবিশারদ আলোমগণ উভয় হাদিসের সমন্বয় এভাবে দিয়েছেন যে, ইলম অর্জনের উপকরণ বা মাধ্যম বেড়ে যাবে; কিন্তু ইলমের হাকিকত অন্তর থেকে কমে যাবে। ইলমের উপকরণ এত পরিমাণ হবে যে, পদে-পদে তার চিত্র ভেসে উঠবে আর অন্তরের অন্ধকার এত বৃদ্ধি পাবে যে, তাতে নূরের চিহ্ন থাকবে না। ফলে মানুষ হক-বাতিল পরখ করতে পারবে না। আর অন্তরের ইলমের জযবা ও বাসনা সৃষ্টি হবে না।

ইলমের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

ইলম এর আসরের মধ্যে একটি উত্তম হলো–

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই কেবল তাঁকে প্রকৃত ভয় করে। *[সূরা ফাতির আয়াত- ২৮]*

আহলে ইলমদের মধ্যে যে ইলম থাকে, তার প্রভাবে তার মধ্যে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ভয় সৃষ্টি হবে। আর যার মধ্যে পরকালের ভয়, মরণের ভয়, আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির ভয় থাকে, তাহলে তার মধ্যে আমলের জযবা-উৎসাহ সৃষ্টি হবে। কিন্তু যদি ইলম দ্বারা খাওফে খোদা– তথা আল্লাহর ভয় সৃষ্টি না হয়, তাহলে মনে করতে হবে, এ ইলম হাকিকী নয়। বরং প্রথাগত ইলম, শাব্দিক ইলম। আর শাব্দিক ইলমের জন্য খাওফে খোদার ওয়াদা নেই।

গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ

আজ পাপ ও অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়া ইলম কম হওয়ার কারণে নয়; বরং আখলাক-চরিত্রে ভাটা পড়ার কারণে। অন্তরে ঈমানি নূর কমে যাওয়ার এবং সৎ কাজের তাওফিক কমে যাওয়ার কারণে। আর তাওফিক কমে যাওয়ার কারণ হলো সন্দেযুক্ত উপার্জন, অবৈধ পন্থায় উপার্জন। অর্থাৎ সতর্কতার সাথে উপার্জন না করা, হালাল-হারামে পার্থক্য না করা। সন্দেহ ও নিঃসন্দেহ কোনোটার তোয়াক্কা না করা। স্রেফ ধন-সম্পদ অর্জন উদ্দেশ্য থাকা। যেভাবেই

হোক টাকার মালিক হতে হবে। ডাকাতি হোক, চুরি হোক, ঘুষ হোক, সুদ হোক এক কথায় যে কোনো উপায়ে হোক টাকা-পয়সা আসা চাই। এমন উপার্জনকৃত সম্পদের ক্রিয়া হলো সৎকাজের তাওফিক চলে যাওয়া।

সারকথা হলো, ইবাদাত ও যুহদ-এর তাওফিক তখনই হবে, যখন ক্বলবে নূর থাকবে। আর কলবে নূর তখনই থাকবে, যখন উপার্জন হবে বৈধ পন্থায়, হালাল পন্থায় আর খাদ্য-খাবার হবে হালাল।

হালাল রিজিক কম হয়; তবে বরকত হয়

হালাল ও বৈধ পন্থায় উপার্জন সর্বদা কম হয়। হারাম ও অবৈধ পন্থায় উপার্জন বেশি হয়। হালাল ও বৈধ পন্থায় উপার্জন কমই হয়। তবে আল্লাহ যদি কাউকে বাড়িয়ে দেন তা ভিন্ন কথা। কিন্তু অপরিহার্য কথা হলো, হালাল সম্পদ প্রয়োজন মোতাবেক অর্জিত হয়। তবে হালাল সম্পদে বরকত বেশি এবং কল্যাণ ও খায়ের প্রকাশ পায় বেশি।

ইবাদাতের বুনিয়াদ

মানবজাতিকে ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর ইবাদাত তখনই হবে, যখন তার উপকরণ ও মাধ্যম বিশুদ্ধ হবে। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

আমার ইবাদাত করার জন্যই আমি মানব ও জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছি। *[সূরা আয-যারিয়াত আয়াত- ৫৬]*

আমি সমস্ত বস্তু মানুষ ও জিনদের জন্য সৃষ্টি করেছি। আর তাদেরকে আমার জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা আমার স্মরণে মগ্ন থাকবে। সমগ্র দুনিয়া তাদের সাহায্যকারী হবে। তারা এ দুনিয়া থেকে উপকার লাভ করবে। তবে কিভাবে করবে? আমার বাতলানো তরিকায় করবে। তো লাভ ও ক্ষতি উভয়টি আল্লাহর হাতে। আর ইবাদাতের বুনিয়াদ লাভ ও ক্ষতির উপর, যা আমি পূর্বে বলেছি।

এমনটিই হযরত ইবরাহীম আ. নিজের সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করে বলেছিলেন–

قَالَ أَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ۝

তোমরা কি এমন মূর্তির উপাসনা করছ, যে তোমাদের সামান্য পরিমাণ উপকার করতে পারে না এবং সামান্য পরিমাণ ক্ষতিও করতে পারে না? *[সূরা আম্বিয়া আয়াত : ৬৫]*

এই মূর্তিগুলো যা তোমাদের রাখা, যা তোমরা নিজ হাতে তৈরি করেছ। তোমরা নিজেরাই কল্পনা করতে পার, এগুলো কি আমাদের প্রভু হতে পারে? এদের তো প্রাণ নেই। এগুলো তো তোমাদের হাতে গড়া, তোমরাই তাদের কারিগর। এত দলিল-প্রমাণ থাকার পরও তোমরা তাদের মালিক বলে স্বীকার করে নিয়েছ। এরা তোমাদের উপকারও করতে পারবে না, ক্ষতিও করতে পারবে না।

মোটকথা, ইবাদাতের বুনিয়াদ হলো উপকার ও ক্ষতির মালিক হওয়া।

মুশরিকরা ধোঁকায় পড়েছে

শিরকপন্থীরা এ বিষয়ে ধোঁকায় লিপ্ত যে, ইবাদাতের ভিত্তি লাভ-ক্ষতির উপর। তো দুনিয়াতে এমন বস্তু নেই, যার মধ্যে মানুষের কোনো-না-কোনো লাভ অথবা ক্ষতি নেই। দুনিয়ার কোনো জিনিস এমন নেই, যা শুধু উপকার করে বা শুধু ক্ষতি করে। প্রতিটি জিনিসে উপকারও আছে, ক্ষতিও রয়েছে। মোটকথা, প্রত্যেক জিনিসে লাভ-ক্ষতি রয়েছে। রুটি যা আমরা প্রতিদিন আহার করি, তাতে উপকারও আছে, ক্ষতিও আছে। যদি সীমার বাইরে আহার করা হয়, তাহলে ক্ষতি হবে, রোগ হবে। আর নিয়মমাফিক আহার করলে উপকার হব।

পানি যদি মধ্যমপন্থায় পান করা হয়, তাহলে উপকার করবে আর অধিক পান করলে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়বে এবং ঠাণ্ডা জাতীয় রোগ সৃষ্টি করবে।

বাতাস উপকার করে আবার ক্ষতিও করে। অধিক পরিমাণ কোনো জিনিস ভোজন করলে দুষিত বায়ু সৃষ্টি করবে, দুর্গন্ধযুক্ত বাতাসের রোগ সৃষ্টি হবে। আর পরিমিত পরিমাণ আহার করলে বাতাস উপকার করবে। মোটকথা, প্রতিটি জিনিসে উপকার ও ক্ষতি উভয়টাই রয়েছে। উদ্ভিদ হোক, জড় পদার্থ হোক এবং প্রাণীজগৎ হোক প্রতিটির মধ্যে লাভ-ক্ষতি মিশ্রিত। ইবাদাতের বুনিয়াদ যেহেতু লাভ ও ক্ষতির উপর আর দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসে যেহেতু লাভ ও ক্ষতি উভয়টাই রয়েছে তাই মুশরিকরা প্রত্যেক জিনিসের পূজা করতে থাকে। ইবাদাতের বুনিয়াদ যখন লাভ ক্ষতির উপর আর দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস লাভ-ক্ষতি রয়েছে তাই তারা কখনও পানির পূজা শুরু করে যে, তাতে উপকার ও অপকার উভয়টাই রয়েছে। কখনও সূর্যের উপাসনা করে যে, তাতে লাভ-ক্ষতি উভয়টা রয়েছে। তারা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এবং উপকার লাভের জন্য পূজা

করে। তেমনিভাবে তারকার, পাথরের, মূর্তির, স্বর্ণ ও রূপার পূজা করতে শুরু করে। সুতরাং উপাসনাকারী একজন আর উপাসক তেত্রিশ কোটি। দুনিয়াতে যত প্রকার বস্তু রয়েছে সবার ভিতর কোনো-না-কোনো ক্ষতি বা উপকার রয়েছে।

কারিগরি বা শিল্পযন্ত্রের পূজা

কিছু মুশরিক যারা বিভিন্ন পেশা ও শিল্পে ব্যস্ত তারা তাদের পেশার যত যন্ত্র বা অস্ত্র রয়েছে, সেগুলোর পূজা করে এই ভেবে যে, এগুলো আমাদের উপকারের মাধ্যম, এগুলো আমাদের জন্য উপকারের কারণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ লেখক হলে সে কলমে সামনে দাঁড়িয়ে আদব দেয়, পূজা করে। কেউ তলোয়ারের মালিক হলে তলোয়ারকে পূজা করে। কেউ কাঠমিস্ত্রি হলে সে তার যন্ত্রপাতির পূজা করে। তারা মনে করে, আমার লাভ বা ক্ষতি এদের মধ্যে।

সারকথা, তারা পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসকে উপাসক বানিয়ে নিয়েছে। কারণ, ইবাদাতের বুনিয়াদ লাভ-ক্ষতি প্রত্যেক জিনিসেই পাওয়া যায়। মুশরিকরা এ উসূল তো সঠিক গ্রহণ করেছে যে, ইবাদতের বুনিয়াদ লাভ-ক্ষতির উপর। কিন্তু এক্ষেত্রে ভুলের মধ্যে রয়েছে যে, প্রত্যেক জিনিসেই লাভ বা ক্ষতি রয়েছে।

তাওহীদের দাবি

ইসলামও দাবি করে, ইবাদাতের বুনিয়াদ উপকার ও অপকারের উপর। কিন্তু লাভ-ক্ষতি মালিকের আয়ত্তে। তাই দুনিয়াতে যত প্রকার উপকরণ রয়েছে, লাভ ও ক্ষতি তাদের অধীনে নেই। বরং তা মালিকের আয়ত্তে। তাঁর ইচ্ছায় উপকার, বা অপকার করে। হাতুড়ি স্বয়ং উপকার করতে পারে না। বাতাস উপকার করতে পারে না। উপকার করা না করা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। প্রকৃত উপকারের মালিক আল্লাহর তায়ালা, যিনি আসল হর্তা-কর্তা। লাভ-ক্ষতি উপকরণের হাতে নেই। তাই ইবাদাত করতে হবে ঐ সত্তার, যাঁর হাতে লাভ-ক্ষতি। তার নয়, যে শুধু লাভ-ক্ষতির কারণ বা মাধ্যম হয়। সে লাভ-ক্ষতির আবিষ্কারক নয়, তাদের সৃষ্টিকর্তা নয়। আর কারণ বা মাধ্যম হওয়ার কারণে আবিষ্কারক সৃষ্টিকর্তা হওয়া আবশ্যক করে না।

ইবাদাতের হকদার

মানুষ সন্তান সৃষ্টির কারণ বা মাধ্যম। তাই বলে কি তাকে সন্তানের সৃষ্টিকর্তা বলা যাবে? কৃষক ফসল উৎপন্যের উসিলা। তাই বলে তাকে ফসল উৎপন্যকারী বলা হবে?

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ

তাকে তোমরা উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? *[সূরা ওয়াকিয়া আয়াত ৬৪]*

তোমাদের কাজ এতটুকু যে, তোমরা ফসল উৎপন্যের মাধ্যম হতে পার, ফসল উৎপন্নকারী হতে পার না, ফসল উৎপন্নকারী হলাম আমি। মাটিতে বীজ বপন করার পর তার নিচ থেকে কে কিশলয় বা পল্লব বের করে? তোমরা বের কর, না আমার কুদরতে বের হয়?

যার বাচ্চাদানীতে মনির ফোটা পৌছার পর তাতে কারিগরি করে মানবচিত্র তৈরির কর্ম তোমরা কর, না আমি করি? আমি তাকে গোস্তের টুকরা বানায় এবং বৃদ্ধি করি, না তুমি কর?

মোটকথা, তোমরা সবাই সৃষ্টি– সৃষ্টিকর্তা নও। কৃষক ফসলের মাধ্যম হতে পারে– সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। সুতরাং পৃথিবীতে যেসব বস্তু রয়েছে, সেগুলো লাভ-ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাদের সৃষ্টিকর্তা ও আবিষ্কারক হতে পারে না। লাভ বা ক্ষতি মহান কর্তা আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান জীবন দান করেন, যাকে চান জীবন কেড়ে নেন। যাকে চান সুস্থতা দান করেন, যাকে চান সুস্থতা ছিনিয়ে নেন। যাকে চান সন্তানের নেয়ামত দেন। যাকে চান সন্তান কেড়ে নেন। এ সবের ক্ষমতা তারই হাতে– উপকরণের হাতে নয়।

তোমরা যদি সন্তানের সৃষ্টিকর্তা হতে, তাহলে যেমনভাবে সৃষ্টি করতে পারতে, তেমনিভাবে তাকে বাঁচাতেও পারতে। তাহলে কোনো মাতা-পিতা তাদের সন্তানকে মরতে দিত না। কিন্তু তারা এ কাজে সক্ষম নয়। তাই যখন জীবন রক্ষা করার ক্ষমতা তাদের নেই, তাহলে জীবন দেওয়ার শক্তি তাদের কোথেকে আসবে? তোমরা বেশি থেকে বেশি মাধ্যম হতে পার। তোমরা মরণের মাধ্যম বা কারণ হতে পার।

মানুষ যদি কাউকে ছুরি মারে, তাহলে সে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কিন্তু মৃত্যু প্রদানকারী হতে পারে না। মৃত্যু প্রদানকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। কেউ যদি

ছুরি মারে আর আল্লাহ তায়ালা ছুরি হতে কর্তনের ক্ষমতাকে দূর করে দেন এবং মৃত্যু না দেন, তাহলে লাখবার যবেহ করার দ্বারাও যবেহ হবে না। আগুনে জ্বলে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে, তাহলে মনে করতে হবে, আগুন মৃত্যু দেয়নি, সে শুধু মরণের কারণ হয়েছে। আর মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহর ইচ্ছায়। আগুনকে তিনি মরণের কারণ বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব, উপকরণের মধ্যে যে লাভ বা ক্ষতি সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহর হুকুমেই হয়। স্বয়ং উপকরণ লাভ বা ক্ষতি পৌছাতে সক্ষম নয়। এ কারণে ঐ উপকরণের ইবাদাত বৈধ নয়। ইবাদাত তারই করতে হবে। তারই হাতে লাভ-ক্ষতি। আর তিনি হলেন বরকতময় সত্তা আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং সারা পৃথিবীও যদি লাভ-লোকসানের কারণ হয়ে যায়, তাহলেও তারা ইবাদাতের উপযুক্ত নয়। যিনি লাভ-ক্ষতি পাঠান, তিনিই হলেন ইবাদাতের হকদার ও উপযুক্ত।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা উসূল বাতলে দিয়েছেন–

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّ لَا يَضُرُّكُمْ ۝ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

তিনি বললেন, তোরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত করছ, যা তোমাদের কোনো উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক্ তোদের জন্য এবং তোরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করছ, তাদের জন্য। তোরা কি বুঝিস না? *[সূরা আম্বিয়া আয়াত ৬৬-৬৭]*

তোমরা এমন জিনিসের ইবাদাত করছ, যা তোমাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। اُفٍّ لَّكُمْ তোমাদের জন্য ধিক্ তোমাদের হাতে নির্মাণকৃত ঐ মূর্তিদের উপর, যাদের মধ্যে উপকার বা অপকার কোনোটারই যোগ্যতা নেই।

অন্য স্থানে তিনি ইরশাদ করেছেন–

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ

হে লোক সকল! একটি উদাহরণ বর্ণনা করা হলো। অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা করছ, তারা কখনও একটা মাছিও সৃষ্টি

করতে পারবে না যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। *[সূরা হাজ্ব আয়াত- ৭৩]*

অর্থাৎ আল্লাহকে ছেড়ে যাদের পূজা করছ এবং যে মূর্তিদের সামনে বসে পূজা করছ, তারা একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও তারা সবাই একত্রিত হয়ে বানাতে চেষ্টা করে, তাহলেও পারবে না।

বয়ান : ৩

হজ : একটি আন্তর্জাতিক ইবাদাত

হজ একটি আন্তর্জাতিক ইবাদাত। আন্তর্জাতিক সাম্য, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতার এক আজিমুশ্বান নমুনা। তাতে সকলের কেন্দ্র এক, আমল এক, চিন্তা এক, পোশাক এক, শারীরিক ডিজাইন এক, কিবলা এক, মহব্বত এক ও অভিন্ন এবং সবার মানবতা ও বিবেকও এক ও অভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। সেখানে পরস্পর উঁচু-নিচু, ধনী-গরীব, তুচ্ছতা ও অবজ্ঞার বীজকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। সুতরাং যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের ধ্বনি বারবার উচ্চারিত হচ্ছে, তারা কুরআনুল কারীমের দেওয়া সাম্যের মডেলকে সামনে রেখে উপদেশ গ্রহণ করুক। অন্যথায় সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শনের (রক্ষার) দাবি মুখে উচ্চারণ না করুক।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا• اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ • اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ• صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এই ঘর, যা মক্কায় উপস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। [সূরা আলে ইমরান ৯৬]

সাম্যের নমুনা বা মডেল

সম্মানিত সুধী!

সাম্য ও একমুখিতাকে ইবাদাতে রঙে বাস্তবতার রূপ দান করার জন্য আল্লাহ তায়ালা হজকে ইবাদাত স্থির করেছেন। তাতে পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা একসঙ্গে একত্রিত হবে, যাতে তাদের মধ্যে উঁচু-নিচুর, ধনী-গরীবের জীবাণু নিঃশেষ হয়ে যায়। আর এই সাম্যের সম্মেলন হতে

তৈরি বাস্তব সমতার মডেলকে সামনে রেখে নিজেদের পরবর্তী জীবনকে সাম্য ও একতার সাথে অতিবাহত করবে।

এ কারণে ইসলামি শরীয়ত এই কেবলাকে প্রথমে সকল মানুষের জন্য কেবলা স্থির করেছিল। এটি হাদিস ও আসার দ্বারা প্রমাণিত যে, যখন সকল নবী-রাসূল এই আল্লাহর ঘরের আযমত এবং তাকে মহব্বত ও সম্মান করেছেন আর তাকে নিজেদের কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তখন অবশ্যই তাঁদের অনুসারী সম্প্রদায়ের কেবলা ছিল বাইতুল্লাহ।

কেবলা বিশ্বব্যাপী হেদায়েতস্থল

কুরআনুল কারীম ঘোষণা করেছে, কেবলা জগতের সকল মানবজাতির জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۚ

কাবা সর্বপ্রথম আল্লাহর ঘর, যা জগতের সকল মানুষের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। এটি মক্কায় অবস্থিত। আয়াতে কারীমায় সর্বপ্রথম وُضِعَ لِلنَّاسِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সকল মানবজাতির জন্য। وُضِعَ لِلْعَرَبِ বা وُضِعَ لِلْعَجَمِ তথা আরব বা আযমের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে বলা হয়নি। তাই প্রমাণিত হয়, এ কেবলা আরব ও আজম সকলের। তারপর কেবলাকে জগদ্বাসীর পথপ্রদর্শক বলার জন্য عالمين শব্দটি ব্যবহার করেছেন এ কথা বুঝানোর জন্য যে, এই কেবলা সারা পৃথিবীবাসীর হেদায়েতের রাহবার। ফলে প্রমাণিত হলো, এই কেবলা সমগ্র বিশ্ব জাহানের জন্য আন্তর্জাতিক হেদায়েত। যার মর্মার্থ এ ছাড়া অন্যটি নয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হতে সকল সম্প্রদায়ের ও গোত্রের মানুষ বিশ্বব্যাপী রাহনুমার অধীনে হজ পালন করার কেবলার দিকে ধাবিত হবে এবং আন্তর্জাতিক ও বিশ্বব্যাপী একতা বা ঐক্যবদ্ধতার পরিচয় দেবে।

মানবজাতির নেতা ও তাদের মার্কায

কুরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম আ. কে ইমামুন নাস্ তথা মানবজাতির ইমাম বলে আখ্যায়িত করেছেন-

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

আপনাকে মানবজাতির ইমাম নির্বাচন করলাম।

তাতে আরো বলা হয়েছে–

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

বাইতুল্লাহ হজ করার জন্য মানুষদের মধ্যে সাধারণ ঘোষণা দাও।

এখানেও উভয় স্থানে الناس শব্দটিকে নির্দিষ্ট কোনো দেশ ও এলাকার সাথে বিশেষিত না করে আমভাবে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ ঘোষক বানানো হয়েছে 'ইমামুন নাস' কে, যাকে সাধারণত পৃথিবীর সকল বড়-বড় সম্প্রদায়ের লোকেরা দলমত নির্বিশেষে ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আবার ঘোষণা বাক্যেও الناس শব্দটিকে সম্বোধন করেছেন– কোনো জাতি বা দেশকে বিশেষিত করা ব্যতীত। যার অর্থ হলো, হে সকল মানুষর! সবাই হজের জন্য চলো। কেননা, এখানে ইমামুল আরব, ইমামুশ শাম বা ইমামুল ইরাক বলা হয়নি বরং ইমামুন নাস বলা হয়েছে, যাকে ইয়াহুদী, নাসারারাও ইমাম মানে। মুসলমানগণও ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। অগ্নিপূজক ও পারস্যের লোকেরাও তাঁকে ইমাম বলে স্বীকার করে। ব্রাহ্মণরাও হযরত ইবরাহীম আ.কে ইমাম স্বীকৃতি দেয়। এ কারণে তারা নিজেদের উপাধি ব্রাহ্মণ রেখেছে। এ ছাড়া আরো অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বিভিন্ন নামে ইমাম হিসেবে স্বীকার করে থাকে।

মোটকথা, হজের ঘোষণার জন্য ইমামুন নাসকে নির্বাচন করা এ কথার সুস্পষ্ট দলিল যে, হজ করার সাধারণ অনুমতি পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য ছিল। আর হজের সাধারণ ঘোষণার খেতাব (সম্বোধন) 'الناس' কে বানানো, যাতে কোনো দেশ বা জাতির বিশেষত্ব নেই। এতেও সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে যে, হজের খেতাব সমগ্র পৃথিবী মানুষের জন্য। ফলে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ তায়ালা এই পবিত্র কেবলাকে মার্কাযুন নাস [মানবজাতি কেন্দ্র] ও মার্কাযুল আলম বানিয়ে হজের জন্য তার আশপাশে সমগ্র পৃথিবীবাসীর একত্রিত হওয়ার সাধারণ অনুমতি প্রদান করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয়, হজ একটি আন্তর্জাতিক ইবাদাত। তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি তা থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা তার দিকে যায়, তাহলে সেটি আন্তর্জাতিক কেবলা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। কারণ, পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডে মুসলমান রয়েছে। তারা ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা হতে পালক্রমে

হজের জন্য আসবেন। ফলে হজের আন্তর্জাতিকতা অটুট থাকবে। সুতরাং হজ একটি আন্তর্জাতিক ইবাদাত হিসেবেই গণ্য হবে।

আন্তর্জাতিক সাম্য

সারকথা হলো, কুরআনের দৃষ্টিত হজ একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন, যাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে অংশ গ্রহণ করে। এর ফলে তাতে কুদরতিভাবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বব্যাপী খেদমতের জযবা জাগ্রত হয়। সাথে সাথে এর কাজ ও গঠনতন্ত্রও সাম্য রাখা হয়েছে। তারপর শুধু তাতেই তুষ্টতা রাখেনি যে সকল সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ থাকবে বরং আগত সকল ব্যক্তিদের মধ্যেও ঐক্য জাহির হবে। সবার পোশাক এক, বাহ্যাবয়ব অভিন্ন, ধর্ম অভিন্ন। ধনী, গরীব, বাদশাহ, ফকীর, খাস, আম তথা সাধারণ পার্সন ও ভি আই পি পার্সন, আলেম ও জাহেল, মূর্খ ও শিক্ষিত নেককার ও বদকার, ভালো ও মন্দ মুত্তাকী ও ফাসেক সবাই একই পোশাকে, একই কাফনে। খালি মাথা ও খালি পায়ে একই ফকীরি আন্দাজে কাবার আশপাশে একত্রি হবে। ইহরাম বাধা অবস্থায় এক বাহ্যাবয়ব এবং সবার নজর একদিকে করে কাবার চার পার্শ্বে পাখির মতো চক্কর লাগাবে, তাওয়াফ করবে এবং আত্মত্যাগের প্রমাণ দেবে।

বন্দেগিতে একতা

আরাফাত ময়দানেও ঐ একই অবয়বে অক্ষম হয়ে নিজের পরওয়ারদেগারের সামনে বিনীতভাবে প্রার্থনা করবে, ফরিয়াদ করবে। মিনা ও মুযদালিফাতেও একইভাবে কান্না-কাটি ও কাকুতি-মিনতিতে নিমজ্জিত ও আত্মহারা হবে। সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে ঐ একই আন্দাজে বশ্যতা স্বীকার করে এবং ইশ্‌ক ও প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে আশেক ও প্রেমিকের ন্যায় দৌড়াবে। এক কাফেলা অন্য কাফেলার সাথে সাক্ষাত হলে পরস্পর জাগতিক বা সামাজিক জয়ধ্বনি উঁচু করার পরিবর্তে লাব্বায়েক, লাব্বায়েক ধ্বনি উঁচু করবে, যাতে পারস্পরিক একতার সাথে সাথে তাদের বন্দেগিতেও একতা থাকে। আর একই নম্রতা, ভদ্রতা ও নির্ভীক আন্দাজে পরস্পর মিলিত হবে। চাই বাদশাহ হোক, রাজনৈতিক নেতা হোক অথবা সাধারণ পাবলিক হোক। এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, যখন এমনভাবে লক্ষ-লক্ষ মানুষের একই ফকীরের পোশাক, একই আচরণ, একই কর্ম, একই মার্কায এবং একই কেবলাধারী হবে। তাহলে কিভাবে সম্ভব যে, এই সাম্যের উপর থেকেও তাদের মাঝে উঁচু-নিচুর, গরীব-ধনীর কল্পনা

অবশিষ্ট থাকবে! দুনিয়ার কোনো জাতি কার্যকরী ও বাস্তব সমতার নযির দেখাতে পারলেও এমন আন্তর্জাতিক সাম্য কোন জাতিতে রয়েছে? প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমতা-সমানতার এমন বাস্তব প্রদর্শনী কারা কবে দেছিয়েছেন বা দেখাতে পারবেন?

অন্তর ও দেহকাঠামোর একতা

তারপর সেই হালতের পাশাপাশি সবার সংযম ও যুহ্দ ও অল্পেষ্টির এই অবস্থা যে, ঘর-বাড়ি ছেড়ে প্রয়োজনমাফিক কিছু রাহখরচ নিয়ে রওনা হয়। মনের ভিতর থাকে না কোনো প্রকার প্রথাগত ইজ্জত ও মর্যাদার কল্পনা। থাকে না পরস্পর বড়ত্বে আত্মগর্ব। থাকে না কারো মধ্যে উঁচু-নিচু ও ধনী-গরীবের খেয়াল। থাকে না কারো যবানে গাল-মন্দ, লজ্জহীন কথা। করে না পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি। বরং আন্তরিকভাবে পরস্পর মান্যতা-বশ্যতা ও পরস্পর খেদমতের জযবা আগ্রহ, অগ্রাধিকার প্রদান করে ও আত্মত্যাগের কম্পনা সর্বময় বিরাজমান থাকে।

সবার ভিতর পরনির্ভর ও মুহতাজ হওয়ার স্থলে তাওয়াক্কুল ও অমুখাপেক্ষিতার জযবা জাগ্রত থাকে। প্রথাগত আড়ম্বর ও শান-শওকত থেকে অনেক ক্রোশ দূরে থাকে। সবাই সরলতা ও সংকোচহীনতায় মাতাল। শুধু একজনের ভালোসার নেশায় তাকেই বারবার ডাকা, একজনের নিকট প্রার্থনা করা। এক সত্তার সম্মুখে মাথা নত করা, যিনি সবার একই হাকিকি মার্কায, আসল অস্তিত্ব এবং খালিক ও মালিক। আর তারই আন্তর্জাতিক ঘরের চার পাশে তাওয়াফ করা, যা সকলের প্রকাশ্য কেন্দ্র, সকলের আসল উৎস, সকলের চেষ্টার মার্কায।

পৃথিবীর কোনো সম্প্রদায় অন্তরের একতা, দেহ-কাঠামোর সাম্য, মানবজাতির এই আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব ও আদমসন্তানের এই বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বের নমুনা দেখাতে পারবে প্রশ্নই আসে না, যে নমুনা ইসলাম ও মুসলিমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে জুড়ে দেখায় আর তারা শুধু নিজেরাই দেখে না বরং তারা দুনিয়াবাসীকে এই শিক্ষা দেন যে, উঁচু-নিচু দূর করে সমতা সৃষ্টি করা। শুধু স্লোগান দ্বারা সম্ভব নয়, বরং তা বাস্তবে এমন হয় এবং অহংকার ও গর্বের মূল শিকড় এভাবে উপড়ে ফেলতে হবে।

সাম্য ও ইবাদাতে একতা-সমতা

আল্লাহর প্রতি মনোযোগ ও একমুখিতার কুদরতি প্রভাব হলো, লক্ষ-লক্ষ মানুষের সমাবেশে যেখানে নারী-পুরুষ একসাথে একস্থানে জমায়েত হয়, সেখানে কোথাও কোনো অবৈধ কর্মের চর্চা হয় না। না আছে লজ্জাকর কাজের সম্ভাবনা, না আছে পাপকাজের কোনো আহ্বান, না আছে অন্যের অধিকার খর্ব করার জযবা। অন্তর তথা ভিতরও শান্ত-স্থির, বাহিরও শান্ত-স্থির। নেই কোনো মারামারি, না আছে দলভিত্তিক ঝগড়া-ফাসাদ যুদ্ধ-বিগ্রহ। সবার চোখ পবিত্র এবং অন্তর সত্যমুখী। সাথে সাথে ইবাদাত ও আল্লাহর সঙ্গে জড়িত।

یوں باہم کس نے کئے ساغر و سنداں دونوں

রাজা আর প্রজা উভয়কে কে করেছে এমন একতাবদ্ধ!

হজ বাস্তবরূপে কার্যকরীভাবে প্রদর্শন করা হয়। কিভাবে পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, বেঁচে থাকা যায়। আর মানবিক সহমর্মিতা ও সাম্যকে ইবাদাতের সঙ্গে কিভাবে কার্যকার করা যায়।

আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব

তারপর হজের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যকে শুধু শাব্দিক অথবা আচরিক-চারিত্রিক সীমা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। বরং তার সাথে সাথে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা এবং অভাবীদের আর্থিক সাহায্য ও সহানুভূতির ধারাও কায়েম করা হয়েছে, যাতে এই ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য সার্বিকভাবে সুদৃঢ় হতে থাকে এবং এই সদ্ব্যবহার ও ইহসানের আমল দ্বারা সারা পৃথিবীর মুসলমানরা পরস্পরের অনুগ্রহ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের সাথে আবদ্ধ ও জড়িত থাকতে পারে। কারণ, বিশেষ করে এই নাতিদীর্ঘ সফরে শুধু ধনিক শ্রেণীর লোকেরা আসে না। গরীবরাও আসে। এমনকি অধিকাংশ গরীবই হয়, যারা নিজেদের আগ্রহ ও প্রেমে কোনো প্রকার রাহখরচ নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায়। হতে পারে, তাদের নিকট অর্থ-কড়ি কমে যায়। ফলে তারা তাদের কিছু আবশ্যকীয় প্রয়োজন পুরা করতে পারছে না। তারা কষ্টে লিপ্ত হয়ে যায় বা প্রয়োজন মোতাবেক অর্থ কড়ি আছে; কিন্তু হঠাৎ কোনো অসাধারণ প্রয়োজন দেখা দেয়, যা তার সামর্থ্যের বাইরে। যেমন- অসুস্থতা, চিকিৎসা ইত্যাদির পেরেশানি। অথবা ঐ সমস্ত অবস্থা হলো কিন্তু অর্থ-কড়ি চুরি হয়ে গেল। ফলে সে এই দূর দেশে গরীব হয়ে গেল এবং সাহায্যের হকদার হয়ে পড়ল অথবা তার মধ্যে কোনোটিই প্রকাশ পেল না; কিন্তু

তৎক্ষণাত সাময়িকের জন্য মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়োজন দেখা যায়। এ সকল অবস্থা সামনে রেখে হাদিসে নববী এ কথা বলে তাদের উপর আর্থিক সাহায্য করার উৎসাহ দিয়েছে যে, হারাম শরীফে যা কিছু গরীব-অভাবীদের জন্য ব্যয় করা হবে, তার প্রতিদান এক লক্ষ গুণ বেশি হবে। অর্থাৎ এক টাকায় এক লাখ টাকার সমপরিমাণ সাওয়াব মিলবে।

হজে আধ্যাত্মিক উন্নতির মর্যাদা স্তর

সারকথা হলো, হারাম ব্যতীত যে আত্মশুদ্ধি বা কৃপণতার খারাবি হতে পবিত্রতা এবং আত্মার সুদ্ধির যোগ্যতা এক লাখ রুপি সাদকার দ্বারা সৃষ্টি হয়, এগুলো হারাম শরীফে এক রুপি সাদকা করলেই হাসিল হয়ে যাবে। আর রুহানী উন্নতির স্তর এক থেকে এক লক্ষ পর্যন্ত পৌছে যাবে।

অকৃতজ্ঞতা হবে যদি এত উৎসাহ দেওয়ার পরও এই প্রবহমান রাস্তায় নিজের দানের হাততে সিক্ত না করি। মানে অর্থ ব্যয় না করি।

আন্তর্জাতিক সদ্ব্যবহার বা হুসনে সুলুক

তারপর কুরআনুল কারীম তথা আল্লাহ তায়ালা হজের কুরবানিসমূহে– যা হজের আরকানের অন্তর্ভুক্ত, তাতেও গরীব-দুঃখীদের নজরে রেখেছেন এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের ধারাকে বিশ্বব্যাপী করে দিয়েছেন। ইশরাদ হয়েছে–

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ

তারপর এই কুরবানিকৃত জানোয়ার হতে নিজে আহার করো এবং দুঃখী-অভাবীদের আহার করাও। *[সূরা হজ্ব : ২৮]*

মোটকথা, হজে যেমনভাবে বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য রাখা হয়েছে, তেমনিভাবে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতাকেও বিশ্বব্যাপী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, আয়াত শরীফে আল্লাহ তায়ালা দুঃখী-অভাবীকে কোনো দেশ বা স্থানের সাথে খাস করেননি যে, সে আরবী হতে হবে বা অনারবী হতে হবে। বরং পৃথিবীর যে কোনো ভূখণ্ডের হোক সবাই সেই আদেশের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হবে।

হজে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

প্রশ্ন হতে পারে, এক ব্যক্তির দান-সদকা করার জযবা আছে। যে গরীব-দুঃখীদের দান করতে চায়, কিন্তু তার নিকট নগদ অর্থকড়ি এত পরিমাণ নেই যে, তার জযবা-আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে। তো কুরআনুল কারীম উক্ত অবস্থাকে সামনে রেখে এ কাজের অনুমতি প্রদান করেছে যে, যদি কেউ ব্যবসার মাল সাথে নিয়ে বিক্রি করতে পারে, যাতে নিজের এবং অন্য ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ হবে, তাহলে এ কারণে তার কোনো গুনাহ হবে না এবং হজের ইবাদাতে বাধাও হবে না। ইরশাদ হয়েছে–

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ

তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ তালাশ করায় কোনো পাপ নেই। *[সূরা বাকারা ১৯৮]*

অর্থাৎ হজে যদি কিছু ব্যবসার মাল নিয়ে যাওয়া ভালো মনে কর, তাহলে তাতে তোমাদের কোনো প্রকার পাপ নেই যে, হজের মৌসুমে জীবনোপকরণ অন্বেষণ করবে, যা তোমাদের কিসমতে তোমাদের পরওয়ারদেগার লিখে দিয়েছেন। কুরআনে পাকের অন্যত্র উক্ত বিষয়টি ভিন্ন শিরোণামে এভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে, তাতে উৎসাহ দেওয়ার শান প্রকাশ পেয়েছে। যেস্থানে হযরত ইবরাহীম আ.কে হজে সাধারণ ঘোষণার আদেশ করেছেন, সেই স্থানে ইরশাদ হয়েছে–

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ

এই ঘোষণায় মানুষ পায়ে হেঁটে, কৃষকরা উটে চড়ে অনেক দূর-দূরান্ত হতে চলে আসবে, যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

এ আয়াতে مَنَافِعَ শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহার হচ্ছে। তাতে প্রথমত হজের পরকালীন কল্যাণ যেমন আল্লাহর রেজামন্দি, আযর ও সাওয়াব এবং পরকালের উন্নতির ধাপগুলো শামিল। আর দ্বিতীয়ত দুনিয়াবি বা ইহকালীন কল্যাণ যেমন কুরবানির গোস্ত খাওয়া ও খাওয়ানো এবং ব্যবসা, কারিগরি পেশা অথবা ঔষধ-চিকিৎসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনও শামিল।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা

সুতরাং কুরআনুল কারীম যেমনভাবে হজের কার্যাবলির ধারাগুলো আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের বন্ধন কায়েম করেছে, তেমনিভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কারিগরি ও প্রকৌশলবিদ্যার কল্যাণের রাস্তাও সুগম করেছে, যাতে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব সাম্য ও সদ্ব্যবহার দৃঢ় বুনিয়াদের উপর কায়েম থাকে। আর আন্তর্জাতিকভাবে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা এবং পরস্পর বেঁচে থাকার ধারা চালু থাকে, যাতে মুসলমানদের পরস্পর সম্পর্ক শুধু নিজেদের দেশের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং তা দুনিয়ার সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং বিশ্বব্যাপী সম্পর্ক তৈরি হয়।

অতএব হজ একটি আন্তর্জাতিক ইবাদাত, আন্তর্জাতিক সমতা, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতার অনন্য ও আজিমুশ্বান দৃষ্টান্ত, যাতে মার্কায এক, মহব্বত এক এবং সবার মানবতাও এক হিসেবে প্রকাশ পায়। আর তাতে উঁচু-নিচু, তুচ্ছ, ঘৃণার বীজ সমূলে ধ্বংস করা হয়। সুতরাং যে সম্প্রদায়ের লোকেরা আজ সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের স্লোগান দিয়ে বেড়াচ্ছে, তারা কুরআনুল কারীমের এই সাম্যের নমুনাকে সামনে রেখে উপদেশ গ্রহণ করুক। তাই লোকদেখানো ভ্রাতৃত্বের দাবি যেন তারা উচ্চারণ না করে। তারা শুধু সাম্য, ভ্রতৃত্ব ও বন্ধুত্বের স্লোগান প্রচার করে বেড়ায়।

সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও সমতার দাবি

সম্ভবত এটি ইসলামের ঐ সাধারণ আহ্বান এবং দাওয়াতের কারণে যে–

كُلُّكُمْ بَنُوْا اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ

তোমরা সবাই আদম সন্তান আর আদমকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

তোমাদের কেউ সূর্যের সন্তান নয়, না চাঁদের। কাউকে স্বর্ণ দ্বারা বানানো হয়নি, না রূপা দ্বারা। আবার কেউ আল্লাহর মুখ হতে বের হওনি। না তাঁর পা হতে। বরং সবাই তাঁর ইচ্ছা ও সৃষ্টির দ্বারা, একই উপাদান এবং একই পিতার সন্তানদের হতে জন্মেছ। তোমরা পরস্পর একে অপরের ভাই, পরস্পর মহব্বত ও ভ্রাতৃত্বের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা চাঁদ-সুরুজের সন্তান হয়ে মানুষকে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের সবক দিতে পারবে না। বরং মাটির আদমের সন্তান হয়ে, মানুষের সাথে মিশে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের সবক দিতে পারে। তারা একাধিক

খোদার বান্দা হয়ে দুনিয়াবাসীকে এক মার্কাযে একত্রিত করতে পারবে না; বরং এক এবং শুধু এক আল্লাহ ও অদ্বিতীয় খোদার বান্দা হয়ে একতা সৃষ্টি ও এক কেন্দ্রে জমা করতে পারে।

আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের কেন্দ্রীয় সূক্ষ্ম বিষয়াবলি

এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালা আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বতের জন্য পৃথিবীতে তিনটি মার্কায পাঠিয়েছেন। ১. কালামুল্লাহ ২. বাইতুল্লাহ ৩. রাসূলুল্লাহকে তাদের আন্তর্জাতিক মার্কায বা কেন্দ্র বানানো হয়েছে।

কুরআনকে ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ (বিশ্ববাসীর জন্য উপদে) বলা হয়েছে। বাইতুল্লাহকে هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ (বিশ্ববাসীর হেদায়েত) বলা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহকে رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (জগতবাসীর রহমত) বলা হয়েছে।

কুরআন দ্বারা বিধান আকারে হেদায়েত সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে প্রসারিত হয়। বাইতুল্লাহ হতে হজের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য সৃষ্টি হয় আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা রহমত, মহব্বত ও মানবতা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে আমলের মাধ্যমে।

বিশ্বস্ততা ও অকপটতা প্রদর্শন বা অন্বেষণ

এ কারণে যে জাতি বা সম্প্রদায় মানুষদের মধ্যে শুদ্ধ হেদায়েত, প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য এবং সঠিক মানবতাবোধ দেখতে চায়, তাদের জন্য অবশ্যই ঐ তিনটি মার্কায অবলম্বন করতে হবে। এ ছাড়া সম্ভব নয়। আর তাদের এই পবিত্র পুঁজি এ তিন পথ দ্বারা মিলতে পারে। যদি পক্ষপাতিত্ব আর স্বজনপ্রীতি ছেড়ে সততা ও অকপটতার সাথে তাদের গ্রহণ করে, তাহলে নিঃসন্দেহে সফলতা ফিরে আসবে।

মোটকথা, এই হজ যেমনভাবে আন্তর্জাতিক ইবাদাত, তেমনিভাবে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব; সাম্য ও পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতার মূল উৎস।

ইসলাম ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের একটি পৃথক নীতি প্রদান করেছে, যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হজের ইবাদাতে গোপন ছিল। এ কারণে আলোচ্য বিষয়ের

আবেদনে ঐ বিষয়টি সংক্ষিপ্তাকারে অল্প সময়ের ভিতর ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল। অন্যথায় হজের ধারাবাহিকতায় দীনি ও দুনিয়াবি উপকার ও কল্যাণের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ যে, এই কটা লাইনে সংকুলান হবে না। তার জন্য আলাদা আলোচনার প্রয়োজন।

وَبِاللهِ التَّوْفِيْقِ

[মাসিক 'আল হক্ব', আকুড়া খটক, পেশোয়ার হতে সংগৃহীত]

বয়ান : ৪

তাযকিয়ার গুরুত্ব

প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহর ভয়ই মানুষকে অন্যায়-অপরাধ থেকে বাঁচাতে পারে। পুলিশ বাহিনী পারবে না। যদি পুলিশ দ্বারা, অস্ত্র দ্বারা, সামরিক শক্তির মাধ্যমে অপরাধ দমন করা যেত, তাহলে বর্তমান দুনিয়াবাসী সবচেয়ে বেশি পরহেযগার ও মুত্তাকী হতো। কেননা, আজ না আছে সৈন্য বাহিনীর স্বল্পতা, না আছে পুলিশ ও হাতিয়ারের কমতি। পূর্ব যুগে কখনও এমন অস্ত্র দেখা যায়নি, যা বর্তমানকালে দেখা যাচ্ছে। এত সংখ্যক সৈন্যবাহিনী পূর্বে কখনও দৃষ্টিগোচর হয়নি, যা এখন দেখা যাচ্ছে। তেমনিভাবে পুলিশ বাহিনী এত পরিমাণ কখনও পরিলক্ষিত হয়নি, যা আজ হচ্ছে। এমনকি রাস্তার মোড়ে-মোড়ে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। কিন্তু অপরাধ দমনের মাধ্যম যত বেড়ে চলছে, তার চেয়ে বেশি অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। অতএব, অপরাধ-অন্যায় দমন করা পুলিশের কাজ নয়, নিয়ম-কানুনের কাজ নয়। যতক্ষণ-না মানুষের ভেতরগত চরিত্রের অবস্থা পরিবর্তন না হয়, শুদ্ধ হয় এবং যতক্ষণ-না আল্লাহর ভয় সামনে থাকে, ততক্ষণ মানুষ অন্যায়-অপরাধ হতে বাঁচতে পারবে না।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ •

وَنَفْسٍ وَّ مَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

শপথ প্রাণের এবং যিনি সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর। তারপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সে-ই সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হয়। *[সূরা আশ্‌শামস্ আয়াত ৭-৯]*

পূর্বকথা

সম্মানিত উপস্থিতি!

কুরআনুল কারীমের এ কটি আয়াত যা আমি আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি এগুলোর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নিজের পাঠানো ধর্মের একটি মূলনীতি ইরশাদ করেছেন, যা আসল ও মূল উদ্দেশ্য এবং মানুষ সৃষ্টির বুনিয়াদি মাকসাদ। এই আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা জানার পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ একটি সূচনা অংশ বুঝে নিন; তাহলে আয়াতগুলো বোঝা সহজ হয়ে যাবে।

ভাল-মন্দের সংমিশ্রণে গঠিত সৃষ্টিজীব

প্রত্যেক মানুষের ভিতর আল্লাহর তায়ালা দুটি যোগ্যতা রেখেছেন। একটি ভালো কর্মের, অপরটা মন্দ কর্মের। ভালো যোগ্যতা দ্বারা সে ভালো কর্মের আঞ্জাম দেয় আর মন্দ ও খারাপ যোগ্যতার কারণে সে খারাপ, অন্যায় ও পাপের কাজে লিপ্ত হয়। কোনো মানুষ এ থেকে মুক্ত নেই যে, তার মধ্যে উভয় যোগ্যতা নেই। মানুষ মানুষ হয়েছে এ কারণে যে, তার মধ্যে ভালো-মন্দ উভয়টা বিদ্যমান। যদি তার মধ্যে শুধু ভালোর যোগ্যতা থাকত, তাহলে সে মানুষ হতো না, তাকে ফেরেশতা বলা হতো। আর যদি তার মধ্যে শুধু মন্দ যোগ্যতা থাকত, তাহলেও মানুষ হতো না। তাকে শয়তান বলা হতো। অর্থাৎ যার মধ্যে খারাবির চিহ্ন নেই, সে ফেরেশতা এবং যার মধ্যে খায়েরের আলামাত নেই, সে শয়তান। মানুষ উভয়টার সমন্নয়ে ঘটিত। সে ফেরেশতাও, আবার শয়তানও। তার মধ্যে উভয় মাদ্দা রয়েছে।

মানুষের উন্নতির রহস্য

মানুষের ভাল-মন্দ উভয় মাদ্দা রয়েছে বলেই তাদের উন্নতি রয়েছে। ফেরেশতা উন্নতি লাভ করতে পারে না, শয়তানও পারে না। রুহানী ও আধ্যাত্মিক যত উন্নতি লাভ করছে, তা মানুষ করছে। কারণ, মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ উভয় মাদ্দা-ই রয়েছে। দুটি বিপরীতমুখী বস্তুর যখন সংঘর্ষ হয়, তখন তৃতীয় আরেকটি বস্তু সৃষ্টি হয়। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা মানুষদের উন্নতি দান করেছেন। তাদের মধ্যে এ দুটি মাদ্দাই বিদ্যমান।

এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, মানুষের মধ্যে খায়ের ও শার, ভাল-মন্দ উভয়ের মাদ্দা রয়েছে। অর্থাৎ এক ধরনের জযবা ও আহ্বায়ক রয়েছে ভালোর আর এক ধরনের জযবা ও আহ্বায়ক রয়েছে মন্দের। একটি ভালোর দিকে উৎসাহিত ও আহ্বান করে অপরটা মন্দের দিকে আহ্বান করে। তারপর এই উভয় মাদ্দাকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ তায়ালা দুটি ভাণ্ডার রেখেছেন, তা থেকে দুই মাদ্দার সাহায্য পৌঁছে।

ভাল ও মন্দ উভয় জযবার আন্দোলন

হাদিস শরীফে এসেছে, প্রত্যেক কলবের ডান পার্শ্বে একজন ফেরেশতা বসানো হয়েছে; যিনি বান্দাকে খায়ের ও কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করেন। আর প্রত্যেক

কলবের বাম পার্শ্বে একটা শয়তান বসানো হয়েছে; যে বান্দাকে মন্দের প্রতি উৎসাহিত করে। এ ব্যবস্থা থেকে কেউ মুক্ত নয়।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যখন উক্ত হাদিস শরীফ শ্রবণ করলেন, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কলবের বাম পার্শ্বেও কি শয়তান বসানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু সে মুসলমান হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমার কলবের বাম পার্শ্বেও শয়তান বসানো হয়েছে; কিন্তু সে আমার কঠিন হস্তক্ষেপ ও বরকতে মুসলমান হয়ে গেছে। এখন সে আমাকে কোনো কিছুর হুকুম করলে ভাল জিনিসের করে। পরামর্শ দিলে বা বোঝালে ভাল পরামর্শ দেয়। কেমন যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতে তার হাকিকত বদলে দেওয়া হয়েছে। ফলে মন্দের স্থলে খায়ের সৃষ্টি হয়েছে। তবে শয়তান বসানো হয়েছে। হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, যা কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্ট এবং হাদিস শরীফেও স্পষ্ট রয়েছে। যখন সন্তান জন্ম নেয়, তখন চিৎকার ও কান্নারত অবস্থায় জন্ম নেয়। বলা হয়, শয়তান তার দিকে চোখ লাগায় এবং নিজের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পৌছাতে চায়। তখন সে তার নিতম্বে আঘাত করে, যাতে তার আসর পৌছে যায়। শুধু দুজন ব্যক্তিত্বকে পৃথক করা হয়েছে যে, তাঁদেরকে শয়তান কোনো প্রভাব পৌঁছাতে পারে না।

একজন হযরত ঈসা আ. আর অপরজন হলেন তাঁর সম্মানিতা মাতা হযরত মারয়াম আ.। তাঁদের জন্মের সময় শয়তান কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। উক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা প্রশ্ন জাগে, তাহলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হযরত ঈসা আ.-এর মর্যাদা কি বেশি? কেননা, হাদিসে শুধু দুজনের কথা বলা হয়েছে যে, তাঁদেরকে শয়তান নিজের প্রভাব পৌছাতে পারে না। তাঁরা হলেন হযরত ঈসা ও মরিয়াম আ.। এতে স্পষ্ট হয় যে, হযরত ঈসা আ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উত্তম; এমনকি হযরত মারয়ামও উত্তম।

কিন্তু আমি যে হাদিস পেশ করেছি তা দ্বারাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম হওয়া সুস্পষ্ট হয়। আর তা এভাবে যে, হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত শয়তান নিজের প্রভাব পৌছাতে পারেনি। আর শয়তানের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রভাব বিজয়ী হয়ে গেছে। ফলে সে শয়তানই রয়নি। সুতরাং শক্তিশালী প্রভাব হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর– হযরত ঈসা আ.-এরনয়। হযরত ঈসা আ.-এর জন্মের সময় অনেক প্রতিবন্ধক ছিল, যাতে শয়তান প্রভাব না ফেলতে পারে। আর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজের প্রভাব ফেলে তাকে পরিবর্তন করে দিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন উত্তম।

অতএব, একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুটি মাদ্দা রাখা হয়েছে। একটি খায়েরের, অপরটা মন্দের। আর কলবের ডান পার্শ্বে ফেরেশতা এবং বাম পার্শ্বে শয়তান বসানো হয়েছে। ফেরেশতা ভালোর দিকে ধাবিত করে আর শয়তান খারাপের দিকে নিয়ে যেতে চায়।

ভালো ও মন্দের যুদ্ধ এবং তাদের সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া

অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ নেক কাজ করতে দ্বিধা-দ্বন্দে পড়ে যায় যে, করব কি করব না? অথবা খারাপ ও বদ কর্মে দোদুল্যমানতা সৃষ্টি হয় যে, করব কি করব না? এমনটি ফেরেশতা ও শয়তানের যুদ্ধের কারণে হয়ে থাকে। ফেরেশতা বলতে থাকে, খায়ের করো আর শয়তান বলতে থাকে খারাপ করো। তখন মানুষ সংশয়ে পড়ে যায় যে, কী করব। যে জিনিস বিজয়ী হয়, মানুষ তা-ই করে। খায়ের বিজয় হলে ফেরেশতার বিজয় হয় আর মন্দের বিজয় হলে শয়তানের বিজয় হয়। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুটি মাদ্দা রয়েছে। আর উভয় মাদ্দার জন্য সাহায্যকারীও রয়েছে। এ কারণে মানুষ দু-ধরনের কাজ করে। ভালোও করে, মন্দও করে। নেক কাজও করে, বদ কাজও করে।

আদেশ ও নিষেধের রহস্য

এ কারণে ইসলামি শরীয়ত দুটি অংশে দুনিয়াতে এসেছে। একটি অংশ আদেশ দেওয়া হয়, এটি করো। এটি খায়েরকে উৎসাহিত করার জন্য। আরেক অংশ হলো নিষেধাজ্ঞা যে, এ কাজগুলো করো না। এটি মন্দকে দমানোর জন্য। তো শরীয়তের দুটি অংশ আছে। একটি মামুরাতের অপরটি মানহিয়াতের। মামুরাত অর্থ যেগুলো করতে হুকুম করা হয়। আর মানহিয়াত অর্থ যেগুলো না করার হুকুম করা হয় এবং তা থেকে বাধা দেওয়া হয়।

এক দিকে বলা হয়, তুমি নামায পড়ো, ইবাদাত করো, রোযা আদায় করো, হজ করো, সত্য বলো। এগুলো হলো আওয়ামের তথা আল্লাহর হুকুম। অর অপর দিকে নাওয়াহি। তুমি চুরি করো না, যিনা-ব্যভিচার করো না, হত্যা করো না, মদ পান করো না, খারাপ ও অন্যায় কর্ম করো না। এগুলো হলো মানহিয়াতের

অংশ। এজন্যই শরীয়ত দুভাগে বিভক্ত। একটি আমর বিল মারুফ তথা সৎ কাজের আদেশ আর অপরটি হলো নাহি আনিল মুনকার তথা অসৎ কাজের নিষেধ। এটি হলো শরীয়তের দুটি দিক। এই দুটি ছাড়া মানুষের উন্নতি হতে পারে না। যদি এমন হয় যে, একদিকে সব নেক কর্ম করে; কিন্তু বদ কর্ম হতে বেঁচে থাকে না। একদিকে নামায পড়ে, অপরদিকে মদ পান হতে বিরত থাকে না। এদিকে রোযা পালন করে, ওদিকে যিনা-ব্যভিচারে মত্ত। এতে মানুষের কোনো ধরনের উন্নতি হবে না। বরং তার নেক কর্ম বেকার হিসেবে গণ্য হবে। যখন উভয় জিনিস একত্র হবে অর্থাৎ বাঁচার জিনিস হতে বাঁচবে এবং করার জিনিস করবে, তাহলে মানুষের উন্নতি হবে। অন্যথায় উন্নতির আশা করা যায় না।

নাওয়াহির অগ্রগামিতা

এ বিষয়টির দৃষ্টান্ত এমন যে, এক ব্যক্তি অসুস্থ হলো। ডাক্তার তাকে বলল, এই ঔষধগুলো সেবন করতে হবে। এটি আমরের অংশ। আর অমুক-অমুক জিনিস পরিহার করতে হবে। এটি নাহীর অংশ। অতএব চিকিৎসার মধ্যে দুটি অংশ আছে। একটি ঔষধ সেবন, অপরটি পরিহার বা বর্জন করা। মানুষ যদি ঔষধ সেবন করতে থাকে; কিন্তু বর্জনীয় জিনিসগুলো পরিহার না করে, তাহলে অসুস্থতা দূর হবে না। ডাক্তারগণ সাথে সাথে এ কথা বলে দেন যে, পরিহারযোগ্য জিনিসগুলো হতে বিরত থাকা ঔষধ সেবন হতে বেশি অগ্রগণ্য। কখনও-কখনও ঔষধ না পান করলেও শুধু বর্জনীয় জনিসগুলো পরিহার করার দ্বারা অর্ধেকের বেশি অসুস্থতা নিরাময় হয়ে যায়। এ কারণে পরহেয করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তেমনিভাবে ইসলামি শরীয়তে পরিহারযোগ্য জিনিস পরিহার করা এবং করণীয় জিনিসকে করা হতে বেশি অগ্রগণ্য। যদি মানুষ গুনাহ হতে, অন্যায় কর্ম হতে, খারাবি হতে বেঁচে থাকে, তাহলে তার দীনের অনেক অংশ সংরক্ষিত হয়ে যাবে। যদিও সে করণীয় জিনিস না করে। অতএব, মানুষের মধ্যে অনেক পরিমাণ পবিত্রতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাই পরহেয করা ঔষধ পান হতে গুরুত্বপূণ। খারাপ থেকে পরহেয করা উপকার লাভ হতে অগ্রগামী । এজন্য ব্যবসায়ীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে, যাতে তার লোকসান বা ঘাটতি না হয়। যখন সে লোকসান থেকে বাঁচতে পারে, তখন দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হয় কিভাবে লাভবান হবে। তাই দেখা গেল, ক্ষতি ও লোকসান হতে বাঁচা আগে। এমনভিবে শরীয়তের বিধান হলো এই যে, মানুষ অন্যায় কর্ম হতে বেঁচে থাকবে। এতে কিছু নেক কর্ম করার তাওফিক হবে। বদ আমলে লিপ্ত থাকার

কারণে তাওফিক দূরীভত হয়ে যায়। ফলে মানুষ নেক কাজ করে না। একটি বুদ্ধিগত উসূল হলো 'দাফ্য়ে মাযাররাত জাল্বে মানফায়াত ছে মুকাদ্দাম হে'। অর্থাৎ অন্যায়-অপকার দূর করা, প্রতিরোধ করা উপকার অর্জন করা থেকে অগ্রগামী। সুতরাং শরীয়তের কার্যাবলিতে নিষিদ্ধ কর্ম হতে বেঁচে থাকা যতটুকু জরুরি, মারফাতের করণীয় কর্ম করা এতটুকু জরুরি নয়। প্রথম করণীয় ও জরুরি বিষয় হলো, মানুষ মুনকারাত হতে বেঁচে থাকবে। যেমন– অন্যায় হত্যা, মদ পান, জুয়া খেলা, মিথ্যা বলা, ঘুষ গ্রহণ করা, সুদি লেনদেন ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা অগ্রগামী।

বেঁচে থাকার পর নামায দ্বারা উপকার হতে পারে, রোযা দ্বারা, হজ দ্বারা, যাকাত দ্বারা উপকার হতে পারে। যদি এমন হয় যে, একজন ব্যক্তির উপার্জন অপবিত্র ও হারাম; সে সুদ খায় এবং নফল নামাযও পড়ে, তাহলে নফল নামাযের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া তার উপর হবে না। সম্ভাবনা রয়েছে, ফরজ আদায় হয়ে যাবে, মুফতি সাহেব ফতুয়া দিয়ে দিবেন, তার ফরজ আদায় হয়ে গেছে; কিন্তু কলবে কোনো প্রকার প্রভাব প্রতিক্রিয়া পৌঁছবে না। যতক্ষণ-না মুনকারাত থেকে বাঁচবে। মানুষ চুরি-ডাকাতিতে লিপ্ত। আবার রোযাও পালন করতে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু রোযার ঐ প্রভাব যা আত্মা পবিত্র হয়, তা হবে না। যেহেতু একদিকে অপবিত্রতা লেগে আছে যে, সে চুরি করে, অন্যায় কাজ করে। সুতরাং বদকর্ম হতে বেঁচে থাকলেই নেক কর্মের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। এ কারণে শরীয়তের পক্ষ হতে জোড় দেওয়া হয় এবং আলেমগণ লিখেছেন, প্রথমে মুনকারাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে, বদকর্ম পরিহার করবে, তাহলে নেককর্ম কার্যকরী ও উপকারী হবে।

ওসায়েলে মানহিয়াতকে পরিহার করা

মুনকারাত কর্মের দুটি স্তর রয়েছে। একটি সর্বশেষ স্তর, যা আসল উদ্দেশ্য। অপরটি হলো তার ওসায়েল বা মাধ্যম। শরীয়ত ওসায়েল থেকে রক্ষা করে, যাতে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে মানুষ নিজে-নিজেই বাঁচতে পারে। উদাহরণস্বরূপ শরীয়ত ব্যভিচার হতে বাধা প্রদান করে।

ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۭ وَسَاۗءَ سَبِيْلًا

তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ, যা মানুষকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে অপমানিত করে। *[সূরা বনি ইসরাঈল আয়াত- ৩২]*

আসল উদ্দেশ্য হলো যিনা থেকে ফিরানো। কিন্তু যিনা পর্যন্ত পরিচালনাকারী যা-যা কর্ম রয়েছে, শরীয়ত সেগুলো থেকেও বাধা প্রদান করে। শরীয়ত হুকুম দেয়, নারীর প্রতি খারাপ দৃষ্টি দেওয়া থেকে বেঁচে থাকো। কোনো গায়রে মাহরামের নিকট যেয়ো না। তাদের গায়ের সুগন্ধির ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য নাসিকাকে তাদের প্রতি মনোযোগী করো না, তাদের আওয়াজের প্রতি কান লাগিও না। অথচ আওয়াজ শ্রবণ ও সুগন্ধির ঘ্রাণ নাকে আসা কোনো পাপের কাজ নয়। কিন্তু যেহেতু এগুলো একটি কবিরা গুনাহের মাধ্যম, তাই সেগুলো থেকে বাধা প্রদান করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۭ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ •

হে নবী! আপনি মুমিনদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। *[সূরা আন নূর আয়াত- ৩০]*

তেমনিভাবে নারীদের বলেছেন–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ

এবং ঈমাদনার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে। *[সূরা আন নূর আয়াত- ৩১]*

দৃষ্টি নত রাখার হুকুম কেন বর্ণনা করা হয়েছে? কেননা, দৃষ্টি পড়লে অন্তরে তার প্রভাব পড়ে। এতে সম্ভাবনা রয়েছে অন্তরে ফেতনা সৃষ্টি হবে অথবা পাপের জযবা সৃষ্টি হবে। এ কারণে নযর নত করতে বলা হয়েছে।

এমনিভাবে মহিলাদের আওয়াজকেও আওরাত বা নারী বলা হয়েছে যে, তার আওয়াজ শ্রবণেরও চেষ্টা করো না। কারণ, কখনও-কখনও মহিলাদের আওয়াজ দ্বারাও অন্তরে খারাপ কাজের জযবা সৃষ্টি হতে পারে।

হিজাব বা পর্দার রহস্য

এ কারণে মহিলাদের জন্য হিজাব বা পর্দার বিধান রাখা হয়েছে। যখন তারা ঘর থেকে বের হবে, তখন নেকাব পড়ে বের হবে, খোলা চেহারায় বের হবে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ مَسْتُوْرَةٌ إِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

নারী হলো পুরুষের জন্য লুকানো ভাণ্ডার। যখন সে বের হয়, তখন শয়তান তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখে এবং ভাবে, এখন কতজনকে গুনাহে লিপ্ত করব, কাউকে কুদৃষ্টিতে, কাউকে কুমন্ত্রণায়। [মিশকাত শরীফ ২য় খণ্ড]

এ কারণেই ইরশাদ হয়েছে, যখন ঘর থেকে বের হবে, তখন নিকাব পরিধান করে বের হবে। শুধু এতটুকু নয়; বরং তাও বলা হয়েছে, সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হবে না, সুগন্ধি লাগিয়ে বের হলে তা দ্বারাও কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়, বিভিন্ন ধারণা জন্মে। তাই তাকেও নিষেধ করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ أَصَابَتْ بُخُوْرًا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا

যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হয়ে, সে যিনাকারীর ন্যায়। কেমন যেন সে যিনা করেছে এবং যিনার রাস্তা পরিষ্কার করেছে। *[মিশকাত ২য় খণ্ড]*

কতক বর্ণনায় এমনও এসেছে যে, সে বাড়ি ফিরে গোসল করবে। কেননা, সে নাপাকীর পথ গ্রহণ করেছে।

নারী-পুরুষের মেলামেশা ও ঘনিষ্টতায় নিষেধাজ্ঞা

নারীদেরকে ইসলাম তাকিদ দিয়েছে, তারা ঘর হতে বের হলে নিকাব পরিধান করে বের হবে। রাস্তার মধ্যস্থলে হাঁটবে না, পাশ দিয়ে চলবে, যাতে পুরুষদের সামনাসামনি না হয়।

মুসলমানদের হকের মধ্যে একটি হক হলো, সে সালাম দেবে এবং তার উত্তর দেবে। কিন্তু মহিলাদের নিষেধ করা হয়েছে, তারা অপরিচিত পুরুষদের সালাম দেবে না এবং তাদের সালামের উত্তর দেবে না। আর এটি করা হয়েছে এ কারণে যে, যাতে নারী-পুরুষের মাঝে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি না হয়। এই মেলামেশা ও

ঘনিষ্ঠতাই অন্যায় ও বদ আমলের মাধ্যম হয়। যে সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেলা বেড়ে যাবে, নিঃসন্দেহে সেই সমাজে খারাপ কর্ম বৃদ্ধি পাবে। যতই তারা মুত্তাকী-পরহেযগার হওয়ার দাবি করুক; কিন্তু বেঁচে থাকা অসম্ভব ও দুষ্কর। এ কারণে ইসলামী শরীয়ত নারী-পুরুষের মেলামেশাকে নিষেধ করেছে।

প্রথমে তো প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে যেতে নিষেধ করেছে। কিন্তু কোনো প্রয়োজনে গেলে নিকাব পরিধান করতে বলা হয়েছে। আবার পর্দা করে বের হলেও রাস্তার এক পার্শ্বে চলতে বলেছে। আবার সাথে সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে, যাতে সে নিজে মানুষদের কুদৃষ্টির মাধ্যম না হয়। আর এ সকল বিষয় এজন্য পরিহার করতে বলেছে, যাতে ঘনিষ্ঠতা ও অবাধ মেলামেশার সুযোগ না হয়।

মদিনার মসজিদে মহিলাদের জামাতে শরিক হওয়ার আবেদন

হাদিস শরীফে হযরত উম্মে হুমাইদ সাঈদিয়্যাহ রা.-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি একজন আনসারী মহিলা ছিলেন। সাহাবিয়্যাহ ছিলেন। আবার খাইরুল কুরুন তথা সর্বোত্তম যুগের মানুষ ছিলেন। তখন পুরুষ মহিলাদের মাঝে শুধু নেকী আর নেকী ছিল, খারাবির কোনো চিহ্ন ছিল না। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দুনিয়াতে আছেন।

মোটকথা, হযরত উম্মে হুমাইদ রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আবেদন পেশ করলেন। তিনি বললেন– 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার মন চায় মসজিদে নববীতে এসে জামাতের সাথে নামায পড়ি, যেন আপনার ইমামতিতে আমার নামায হয়।'

তিনি কত পবিত্র আবেদন করেছেন!

প্রথমত নামায সর্বোত্তম ইবাদাত। তার থেকে উঁচু মানের আর কোনো ইবাদাত নেই। সেই ইবাদাতের আবেদন করেছেন। তারপর এই ইবাদাতের আবেদন কোথায় করেছেন? মসজিদে নববীতে যেখানে এক ওয়াক্ত নামাযে পঞ্চাশ হাজার ওয়াক্তের সাওয়াব মিলে। কোনো ইমামের পিছনে নামায পড়ার আবেদন? যিনি পৃথিবীর সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব এবং বরকতময় সত্তা। আর কাদের সাথে জামাতে শরিক হয়ে নামায পড়তে চেয়েছেন? সাহাবীদের জামাতে, যাঁদের ব্যাপারে সকল মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাস হলো, উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় কুতুব, গাউস যত উপরের মাকাকে পৌঁছে যান না কেন, তাঁরা সাহাবিয়্যাতের মাকামের

আশপাশেও পৌছতে পারবেন না। তারা সর্বসম্মতিক্রমে সকল উম্মত হতে উত্তম। তো তিনি কত পবিত্র ও দামি দরখাস্ত করেছেন! সর্বোত্তম ইবাদাত নামাযের, উত্তম ও সর্বোচ্চ দামি মসজিদে নববীতে, সর্বোত্তম জামাতে শরিক হওয়ার আবেদন এবং সর্বোত্তম ইমামের পিছনে নামায পড়ার আবেদন।

কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

صَلٰوتِكَ فِيْ دَارِكَ خَيْرٌ مِّنْ صَلٰوتِكَ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا

তোমার নামায তোমার ঘরে আদায় করা আমার এই মসজিদ থেকে উত্তম।

তারপর বললেন–

وَصَلٰوتِكَ فِيْ بَيْتِكَ خَيْرٌ مِّنْ صَلٰوتِكَ فِيْ دَارِكَ

বাড়ির উঠান ও আঙিনায় নামায পড়া থেকে উত্তম বাড়ির ঘরে নামায পড়া।

তারপর আবার বললেন–

وَصَلٰوتُكَ فِيْ مِخْدَعِكَ خَيْرٌ مِّنْ صَلٰوتِكَ فِيْ بَيْتِكَ

এবং ঘরের ভিতরের রুমে নামায পড়া উত্তম ঘরের বাইরের অংশের বিল্ডিংয়ে নামায পড়া থেকে।

সারকথা, হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, যে অংশে পর্দা বেশি হতে থাকবে সেই অংশে উত্তমতা বাড়তে থাকবে। মসজিদে গমন হতে বাড়িতে মহিলাদের পর্দা বেশি। এ কারণে তাদের জন্য ঘরে নামায আদায়কে উত্তম বলা হয়েছে। তারপর বাড়ির উঠান হতে বিল্ডিংয়ে বেশি পর্দা যে আকাশ পথে তাকে কেউ দেখবে না। তাই তাতে উঠান থেকে উত্তম বলা হয়েছে। তারপর ভিতর রুমকে বেশি উত্তম বলা হয়েছে। যেহেতু ভিতর রুমে আরো বেশি পর্দা।

মোটকথা, যত বেশি পর্দা হবে, যত বেশি গোপন স্থান হবে, তত বেশি উত্তমতা মহিলাদের জন্য বাড়তে থাকবে। এমনকি মসজিদে হারাম ও মসজিদে ইবরাহীমি তথা মক্কা মুকাররামা যাতে হজ করার জন্য সারা পৃথিবী একত্রিত হয়, যা আমাদের সকলের ইবাদাতের কেন্দ্র। যতক্ষণ আমাদের মসজিদের দিক তার দিকে না হবে, ততক্ষণ নামায কবুল হবে না। প্রতিটি মসজিদ মসজিদে হারামের দিকে মুখ করা। সেই মসজিদ সম্পর্কে হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

'সেখানে এক ওয়াক্ত নামায পড়া এক লক্ষ নামায সমতুল্য।' এক লক্ষ গুণ ডাবল সাওয়াব মিলে।

কিন্তু মহিলাদের জন্য এই উত্তমতা রাখা হয়নি। মহিলারা সেখানেও যদি বাড়িতে নামায পড়ে, তাহলে কাবা শরীফে থেকে তাদের নামায উত্তম হবে। বরকতস্বরূপ যদি মহিলাদের অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা যেকোনো ওয়াক্ত নামায মসজিদে হারামে আদায় করবে, তাহলে তারা তা এত পরিমাণ পাবন্দী করবে যে, রৌদ্র হোক, গরম হোক যেকোনো পরিস্থিতিতে তারা সেখানে পৌঁছবেই। তাদের জন্য উত্তম হলো ঘরে নামায পড়া।

সারকথা, ওখানে গায়রে মাহরাম পুরুষের ভিড়, মেলামেশার বেশি সম্ভাবনা আছে। মনে কোনো কুধারণা সৃষ্টি হয়ে যাবে, কোনো খারাবি হয়ে যেতে পারে। তাই শরীয়ত চায় মানুষের আত্মাকে পবিত্র রাখতে, যাতে তাদের অন্তরে কুধারণাও সৃষ্টি না হয়। এ কারণে ঐ উপকরণকে পরিহার করতে হবে, যা দ্বারা কোনো কুধারণা সৃষ্টি হতে পারে।

এ ব্যবস্থা কেন?

মূলত তাকে ঐ পাপ হতে রক্ষা করা, যাকে ব্যভিচার বলে। এগুলো যিনার মাধ্যম হতে পারে; তাই বাধা প্রদান করা হচ্ছে। এটি শরীয়তের পরিভাষায় 'সাদ্দে যারায়ে' বা 'মাধ্যমে বাধা' বলে। অর্থাৎ মাধ্যম হতে রুখে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ আসল মাকসাদ থেকে বাঁচতে পারে। যদি মাধ্যম ও উছিলাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে এক দিন না একদিন অবশ্যই মূল পাপে পৌঁছে যাবেই।

তারবিয়াতের পদ্ধতি

হাদিস শরীফে এসেছে–

مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

যে বস্তুর বেশি অংশে নেশা রয়েছে, তার অল্পও হারাম।
[মিশকাত ২য় খণ্ড]

মদ যেমনভাবে এক চুমুক হারাম, তেমনি এক ফোঁটা পান করাও নিষেধ। অথচ এক ফোঁটা পান করার দ্বারা নেশা সৃষ্টি হবে না। আর মদকে হারাম করা হয়েছে নেশার কারণে। তাই এক ফোঁটা পরিমাণ পান করা জায়েয হওয়া উচিত। কারণ, হারাম হওয়ার কারণ নেশা তো এতে নেই। কিন্তু তাও নাজায়েয করা হয়েছে। কেন? কারণ, যে ব্যক্তি আজ এক ফোঁটা আস্বাদন করবে সে

আগামীকাল এক চুমুক পান করবে। আর যে এক ঢোক পান করবে, সে পরদিন এক গ্লাস পান করবে। আর যে এক গ্লাস পান করবে, সে কিছু দিন পর মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এখানে মূলত মদখোর হওয়া থেকে বাধা প্রদান উদ্দেশ্য। তাই এক ফোঁটা থেকে বাধা দেওয়া শুরু করেছে, যাতে সে অভ্যস্ত হওয়া পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। হাদিস শরীফে এসেছে–

مَنْ اَتٰى عَرَّافًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

যে ব্যক্তি কোনো জাদুকরের নিকট গেল, সে শরীয়তে মুহাম্মাদীর সাথে কুফরি করল। *[মিশকাত ২য় খণ্ড]*

কুফরি হয় কখন? যখন মানুষ তাওহীদকে অস্বীকার করে, নবুওয়াতকে অস্বীকার করে, কেয়ামত অস্বীকার করে, তখন কুফর প্রমাণিত হয়। জাদুকরের নিকট যাওয়ার দ্বারা সুস্পষ্ট কুফর না হওয়া উচিত।

কিন্তু তাকে কুফর কেন বলা হলো?

কারণ, আজ যে জাদুকরের নিকট যাবে, তার অন্তর থেকে জাদূর খারাবি-[মন্দ] বের হয়ে যাবে। পরবর্তী দিন সে বলবে, কিছু জাদু দেখাও তো। তৃতীয় দিন বলবে, আমাকেও এ তাবিজ ও মন্ত্র শিক্ষা দাও। পরবর্তীতে সে বড়-সড় জাদুকরে পরিণত হবে।

এ পরিণতি থেকে বাঁচানোর জন্যে জাদুকরের নিকট যেতে নিষেধ করা হয়েছে। জাদুকরের নিকট যাও কেন? এ সুযোগ আসে কেন? সুতরাং এটি সাদ্দে যারায়ে যে, মাধ্যমকে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে মানুষ আসল মাকসাদ কবিরা গুনাহ পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে।

বর্তমানকালের মহিলাদের কৃষ্টি-কালচার

বর্তমান সময়ের প্রতি নজর দিলে দেখা যাবে, আজ আমরা সবচাইতে বেশি পাপকর্মে লিপ্ত। মহিলাদের তো বলা হয়েছে, বিনা প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হবে না। বের হলে পর্দার সাথে বের হবে। কিন্তু আজ মহিলা সমাজের কী হাল। আজ জাতির রীতি-নীতি ও তামাদ্দুন হলো, নারীরা যত বাইরে যেতে পারে, যত বেশি সেজে-গুজে স্মার্ট হতে পারে ততই তাকে সামাজিক বলা হয়। অথচ হাদিস শরীফে সুস্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে–

رُبَّ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مَائِلَاتٍ مُمِيْلَاتٍ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ

অনেক মহিলা কাপড় পরিহিতা হবে, তবুও উলঙ্গ দেখা যাবে। সে বের হবে কাপড় পরিধান করে; কিন্তু তারপরও উলঙ্গ মনে হবে। তারা নিজেও পর পুরুষের প্রতি আসক্ত হবে এবং অন্যদেরও নিজের প্রতি আসক্ত করবে। তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। *[মিশকাত ২য় খণ্ড]*

জান্নাতের পুত-পবিত্র ও সম্মানিত স্থান তাদের ঠিকানা হবে না যতক্ষণ না তাদের শাস্তি দিয়ে পবিত্র করা হয়। অথবা যেকোনো উপায় আল্লাহ তায়ালা অবলম্বন করেন। সে নিজে-নিজে ঐ সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করবে তা হবে না।

হাদিস শরীফে এসেছে, এমন একটা সময় আসবে যখন মহিলাদের মাথার চুলের ডিজাইন এমন হবে যেমন উটের কুহান হেলেদুলে উড়ে, তেমনি তাদের মাথার চুল হেলেদুলে উড়বে। অর্থাৎ মাথার চুল এমন ডিজাইন করবে কেমন যেন মাথার উপর একটা টুকরি রাখা আছে। মনে হবে, উটের কুহান। আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি, নবীজির ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ পাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমাজে কাপড় পরিধানকারিণী উলঙ্গ নারী, নিজের প্রতি আকৃষ্টকারিণী নারী, অন্যদের আকৃষ্টকারিণী অহরহ রয়েছে।

পোশাকের উলঙ্গপনা

পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ; তার কয়েকটি সুরত হতে পারে। প্রথমত পোশাকই অসম্পূর্ণ বা খাট। যেমন– বর্তমানকালে মহিলাদের পোশাক পায়ের নলী খোলা থাকে, বাজু অনাবৃত থাকে, বুক খোলা, পিটের কিছু অংশ আবৃত থাকে না। আবার মাথাও উলঙ্গ থাকে। অথচ মহিলাদের গর্দান থেকে টাখনু পর্যন্ত ঢেকে রাখার হুকুমে। এতটুকু না ঢাকলে নামায হবে না। তবে বিশেষ অবস্থায় খোলা যাবে। একাকি থাকার সময়ও এতটুকু ঢেকে রাখা জরুরি। আর ভরপুর মজলিসে তো বলাই বাহুল্য। তো পোশাক অসম্পূর্ণ ও খাট হওয়ার কারণে উলঙ্গপনা হবে যে নলী, টাখুন, বুক, পিঠ সব উলঙ্গ থাকবে।

দ্বিতীয়টি হলো, পোশাক তো পুরোপুরি গর্দান হতে টাখনু পর্যন্ত সারা শরীর ঢাকা থাকবে। কিন্তু এতে পাতলা ও হালকা হবে যে, শরীরের সর্বাঙ্গ দেখা যাবে।

এমন পোশাকও হাদিসের ভাষ্যমতে كاسيات এবং عاريات এর হুকুমের মধ্যে শামিল যে, পোশাক পরা আছে; কিন্তু তারপরও নারী উলঙ্গ। সে এত পাতলা নেট কাপড় পরিধান করেছে যে, পোশাক দেখা যায় না; শুধু শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়।

তৃতীয় সূরত হলো, পোশাক তো মাথা হতে পা পর্যন্ত আবৃত করার মত লম্বা এবং কাপড়ও মোটা; কিন্তু এত পরিমাণ আঁটসাঁট যে, বডির আকৃতি-গঠন দেখা যায়। এ ধরনের পোশাকও উল্লিখিত বিধানের আওতায় পড়ে। যেমন– বর্তমানে এক ধরনের পোশাক তৈরি হয়েছে, যাকে টাউজার বলে। সেটি পায়জামা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। তা এত টাইট যে, রান ও হাঁটুর পূর্ণ আকৃতি ফুটে ওঠে যদিও দেখা যায় না।

মোটকথা, এক ধরনের উলঙ্গপনা হলো পোশাকই ছোট-অসম্পূর্ণ। আরেক ধরনের হলো লেবাস তো পুরাপুরি; কিন্তু এত পাতলা যে, শরীর আবৃত হবে না। আরেকটি হলো লেবাস পূর্ণ এবং মোটাও; কিন্তু এত চুস্ত বা আঁটসাঁট যে, শরীরের গঠন-গড়ন দেখা যায়। এই সবগুলোই হাদিসের ভাষ্যমতে 'পোশাক পড়েও উলঙ্গ'র হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে, তারা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। তারা সম্মানিত স্থান পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। তাদের রেজায়ে মাওলার মাকাম অর্জন হবে না। বর্তমানকালে নামায-রোযা যতটুকু জরুরি বিষয়, তার চেয়ে আরো বহুগুণে জরুরি এগুলো থেকে বাঁচা ও বাঁচানো। আমরা নিজেরাও বেঁচে থাকব, সন্তানদেরও বাঁচাব এবং অধীন মহিলাদেরও বাঁচাব।

মুনকারাত বস্তু থেকে বেঁচে থাকার তাগিদ

শরীয়ত মুনকারাত থেকে বেঁচে থাকার প্রতি এত পরিমাণ গুরুত্ব প্রদান করেছে যে, সহোদর ভাই-বোন যারা এখনও প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছেনি, সবে দশ-এগার, তাদেরও একা ঘরে থাকতে নিষেধ করেছে। শরীয়ত এক চৌকিতে দুই ভাই-বোনকে শয়ন করতে অনুমতি দেয়নি। অথচ তারা সহোদর আবার এখনও পূর্ণ বয়সে পৌঁছেনি। প্রবাদ রয়েছে, 'মানুষের শয়তান মানুষই হয়।' শয়তান আসতে দেরি হয় না। ইসলামী শরীয়ত অত্যন্ত দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। সে এমন কিছু উপকরণ প্রণয়ন করেছে, যা দ্বারা প্রতিটি মানুষ পাক-পবিত্র ও সম্মানিত হতে পারবে। সুতরাং ঐ সকল উপকরণ হতে বেঁচে থাকতে হবে, যেগুলো তাকওয়া, পবিত্রতা ও সংযমতার প্রতিবন্ধক হয়। এগুলো থেকে পরহেয করা ও বেঁচে থাকা ফরজ। একদিকে আপনি নামায পড়েন, অপরদিকে পরিবারের অবস্থা খারাবের দিকে যাচ্ছে; তা থেকে ফিরালেন না; তাহলে নামায তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। যতক্ষণ না মুনকার বস্তু হতে পরহেয করা হবে। যেমন– ঔষধ প্রতিক্রিয়া করে না নিষিদ্ধ বস্তু হতে পরহেয না করলে। একদিকে

ঠাণ্ডা-কাশির রোগে আপনি গুলে বনফ্শা [ঠাণ্ডা নিরাময় ঔষধ] পান করছেন, অপর দিকে মিষ্টি দধি বরফ মিশিয়ে পান করছেন, তাহলে ঔষধের কী প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে?

সুতরাং মুনকারাত থেকে বাঁচা তার চেয়েও জরুরি, যতটুকু করণীয় জিনিসের উপর করা জরুরি।

সামাজিক ব্যবস্থা ধ্বংসের কার্যাবলি

মুনকারাতের মধ্য ছোট-ছোট গুনাহের কর্মগুলোকেও পরিহার করা জরুরি। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেছেন–

إِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ

হে মানুষেরা! তোমরা ছোট-ছোট গুনাহ হতে বাঁচার চেষ্টা করো। বড়-বড় গুনাহ হতে মানুষ অনেক সময় বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব ও কপটতার কারণে বেঁচে যায়। একটা সুন্দর সমাজে বসবাসকারী কখনও প্রকাশ্যভাবে নেশা পান করবে না। তার মন চাইবে; কিন্তু এই ভাববে যে, লোকেরা কী বলবে এমন মহান ব্যক্তিত্ব নেশা করে, নেশাখানায় আড্ডা দেয়। তাই সমাজব্যবস্থার কারণে অনেক সময় পাপ থেকে বাঁচতে পারে। কিন্তু ছোট-ছোট গুনাহ তথা ছগিরা গুনাহ যেগুলোর দিকে কারো নজর আরোপিত হয় না। সেগুলো মানুষের অহরহ করতে থাকে। সবাই মনে করে, ব্যক্তিত্বের কারণে কেউ ভর্ৎসনা করবে না।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, এসব গুনাহ হতে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করো। কেননা, এগুলো মানুষের অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়। কোনো গায়রে মাহরাম মহিলার প্রতি তাকালেন, কেউ দেখল না, কেউ বুঝতে পারল না, কিন্তু তা থেকে বাঁচা, ব্যভিচার হতে বাঁচা হতে বেশি জরুরি। কেননা, যিনা-ব্যভিচার পর্যন্ত যাওয়ার পথ হলো ক্ষুদ্র গুনাহগুলো। তাই ছগিরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকো, যাকে মানুষ গুনাহ মনে করে না। পরিশেষে কবিরা গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয় মুনকারাত কর্ম দ্বারা। এ কারণেই মুনকারাত থেকে পরহেয করা জরুরি।

চারিত্রিক দৃঢ়তা ব্যতীত অন্যায়ের মূলোৎপাটন সম্ভব নয়

অন্যায়-অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় যতক্ষণ না অন্তরে পবিত্র ও সংযমের জযবা সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ অন্যকে ফিরায়, নিজে ফিরে তাকে ফিরানো

বলে না। বাধা দেওয়া বলে না। এটি তো অপারগ হয়ে ফিরে থাকা। আপনার অন্তর অন্যায় থেকে বিরত থাকা উচিত। যদি আইন আপনাকে বাধা দিল আর আপনি বাধা মেনে নিলেন, তাহলে তা অপারগ হয়ে ফিরলেন। হাজারো অপরাধ, হাজারো অন্যায়, আইন-কানুন দ্বারা সেগুলোর মূলোৎপাটন হবে না। কানুন দ্বারা অন্যায় বন্ধ হবে না। যতক্ষণ না স্বয়ং মানুষের মধ্যে পরিহার করার চারিত্রিক সাহসিকতা তৈরি হবে এবং নিজের ভিতর বেঁচে থাকার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

তিন লক্ষ টাকার একটা ব্যাগ পৃথক ঘরে রাখা, সেখানে কোনো পুলিশ নেই, নেই সি. আই. ডি.র কোনো সদস্য। যদি তা তুলে নেন, তাহলে কেউ বাধা দেওয়ার নেই। তারপরও যদি আপনি সেগুলো তুলে না নেন, ব্যগটা গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন, তাহলে কেন থাকলেন? আল্লাহর ভয় আপনাকে ফিরিয়ে রেখেছে। তো অপরাধ হতে বাঁচানেওয়ালা আসলে আল্লাহর ভয়– পুলিশ নয়।

কানুনের আধিক্য দ্বারা অপরাধ হ্রাস পায় না

যদি পুলিশ, অস্ত্র, সামরিক শক্তি দ্বারা পাপ-অন্যায় থেকে ফিরানো যেত, তাহলে বর্তমান বিশ্ববাসী সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী হতো। কারণ, আজ কোনোটির কমতি নেই। না আছে পুলিশের কমতি, না অস্ত্রের ঘাটতি। কোনোকালে এমন নতুন-নতুন আবিষ্কৃত হাতিয়ার অস্ত্র দেখা যায়নি, যা আজ দেখা যাচ্ছে, নির্মাণ হচ্ছে। সৈন্যবাহিনীর এত সংখ্যা পূর্বে কোনো সময়ে দেখা যায়নি, যা আজ দেখা যাচ্ছে। এত সংখ্যক পুলিশ কখনও ছিল না, যা বর্তমান সময়ে রয়েছে। এমনকি এখন রাস্তায় ও মোড়ে-মোড়ে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। কিন্তু এগুলো বাড়ার সাথে সাথে অপরাধ সমানতালে বেড়ে চলছে। সুতরাং অপরাধ বন্ধ করা পুলিশের কাজ নয়; শুধু আইনের কর্ম নয়। যতক্ষণ-না মানুষের চারিত্রিক অবস্থা ভিতর হতে শুদ্ধ হবে এবং আল্লাহর ভয় সামনে থাকবে, মানুষ অন্যায়-অপরাধ থেকে বাঁচতে পারবে না।

তাকওয়ার অভ্যাসই অপরাধ থেকে বাঁচাতে পারে

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানুভী রহ.-এর ঘটনা, যা তিনি নিজেই শুনিয়েছিলেন। তিনি সাহারানপুর সফর করছিলেন। তখনকার ইক্ষু প্রসিদ্ধ ছিল; সেগুলো অনেক ভালো মানের হতো। তিনি সেখান থেকে দু-তিন ধড়া ইক্ষু খরিদ করলেন। ঘটনাক্রমে তাঁর সাথে মুসলিম দু-একজন চেকার ছিল, যারা

হযতরকে ভক্তি করত। হযরত থানুভী রহ. বললেন, ভাই! কাটায় নিয়ে এগুলো মাপ দিয়ে আন। যাতে ভাড়া আদায় করতে পারি। তখন ঐ চেকার বলল, হযরত! তার প্রয়োজন নেই; আমি তো চেক করি আর আমি আপনার সাথে আছি, আপনি নির্ভয়ে রাখুন।

তিনি বললেন, 'ভাই আমাকে আগে যেতে হবে।'

সে বলল, আরো আগে আপনি কোথায় যাবেন? তিনি বললেন, এখন তো আমি কানপুর যাচ্ছি। আপনি আমাকে গাজীয়াবাদ রেখে চলে যাবেন। দিল্লী চলে যাবেন। তারপর আমার কী হবে? তখন তো অন্য চেকার আসবে। সে তো ডাবল ভাড়া নিবে। সম্ভাবনা রয়েছে, সে জরিমানা আদায় করে নিবে। আপনি আমাকে এমন মসিবতে ফেলতে চান?

লোকটি বলল, হযরত! আমি গাজীয়াবাদের গাড়ির চেকারকে বলে দেব; সেও আপনাকে আটকাবে না। তিনি বললেন, 'যখন আমি কানপুর স্টেশনে নেমে যাব এবং দরজা দিয়ে বের হতে যাব, তখন সেখানে তো টিকেট গ্রহণকারী লোক দাঁড়িয়ে থাকে; সে যদি কিছু বলে?'

লোকটি বলল, চেকারদের মাধ্যমে বাবুকে বলে দেব; সেও আপনাকে আটকাবে না।

এ কথার পর তিনি বললেন, ভাই! আমাকে আরো আগে যেতে হবে। লোকটি বলল, হযরত! আগে আবার কোথায় যাবেন? তারপর তো আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবেন। তিনি বললেন, তার চেয়ে আরো আগে যেতে হবে। সে বলল, তারপর আবার আরো আগে কোথায় যাবেন? তিনি বললেন, আমাকে আল্লাহর নিকট যেতে হবে। আল্লাহকে আমার চেহারা দেখাতে হবে। কিন্তু কবরে, হাশরে আমার কী অবস্থা হবে? ওখানে আমাকে গ্রেফতার হতে হবে যে, তুমি কেন ঐ অবৈধ কাজটা করেছ? তুমি কেন চুরি করেছ? তখন আমি কী উত্তর দেব? তাই আপনি মেহেরবানি করে মেপে দিন। আমি এখনই ভাড়া দিয়ে দেব, যাতে আমার দুনিয়া ও আখেরাতে গ্রেফতার হতে না হয়।

যে জিনিসটি হযরতকে রক্ষা করেছে এবং প্রত্যেক মুসলমানকে রক্ষাকারী, তা হলো আল্লাহর ভয়, যা অন্তরে থাকে। তা অপরাধ থেকে রক্ষা করে। আইন-কানুন তো দৃশ্যমান অপরাধ হতে বাধা দিতে পারে। আপনি যদি প্রকাশ্যে ডাকাতি করেন অথবা প্রকাশ্যে নিরাপত্তা বিঘ্ন ঘটান, তাহলে পুলিশ এসে আপনাকে গ্রেফতার করবে। কিন্তু যেখানে একা গোপনে অন্যায় হয়, যেখানে পুলিশের কোনো খবর নেই। সেখানে কে রক্ষা করবে? সেখানে আপনার

আপনার অন্তর বাঁচাবে। সুতরাং সবচেয়ে বড় পুলিশ হলো ঐ কলবের জযবা, যা তার ভিতর থাকে। একজন পুলিশও না থাকলে যদি কলবে জযবা বিদ্যমান থাকে, তাহলে মানুষ নিজে নিজেই বাঁচতে পারবে।

অপরাধ বন্ধে পার্লামেন্টের বিফলতা

দুটি ঘটনা আমার মনে পড়েছে, উভয় ঘটনার পার্থক্য আপনারা অনুমান করবেন। উভয় ঘটনা পত্রিকায় প্রকশ হয়েছিল। কিছু দিন পূর্বে আমেরিকায় এ প্রশ্ন ওঠেছিল যে মদ পান বন্ধ করা উচিত। সুতরাং হুকুমতের সকল কর্তৃপক্ষরা এ ব্যাপারে ঐক্যমত হলো যে, মদ পান বন্ধ করা প্রয়োজন। তার জন্য একটি নির্দিষ্ট কমিটি গঠনা করা হল- যারা মদ বন্ধের কানুন-সংবিধান তৈরি করবেন, তার জন্য কয়েক লক্ষ রুটি বাজেট করল যে বছর দেড় বছর কানুন তৈরি করতে লাগবে, এর মধ্যে কমিটির সদস্যদের বেতন দিতে হবে। ব্যয়ের একটা অফিস খোলা হলো। তারপর এক বছরে কানুন তৈরি হল– তারপর তা সংসদে উত্থাপন করা হলো। প্রথমে তা সংসদে পড়ে শুনালো হল তারপর অনুমোদন মঞ্জুর করে এ আদেশ জারি করা হলো যে, জনসাধারণের মাঝে তার বিজ্ঞাপন দিতে হবে এবং এ কানুনকে ব্যাপকভাবে প্রচার করবে। যাতে এ কানুনের ব্যাপারে জনতার সাধারণ অভিমত জানা যায়। ঐ কানুন লেখা ছাপানোর জন্য এবং প্রচার-প্রসার করার জন্য আরো কয়েক লক্ষ রুপি বাজেট মঞ্জুর করা হলো। যাতে উক্ত কানুন ছাপিয়ে সারা দেশে প্রচার করে ফলে সকল বুদ্ধিজীবিরা তাতে স্ব-স্ব অভিমত পেশ করবেন। দীর্ঘ এক সময় পর্যন্ত প্রচার-প্রসারের কাজ জারি থাকল– যাতে লোকেরা তাদের স্ব-স্ব অভিমত প্রকাশ করতে পারে।

অনেক দিন পর জনতার অভিমত সংগ্রহ করে ফের তাকে সংসদে উত্থাপন করা হল। সংসদ আলোচনা পর্যালোচনার পর মদ বন্ধের আইন পাশ করলেন। এখন তা পরিচালনার জন্য আরো কয়েক কোটি বাজেট মঞ্জুর করল যে, তার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করতে হবে যারা তা জারি করবে, বাস্তবায়ন করবে, যাতে দেশ বাসীরা তার উপর আমল করে। মোটকথা কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে সংবিধান তৈরি করল এবং জারি করল। পুলিশকে দিক নির্দেশনা দেওয়া হল– এক বছর পর রিপোর্ট পেশ করবে যে, তার উপর আমল কেমন হলো এবং তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কেমন হলো? এক বৎসর পর পুলিশ রিপোর্ট পেশ করল যে, প্রথমে ধুমপায়ী নেশাখোর পঞ্চাশ হাজার ছিল এখন তা বেড়ে এক

লক্ষে পৌছেছে। এই হলো কানুনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া। এমন দৃশ্য কেন দেখা গেল?

কারণ প্রথমে নেশা দ্রব্যের কারখানা খোলা হয়েছিল, হাজারো মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অনেক বিশেষ পার্সন মানুষেরা তা সেবন করত না এই ভেবে যে, আমাদের সম্মানে, বিশ্বস্ততায়, দাগ লাগবে, মানুষ আমাদের খারাপ মনে করবে যে তারা নেশাখোরদের স্থানে আড্ডা দিচ্ছে। এই কারণে তারা নেশা করত না। আর এক-দুজন মানুষ চুপিসারে সেবন করত।

কিন্তু যখন আইনীভাবে বন্ধ হয়ে গেল এবং পুলিশ সবাইকে প্রকাশ্য নেশা থেকে আটকে দিলো। তখন সবাই ব্লক করে চুপিসারে চুরি করে নেশা সেবন শুরু করে। যারা বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রকাশ্যে নেশা সেবন করত না তারা বলল এখন যেহেতু সবাই গোপনে নেশা করছে, তাই আমরাও গোপনে নেশা করি। তাই প্রথমে পঞ্চাশ হাজার ছিল আর এখন এক লাখে উন্নতি হয়েছে। এ চিত্র উক্ত সংবিধানর ফলাফল তা সংসদে পেশ করা হলো।

সংসদ বলল- আইন করা, হুকুমাতের মর্যাদা পরিপন্থী। আইন জারি থাকবে, পুলিশ পাহারা দিতে থাকবে। তখন কানুন জারি ছিল- নেশা সেবনও চলতে ছিল। উভয় বস্তু স্ব-স্ব স্থানে বিদ্যমান ছিল। নেশা সেবন বন্ধ হয়নি। সেবনকারীরা সেবন জারি রাখে, তারা গোপনে সেবন করতে থাকে। ফলে উক্ত কোটি কোটি রুপি বেকার ব্যয় হয়। নেশা সেবনের অবস্থা পূর্বে যা ছিল তাই রয়ে গেল বরং সেবনের মাত্রা বহুগুণে বেড়ে গেল সবাই গোপনে সেবন করতে লাগল। আরেকটি ঘটনা সামনে বর্ণনা করা হবে।

অপরাধ বন্ধে ইসলামের কর্মপদ্ধতি

ইসলামপূর্ব যুগে তথা জাহেলী যুগে মদপান ব্যাপকহারে ছিল। আরবের সবাই মদ পান করত। মদ পান তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এমনকি সন্তান জন্ম নিলে প্রথমে তাকে মদ চাটানো হতো। ইসলাম আসার পরও মদের প্রচলন ছিল– মানুষ মদ পান করত। তারা মুসলমানও ছিল আবার মদও পান করত। কিন্তু যখন মদ নিষিদ্ধের সময় এল, তখন হঠাৎ হুকুম করা হয়নি যে, মদপান বন্ধ করে দাও। সর্বপ্রথম অন্তরে প্রশ্ন জাগানো হলো। কুরআনুল কারীম সেটি বর্ণনা করেছে–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

হে রাসূল! মানুষ আপনার কাছে প্রশ্ন করে মদ ও জুয়া সম্পর্কে।

قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۬

আপনি বলে দিন, জুয়া ও মদপানে কিছু উপকার আছে আবার কিছু অপকারও আছে। কিন্তু ক্ষতি বিজয়ী আর লাভ পরাজিত অর্থাৎ লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি। *[সূরা বাকারা আয়াত-২১৯]*

মদ ও জুয়ার ক্ষতি বেশি উপকারের তুলনায়।

প্রাথমিক অবস্থায় এতটুকু আয়াত নাযিল হয়। তাতে মদ পান নিষেধ করা হয়নি। শুধু তার নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, অনেক বিশিষ্ট সাহাবা, যাঁরা নবুওয়াতের মান্‌শা বুঝতেন, তাঁরা উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মদ পরিহার করেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, আল্লাহ যখন মদের ক্ষতিকর হওয়ার কথা বলেছেন, তখন মদ পছন্দীয় নয়। বহু সাহাবা সেদিনই মদপান ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু মানুষ পান করছিল। কিছু দিন পর দ্বিতীয় আরেকটি হুকুম নাযিল হলো–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى

হে ঈমানদারগণ! তোমরা মদ পান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়ো না। *[সূরা নিসা আয়াত- ৪৩]*

উক্ত আয়াতে নামাযের সময়গুলোতে মদ নিষেধ করে দেওয়া হলো। নামাযের সময় ছাড়া লোকেরা অন্য সময় পান করতে থাকল। নামাযের সময় মদ পান করে যাওয়াকে হারাম করা হয়েছে। ফলে পাঁচ ওয়াক্ত মদ পান নিষিদ্ধ হলো। আর বাকি সময়ে জায়েয রইল। উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর হাজার-হাজার সাহাবী মদ পান ছেড়ে দেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন, মদ নিষিদ্ধ হবে আর আল্লাহ তায়ালা মদ পছন্দ করেন না। কিছু দিন পর তৃতীয় হুকুমটি নাযিল হয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

হে ঈমানদারগণ! এই মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ বৈ নয়। অতএব,

তোমরা এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। *[সূরা মায়েদা আয়াত- ৯০]*

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়। হাদিস শরীফে এসেছে, যেদিন উক্ত আয়াত শরীফ নাযিল হয়, সেদিন যার ঘরে দশ মটকা মদ ছিল, সে সবগুলো ভেঙ্গে দিল, যার ঘরে দু-মটকা ছিল সেও ভেঙ্গে দিল। মদিনার অলি-গলিতে ও নালা-ড্রেনে মদ এমনভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল, যেমনভাবে বর্ষাকালে পানি প্রবাহিত হয়। কারো ঘরে এক ফোঁটা মদও অবশিষ্ট রইল না।

এখন লক্ষ্য করুন এবং পার্থক্য বিধান করুন। আমেরিকানরা কোটি-কোটি টাকা বরাদ্দ করল মদপান বন্ধ করার জন্য। কিন্তু পরিশেষে ফল হলো উল্টো মদখোর দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আর ইসলামযুগে কোনো ধরনের বাজেট হলো না। এক কোটির ও না, এমনকি এক পয়সাও না। নিষিদ্ধের হুকুম পুরাপুরি নাযিল হয়নি; তার পূর্বেই মদপান পরিহার করা শুরু হয়ে যায় এবং আস্তে-আস্তে প্রতিটি ঘর মদমুক্ত হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রীয় আইন ও আল্লাহর আইনের পার্থক্য

উভয়ের মাঝে পার্থক্য?

মানবরচিত আইনে বলপ্রয়োগ আছে আর এখানে আল্লাহর ভয়। আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হওয়ার কারণে মদের মূলোৎপাটন হয়ে গেছে, শিকড় উপড়ে গেছে। আর সেখানে শুধু আইনের চাপ ছিল। তাই শুধু আইন দ্বারা অপরাধ বন্ধ হবে না যতক্ষণ-না নিজের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে। অতএব, ইসলামী শরীয়ত অন্যায়-অপরাধ থেকে মানুষদের রক্ষা করতে চায়; তবে চাপ প্রয়োগ করে নয়। শরীয়ত চায় স্বয়ং মানুষের অন্তরে চাপ সৃষ্টি হোক। অন্তর নিজেই বলবে, এগুলো খারাপ কাজ। আমাদের এগুলো পরিহার করা উচিত।

গুনাহের হাকিকত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো–

مَا الْإِثْمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟

হে আল্লাহর রাসূল! গুনাহ কী?

তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি, মদ সেবন করা গুনাহ, যিনা- করা গুনাহ, চুরি ডাকাতি করা গুনাহ। তিনি কি উত্তর দিয়েছিলেন? তোমরা জিজ্ঞেস করছ, গুনাহ কী?

مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ

যে বস্তু তোমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি করে, তা-ই গুনাহ।

অর্থাৎ যা তুমি প্রকাশ্যে করতে পার না, মানুষের সামনে করতে লজ্জাবোধ কর, তাই খারাপ ও গুনাহ। সুতরাং তা হতে বাঁচার চেষ্টা করো। কেমন যেন গুনাহের সম্পর্ক কলবের সাথে। তাই বলেছেন–

مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ

যা তোমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি করে তা-ই গুনাহ। তা থেকে বেঁচে থাকো।

এ কথা বলা হয়নি, যা থেকে পুলিশ নিষেধ করে তা থেকে বেঁচে থাকো। যা থেকে রাষ্ট্র ও সামরিক বাহিনী নিষেধ করে, তা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, তারা দৃশ্যমান বস্তু থেকে ফিরাবে আর তোমার অন্তর যদি খাদযুক্ত ভেজালযুক্ত হয়, তাহলে নজর হেফাজত করে লাভ নেই; তুমি পুনরায় একই কাজ করবে। আমরা চাই অন্তর পাক হোক। শুধু হাত-পা পাক হলে কাজ চলবে না।

সরকার যখন চোরকে জেলে পাঠায় তখন অবশ্যই সে জেলে থাকাকালীন চুরি করে না। কিন্তু তার মন থেকে চুরির আগ্রহ দূর হবে না। সে এমন সংকল্প করে যে, যখনই মুক্তি পাব, আবারও চুরি করব। বরং কতক চোর তো এ কথা বলে যে, বাড়িতে এমন হালুয়া-রুটি মিলবে না যেমন স্বাধীনভাবে জেলখানায় মিলে থাকে। এ কারণে মুক্তি পাওয়ার পর আরো একবার চুরি করব, যাতে লাল বিল্ডিংয়ে পৌঁছতে পারি এবং মেহনত ব্যতীত খেতে পারি।

ইসলাম চায় মানুষের অন্তরকে পবিত্র করতে। আইন শুধু বাহ্যিক দেহকে পাক করবে। অন্তরকে পাক করবে না। দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় আইন বাহ্য বদনে বাস্তবায়ন হবে আর আল্লাহর আইন অন্তরে বাস্তবায়ন হবে। তার কারণ হলো, রাজা-বাদশাদের হুকুমাত শুধু জাহেরের উপর হয় আর আল্লাহর হুকুমাত বাতেনের উপরও চলে। আল্লাহপ্রদত্ত আইন-কানুন যেমনভাবে জাহেরকে ফিরাবে, তেমনিভাবে বাতেনকেও ফিরাবে। অতএব, শরীয়ত চায়, তুমি শুধু যিনা-ব্যভিচার হতে বাঁচবে না বরং তোমার ভিতর যিনার খেয়ালও যাতে না আসে। বরং এমন হয় যে, তোমার অন্তরে যিনার প্রতি এমন ঘৃণা সৃষ্টি হবে যে,

যেমনভাবে নাপাকের প্রতি সৃষ্টি হয়। মদপান হতে তোমার ভিতর এমন ঘৃণা সৃষ্টি হবে যে, যেমন পেশাব-পায়খানাকে ঘৃণা কর। এমনটি তখনই হবে, যখন অন্তর পবিত্র হবে।

তারবিয়াতের কেন্দ্রস্থল

ইসলামে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাযকিয়ায়ে নাফ্স তথা অন্তর পবিত্রকরণ, যাতে নেক কাজের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং বদ কাজের জযবা দূর হয় আর শান্তি ও নিরাপদে থাকতে পারে। এ কারণে ইরশাদ হয়েছে–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

যে নিজের নফ্স্‌কে শুদ্ধ করে, সে সফলকাম হয়।

[সূরা শামস্ আয়াত- ৯]

উক্ত আয়াত শরীফে এ কথা বলা হয়নি যে, সফলকাম ঐ ব্যক্তি হবে, যে খারাপ কর্ম ছেড়ে দেবে এবং অপরাধমূলক কর্ম হতে বেঁচে থাকবে। লোকটি খারাপ কর্ম ছেড়ে দিল; কিন্তু অন্তরে করার তামান্না রয়ে গেল; তাহলে সে নিরুপায় হয়ে ছেড়ে দিল। কামিয়াব ও সফলকাম ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর পবিত্র হয়ে যায় এবং তাতে খারাপের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আর অন্তর নিজে-নিজে বলতে থাকে, এই খারাপ কর্ম করো না। এমন অবস্থাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গুনাহ মদ ও যিনা নয় বরং مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ হলো গুনাহ। যখন তোমর অন্তর বলবে, এগুলো খারাপ, তখন ঐ খারাপ কর্মগুলো ছেড়ে দাও-পরিহার করো। আর এগুলোই খারাপ কর্ম। সুতরাং মানুষের পবিত্রতা ও স্বচ্ছতার বুনিয়াদ অন্তরের উপর। অন্তর শুদ্ধ হয়ে গেলে কালেব তথা বাহ্য অংশও শুদ্ধ হয়ে যাবে। কলব নষ্ট হলে কালেবও নষ্ট। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

وَفِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

মানবদেহে গাজরের আকৃতির একটি গোস্তপিণ্ড রয়েছে, যা বাম পার্শ্বে ঝুলানো। সেটি শুদ্ধ হলে সারা মানুষ শুদ্ধ আর সেটি নষ্ট হলে সারা দেহ নষ্ট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন الا وهى القلب সতর্ক হয়ে যাও! সেটি হলো মানুষের কলব।

যদি আপনার অন্তর ঠিক থাকে, তাহলে দেহ ঠিক, আর অন্তর ভেজাল হলে দেহও ভেজাল। কারণ, অন্তরের আদেশে আপনি ভাল বা মন্দ কর্ম করেন। প্রথমে অন্তরে খেয়াল জন্মে, খেয়াল থেকে ইচ্ছা জন্মে, ইচ্ছা ও সংকল্প থেকে কাজ প্রকাশ পায়। যদি অন্তর নষ্ট হয়, তাহলে খারাপ খেয়াল সৃষ্টি হবে, খারাপ খেয়াল হতে খারাপ ইচ্ছা-সংকল্প সৃষ্টি হয় আর তা থেকে খারাপ আমল প্রকাশ পায়। এ কারণে শরীয়ত চায়, তোমরা হাত-পা ধৌত কর, পরিষ্কার কর; তাহলে কলবকে কেন ধৌত কর না। কালবকে ধুয়ে পবিত্র করে নিলে সারা দেহ এমনিতেই পবিত্র হয়ে যাবে।

কলব পবিত্রকরণ

কলব বা অন্তর পবিত্র হয় অধিক যিকরুল্লাহ এবং আল্লাহর ভয়ের মুরাকাবা করার দ্বারা। মানুষ ভাববে, মনে-মনে অনুভব করবে, একসময় আমার আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। নিজের জীবনের জবাবদিহি করতে হবে, আমি কী জবাব দেব। হযরত জুনায়েদ রহ. বলেন, আমি দুনিয়াতে এমন কোনো কর্ম করিনি, যার দলিল-প্রমাণ তার পূর্বে তালাশ করিনি, যাতে আল্লাহর সম্মুখে বলতে পারি, অমুক কাজ অমুক দলিলের ভিত্তিতে করেছি। শুধু নফসের চাহিদা অনুযায়ী করিনি। তাই মনে-মনে দলিল তালাশ করে নিবেন, যাতে উক্ত কর্মে এমন কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ থাকে, যা আল্লাহর সামনে বলা যাবে। যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে অধিক ওযর-আপত্তি গ্রহণকারী আল্লাহ থেকে আর কাউকে পাওয়া যাবে না। যদি কেউ সত্য ওযর নিয়ে হাজির হয়, তাহলে অবশ্যই তার ওযর কবুল হবে। কোনো প্রকার গুনাহের জন্য এমন করা হবে না যে, তাকে সরাসরি জাহান্নামে দিয়ে দেবে, শাস্তি দিয়ে দেবে বরং তাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করা হবে এই কাজটি কেন করেছ? কোনো ওযর-আপত্তি তোমার নিকট রয়েছে কী? যদি কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ বর্ণনা করা হয়, তাহলে ক্ষমা পাবে। আর যদি কোনো কারণ পেশ না করতে পারে এবং একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু নফসের কুকাম ও বদমায়েশির কারণে করেছে। তখন শাস্তি জারি করবে। এজন্য যা কিছু করবেন, প্রথমে তার হুজ্জত অন্বেষণ করবেন। আর হুজ্জত অন্বেষণ করলে অন্তরে যোগ্যতা সৃষ্টি হবে।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝

যে নিজেকে শুদ্ধ করে সে সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে সে ব্যর্থ হয়। *[সূরা আশ-শামস্ আয়াত- ৯-১০]*

শরীরের পবিত্রতা যথেষ্ট নয়, কাপড়েরর পবিত্রতা যথেষ্ট নয়। আসল পবিত্রতা হলো অন্তরের পবিত্রতা। অন্তর পবিত্র হলে শরীরকে পাক করবে, কাপড়কেও পাক করবে।

গুনাহের স্তর

বলা হয়ে থাকে–

اِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوْبِ

গুনাহ হতে বেঁচে থাকো। তবে বড়-বড় গুনাহের তুলনায় ছোট-ছোট গুনাহ হতে বেশি বেঁচে থাকো। কারণ, ছোট গুনাহ বড় গুনাহ পর্যন্ত পৌছায়। শরীয়ত গুনাহকে দুভাগে ভাগ করেছে। প্রথমটিকে বলে ছগীরাহ, দ্বিতীয়টির নাম কবিরাহ। মাকসাদ বা আসলের স্তরে কবিরাহ আর ওসায়েল বা মাধ্যমের স্তরে ছগীরাহ। ব্যভিচার কবিরাহ গুনাহ আর মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করা, উঁকি দেওয়া, তার পিছু-পিছু চলা ছগিরা গুনাহ।

তাওবার স্তর

কবিরাহ গুনাহ হতে বাঁচতে পারলে ছাগীরাহ গুনাহ নিজে নিজেই মাফ হয়ে যায়।

اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ

নেক কর্ম বদ কর্মকে মিটিয়ে দেয়।

মানুষ যখন নেক কাজ করে, তখন যত ছাগীরাহ হবে, সেগুলো কবিরাহ গুনাহ হতে বেঁচে থাকার কারণে এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কবিরাহ গুনাহ মাফ হবে না যতক্ষণ-না মানুষ তাওবা করবে। তাওবা ব্যতীত তার ময়লা অন্তর হতে দূর করতে পারে না। কেউ কবিরা গুনাহ করল আর তাতে বান্দার হক নষ্ট করল, তাহলে এমন গুনাহ তাওবা দ্বারাও মাফ হবে না যতক্ষণ-না ঐ বান্দা তথা হকদার মাফ করে। আল্লাহ হক্ চুরি করলে তিনি তাঁর দয়া-অনুগ্রহ দ্বারা ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু বান্দার হক চুরি করলে হাজারোবার তাওবা করলে ক্ষমা হবে না। যতক্ষণ-না চুরির মাল তার মালিকের নিকট ফেরৎ দেওয়া হবে। যদি

কাউকে অন্যায়ভাবে গালি দেওয়া হয়, তাহলে হাজারো তাওবা করলে মাফ হবে না। যতক্ষণ-না সে ক্ষমা করে।

ছগীরা গুনাহের ভিতর কবিরাহ গুনাহের সৃষ্টি হয় ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়, যদি কবিরা হতে বেঁচে থাকা যায়। আর যদি কবিরা হয়, তাহলে তাওবা দ্বারা মাফ হবে। অর যে কবিরা গুনাহ বান্দার সাথে সম্পর্কিত, সেগুলো তাওবা দ্বারা মাফ হবে না যতক্ষণ-না ঐ বান্দা হতে মাফ করানো হবে।

আইনি শাস্তি

উদাহরণস্বরূপ যিনা-ব্যভিচার। বাস্তবে এতে মানুষ তিন ধরনের গুনাহ করে এবং তিনজনের অধিকার হরণ করে। সুতরাং যিনাকারী সর্বপ্রথম আল্লাহর হক নষ্ট করে। আল্লাহ বলে ছিলেন যিনা করো না আর সে তা করেছে। তো সে সংযমের বিপরীত কাজ করল। একটা গুনাহ তো এই হলো যে, সে আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করেছে।

দ্বিতীয়ত সে সাধারণ জনতার হক নষ্টের গুনাহ করেছে। যে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে এবং তাদের জন্য যিনার রাস্তা সুগম করেছে। এখন মানুষর যিনা করে বেড়াবে। তাই সে মানুষের হক নষ্টের গুনাহ করল।

তৃতীয়ত নিজের নফসের হক নষ্টের পাপ করল। তার উপর আবশ্যক ছিল নিজের নফসকে খারাবি থেকে পবিত্র করবে। কিন্তু সে যিনা করে নিজের কালবকে, নফসকে, বদনকে মলিন ও নাপাক করেছে। অতএব, যিনকারী প্রথমে আল্লাহর হক নষ্ট করল, দ্বিতীয়ত সাধারণের হক, তৃতীয়ত নিজের আত্মার হক নষ্ট করল। তাওবা করার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা চাইলে নিজের হক মার্জনা করে দেবেন। কিন্তু নিজের নফসের মধ্যে যে নাপাকি বসেছে এবং বান্দার যে ক্ষতি করেছে, তা তাওবা দ্বারা নিঃশেষ হবে না। যতক্ষণ-না প্রস্তরাঘাত ও রজম করা হয়।

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মাযহাবমতে তারপরও তাওবা করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, যিনার শাস্তি প্রদান করা হলে, প্রস্তারাঘত করা হলে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন মাফ হয়নি। প্রস্তরাঘাত করার দ্বারা সাধারণ জনতার যে হক নষ্ট করেছিল, তা শেষ হয়; কিন্তু আল্লাহর হক এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। তা তাওবা ছাড়া মাফ হবে না। আর নিজের নফসের যে হক নষ্ট করেছে, তা ঐ পর্যন্ত মাফ হবে না যতক্ষণ-না সে অঙ্গীকার করবে যে, ভবিষ্যতে এমন কর্ম আর হবে না।

অতএব, শরীয়তের আইনী শাস্তি জারি হওয়ার পাশাপাশি তাওবাও জরুরি। এ প্রকার অপরাধে মানুষ অনেক ধরনের হক নষ্ট করে থাকে। আল্লাহর হক, জনগণের হক, দেশের হক, নিজের নফসের হক নষ্ট করে। তো তাওবার দ্বারা আল্লাহর গুনাহ মার্জনা হবে, শরয়ী শাস্তি প্রদানের দ্বারা পাবলিকের গুনাহ ক্ষমা হবে। সে তাদের জন্য অনিরাপত্তার রাস্তা খুলে দিয়েছিল। এখন শাস্তি দেওয়ার দ্বারা নিরাপত্তা কায়েম হবে।

পবিত্রতার ব্যবস্থাপত্র

গভীর দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে, তিনটি গুনাহের সম্পর্ক কলবের সাথে। কলব পবিত্র না হলে মানুষ পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না। আর কলব পবিত্র থাকলে অবশ্যই বেঁচে থাকতে পারবে। এজন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কলবকে পবিত্র ও শুদ্ধ করা। আর তার জন্যই শরীয়ত যিকরুল্লাহর প্রেসক্রিপশন নির্ধারণ করেছে যে, আল্লাহর স্মরণ সর্বদা তোমাদের সামনে থাকবে। আল্লাহর ভয় অন্তরে সৃষ্টি হবে। আর এতেই মানুষ অন্যায় হতে বাঁচার চেষ্টা করবে। অপরদিকে জিকির ব্যতীত যত গাফলত সৃষ্টি হয়, ততই অপরাধ বাড়তে থাকবে। এ কারণে গুনাহ হতে বাঁচার বুনিয়াদি বস্তু হলো–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

আল্লাহর স্মরণ নিজের ভিতর সৃষ্টি করো।

সর্বাবস্থায় জিকির

সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ কলবে থাকবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে–

كَانَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهٖ

সর্বাবস্থায় তিনি আল্লাহর জিকির করতেন।

তাঁর উম্মতকেও এমন হওয়া উচিত। কিন্তু আপনারা বলবেন, সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির কিভাবে করা সম্ভব। দোকানে যেতে হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হয়, হাল-চাষ করতে হয়। সন্তানদের সময় দিতে হয়। আরো কত কিছু করতে হয়। তাহলে সর্বদা জিকির করব কিভাবে। এটি তো সুস্পষ্টতো দুষ্কর কাজ। কিন্তু চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, আপনি কিভাবে সর্বদা আল্লাহর

জিকির করবেন। এক প্রকার জিকির তো প্রচলিত জিকির। যেমন– সকাল-সন্ধ্যা এক-এক তাসবীহ করে পড়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। এগুলো জিকির। এ ছাড়া অন্যান্য সময়, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে থাকার সময়, দোকান ও কর্মস্থলে অবস্থান করার সময় যিকরের পদ্ধতি হলো এমন যে, এমন নিয়ত করে যাবেন যে যদি দু-চার পয়সা অর্জন করতে পারি, তাহলে তা দ্বারা বাল-বাচ্চাদের লালন-পালন করব। তাদের লালন-পালন করা আল্লাহর হুকুম। আমি তো তাঁর হুকুম পালন করার জন্য কর্মস্থলে যাচ্ছি। নিজের নফসের টানে তো যাচ্ছি না। আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য যাচ্ছি।

চাষী চাষাবাদ করবে এই নিয়তে যে, যদি কিছু উৎপন্ন হয়, তাহলে তা ছেলেমেয়েদের খাওয়াব এবং সৃষ্টজীবের খেদমত করব। আল্লাহর মাখলুকদের লালন-পালন করব। তাহলে সব কর্ম যিকরুল্লাহর মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে। যিকরুল্লাহর জন্য প্রয়োজ নেই, আপনি ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ তথা সকল কাজ-কারবার ছেড়ে মসজিদে বসে আল্লাহ-আল্লাহ তাসবীহ পড়া। কাজ-কারবারে শুধু নিয়ত করে নিলেই যিকরুল্লাহতে শামিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে নিয়তের ফলে সকল পারিবারিক কর্ম ইবাদাতে রূপান্তরিত হবে। আর প্রতিদান তা-ই পাওয়া যাবে, যা ইবাদাত করলে পাওয়া যায়।

হাদিস শরীফে এসেছে, মানুষ যখন আহার করতে বসে; তখন শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। বলা হয়, এভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যিরুল্লাহর সাথে আহার করলে তার আগের-পিছনের সকল ছগীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

সুতরাং আহার করা একটি পারিবারিক কাজ, কিন্তু তা গুনাহ মাফের মাধ্যম হিসেবে গণ্য হচ্ছে। যেমন– নামায-রোযা হয়ে থাকে। শুধু সামান্য নিয়ত পরিবর্তনের ফলে ক্ষমা সংযোজন হয়ে গেল।

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

مَنْ قَادَ اَعْمٰى غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ

যে ব্যক্তি কোনো অন্ধকে রাস্তা দেখিয়ে দিল, তার যত ছগিরা গুনাহ রয়েছে, সব ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অন্ধকে রাস্তা দেখানো প্রকাশ্যত নামায-রোযা নয়; কিন্তু সাওয়াব তেমনই পাওয়া গেল, যেমনটি ইবাদাত করলে মিলে। কারণ, নিয়ত শুদ্ধ ছিল। তেমনিভাবে অনেক আমল যেগুলো পারিবারিক ও সামাজিক; কিন্তু তার সাওয়াব মিলে আনুগত্য ও ইবাদাতের ন্যায়। কারণ, যেহেতু এগুলো জিকিরে শামিল হয়ে যায় নিয়ত শুদ্ধ হওয়ার কারণে।

সার্বক্ষণিক জিকির

আপনাকে এ কথা বলা হয়নি যে, নামায-রোযা হতে ফারেগ হয়ে অবশিষ্ট সময় আপনি মসজিদে বসে থাকেন। সর্বদা আল্লাহ-আল্লাহ জিকির করতে থাকেন। বরং দুনিয়ার যত প্রকার কাজ-কর্ম আছে, সেগুলোতে নিয়তকে শুদ্ধ করে নিন। সুন্নাতের অনুসরণ করুন; তাহলে সবই যিকরুল্লাহর মধ্যে গণ্য হবে। তাহলে আপনি জিকির করনেওয়ালা হয়ে যাবেন। যেমন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা জিকির করতেন, তেমনিভাবে আপনারও সেই মাকাম অর্জিত হবে।

তেমনিভাবে ইসলাম বিভিন্ন সময়ের জন্য কিছু দোয়া নির্ধারণ করেছে। সেগুলো মুখস্থ করে নিন এবং সময়মত পড়ে নিন; তাহলে পূর্ণ সময় যিকরুল্লাহর মধ্যে গণ্য হবে। সূর্য ওঠার সময় দোয়া, পোশাক পড়ার সময় দোয়া, বাথরুমে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময় এই দোয়া পড়ে নিন। কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হলে মুসাফাহার সময় দোয়া পড়ুন। এগুলো সবই যিকরের অন্তর্ভুক্ত। দোয়ায়ে মাসনুনাহগুলোর অভ্যাস করে নিলে পুরো জীবন যিকরুল্লাহর মধ্যে অতিবাহিত হবে।

মোটকথা, সর্বদা আল্লাহর জিকির হওয়া উচিত। আর তার অর্থ এই নয় যে, মানুষ আহারাদি ছেড়ে দেবে, সকল কাজ-কারবার ছেড়ে দেবে। এই আহারাদিকে সামান্য একটু পরিবর্তন করে জিকির বানাবে। তাহলে পুরা সময় যিকরে অতিবাহিত হবে। এতে অন্তর পরিষ্কার হবে এবং তাতে উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হবে।

জিকিরের অনুশীলন

যিকরের অনুশীলন ও মশ্‌ক করে অভ্যাসে পরিণত করা কোনো মন্দ কাজ নয় বরং সর্বোত্তম কাজ। চলাফেরা ও ওঠা-বসায় আল্লাহর কোনো-না-কোনো নাম যবানে জারি রাখা। উপরে উঠছেন তো আল্লাহু আকবার বলতে-বলতে উঠুন। নিচে নামছেন তো সুবহানাল্লাহ বলতে-বলতে নামুন। কোনো আশ্চর্য কথা শ্রবণ করলে সুবহানাল্লাহ বলুন। আর কোনো কদর ও মর্যাদা বাড়াতে চাইলে মাশাআল্লা বলুন। এগুলোর অভ্যাস করলে প্রথম-প্রথম তো লৌকিকতা হবে এবং কষ্ট হবে। কিন্তু যখন অভ্যাস করে নিবেন, তখন অনিচ্ছাকৃত যবান হতে সর্বদা আল্লাহর নাম জারি হয়ে যাবে।

আরেফ বিল্লাহগণও এর অনুশীলন করান। প্রথমে কিছুটা লৌকিকতা হয়, শেষে তা অনিচ্ছাকৃতভাবে জারি হয়ে যায়।

সার্বক্ষণিক জিকিরের ফলাফল

তার ফলাফল কেমন হয়?

যখন পুরা জীবনে জিকিরের অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং অনিচ্ছাকৃত মুখে জারি হয়ে যাবে, তাহলে মরণের সময়ও আল্লাহর নাম মুখে জারি থাকবে। ফলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ জিকিরের সাথে হবে। আর শেষ নিঃশ্বাস তথা সহি করার জন্যই দুনিয়ার যত মেহনত। যদি শেষ ভালো হয় তো সব ভালো। হাদিসে এসেছে–

مَنْ كَانَ اَوَّلُ كَلَامِهٖ وَاٰخِرُ كَلَامِهٖ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

যে ব্যক্তির শুরু ও শেষ কথা হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

শেষ কথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কখন হবে? যখন জীবনে আল্লাহর নামের অনুশীলন হবে। সুতরাং হাদিস শরীফে বলা হয়েছে–

تُحْشَرُوْنَ كَمَا تَمُوْتُوْنَ وَتَمُوْتُوْنَ كَمَا تَحْيَوْنَ

তোমাদের হাশর এ অবস্থায় হবে, যেভাবে তোমাদের মরণ হবে। আর মরণ ঐ অবস্থায় হবে, যে অবস্থায় জীবন যাপন করবে।

মোটকথা, জীবন যে অবস্থায় পরিচালিত হবে, মরণ সেই অবস্থায় আসবে। আর যে অবস্থায় মরবেন, সেই অবস্থায় হাশরের ময়দানে উঠবেন। যদি কেউ জীবন পরিচালনায় আল্লাহর জিকিরের অনুশীলন করে, তাহলে অবশ্যই মরণের কালে আল্লাহর স্মরণ মুখে জারি থাকবে। আর যখন কবর হতে উঠবে, তখন ঐ কালিমা পড়তে-পড়তে উঠবে। যে কালিমা পড়তে-পড়তে মরণ হয়েছিল।

হাদিস শরীফে এসেছে, একজন হাজী সাহেব যদি লাব্বায়েক-লাব্বায়েক বলতে-বলতে মারা যান, তাহলে তিনি কবর হতে লাব্বায়েক-লাব্বায়েক বলতে-বলতে উঠবেন এবং তিনি মনে করবেন, আমি এখন আরাফাত ময়দানে রয়েছি। পরে জানতে পারবেন, তিনি হাশর ময়দানে আছেন। আরাফাত কোথায়? আমি তো মক্কায় নয়; পরজগতে আছি। কিন্তু তখন যবানে লাব্বায়েক জারি থাকবে। তেমনিভাবে মানুষ যে কালিমা যবানে জারি করে নেবে এবং আল্লাহর নামের

অনুশলীন করতে থাকবে, তাহলে আল্লাহর ঐ নাম নিঃশ্বাসের সময় বের হবে এবং ঐ নাম উচ্চারণ করতে-করতে লোকটি হাশর ময়দানে উঠবে।

কবর ও হাশরে জিকির সংরক্ষকের ভূমিকায় থাকবে

এই জিকির যিশিরকারীদের জন্য পাহারাদার এবং সংরক্ষক হবে। হাদিস শরীফে এসেছে, মানুষ যখন কবর হতে ওঠবে, তখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তার আগে-আগে থাকবে, আর 'আল্লাহু আকবার' থাকবে মাথার উপর। 'সুবহানাল্লাহ' থাকবে ডান পার্শ্বে, 'আলহামদুলিল্লাহ' থাকবে বাম পার্শ্বে এবং 'লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' অবস্থান করবে তার পিছনে। তারা তাকে চারদিক বেষ্টন করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে হাশর ময়দানে যাবে এবং সর্বদিক হতে আযাবের আক্রমণকে প্রতিরোধ করবে।

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবর শায়িত করা হয়, তখন মাথার দিক থেকে আযাব আসতে থাকে। যদি তার মাথায় কুরআনের আয়াত থাকে, যা সে দুনিয়াতে মুখস্থ করেছিল এবং তেলাওয়াত করেছিল, আয়াতগুলো দাঁড়িয়ে যাবে এবং বলবে, সাবধান এদিক থেকে আসতে পারবে না।

আযাব ডান দিক থেকে আগে বাড়তে থাকবে। তখন হাদিসে এসেছে- اَلصَّلٰوةُ بُرْهَانٌ 'নামায মানুষের প্রমাণপত্র' সে ডান দিকে আযাবকে প্রতিরোধ করবে। আযাব বাম পাশ থেকে ধেয়ে আসবে। তখন রোযা দাঁড়িয়ে যাবে। হাদিস শরীফে এসেছে اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ 'রোযা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ'। সে বাম দিকে ঢাল সেজে হামলা প্রতিহত করবে এবং নিজেকে হেফাজত করবে। আর পায়ের দিক থেকে আযাব অগ্রসর হলে- হাদিসে এসেছে যাকাত-সাদকা দাঁড়িয়ে যাবে। কেননা, সেগুলো মানুষের চলাফেরা তথা উঠা-বসার কামাই। এ কারণে পায়ের দিককার আযাব ফিরাবে। মোটকথা, কবরে যদি আযাব-প্রতিবন্ধক কোনো বস্তু থাকে, তাহলে তা যিকরুল্লাহ হবে। হাশর ময়দানে মানুষকে সম্মানের সাথে যদি কেউ নিয়ে যায়, তাহলে তাও হবে যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর নাম। আর যে বস্তু শেষ নিঃশ্বাসকে কল্যাণময় করবে, সেও মানুষের জিকির এবং আল্লাহর স্মরণই হবে।

মুহাফেযের পরিসীমা

এসব কিছু তখনই হবে, যখন জীবনে যিকরুল্লাহর অনুশীলন হবে। জীবনে গাফলতি থাকলে আইনগতভাবে মৃত্যুতেও গাফলতি হবে। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন, তিনি কার সাথে কেমন ব্যবহার করবেন। তবে হাশরে ঐ বস্তুই প্রকাশ হবে, যা সে নফসের অংশ বানিয়ে নিয়েছিল।

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, মাইয়েতকে যখন কবরে সমাহিত করা হয় আর মুনকার-নাকির সাওয়াল-জাওয়াব করতে আসে এবং তার মধ্যে রুহ বা আত্মা প্রদান করা হয়, তখন তার কাছে এমন মনে হয় যে, সূর্য উদিত হয়েছে; কিন্তু অস্তমিত হওয়ার নিকটবর্তী। সূর্যের প্রতিচ্ছবি সামনে ভেসে উঠবে এবং এমন মনে হবে যে, রৌদ্রের উপর হলুদ আবরণ ছেয়ে গেছে আর মাগরিবের সময় অতি নিকটবর্তী। ফেরেশতারা প্রশ্ন করবে তোমার রব কে? তখন সে উত্তর দেবে, মিয়া সাব! পরে কথা হবে; এখন আমাকে নামায পড়তে দাও। আমার সময় চলে যাচ্ছে। নামায কাজা হয়ে যাবে; হাতে সময় কম। এক ফেরেশতা অপরজনকে বলবে, তাকে তার রব সম্পর্কে কী প্রশ্ন করব যে, তার রবের জন্য এতটুকু ফানা যে, এখানেও নামায পড়ার জন্য তৈরি। তাকে কী জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমার রব কে? দ্বিতীয়জন বলবে, আমাদের কাজ তো ডিউটি পালন করা। আমরা তো জানি, কে সত্য উত্তর দেবে। কিন্তু প্রশ্ন করা আমাদের দায়িত্ব। সুতরাং এমন উত্তর দেওয়া যে, মিয়া! পরে আসেন; আমাকে নামায পড়তে দিন। এমন কথা কারা বলবে? যারা দুনিয়াতে সর্বদা অনুশীলন করেছে যে, আমার নামায কাযা হতে দিব না; সময়মত আদায় করব। আর যদি এমন হয় যে, দুনিয়াতে নামাযের সময় চলে যায়; পরে কোনোমতো নামায পড়ে বা একেবারেই পড়েনি, তারা সেখানে একথা বলতে পারবে না। কেননা, দুনিয়াতে তাদের নামাযের অভ্যাস ছিল না। মোটকথা, দুনিয়ার জীবনে যার অভ্যাস করবে, সেগুলোই কবর জগতে, হাশর জগতে কায়েম থাকবে আর সেগুলোই নাজাতের মাধ্যম হবে।

যিকরুল্লাহর দুটি অংশ

এজন্য শরীয়তের ইত্তেবা, যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর স্মরণ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। আর যিকরুল্লাহর দুটি অংশ আছে। একটি মুনকারাত বিষয়গুলো হতে বেঁচে থাকা অপরটি করণীয় বিষয়গুলোর উপর আমল করা। একটি হলো আদেশের উপর আমল করা, আরেকটি নিষেধের উপর আমল করা। উভয়ের

মধ্যে আমলের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হলো মুনকারাত থেকে বেঁচে থাকা, যেগুলোকে শরীয়ত গুনাহ হিসেবে গণ্য করেছে। যেগুলো শরীয়ত কবিরা ও ছগিরা বলেছে, সেগুলো হতে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে তা মামুরাত (আদিষ্ট বিষয়াবলি)-এর উপর আমল করার এবং আহকামে শরীয়াতের উপর আমল করার মাধ্যম হবে। আর যে ব্যক্তি মুনকারাত বস্তু হতে পরহেয করে না, তার নেক কর্মের তাওফিক হয় না। যদিও হয় কিন্তু নেক কর্ম নেকের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে না। কেননা, ক্ষতিকার জিনিস ব্যবহার হচ্ছে। আর যে ব্যক্তি উভয়টির উপর আমল করে; অর্থাৎ নেক কর্ম করে এবং বদ কর্ম পরিহার করে, শরীয়তের পরিভাষায় তাকে তাযকিয়া বলে যে, সে নিজের নফ্সকে পবিত্র করে নিল।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

যে ব্যক্তি বদ আমল ত্যাগ করল, নেক আমল গ্রহণ করল। ইত্তেবায়ে শরীয়ত গ্রহণ করল আর হারাম, মাকরুহ, এবং নিষিদ্ধ বস্তুগুলো পরিহার করল, তাহলে নিজের নফ্সকে পবিত্র করে নিল এবং সফলতার মাকামে পৌঁছে গেল। উক্ত আয়াতের শুরুর দিকে বলা হয়েছে–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝

শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর। তারপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। *[সূরা শামস্ আয়াত ৭-৮]*

আল্লাহ মানুষের মধ্যে নেক ও বদ উভয় কাজের জয্বা প্রদান করেছেন, যাতে উভয়ের ঝগড়া দ্বারা সে উন্নতি লাভ করতে পারে। একটি বিষয় আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে, উক্ত আয়াতে বুনিয়াদি উসূল বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে নেক ও বদ উভয়ের মাদ্দা রয়েছে। বদ থেকে বাঁচার জন্য আর নেক কর্ম করার জন্য। উভয়টাকে একত্র করে মানুষের মধ্যে উন্নতির মাদ্দা সৃষ্টি হয়। ফলে সফলতা ও কামিয়াবির মাকাম অর্জিত হয়। এ কথাগুলো উক্ত আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। তার বিস্তারিত ব্যাখা অনেক দীর্ঘ। এ কারণে সংক্ষিপ্তভাবে উক্ত উসূল বলে দিলাম এবং সামান্য ব্যাখ্যা বলে দিলাম। পরিশেষে দোয়া করি, আল্লাহ যেন আমাদের নেক কর্ম করার এবং বদ কর্ম পরিত্যাগ করার তাওফিক দান করেন। আমীন!

দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

হে আল্লাহ! হে আমার পালনকর্তা! সরল পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান করো তুমিই সবকিছুর দাতা। *[সূরা আলে ইমরান আয়াত- ৮]*

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَا بِالْخَيْرِ، وَاخْتِمْ لَنَا بِالْخَيْرِ. اَللّٰهُمَّ نَسْئَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، اَللّٰهُمَّ وَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ. وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

হে আল্লাহ! আমাদের জন্য কল্যাণের দ্বার খুলে দাও। আমাদের শুভ সমাপ্তি নসীব করো। হে আল্লাহ! আপনার সকাশে সর্বপ্রকার ভাল ও কল্যাণ ভিক্ষা চাই আর সর্বপ্রকার অকল্যাণ হতে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! মুসলিমদের সাথে মরণ দান করো এবং সালেহীনদের সাথে মিলিত করো, অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও জাহান্নামীর সাথে নয়। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টিকূলের শ্রেষ্ঠ মানব, আমাদের সরদার ও মনিব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবী এবং সকল মুমিন-মুসলমানের উপর। হে দয়ালুদের দয়ালু! তোমর রহমতে করুণায় আমাদের দোয়া কবুল করো।

সতর্ক বাণী

একটি মাসয়ালা শুনে নিন।

কিছু মানুষের অভ্যাস এমন যে, তারা ওয়াজ শুনতে বসে; কিন্তু সেখানে বিভিন্ন ওজিফা পড়তে শুরু করে। এমনটি করা ঠিক নয়। এটা ওয়াজ ও দরসের আদববহির্ভূত কর্ম। ওয়াজ শ্রবণ করা একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক ইবাদাত। এ

কাজটা এমন যে, কেউ নামায পড়ছে আবার অন্যজনকে পয়সাও দান করছে। তাহলে তার নামায হবে না এবং পয়সা বণ্টনও সঠিকভাবে হলো না। তো এহেন কর্ম করা মজলিসের আদবের খেলাফ। প্রত্যেকের জন্য ফরজ হলো, যারা মজলিসে বসবে তারা ওয়াজ-নসিহত শ্রবণ এবং সেদিকে ফিরে থাকবে। আর যা বলা হচ্ছে, তা অন্তরে বসানোর জন্য ফিকির করবে। আর যদি ওয়াজিফার প্রয়োজন হয়, তাহলে অন্যত্র গিয়ে তা আদায় করে নিবে। এখানে বসে নয়।

وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

[১৯ জুমাদাল উলা ১৪০৭ হিজরী, জুমার দিন লিখিত ওয়াজ।]

বয়ান : ৫

মানবসৃষ্টির মৌলিক উপকরণ

মানবচরিত্রের উপাদান চারটি। ১. ইলমে সহি ও ইলমে নাফে। অর্থাৎ শুদ্ধ ও উপকারী জ্ঞান। ২. আমলে সহি ও আমলে সালেহ। অর্থাৎ শুদ্ধ ও নেক কর্ম। ৩. ইখলাসে কামিল বা পরিপূর্ণ নিষ্ঠা। ৪. সঠিক চিন্তা। এই চারটি বস্তু একজন মানুষের মধ্যে একত্রিত হলে তাকে প্রকৃত মানুষ বলা হবে। যার মধ্যে ইলমের স্থলে জাহালাত তথা মূর্খতা থাকে, তাকে জন্তু বলা হবে। আর যদি ইলম থাকে; কিন্তু আমল নেই, তাহলে তাকে বলা হবে আলেমে বেআমল তথা আমলহীন আলেম এবং হত্যাযোগ্য মানুষ। আর যার ইলম ও আমল দুটিই আছে; কিন্তু মুনাফিক, তাহলে তাকে বলা হবে অপদার্থ বা নির্বোধ। আর যার মধ্যে সেগুলোর পাশাপাশি ইখলাসও আছে; কিন্তু চিন্তাশক্তি নেই, তাহলে তাকে বলা হবে, সে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ প্রকারের মানুষ। অথর্ব মানুষ। যার মধ্যে ইলম আছে, আমল আছে, ইখলাস আছে এবং আখেরাতের চিন্তা আছে, তাকে বলা হবে গ্রহণযোগ্য মানুষ। তাকেই মানুষ বলে পরিচয় দেওয়া যায় এবং বলা যেতে পারে, তিনি একজন প্রকৃত মানুষ।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ:

فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْعَالِمُوْنَ وَالْعَالِمُوْنَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْعَامِلُوْنَ وَالْعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْمُخْلِصُوْنَ وَالْمُخْلِصُوْنَ عَلٰى خَطَرٍ عَظِيْمٍ (اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষ সবাই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে; কিন্তু আলেমরা নয়। আলেমরাও সেদিকে যাচ্ছে; কিন্তু আমলকারীরা নয়। আর আমলকারীরাও ধ্বংসের দিকে। তবে মুখলিসরা নয়। আর নিষ্ঠাবানরা বড় শঙ্কার মধ্যে নিপতিত আছে।

সীরাতুন্নবীর ব্যাপকতা

অজকের মাহফিল সীরাতুন্নবী নামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ মাহফিলের আলোচ্য বিষয় হলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাত সম্পর্কে আলোকপাত করা এবং তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা, যাতে মানুষ সীরাতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুত-পবিত্র সীরাত প্রকৃতপক্ষে এক সত্তা বা এক ব্যক্তিত্বের সীরাত নয়, বরং তা সমগ্র মানবজাতি ও সকল মানবতার পবিত্র সীরাত। পৃথিবীতে এমন অগণিত ব্যক্তিত্ব অতিবাহিত হয়েছেন, যাঁরা এক-একটি দলের প্রতিনিধি ছিলেন, তাদের পরিচালনা করতেন। অর্থাৎ পুরা জামাত মিলে যতটুকু কামালাতের মালিক হতো, কখনও আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল কামালাতকে একজন ব্যক্তির মাঝে সমাবেশ ঘটাতেন।.

কোনো-কোনো ব্যক্তি একটি জামাত বা দল নয় বরং একটি গোষ্ঠীর সকলের কায়েম-মোকাম হতেন। আবার কোনো-কোনো ব্যক্তিত্ব এমন ছিলেন, যারা সারা জাতি ও উম্মতের কায়েম-মোকাম হতেন। অর্থাৎ একটা জাতির লোকদের মধ্যে ইলম ও আমলের যে পূর্ণতা সবটুকু তার মধ্যে একত্রিত করে দেন। যেমন– হযরত ইবরাহীম আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে–

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম আ. একাই একটি উম্মত। একটি উম্মতের মধ্যে যত গুণ ও সচ্চরিত্র একত্রিত হতে পারে, তা সবই আল্লাহ তায়ালা এক সত্তা হযরত ইবরাহীম আ.-এর মধ্যে একত্রিত করে দিয়েছিলেন।

এখন আপনারা আন্দাজ করুন, যে বরকতময় পবিত্র সত্তা মিল্লাতে ইবরাহীমকে পূর্ণতা প্রদান করার জন্য দুনিয়াতে আগমন করেছেন, সেই সত্তা কত মহান হবেন! কী পরিমাণ গুণের অধিকারী হবেন! তিনি এক উম্মত বা জাতি নয় বরং সমগ্র বিশ্বের সকল উম্মাতের গুণবলী ও বৈশিষ্ট্যের কায়েম-মোকাম হবেন। সারা উম্মত ও জাতি-গোষ্ঠী একত্রে যে কামালাতের অধিকারী হবে, তা সবাই এক সত্তার মধ্যে সমাবেশ ঘটবে। আর ঐ পবিত্র সত্তা হলেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মানবচরিত বা সীরাত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাত সমগ্র মানবের কামাল সীরাত। এজন্য আমি প্রয়োজন অনুভব করছি, এই পবিত্র সীরাত বর্ণনা করার পূর্বে মানবসীরাতের উপর আলোকপাত করব। ইনসান কাকে বলে, তার সীরাতের অংশগুলো কী কী যদি তা হৃদয়াঙ্গম হয় বা বুঝে আসে, তাহলে বরকতময় সত্তা, যার সীরাত বিশ্বমানবের অনুপম আদর্শ তা অনায়াসে বুঝে আসবে। এ কারণে

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ হাদিসটি তেলাওয়াত করেছি, যাতে ইনসান কাকে বলে তার উপাদানগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। ইনসান শব্দের অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে।

মানবসত্তার সৃষ্টিগত স্তরসমূহ

এ বিষয়টি এভাবে বুঝে নিন যে, মানবজাতির যতটুকু শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান বা মর্যাদা রয়েছে, তা তাদের জন্মগত সত্তার কারণে নয়। সকল সৃষ্টিজীবের উপর তাদের যতটুকু বুযুর্গি, বড়ত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদা আছে, সেগুলো তাদের মাদ্দার কারণে নয়। মানুষ সৃষ্টির মাদ্দা-উপকরণ কুরআনুল কারীমের যে কস্থানে উল্লেখ আছে, সেগুলো সবই পচা-গান্ধা ও নাপাক উপকরণ। এগুলোর কারণে মানুষের কোনো প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযিলত হতে পারে না।

কোথাও মানবসৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ

আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি।

কোথাও বলেছেন–

خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ

আমি মানুষকে এক ফোঁটা গান্ধা-পচা পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। *[সূরা সাফ্ফাত- ৭৭]*

কোথাও বলেছেন–

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ

আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? *[সূরা মুরসালাত- ২০]*

কোথাও বলেছেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ

আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরি বিশুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। *[সূরা আল-হিজরর- ২৬]*

তো কোথাও মাটি, কোথাও শুক্রবিন্দু, কোথাও ঠনঠনে মাটি, কোথাও তুচ্ছ পানি ইত্যাদিকে মানবসৃষ্টির উপাদান বলা হয়েছে। সুতরাং যার মধ্যে স্বয়ং তুচ্ছতা রয়েছে, এই মাদ্দাগুলোর দ্বারা মানুষের কি মান-মর্যাদা, ফযিলত, শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন হতে পারে?

কুরআনুল কারীমের একস্থানে ঐ মাদ্দাগুলোকে একসাথে একত্রিত করে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۗ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝

আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তাকে শুক্রবিন্দূরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি। তারপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি। এরপর সেই শুক্রপিণ্ড থেকে অস্তিত্ব সৃষ্টি করেছি। তারপর অস্তিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করেছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়। *[সূরা মুমিন আয়াত ১২-১৪]*

মানবসৃষ্টির প্রথম স্তর

উপরে মানবসৃষ্টির মাদ্দা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পরিষ্কার কথা হলো, মাটির মধ্যে কোনো প্রকার আড়ম্বর নেই। মাটি তো এমন বস্তু, যাকে 'অনুগত' বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا

তিনি তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করেছেন। *[সূরা মুলক আয়াত- ১৫]*

অর্থাৎ মাটিকে আমি তোমাদের জন্য নিচু বানিয়ে দিয়েছি। তো মাটি বেচারা জুতাযুক্ত পদদলিত হয়। আপনারা তাকে পায়ে পিষেন। কিন্তু সে উঁফ শব্দটুকু করতে পারে না। তার অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের এই অবস্থা যে, তাতে কোনো উজ্জ্বলতা নেই। নেই তার কোনো ভাল চেহারা। মাটি হলো মানবসৃষ্টির প্রথম স্তর বা প্রাথমিক উপকরণ।

মানবসৃষ্টির দ্বিতীয় স্তর

তারপর আরো আগে বেড়ে বলেন–

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝

তারপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু বানিয়ে একটি সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।

অর্থাৎ মায়ের জরায়ুতে। এখন তা আরো গন্ধযুক্ত ও পচা স্থানে উন্নতি হয়েছে। কারণ, মাটি তো নাপাক নয়। অতিরিক্ত ময়লা-আবর্জনার অপরিচ্ছন্নতা মাত্র। কাপড়ে লাগলে ধুয়ে ফেললেই চলে আর গায়ে লাগলে মানুষ গোসল করে পরিষ্কার করে নেয়। তো মাটি অপরিচ্ছন্ন বস্তু, নাপাক বস্তু নয়। বরং সে পবিত্রকারী বস্তু, যে অন্যকে পবিত্র করতে পারে। পানি না পাওয়া গেলে তা দ্বারা তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে। অতএব, মাটি হল পানির স্থলাভিষিক্ত। মোটকথা, মাটি নিজে পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্র বানাতে পারে। শুধু এতটুকু যে মাটি ময়লা-আবর্জনা ছিল, গায়ে বা কাপড়ে লাগলে ধৌত করার প্রয়োজন হতো।

মানবসৃষ্টির তৃতীয় স্তর

কিন্তু যখন তাকে শুক্রবিন্দুতে রূপান্তর করা হলো, তখন নাপাকে পরিণত হলো। ঘনত্ব ও আবর্জনা হওয়ার সাথে সাথে তাতে নাপাকি সৃষ্টি হলো। আর এমন কঠিন ও শক্ত নাপাক হলো যে, যদি সামান্য এক ফোঁটা বের হয়, তাহলে আপনি কুরআন পড়ার উপযুক্ত থাকবেন না। মসজিদে যেতে পারবেন না। নামায পড়তে পারবেন না। এত পরিমাণ কঠিন নাপাক হয়ে যায়। এজন্য একস্থানে ইরশাদ হয়েছে–

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝

মানুষের দুঃসাহস দেখো যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি এক নাপাক-গান্ধা ফোঁটা থেকে আর সে এখন আমার বিরুদ্ধে ঝগড়াটে দুশমনে পরিণত হয়েছে! *[সূরা ইয়াসীন আয়াত- ৭৭]*

এখন পর্যন্ত মানবসৃষ্টির ময়লা-আবর্জনা ছিল। শুক্রবিন্দু হওয়ার পর নাপাকে পরিণত হলো।

মানবসৃষ্টির চতুর্থ স্তর

তারপর ইরশাদ করেন–

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

তারপর শুক্রবিন্দুকে আমি জমাট রক্ত বানিয়েছি। শুক্রবিন্দুর ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। কেউ-কেউ তাকে পবিত্র বলেছেন। তার নাপাক হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত নন। কিন্তু শুক্র থেকে পরিবর্তন হয়ে যখন রক্ত হলো, তখন রক্ত পাক হওয়ার সম্পর্কে কেউ মত প্রকাশ করেননি। সকল ইমামের মতে রক্ত নাপাক পদার্থ। সুতরাং নাপাকের হুকুম আরো মজবুত হলো। মাটির বৈশিষ্ট্য নাপাক ছিল না। আবর্জনা ছিল। আর শুক্র ময়লা হওয়ার সাথে সাথে নাপাক ছিল। তবে পাক-নাপাকের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ ছিল। আর যখন রক্তে পরিণত হলো, এখন নাপাক হওয়ার ব্যাপারে কারো মতভেদ রইল না।

তারপর রক্তকে গোশ্তপিণ্ডে রূপান্তর করে তাতে হাড় পরিধান করানো হয়। উপরে উল্লেখিত বস্তুর মাঝে কোনো সৌন্দর্য নেই, নেই কোনো পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতা। বাহ্যিক চমকও নেই, মৌলিক সৃষ্টিগত চমকও নেই যে, তা থেকে কোনো জ্যোতি প্রকাশ পাবে।

এইগুলো হলো মানবজাতির জন্মগত মাদ্দা।

মানবসৃষ্টির প্রথম অন্ধকার ঘাঁটি

তারপর উল্লিখিত উপকারণসহ কেমন স্থানে সৃষ্টি করা হয়েছে? যেখানে সৃষ্টির কাজ করা হয়েছে, সেটিও গান্ধা-পঁচা স্থান। সে স্থানটি গন্ধযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে অন্ধকারও বটে।

কুরআনুল কারীমের একস্থানে ইরশাদ হয়েছে–

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ

তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মায়ের গর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে। *[সূরা যুমার ৬]*

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে। কোথায় সৃষ্টি করেছেন? فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ তিন অন্ধকার কুঠরিতে তিনটি অন্ধকারের ভিতরে।

সর্বপ্রথম অন্ধকার রুম মায়ের পেট, যার মধ্যে চাঁদ-সূর্যের কোনো প্রকার আলো পৌঁছে না। আবার ভিতর হতেও কোনো আলো বের হয় না।

মানুষ সৃষ্টির দ্বিতীয় অন্ধকার রুম

মায়ের পেটের ভিতর আরেকটি রুম আছে। তাকে রেহেম বলে, যার মধ্যে সন্তান সৃষ্টি হয়। তাতে আরো অধিক অন্ধকার। মায়ের পেটে তো সম্ভব ছিল নলকূপের মাধ্যমে কোনো বস্তু পৌঁছে যাবে। কিন্তু মায়ের রেহেম তো তার পেটের ভিতর একটি বন্ধ কুঠরি। সেখানে না বাহির থেকে কোনো জিনিস পৌঁছতে পারবে, না ভিতর থেকে কোনো জিনিস বাইরে আসবে।

মানবসৃষ্টির তৃতীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান

তারপর তার ভিতর আরো একটি কামরা আছে। আর তা ঐ পাতলা-আবরণ, যার ভিতর সন্তান মোড়ানো থাকে। ধাত্রীরা তা কেটে বাচ্চা বের করে। অতএব মায়ের পেট একটি অন্ধকার রুম। তার রেহেম আরো অন্ধকার কামরা। তার পাতলা আবরণ আরো অন্ধকার কামরা। এ তিন অন্ধকারের ভিতর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেন।

মর্যাদা না লাঞ্ছনা; ইজ্জত না বেইজ্জত

তিনটি অন্ধকার বেষ্টনিতে মানুষকে লালন-পালন করা হয়, সৃষ্টি করা হয়। এই তিন অন্ধকার কামরায় নাপাকি ছাড়া আর কী থাকতে পারে? হায়েজের রক্ত খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়, পচা-গান্ধা পানিতে মানুষ সাঁতার কাটে। তো মানুষের জন্মের উপকরণও নাপাক, স্থানও নাপাক। যে রাস্তা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে, তাও নাপাক। যে রাস্তায় বেরিয়ে আসে তাও নাপাক। তাই যাদের জন্মের রাস্তা গান্ধা, উপকরণ গান্ধা, স্থান গান্ধা মূল উপকরণও গান্ধা, তারা ঐ পচা-গান্ধা জিনিস ও স্থানসমূহে জন্ম লাভ করে, তাদের কী ইজ্জত-সম্মান হতে আপনারা অনুমান করে দেখুন। ইজ্জত-সম্মান তো দূরের কথা যদি ঐ মাদ্দাগুলোর প্রতি খেয়াল করা হয়, তাহলে লজ্জায় তার মাথা নত হয়ে যাওয়ার কথা। এই নাপাকির সমষ্টিতে যারা জন্মলাভ করেছে, তাদের জন্য তো কোনো গর্ব-অহংকার থাকতে পারে না। তাদের জন্য সুযোগ থাকতে পারে না বড়লোকি দেখানোর। মানুষ কি গান্ধা বস্তু নিয়ে অহংকার করতে পারে? তারা নাপাকি বস্তু নিয়ে অহংকার করতে পারে? তারা নাপাকি বস্তু নিয়ে বাহাদুরি করতে পারে?

মানুষ ধোঁকায় পড়েছে

কোনো এক বুযুর্গ রাস্তা দিয়ে চলছিলেন। এক সম্পদশালী ব্যক্তি, যাকে দুনিয়ার পরিভাষায় ধনী বলা হয় সে নিজের বড়ত্বের কারণে অহংকার প্রদর্শন করে চলছিল, বুক টান করে চেহারা উপরে উঠিয়ে হাঁটার স্বাভাবিক নিয়ম পরিবর্তন করে। অর্থাৎ অহংকারীর মতো হাঁটছিল।

অপরদিক থেকে কোনো আল্লাহওয়ালা লোক– যিনি সাদাসিধা জীবনধারী দরবেশ ছিলেন– আসছিলেন। তিনি তার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তাকে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, হে প্রিয় ভাই! আল্লাহর জমিনে এমন অহংকার করে চলো না।

لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না।

আল্লাহর জমিনে অহংকারীর ন্যায় চলো না, দম্ভ করে চলো না। তুমি তো অহংকার ও দম্ভভরে চলছ।

إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

নিশ্চয় তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনও বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনও পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না। *[সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত- ৩৭]*

তুমি যে স্থানে আছ সেখানেই থাকবে তুমি শুধু-শুধু কেন কষ্ট করছ? এমনটা মানুষের কাজ নয়। দরবেশের উপদেশ লোকটির অনেক অপছন্দ হলো যে, দুনিয়াতে এমন কেউ কি আছে, যে আমার দোষ ধরবে, আমি তো সবচেয়ে বড়। লোকটি অহংকারবলল, হে জাহেল দরবেশ! তুমি জান না আমি কে এবং তুমি আমার সামনে এমন গোস্তাখী কর্ম করছ! তুমি চিন আমি কে?

এই দরবেশ সাহেবও একজন ভবঘুরে টাইপের মানুষ ছিলেন। তিনি সম্পদেও আত্মভোলা ছিলেন, নিজের ব্যাপারেও আত্মহারা ছিলেন। জ্ঞানহারা ছিলেন।

মানুষের আসল পরিচয়

তিনি আগে বেড়ে বললেন, জি, আমি জানি, তুমি কে? যদি অনুমতি দাও, তাহলে বলব তুমি কে? লোকটি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল! উনি তো আজব দরবেশ দেখছি। আপনি বলেন তো আমি তাহলে কে।

দরবেশ বলল, আমি জানি তুমি কে? শুনে নাও তোমার আসল পরিচয়-

اَوَّلُكَ نُطْفَةٌ قَذِرَةٌ وَاٰخِرُكَ جِيْفَةٌ مَذِرَةٌ وَاَنْتَ بَيْنَ ذٰلِكَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ

তোমার জন্মের শুরুটা হয়েছে এক ফোঁটা দুর্গন্ধযুক্ত শুক্রবিন্দু দ্বারা, যা শরীর থেকে বের হলে গোসল ফরজ হয়, কাপড়ে লাগলে তা ধৌত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর যার শরীর থেকে বের হয় তার নামায-তেলাওয়াত বন্ধ হয়ে যায়। এটা তোমার জন্মের শুরু। আর শেষ হলো কবরে পৌঁছে তোমার বডি পচে-গলে পানি হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। তাতে পোকা পড়বে। তা নাপাকে পরিণত হবে।

এ হলো তোমার শেষ অবস্থা। আর মধ্যবর্তী অবস্থা হলো, তোমার বিচরণ-ভ্রমণ গান্ধা, পেটে নাপাক ভরপুর। তাতে আছে পেশাব, আছে পায়খানা এবং প্রবাহিত রক্ত। সবই নাপাক। তো তোমার শুরুটা গান্ধা, শেষটা গান্ধা আর মধ্যবর্তী অবস্থা ডাবল গান্ধা। এ হলো তোমার আসল পরিচয়। বলো, তুমি কি তোমার আসল পরিচয় পেয়েছ যে, তুমি কে?

লোকটার চোখ খুলে গেল। উপদেশদাতা ছিলেন একজন সত্যিকার মানুষ, যারা অন্তর থেকে কথা বলে। তাদের কথার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সে বলল-

جزاك الله چشم باز کردی:: مرا باجاں ہمہ باز کردی

আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন, আপনি আমার অন্তরদৃষ্টি খুলে দিয়েছেন। ইতঃপূর্বে আমি জানতাম না, আমার হাকিকত এই।

বাস্তবতা হলো, মানুষের নিজের জন্মগত মাদ্দা হলো পচা-গান্ধা ও নাপাক বস্তু। তারা যদি তাদের মাদ্দার প্রতি খেয়াল করে, তাহলে গর্বভরে চেহারা উঠাতে পারে না, চোখ উপরে উঠাতে পারে না। তারা লজ্জায় চোখ নিচু করে রাখবে।

সাত্তারুল উয়ুব আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ

দোষ-ত্রুটি গোপনকারী আল্লাহর তায়ালার ফজল, করম ও ইহসান যে, তিনি আমাদের পচা-গান্ধা ও দুর্গন্ধযুক্ত জিনিসগুলো গোপন করে দিয়েছেন এবং অত্যন্ত সুন্দর চামড়ার আবরণ দ্বারা আবৃত করে দিয়েছেন, যা দ্বারা তিনি ঐগুলোকে আড়াল করেছেন, ঢেকে দিয়েছেন। আল্লাহ না করুন যদি খুলে যায়, তাহলে মানুষকে মানুষই ঘৃণা করবে।

আল্লাহ না করুন, ঐ দুর্গন্ধের বাষ্প যদি পেট থেকে বের হয় এবং মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে, তাহলে মানুষ মানুষকে ভয় করতে থাকে। তার পার্শ্বে দাঁড়াতে ঘৃণা আসে। পেটে বাষ্প হয়, যা দুর্গন্ধে বায়ুর সূরতে বের হয়। তা কখনও উচ্চশব্দে বের হয়ে গেলে মানুষ হতে মানুষ ঘাবড়ে যায়। ভয় পায়। অতএব আল্লাহ তায়ালার ফজল ও অনুগ্রহ যে, তিনি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুগুলো গোপন করেছেন এবং তাদের উপর সুন্দর আবরণ ঢেলে দিয়েছেন।

মানুষের কোনো সুযোগ নেই যে, তারা গর্ব করবে, বড়ত্ব প্রদর্শন করবে বা দম্বভরে অহংকারীর চলন চলবে। কেমন যেন এখানে বলা হয়েছ, মানুষ নিজের সৃষ্টিগতভাবে গান্ধা-পচা প্রমাণিত হয়েছে। এখন যদি তার মধ্যে কোনো ভালো গুণ ঢেলে দেন, তাহলে তা আল্লাহর তায়ালার অনুগ্রহ। কিন্তু মানুষের সত্তার কোনো কৃতিত্ব নেই। মানুষের সত্তা এই, যা আমি ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি।

সুস্পষ্ট কথা হলো, ঐ সকল মাদ্দা উপকরণ থাকাবস্থায় না পারে মানুষ মানব সীরাত হতে, না তাদের কোনো প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযিলত অর্জন হতে পারে। সর্বশেষ কথা ঐ সকল মাদ্দার কারণে তাদের মধ্যে কোনো প্রকার সৌন্দর্য থাকতে পারে না।

বাহ্যিক সৌন্দের্যের হাকিকত

এখন আপনারা বলবেন, এগুলো তো গোপন জিনিস। কিন্তু তাদের উপরাংশ তো সুন্দর হয়ে থাকে, অন্য কোনো প্রাণীকে তো এমন সৌন্দর্য প্রদান করা হয়নি, যা মানবসমাজকে দেওয়া হয়েছি। তাহলে মানুষ তাদের সুন্দর আকৃতির কারণে উত্তম ও মর্যাদাবান। আর তা যতটুকু দাবি করে তাও তো কম নয়।

আমি বলি, এই আকৃতি আসলে একটি অস্থায়ী জিনিস, যা অতি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। তিন দিন জ্বর থাকলে সারা আকৃতি-গঠন বিকৃত হয়ে যায়। শরীরের গঠন খারাপ ও পরিবর্তন হয়ে যায়। ফলে না গায়ের রং অবশিষ্ট থাকে, না চর্বি অবশিষ্ট থাকে। যদি মানুষের মর্যাদার অর্থ এই হয় যে সে সুন্দর, তাহলে তিন দিন জ্বর থাকার পর তার মর্যাদা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তখন সে হীন ও নীচু হয়ে যায়।

প্রথমে আশরাফুল মাখলুকাত ছিল আর আড়াই দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আরযালুল মাখলুকাত হয়ে গেল। তাহলে এমন মর্যাদার কী প্রয়োজন? এই আকৃতির সৌন্দর্য ও লাবণ্যতার কী প্রয়োজন? এটি একটি অস্থায়ী বস্তু। জ্বর এলে নিঃশেষ হয়ে যায়।

মানুষ কোনো চিন্তায় লিপ্ত হলেও শরীরের সূরত পাল্টে যায়। সুতরাং যে জিনিসকে অস্থায়ী বস্তু নষ্ট করে দেয়, তা মর্যাদার ভিত্তি হতে পারে না। মর্যাদা তো এমন জিনিসের নাম, যা মূল উপকরণের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। আর এখানে উপকরণ হলো গান্ধা, তাহলে মর্যাদা কোথা থেকে আসবে?

যদি মেনে নেওয়া হয়, কোনো প্রকার অসুস্থতা আসবে না; কিন্তু বার্ধক্য কোথায় যাবে? বার্ধক্য চলে এলে সৌন্দর্য ও লাবণ্যময় আকৃতি ভয়ানক দেখা যায়। চেহারা কুলক্ষণ হয়ে যায়। আকৃতি ও গঠন বিকৃত হয়ে পড়ে, পরিবর্তন হয়ে যায়। আর যদি মেনে নেওয়া হয় যে, বার্ধক্যও আসবে ন, তবে মৃত্যু তো সর্বাবস্থায় আসবেই। সে তো আকৃতিকে একেবারেই নিঃশেষ করে দেবে।

আকলের বিভ্রান্তি

এটি বুদ্ধি ও আকলের গোমরাহি যে, মানুষ এমন রূপের কারণে অহংকার করে, যা পরিবর্তনযোগ্য। আমরা সর্বদা এরূপ লাবণ্যকে সজ্জিতকরণে ব্যস্ত থাকি। চিরুনি, চুলের খোঁপা, আরো যত প্রসাধনী হতে পারে ব্যবহার করি। তাকে আপনি কতক্ষণ সাজিয়ে রাখবেন, যা পরিবর্তনের জন্য সৃষ্টি হয়েছে এবং যে জিনিসকে প্রতিটি জিনিসে পরিবর্তন করে দেয়? আপনি তাকে কতক্ষণ পরিপাটি করবেন? অসুস্থতা তাকে বিকৃত করে, বাধ্যক্য বিকৃত করে, চিন্তা-কষ্ট তাকে বিকৃত করে, লাবণ্য গলিয়ে দেয়, মরণ তার গঠন বিকৃত করে দেয়। সুতরাং আপনি অন্যায়ভাবে তাকে সজ্জিত ও পরিপাটি করার চেষ্টা করছেন। যে জিনিস পরির্বনের জন্য তৈরি হয়েছে, তাকে সাজানো কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মানুষ যদি সজ্জিত ও পরিপাটি করার চেষ্টা করে, তাহলে নিজের সীরাতকে সাজানোর জন্য চেষ্টা করুক– সূরতকে নয়। অনুসরণযোগ্য জিনিস হলো মানুষের সীরাত– সূরত নয়। সূরত বা আকৃতিকে যতই সাজান, পরিপাটি করেন এবং সুসজ্জিত করেন, পরিশেষে তা ধ্বংস হবেই। তার সৌন্দর্যও ধ্বংস হবে। যদি অনুসরণযোগ্য কোনো জিনিস থাকে, তাহলো মানুষের সীরাত।

নাপাকের প্রেমিক

কোনো এক বুযুর্গের ঘটনা বর্ণিত আছে। মানুষ তাঁর খানকায় নিজের তারবিয়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা জিকির করার জন্য একত্রিত হত আর শায়েখ লোকদের তারবিয়াত দিতেন। ঐ শায়েখের খানকার নিয়ম ছিল, সেখানে বিশ-বিশজন এবং পঞ্চাশ-পঞ্চাশজন মুরিদ ও মুতাওয়াসিলীন (নৈকট্য লাভের

আশাবাদীরা) জমায়েত হত। তাদের খাবার শায়েখের বাসা হতে আসত। এক দাসী উক্ত কাজের জন্য নির্ধারিত ছিল। সে খাবার বণ্টন করত। একজন নতুন মুরিদ এসে বাইয়াত হল। তার উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ আল্লাহ করে নিজের অবস্থার ইসলাহ করবেন। দাসী যখন খাবার নিয়ে আসত, ঘটনাক্রমে সে কিছুটা সুন্দরী ছিল। ঐ মুরিদ সাহেবের চোখে সে ভালো লেগে যায়। সে তার উপর কিছুটা আসক্ত হয়ে পড়ে। এখন অবস্থা হলো যে, যখন সে খাবার নিয়ে আসত, তখন বসে-বসে তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখত। সে না এলে তার অপেক্ষায় থাকত, কখন আসবে। সে তার অপেক্ষায় বসে থাকত। যখন আসত, তখন সজাগ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত।

ঘটনাক্রমে শায়খ তাদের সংবাদ জেনে ফেললেন। আল্লাহওয়ালারা চিকিৎসা করেন, তা যবান দ্বারা হয় না বরং আমল দ্বারা হয়, যাতে রোগের মূলোৎপাটন হয়ে যায়। শায়েখ চাচ্ছিলেন, তার রোগ-ব্যাধি দূরীভত হোক। যদি তিনি মুখে বলে দিতেন, বুঝিয়ে দিতেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তার প্রতিক্রিয়া হতো; কিন্তু যেহেতু তবিয়ত তার প্রতি আকৃষ্ট ছিল, তাই স্বভাবকে পরিবর্তন করা দূরুহ ব্যাপার। তাই তিনি চাইলেন, তার তবিয়তকে বদলিয়ে দিতে, যাতে তা একেবারেই খতম হয়ে যায়।

তো তিনি একটা আশ্চর্যজনক পন্থা অবলম্বন করলেন। দাসীকে ডাইরিয়া হওয়ার ঔষধ সেবন করালেন। ফলে তার অনেক দাস্ত হলো। তিনি তার জন্য একটা নির্ধারিত স্থান নির্দিষ্ট করে দেন, তুমি সেখানে গিয়ে পায়খানা করো। মোটকথা, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক দাস্ত করল। সন্ধ্যায় তার অবস্থা এমন হলো যে, না আছে তার শরীরের রং, না আছে লাবণ্য। হাড়ের সাথে চামড়া লেগে গেছে। তার চেহারার দিকে তাকালে ভয়-ভয় লাগে। তার চেহারার আকৃতি ভয়ানক হয়ে গেছে।

তারপর শায়েখ তাকে আদেশ করলেন, খাবার নিয়ে ঐ মুরিদের নিকট যাও এবং সে যা কিছু বলে তা আমাকে জানাবে, অবগত করবে। সেদিন ঐ বেচারী খাবার নিয়ে পৌঁছল। তার অবস্থা এমন হলো যে, দম নাকের গোড়ায় এসে গেছে। তার পা থরথর করে কাঁপছে। দুর্বলতার কারণে চলতে পারছে না। আবার মুখমণ্ডলের আকৃতিও ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। যে মুরিদ প্রতিদিন তার অপেক্ষায় থাকত, আজ যখন সে এল তখন তার অবস্থা দেখে তার মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হলো। ফলে তার দিকে তাকানো তো দূরের কথা চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে বলল, খানা রেখে দাও এবং তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাও।

বেচারী খাবার রেখে চলে গেল এবং শায়েশের নিকট এসে জানাল, আজ সে আমার দিকে তাকানোর পরিবর্তে আমাকে ঘৃণা করল আর বলল, এখান থেকে চলে যাও, দূর হয়ে যাও। আমি চলে এলাম। শায়েখ বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্ চিকিৎসা হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও চিকিৎসা পুরা হয়নি। একটা অংশ অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

শায়েখ নিজে ঐ মুরিদের নিকট গেলেন এবং বললেন, একটু আমার সাথে আস। বলেই ঐ বাথরুম যেখানে বাদী তার দাস্তর ময়লা একত্রিত করেছিল, সেখানে তাকে নিয়ে গেলেন এবং তাকে উদ্দেশ করে বললেন, এই হলো তোমার প্রেমিকা; এই নাপাককে খুব গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে নিজ রুমের স্বযত্নে রেখে দাও। কারণ, এগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত বাদীর পেটে ছিল, ততক্ষণ তাকে মহব্বত করেছ। যখন তা বের হয়ে গেছে, তখন সে ঘৃণার পাত্র হয়ে গেছে। এতে প্রতীয়মান হলো, তুমি বাদীকে মহব্বত করনি বরং তার এই দুর্গন্ধ ময়লাকে মহব্বত করতে। তাই এগুলো উঠিয়ে নিয়ে যাও; এ তো তোমার প্রেমিকা।

আসলে এখানে শায়েখ বোঝাতে চেয়েছেন, রূপ-লাবণ্যের ইশ্‌ক বাস্তবে দুর্গন্ধের ইশ্‌ক বই নয়।

সীরাতের মহব্বত

আসল ইশ্‌ক হলো সীরাতের ইশ্‌ক, যা অত্যন্ত মজবুত ও পোক্ত ইশ্‌ক। আর তা ঐ মহব্বত, যা করার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। আজ আমরা ইমাম আবূ হানিফা রহ. কে ইমাম শাফেয়ী রহ. কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. কে ইমাম বোখারী রহ. কে ইমাম তিরমিযীকে, হযরত জুনায়েদ বোগদাদী রহ. কে হযরত শিবলী রহ. কে এবং সমস্ত আল্লাহর ওয়ালীদেরকে মহব্বত করি আর তাদের মহব্বতকে ঈমানের অংশ জ্ঞান করি। তাঁদের সাথে মহব্বতকে নিজের নাজাতের উছিলা মনে করি। তাঁদের প্রতি এ মহব্বত কি তাঁদের রূপের কারণে? আমরা তো আজ পর্যন্ত তাদের রূপ-লাবণ্য দেখিনি। তাহলে এ মহব্বত কিসের? অবশ্যই তাঁদের সীরাত ও কামালাতের মহব্বত আর এত মজবুত মহব্বত যে, আজ পর্যন্ত আমরা তাদের সূরত দেখিনি; কিন্তু অন্তরে বিদ্যমান আছেন এবং এত কঠিন মহব্বত যে, কেউ যদি তাঁদের শানে সামান্য বেয়াদবি করে, তাহলে আমরা তার মুখ ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যাই। সহ্য করবে পারি না। এটি অবশ্যই সীরাতের মহব্বত, তাদের সূরত ও রূপ-লাবণ্যের মহব্বত নয়।

সীরাতের নেতৃত্ব

হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ., হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ.– যিনি একজন জালিলুল কদর তাবেয়ী ছিলেন– সম্পর্কে বলেন–

مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ

আমি আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. থেকে বড় আলেম এবং উত্তম ব্যক্তি আর দেখিনি।

অর্থাৎ আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. হলেন নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতো ব্যক্তিত্ব যাঁর প্রশংসা করেছেন। তাহলে পরিমাপ করে দেখুন, তিনি কত উঁচু মাপের ব্যক্তিত্ব। সুতরাং হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সাক্ষ্য অনুযায়ী হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. হলেন যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

হযরত আবূ রাবাহ একজন গোলাম ছিলেন। হাবশা দেশের অধিবাসী ছিলেন। গায়ের রং ছিল গাঢ় কালো। ঠোঁটদ্বয় ছিল মোটা-মোটা। রূপের মধ্যে কোনো প্রকার লাবণ্য ছিল না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, আমি তার চেয়ে উত্তম মানুষ পৃথিবীতে দেখিনি। এই উত্তমতা সূরত-রূপের কারণে ছিল না; বরং সীরাতের কারণে ছিল। ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর বর্ণনা করেছিলেন। আমাদের সামনে হযরত বেলাল হাবশীর নাম উচ্চারিত হলে আমরা রা. বলে তাঁর বিশ্বাস ও দীনদারীর আবেদন হিসেবে ঘাড় নিচু করি। অথচ তাঁর গায়ের রং ছিল গাঢ় কালো। ঠোঁটগুলো ছিল মোটা-মোটা, যেমনটি একজন হাবশীর হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, হযরত উমর ফারুক রা. তাঁকে উপাধি লাগিয়ে বলতেন يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا 'বেলাল আমাদের সর্দার এবং আমাদের মাওলা।' হযরত বেলালের কোথায় সর্দারী ও মালিকত্ব ছিল? অতএব তা সূরতের সর্দারী ছিল না; বরং সীরাতের সর্দারী ছিল।

রূপ-লাবণ্য ফেতনার কারণ আর সীরাত মুক্তির কারণ

চিন্তা ও গবেষণা করলে দেখা যায়, ফেতনায় লিপ্তকারী বস্তু মানুষের রূপ। সিরাত ফেতনায় লিপ্ত করে না।

হযরত ইউসুফ আ.-এর সূরত ও তাঁর রূপ-সৌন্দর্যের ব্যাপারে আপনার কথা থাকতে পারে না। কারণ, স্বয়ং কুরআনুল কারীম তার সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

তেমনিভাবে হাদিসে নববীও তাঁর সৌন্দর্য ও রূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে। বলা হয়েছে, যখন আল্লাহর তায়ালা সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন, তখন অর্ধেক সৌন্দর্য দুনিয়াকে বণ্টন করে দিলেন আর অবশিষ্ট অর্ধেক সৌন্দর্য একা হযরত ইউসুফ আ. কে দান করলেন।

এমন যবরদস্ত সুন্দর ব্যক্তিত্ব, যাঁর ব্যাপারে কুরআন ও হাদিস সাক্ষ্য দিয়েছে, কিন্তু তিনি যত জায়গায় বিপদ ও ফেতনায় পড়েছেন, তা সবই সূরত ও রূপ করেছে। কিনানের কূপে পড়তে হয়েছে রূপের কারণে। মিশরের বাজারে গোলাম হিসেবে বিক্রি হলেন রূপের কারণে। মিশরের জেলখানায় বন্দী হলেন রূপের কারণে। সুন্দর রূপই তাঁকে প্রত্যেক স্থানে মসিবতে ফেলল। কিন্তু তিনি যখন মিশরের বাদশা হলেন এবং রাজত্ব দাবি করলেন, তখন বললেন–

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ •

ইউসুফ বলল, আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন, আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান। *[সূরা ইউসুফ আয়াত- ৫৫]*

অর্থাৎ আমাকে অর্থমন্ত্রণালয় প্রদান করুন, আমি দেশের নেযান-শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে পারব। তিনি দলিল হিসেবে একথা বলেননি যে, انى حسين جميل আমি অনেক সুন্দর; তাই দেশ চালাতে পারব। বরং তিনি বলেছেন- انى حفيظ عليم আমার মধ্যে দেশ দেখা-শুনার মাদ্দা রয়েছে, আমি দেশ পরিচালনা করতে পারব। তাই যখন বাদশাহী পেলেন, তখন তাঁর সৌন্দর্য কাজে আসেনি, কাজে এসেছে সুন্দর সীরাত আর যখন মসিবতে পড়েছেন, তখন সৌন্দর্য ফেলেছে- সীরাত ফেলেনি।

আভিজাত্যের মাপকাঠি

মানুষ বিপদে পড়লে রূপের কারণেই পড়ে। সীরাতের কারণে বিপদে পড়ে না। সীরাত তো মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধিকারক বস্তু। অতএব মানুষের আভিজাত্যের কারণ না হতে পারে তার জন্ম উপকরণ, না হতে পারে তার রূপ আর সুন্দর পোশাক। পোশাক তো সূরতের চেয়েও একটা অতিরিক্ত বস্তু। যখন মানুষের মূল উপকরণে কোনো কামাল নেই, তার সূরতে কোনো বিশেষ কামাল নেই। আরো যা আছে সবই তো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মতো বস্তু। আর পোশাক তা তো আরো অস্থায়ী। কেউ যদি পোশাকের অহংকার প্রদর্শন করে এবং তার আভিজাত্য বর্ণনা করে, তাহলে তার চেয়ে বড় আর কোনো আহমক নেই।

কেননা, পোশাককে তো সে নিজেই রাতে খুলে রেখে দেয়। সুতরাং যে জিনিস দিনের বেলা ভদ্রতার প্রতীক হয় আর রাতের বেলা তুচ্ছ সাজে, সেটি কেমন আভিজাত্য হলো যে, তাকে মানুষ নিজ হাতে নষ্ট করে?

যারা নিজেদের শরাফতকে পোশাক দ্বারা প্রমাণ করে, তারা শরাফত কাকে বলে বোঝেই না। মোটকথা, মানুষের শরাফতের সম্পর্ক পোশাকের সাথে নয়।

কামালের (পূর্ণতার) মাপকাঠি

সাকরাত নামে এক ব্যক্তির ঘটনা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি একজন বড় মাপের ইউনানী হাকীম ছিলেন। তিনি একজন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন। তাঁকে ডাক্তারী বিদ্যার আবিষ্কারক করা হত। তিনি অনেক বড়-বড় গবেষণা ও পরীক্ষা চালিয়েছেন। তিনি দিন-রাত সর্বদা জঙ্গলে-পাহাড়ে গাছ-গাছড়া ও শিকড়ের পরীক্ষা করে বেপরোয়া ঘুরে বেড়াতেন। তেমনিভাবে তিনি শিকড় ও গাছ-গাছড়ার বৈশিষ্ট্য কিতাবসমূহে আবিষ্কার ও সন্নিবেশিত করেছেন। একদিন জঙ্গলে গাছ-গাছড়ার পরীক্ষা করতে সারা দিন লেগে যায়। তিনি সন্ধ্যার সময় শহরে ফিরে আসেন। তিনি ছিলেন অনেক ক্লান্ত ও অবসন্ন। তিনি কোনো এক রাস্তার পাশে বেঞ্চে বসে ঘুমিয়ে গেলেন। তার পাগুলো রাস্তার দিকে ঝুলে পড়ছিল। ঘটনাক্রমে তখনকার রাজার গাড়ির বহর বের হলো। ঘোষক ও পাহারাদাররা রাস্তা দাও, দূরে সরে যাও বলে ঘোষণা দিতে দিতে এগুচ্ছিল। কিন্তু সাকরাত বেচারা অনেক দিনের ক্লান্ত ছিলেন। তার কানে তাদের আওয়াজ পৌঁছেনি। তিনি আগের হালতেই শুয়ে আছেন।

এদিকে বাদশাহর গাড়িবহর নিকটে এসে গেল। বাদশা এই দৃশ্য দেখে অনেক রাগান্বিত হলেন যে, আমি এখান দিয়ে যাচ্ছি আর এই লোকটি রাস্তার দিকে পা ছড়িয়ে এভাবে শুয়ে আছে! বাদশাহ রাগ হয়ে বাহন থেকে নেমে তাকে পা দ্বারা লাথি মারলেন এবং বললেন, হে আহমক! তুমি উঠলে না? তিনি চোখ ঘর্ষণ করতে করতে ওঠে বসলেন এবং বাদশাহকে গভীর নজরে দেখতে লাগলেন। বাদশাহ বললেন, হে আহমক! তুমি জান না আমি কে? তিনি চোখ মলতে-মলতে বললেন, হ্যাঁ জানি! আমি তো এ নিয়ে গবেষণা করছি যে, আপনি কে? আমি এখন পর্যন্ত এই ফলাফল লাভ করেছি যে, মনে হয় আপনি বন-জঙ্গলের কোনো হিংস্র প্রাণী। কারণ, হিংস্রপ্রাণীর স্বভাব হলো তারা ভূমিতে পা মেরে ধূলি-বালি উড়িয়ে চলে। আপনি যখন আমাকে পা দ্বারা ঠোকর মারেন, তখন আমি অনুভব করলাম, জঙ্গল হতে কোনো হিংস্রপ্রাণী এসেছে।

বাদশার রাগ আরো বৃদ্ধি পেল। বলতে লাগলেন, হে আমহক, মূর্খ! তুমি জান না, আমি বর্তমান সময়ের বাদশাহ? এত পরিমাণ কেল্লা আমার অধীনে, শাহী তাঁবু আমার দখলে, শাহী মুকুট আমার মাথায়। এত এত ধনভাণ্ডারের মালিক আমি। তিনি তার সকল নেয়ামতের বর্ণনা দিলেন।

সাক্রাত বললেন, হে আহমাক, বেয়াকুফ। তুমি তোমার বড়ত্ব ও বুযুর্গী বর্ণনা করতে গিয়ে যা পেশ করেছ, কেল্লার কথা, ধন-সম্পদ, শাহী মুকুট, শাহী তাবু, ইত্যাদির কথা বললে এসব জিনিস তো তোমার বাইরের বস্তু, বাহ্যিক বস্তু। তোমার ভিতরে কী পূর্ণতা আছে, যার উপর তুমি অহংকার করবে? তুমি যা বলেছ, তা সবই বাইরের বস্তু। মুকুট যদি ভাল হয় তাহলে তা সত্তাগত ভালো, তুমি তা থেকে কী মর্যাদ লাভ করলে? তাঁবু যদি সুন্দর মনে হয়, তাহলে তা কাপড়ের কারণে, তোমার সত্তার এতে সৌন্দর্য রয়েছে? তুমি তোমার সৌন্দর্য বর্ণনা করার জন্য সবগুলো বাইরের জিনিসের বর্ণনা দিয়েছ। এগুলোর মধ্যে তোমার সত্তার তো কোনো দখল নেই। এতে প্রতীয়মান হয়, তোমার শরাফত শুধু বাইরে, তোমার ভিতরে কোনো শরাফত বা কামাল নেই।

এ সম্পর্কে আরেকটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো বিখ্যাত নাহুবিদ আল্লামা সিবওয়াই রহ.-এর ছাত্রজীবনের ঘটনা। তিনি ছাত্রজীবনে অনেক স্মরণীয় পাঠ ও ঘটনা সংগ্রহ করে রাখতেন। ওস্তাদদের নিকট শ্রবণ করা ব্যাখ্যা এবং নিজের অধ্যয়ন থেকে অর্জন করা স্মরণীয় ও জরুরি কিছু প্রশ্ন ইত্যাদি। মোটকথা, অনেক কাগজের একটা পুলিন্দা লিখে সাথে রাখতেন এবং তা থেকে মুখস্থ করতেন। যখন আহার করার সময় হলো তখন তিনি ঐ পুলিন্দা ভাঁজ করে দস্তরখানায় রেখে দেন এবং তাতে কিছু রুটিও ছিল। ঘটনাক্রমে একটা কুকুর এসে দস্তরখানাটি নিয়ে চলে গেল।

হযরত সীবওয়াই রহ. তার পিছু-পিছু দৌড়াতে লাগলেন। তিনি তাকে ধরতে পারছেন না আর কুকুরটাও এত কমবখত যে, সে শুধু উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতেছিল-পিছনে ফিরে দেখছিল না। তিনি কুত্তার পিছনে দৌড়াচ্ছিলেন। মানুষ দেখে বলল, লোকটি তো বড় আহমক, হয়তো একটা রুটি বা দুটা রুটি কুকুর নিয়ে গেছে, তাকে যেতে দিক। কিন্তু সে লাঠি হাতে তার পিছু-পিছু ছুটছে। সে নিজের যে শক্তি ব্যয় করছে, এই কটা রুটি আহার করলে উক্ত শক্তি ফিরে আসবে না, যা সে কুত্তার পিছনে ব্যয় করছে। মানুষ বলতে লাগল, লোকটি তো বাস্তবেই বেব্রকুফ। তখন তিনি বললেন–

বেকুফ তো তোমরা। আমি রুটির জন্য দৌড়াচ্ছি না। ঐ দস্তরখানে আমার সারাজীবনের ইলম ছিল, যা কুত্তাটা নিয়ে চলে যাচ্ছিল। তাহলে আমি পূর্বের

জাহেলই থেকে যেতাম। লোকেরা বলল, হে আহমক! এ আবার কেমন ইলম, যা কুকুর নিয়ে যায়।

তো বাদশা সত্যিকারে নিজের ফযিলত ও শরাফত শাহী মুকুট ও শাহী তাঁবুকে মনে করে বসে আছেন। অথচ এগুলো এমন বস্তু যে, যদি কোনো দুশমন বা ডাকাতও লুটেরা আসে, তাহলে মুকুট ছিনিয়ে নিবে, কেল্লা নিয়ে নিবে, শাহী তাঁবু নিয়ে নিবে। ফলে বাদশাহর শরাফত নিঃশেষ হয়ে যাবে। আসলে শরাফত বলা হয় এমন বস্তুকে যে, মানুষ ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করলেও কামাল থাকে এবং জমিনের নিচে চলে গেলেও কামাল থাকে। কামাল তাকেই বলে। এটি প্রকৃত কামাল নয় যে, এখানে কামাল আছে; কিন্তু ওখানে গেলে কামাল থাকে না। সত্যিকারের কামাল ব্যক্তির সত্তার মধ্যে থাকতে হয় তা তার ভিতরে মূল উপকরণ হতে হয়।

মেহনতের কেন্দ্রস্থল

হযরত মাওলানা রুমী রহ. একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সম্ভাবনা আছে ঘটনাটি বাস্তবে ঘটেছিল– কাল্পনিক নয়। এক সময় রুম ও চায়নাদের মধ্যে ঝগড়া হলো। তারা পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হলো। চায়নারা বলল, আমরা বেশি সয়ংসম্পূর্ণ আমরা বেশি বিজ্ঞ প্রকৌশলী এবং আমরা বড় হস্তশিল্পী। রুমবাসীরা বলল, আমরা বড় বিজ্ঞ প্রকৌশলী এবং বেশি নিপুণ হস্তশিল্পী। আর আমরা কারিগরি বিদ্যাও বেশি পারদর্শী। এ ব্যাপারে উভয়ের ঝগড়া হলো, উভয়ের নিকট দলিল-প্রমাণও ছিল। তা এক সময় যুদ্ধ বেঁধে থাবার উপক্রম হয়।

অন্য লোকেরা বলল, হে ভাইয়েরা! পরস্পর ঝগড়া-লড়াই করছ কেন? কাউকে তৃতীয় পক্ষ বা বিচারক বানিয়ে নাও। তো বিষয়টি সে যুগের বাদশার নিকট পৌছল যে, তারা পরস্পর এ বিষয়ে ঝগড়া বাঁধাচ্ছে। তাদের উভয়ের দাবি এক। একদল বলছে, আমরা কামালের মালিক, অপর দল দাবি করছে, না; আমরা বেশি। চায়নারা বলল, হিকমত নিপুণতা আমাদের হাতে। রুমীরা বলল, না; নিপুণতা আমাদের হাতে। বাদশা তাদের কথা শ্রবণ করে বললেন, তোমাদের শুধু দাবি দ্বারা কাজ হবে না। তোমরা উভয় জাতি নিজেদের কারিগরি দক্ষতা প্রদর্শন করো। প্রত্যেকের নিপুণতার নমুনা দেখাও। তা দেখে আমি সমাধান দেব কারা বেশি সক্ষমতা লাভ করেছে।

সিদ্ধান্ত হলো, একটা হল নির্মাণ করা হবে এবং তাতে পার্টিশন করে দেওয়া হবে আর ভাগ করে দেওয়ালে পর্দা টাঙ্গিয়ে দেওয়া হবে এবং উভয় সম্প্রদায়কে বলা হবে, তোমরা অর্ধেকের মধ্যে তোমাদের নিপুণতা প্রদর্শন করো আর

অবশিষ্ট অর্ধেকে তারা তাদের হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যা প্রদর্শন করবে। তারপর মধ্যস্থল থেকে পর্দা সরিয়ে আমরা পরিমাপ করব, যাদের প্রকৌশলবিদ্যা ও কারিগরি উন্নত ও পূর্ণতা লাভ করেছে। অতএব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উভয় সম্প্রদায় নিজেদের কারিগরি ও হস্তশিল্পের কর্ম শুরু করে দিল।

চায়নারা ওয়ালে প্লাষ্টার করে তাতে বিভিন্ন ধরনের চিত্র বানাতে শুরু করল। তারা বিভিন্ন ডিজাইনের ফুল ও বৃক্ষ কংকন করল। তারা ওয়ালকে বাগিছায় পরিণত করল। এমন কোনো বৃক্ষ নেই, যা তাতে নেই। এমন কোনো ফুল ও পাতা নেই, যা এখানে অংকন করা হয়নি। পৃথিবীর কোনো প্রকার রং বাকি রাখা হয়নি, যা ওয়ালে লাগানো হয়নি। তারা সমগ্র দেওয়ালটিকে গুলশানে পরিণত করল। দর্শনার্থীদের দৃষ্টি ওয়ালে আটকে যেত, সৌন্দর্যের কারণে দৃষ্টি সরত না।

আর অবশিষ্ট অর্ধাংশে রুমীরা প্লাস্টার করে তাকে দীপ্তিমান বানাতে কাজ শুরু করে, তারা তা ঘষতে থাকে। ঘর্ষণ করতে করতে এমন চমকদার উজ্জ্বল বানাল যে, ওয়াল আয়নার মতো হয়ে যায়। তাতে ছবি দেখা যেত। তারপর আরো ঘর্ষণ করে উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে গ্লাসে পরিণত করল। তারা কোনো নকশা, চিত্র, কোনো বৃক্ষ, কোনো ফুল ইত্যাদি কিছুই বানাল না। বরং শুধু ঘর্ষণ করে গ্লাস বানিয়ে ফেলল। যে তার সামনে দাঁড়াত তার প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠত।

বাদশাহ নির্দেশ দিলেন পর্দার আড়াল সরিয়ে ফেলতে, যাতে পরিমাপ ও যাচাই-বাচাই এবং পর্যবেক্ষণ করা যায়। পর্দার দেওয়াল সরানোর সাথে সাথে চায়নারা যত নকশা-চিত্র নির্মাণ করেছিল, তা সবই অপর সাইডে দেখা যাচ্ছিল। কারণ, রুমীদের ওয়াল আয়নার মতো হয়ে গিয়েছিল। তাদের সকল ফুল রুমীদের দেওয়ালে দেখা যাচ্ছিল।

এখন বাদশাহ হতভম্ব যে, কাপড়ে আঁকা নক্শা এদিকে ঐ বেল্‌বোটা ওদিকেও। যে কালার এদিকে, ঐ কালার ওদিকেও। এখন তিনি এই ভেবে পেরেশান যে, ফয়সালা কী অনুযায়ী দেব এবং কিসের বিপরীত দেব? পরিশেষে রুমীয়দের পক্ষে রায় দিলেন যে, তারা তাদের কারিগরি দক্ষতায় সবচাইতে অগ্রসরতা লাভ করেছে। কেননা, তারা নিজেদের দক্ষতা ও নিপুণতা তো প্রকাশ করেছে, সাথে সাথে অন্যদের কারিগরি বিদ্যাকে ছিনিয়েও নিয়েছেন। এখানে (রুমী) বেল্‌বোটার সাথে সাথে চমকও রয়েছে, আর ওখানে (চীনা) শুধু নকশা-চিত্র কোনো চমক নেই। রুমীরা নিজেদের দক্ষতা-নিপুণতা প্রদর্শন করেছে। সাথে সাথে অন্যদেরটাও ছিনতাই করেছে। তাই তারা যেন ডাবল নিপুণতা প্রদর্শন করেছে, এজন্য তারা অগ্রগামিতা লাভ করেছে।

এই ঘটনা বর্ণনা করে হযরত রুমী রহ. লিখেন, হে প্রিয়! তুমি তোমার আত্মায় চায়নাদের কারিগরি তথা নকশা-চিত্র অংকন করো না যে, সারা দুনিয়ার ফুল, বৃক্ষগুলো দেখতে থাকবে। রুমীয়দের কাজের অনুসরণ করো, নিজের অন্তর ঘষে-মেজে আয়না বানিয়ে ফেলো, যাতে সারা পৃথিবীর কারিগরি-দক্ষতা-নিপুণতা তুমি ঘরে বসে দেখতে পার। তুমি দুনিয়ার নকশা-চিত্র এবং ফুল-পাতা অনুসন্ধান করে কোথায় মসিবতে পড়ে ঘুরছ। তোমার ভিতরে তো সারা পৃথিবী বিদ্যমান যে, সারা পৃথিবীর ফুল-ফল, পাতা তোমার মাঝে আছে। তোমার অন্তরকে ঘর্ষণ করে রুমীদের ন্যায় উজ্জ্বল বানিয়ে নাও। সারা দুনিয়া তো তুমি এখানে বসে দেখতে পাবে।

ستم است اگر ہوست کشد کہ بسیر دو چمن اورآ
تو ز غنچہ کم نہ دمیدۂ درِ دل بکشا بچمن درآ

তোমার ভিতর তো অন্তর রয়েছে; তার নিচ দিয়ে একটা দরজা খুলে দিলে সারা পৃথিবী দেখতে পাবে। আর উপরে জানালা কাটলে অদৃশ্য জগত দেখতে পাবে। দুনিয়ার বাহ্য বস্তু অন্তরে চলে আসবে এবং উপর জগতের অদৃশ্য ইলম অন্তরে আসবে। তো অন্তর হলো একটি আশ্চর্য বাতায়ন যে, তাতে দুটা দরজা খোলা আছে। একটা অদৃশ্য জগতের দিকে অপরটা দৃশ্যমান জগত দুনিয়ার দিকে।

অনুভবযোগ্য, দৃষ্টমান বস্তুর আকৃতিও অন্তরে আছে, অদৃশ্যের জ্ঞানও অন্তরে আছে। সুতরাং যে মানুষকে এমন বস্তু দান করা হয়েছে, তারা কি শুধু দুনিয়ার ফুল-পাতা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে? তাদের তো উচিত ঐ জানালাও খুলে দেবে, যাতে সে সব আকৃতি দেখতে পারে। শুধু দৃশ্যমান বস্তু নয় বরং অদৃশ্য জগতের বস্তুও তার নিকট বিকশিত হবে, সে দেখতে পাবে।

উলুমের মাযার

হযরত ইমরান ইবনুল হুসাইন রা. একজন জলিলুর কদর সাহাবী ছিলেন। তিনি রোগাক্রান্ত হলেন। তাঁর কোমরে ফোঁড়া বের হলো। এমন কঠিন ও ভয়ানক ফোড়া, যা দীর্ঘ বত্রিশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তাঁর অবস্থা ছিল এমন যে, তিনি পার্শ্ব ফিরাতে পারতেন না। চিত হয়ে শুয়ে থাকতেন। তিনি আহার করতেন চিত হয়ে, ইস্তিঞ্জা করতেন একই অবস্থায়, নামায পড়তেন ইশারায় চিত হয়ে শুয়ে। তিনি না পারতেন উঠতে, না পারতেন বসতে, না পারতেন পাশ ফেরাতে। এভাবে ত্রিশটি বছর কেটে গেল। তো অনুমান করে দেখুন, কত কঠিন কষ্ট ও কেমন ভয়াবহ শাস্তি? কিন্তু এত কঠিন কষ্ট সত্ত্বেও চেহারার দিকে

তাকালে দেখা যেত, তিনি এত উৎফুল্ল যে, সুস্থ-সবল মানুষের চেহারাতেও এত উজ্জ্বলতা নেই। হযরতের চেহারায় সর্বদা হাসি-খুশি ফুটে থাকত।

লোকেরা বলল, হযরত! অসুস্থতা এত কঠিন যে, কষ্টের সীমা নেই। কিন্তু আপনার প্রফুল্লতার অবস্থা এমন যে, কোনো সুস্থ-সবল মানুষের চেহারাও এতটুকু সতেজ নয় যতটুকু সতেজ আপনার মুখমণ্ডল?

তিনি বললেন, তার কারণ হলো, যখন আল্লাহ তায়ালা আমাকে এত কষ্ট দিলেন, তখন আমি কান্নাকাটি এবং তাঁর নিকট শেকায়েত করার স্থলে ধৈর্য ধারণ করেছি আর বলেছি, হে আল্লাহ! তোমার শুকরিয়া যে, তুমি আমাকে যে অবস্থায় রাখ আমি তাতে সন্তুষ্ট আছি। তো আমি এই কষ্টের উপর আমার রেযামন্দিও মেনে নেওয়া প্রকাশ করেছি। আর নিজেকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করেছি। আর শুধু ধৈর্যধারণ করেনি বরং শুকরিয়া আদায় করেছি। এতে ফলাফল এই হলো যে, এ বিছানায় শুয়ে আমি আজ বত্রিশ বছর পর্যন্ত ফেরেশতাদের সাথে মুসাফাহা করেছি। অদৃশ্য জগৎ আমার সামনে উন্মুক্ত, অদৃশ্য জগতের মানুষেরা আমার সামনে আসে। আমার নিকট ফেরেশতারা আসা-যাওয়া করে। তাদের কর্মকাণ্ড আমি প্রত্যক্ষ করি। যদিও আমি স্বেচ্ছায় এই মুজাহাদা করিনি, এটি তাকদিরি, যা আল্লাহ তায়ালা আমাকে দিয়েছেন। আর এ তো হলো আমার অপারগতার মুজাহাদা। কিন্তু আমি এই মুজাহাদাকে গ্রহণ করে সবর করেছি। এ মুজাহাদার বরকতে আল্লাহ আমার অন্তরের দরজা খুলে দিয়েছেন। আমার সামনে অদৃশ্য জগত উন্মুক্ত হয়ে গেছে, আমি এখন ফেরেশতাদের সাথে মুসাফাহা করি।

যে মানুষকে এই পৃথিবী দেওয়া হয় আর সে স্বেচ্ছায় মুজাহাদা করে, সুবহানাল্লাহ! আর মুজাহাদা যদি হয় অপারগতাবশত; কিন্তু সে যদি তাতে ধৈর্য ধরে ও মেনে নেয়, তাহলে তার নিকট অদৃশ্য বস্তু উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। অতএব যে লোকটির অবস্থা হয় এমন যে, সে দুনিয়াতে বসে-বসে আখেরাতের সবকিছু দেখতে পারে, তার জন্য কি মসিবত থাকতে পারে। সে তো পরকালের ফুল-পাতায় উৎফুল্ল হয়ে ঘুরবে। কারণ, সকল ফুল-পাতা ও রং-তামাশা তার নিকট রয়েছে।

আহলে হকদের সংশ্রবে কাশফ লাভ হয়

আল্লাহওয়ালা ও কামেল ব্যক্তিরা যখন নিজেদের কামালাত, মুজাহাদা ও রিয়াজাতের (সাধনা) মাধ্যমে উঁচু মাকামে পৌঁছে, তখন তাঁদের অন্তরদ্বার খুলে

দেওয়া হয়। এমনকি যারা তাঁদের হাত ধরে, তাদেরও অন্তরদরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর তিনি উদ্দেশ্য ও সফলতাপ্রাপ্ত হয়ে যান।

আমি আমার বড়দের থেকে একটি ঘটনা শুনেছি। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন মুরাদাবাদের বাসিন্দা হযরত মাওলানা মনসুর আলী খান সাহেব রহ.। তিনি হযরত নানুতভী রহ.-এর সাগরেদ ছিলেন।

হযরত মানসুর আলী সাহেব রহ. স্বয়ং আমাকে উক্ত ঘটনা শুনিয়েছেন। কোনো মাধ্যম হতে শুনিনি। তিনি বলেন, দারুল উলুম দেওবন্দে পড়াকালীন আমি সেখানে থাকতাম। তখন সবে দারুল উলুম চালু হয়েছে। আমি হযরত নানুতভী রহ.-এর নিকট পড়তাম।

তিনি বলেন, ছাত্রদের মধ্যে একজন যুবক অত্যন্ত সুন্দর ও লাবণ্যময় ছিল। তার উপর চোখ লেগে যায়, তার মহব্বত তাঁর অন্তরে সৃষ্টি হয়। কিন্তু তিনি যেহেতু পুত-পবিত্র ও পাপ থেকে বাঁচার যোগ্য ছিলেন, তাই কোনো মন্দ জযবা অন্তরে আসেনি। তবে ইশক-মহব্বতের কারণে এক ধরনের মর্মজ্বালা এবং অস্থিরতা ও দুর্ভাবনা বিদ্যমান থাকত। সর্বদা এক প্রকার জ্বালা ও যন্ত্রণা বিরাজমান থাকত। অন্তরে সবসময় তার ধ্যান ও কল্পন জারি থাকত। তিনি বলেন, অবস্থা এতই প্রবল হলো যে, একদিন আমি নামায পড়ছিলাম। তখন সিজদায় নির্দিষ্ট তাসবীহ ব্যতীত ঐ ছেলের নাম যবানে উচ্চারিত হচ্ছিল। এমন কঠিন মহব্বত আমার অন্তরে জন্মে গেছে।

তিনি বলেন, আমার অন্তরে ব্যথার পাহাড় ভেঙে পড়ল। তার মহব্বতে আমাকে কী করে ছাড়ল, দুনিয়া তো নষ্ট হলোই এবার আখেরাতও নষ্ট হতে চলল। যখন আমার নামায এরকম হয়ে গেল যে আল্লাহর নামের স্থলে গায়রুল্লাহর নাম উচ্চারিত হতে লাগল, তখন আমার দীনের কী অবশিষ্ট রইল?

এ ঘটনার অভিযোগ নিয়ে হযরত নানুতভী রহ.-এর নিকট গেলাম। তাঁকে বললাম, হযরত ঘটনা এই। তিনি তা পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন; কিন্তু কিছু বলেননি। যখন তিনি বললেন, হযরত! এখন তো আমার দীন ও আখেরাত নষ্ট হতে চলছে, আপনি আমার হাত ধরেন, আমাকে ক্ষমা করেন।

তখন হযরত হেসে বললেন, হ্যাঁ! মৌলভী মানসুর আলী! তুমি তো পাঠান বংশের লোক, এতটুকুতেই ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? খান সাহেব তখন হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হযরত! এ তো ঠাট্টার সময় না, আমার দীন চলে যাচ্ছে আর দুনিয়া তো ইতঃপূর্বে চলে গেছেই। আপনি আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে চিকিৎসা করুন। হযরত নানুতভী রহ. বললেন, আগামী কাল ফযর

নামায বাদ যখন আমি মসজিদ থেকে বের হব এবং হুজরার দিকে যাব, তখন তুমি আমার পিছ-পিছু যাবে, কিছুই বলবে না। আমার নিকট এসে বসে যাবে। তিনি তা-ই করলেন।

হযরত নানুতভী রহ. ছাত্তা মসজিদে অবস্থান করছেন, যে মসজিদটি দেওবন্দ মাদরাসার সাথে মিলিত। আর সেখানেই দারুল উলুম দেওবন্দের সূচনা হয়েছে। তার পার্শ্বে একটা আনার বৃক্ষ, যা আজও দাঁড়িয়ে আছে। তারই নিচে দারুল উলুমের সূচনা হয়। শুরুটা হয় একজন ওস্তাদ ও একজন ছাত্রের মাধ্যমে। উস্তাদের নাম মোল্লা মাহমুদ রহ. আর ছাত্রের নাম শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ.। ছাত্তা মসজিদে ডালিম বৃক্ষে ছায়ায় দুই মাহমুদের নামে দারুল উলুমের সূচনা হয়। উক্ত ছাত্তা মসজিদে বড়-বড় আকাবিরদের সম্মেলন ঘটত। হযরত মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেব রহ. যিনি দেওবন্দের প্রথম মুহতামিম ছিলেন, তিনি নকশবন্দি তরিকার বুযুর্গ ছিলেন। আর দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত নানুতভী রহ. ছিলেন চিশতিয়া তরিকার বুযুর্গ। এ কারণে আমাদের পুরা জামাতে চিশতিয়া তরিকার প্রাধান্য পায়। আমাদের আসল তরিকা চিশতিয়া; কিন্তু আমাদের আকাবিরগণ তারবিয়াতও দিতেন, যাকে যে তরিকায় বাইয়াত করা মুনাসেব মনে হতো, তাকে সেই তরিকায় বাইয়াত করতেন এবং তারবিয়াত দিতেন। সুতরাং তিনি ছিলেন জামিউত-তুরুক বা চার তরিকা একত্রকারী। কিন্তু চিশতিয়া ছিল অগ্রগণ্য। আমাদের আসল সিলসিলা হলো চিশতী। এটি হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী আজমিরী রহ. পর্যন্ত পৌঁছে। তাঁর থেকে হযরত খাজা হাসান বসরী রহ. পর্যন্ত পৌঁছে। তাঁর থেকে হযরত আলী এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে। এক কথায় হযরত নানুতভী রহ. চিশতিয়া তরিকার আকাবির ছিলেন।

তিনি মানসুর আলী খান সাহেব রহ.কে বললেন, আগামীকাল ফজর নামায পর যখন আমি কামরায় যাব, তখন তুমি আমার পিছু-পিছু যাবে; কিন্তু কিছুই বলবে না। সুতরাং তিনি যখন মসজিদ থেকে বের হলেন, তখন তিনি সাথে সাথে চললেন। মাওলানা মানসুর আলী সাহেব রহ. আমাকে বলেছেন, তখন আমি হযরতের চোখ লাল এবং অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখেছি। ফলে আমর পা কাঁপছিল। আমি ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। হযরত রুমে প্রবেশ করলেন। আমিও প্রবেশ করলাম এবং দরজা বন্ধ করে দিলাম।

খান সাহেব বলেন, যখন হযরত রুমে বসে পড়লেন, আমিও আদবের সাথে বসে পড়লাম। তিনি আমার হাতের দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং আমার হাত ধরলেন। তিনি বলেন, আমার ডান হাত হযরতের হাতে দিলাম। তিনি আমার

হাত তাঁর বাম হাতের উপর রাখলেন এবং নিজের ডান হাত আমার ডান হাতের উপর ধীরে-ধীরে ঘোরাতে শুরু করলেন যেমন রশি পাকানো হয়।

মাওলানা মানসুর আলী সাহেব রহ. আমাকে বলেছেন, আমি তোমাকে শরয়ী কসম দিয়ে বলছি, যতক্ষণ তিনি তাঁর হাত আমার হাতের উপর ঘোরাচ্ছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সারা আকাশ ও জমিনের সকল বস্তু আমার সামনে ভাসছিল। আমি ফেরেশতাদের আগমন ও প্রস্থান দেখছিলাম। তারা নিচে নামছিল, উপরে উঠছিল। এক কথায় সারা অদৃশ্য জগত সামনে খুলে গিয়েছিল। এ ছিল আমার অবস্থা। পরিশেষে জোর হাত ঘুরিয়ে আমাকে হাতে ইশারা করলেন, যাও, উঠে চলে যাও।

তিনি বলেন, আমি বাইরে এলাম। তখন অনুভব করলাম, আমার ভিতর হতে কোনো একটা বস্তু বের হয়ে গেছে। কিন্তু কী বের হয়েছে তা মোটেও স্মরণে নেই। ওটি ঐ নওজোয়ানের মহব্বত ছিল। কিন্তু তাও ভুলে গেলাম যে তা কী জিনিস ছিল। আমি ভাবতে-ভাবতে যাচ্ছিলাম যে, আমার ভিতর হতে কোনো জিনিস বের হয়েছে, যা আমার অন্তরে বসে ছিল, আমার স্মরণে আসতে ছিল না সেটি কী জিনিস? তিনি বলেন, যখন আমি দারুল উলুম ও ঐ দরজার নিকট পৌছলাম, যা রাস্তার পার্শ্বে তখন ঐ নওজোয়ানকে দেখতে পেলাম। তাকে দেখে মনে পড়ল, আচ্ছা তার মহব্বত ছিল, যা অন্তর বসে গিয়েছিল আর তা এমনভাবে বের হলো যে, মনেই পড়ছিল না, তার মহব্বত অন্তরে ছিল কি-না।

তাই আমি বলি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ অনেক উঁচু মানের ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁদের গোলাম ও খাদেমদের এমন হালত দেওয়া হয়েছে যে, যদি তাঁরা কারো হাতের উপর হাত রাখে, তাহলে তার সামনে অদৃশ্য বস্তু দৃশ্যমান হয়ে যায়।

আল্লাহ মানুষের অন্তরকে এমন এক পৃথিবী দান করেছেন যে, যদি মানুষ তার অন্তরকে সজ্জিত করে, তাহলে শুধু দৃশ্যমান নয় বরং অদৃশ্যমান বস্তুও তার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং বড়-বড় ইলম তার উপর উদ্ভাসিত হয়ে যায়।

মহান আল্লাহর তাজাল্লির কেন্দ্রস্থল

এজন্যই বলা হয়ে থাকে, কলব হলো 'আরশুর রহমান'। দুনিয়াতে যদি আরশে আযীমের কোনো নমুনা থেকে থাকে, তাহলে তা হলো মুমিনের কলব, যাতে আল্লাহর তাজ্জাল্লি পতিত হয়। মানুষের হাতে তাজাল্লি নাযিল হয় না, তার দেমাগে তাজাল্লি নাযিল হয় না। তাজাল্লির জন্য যদি কোনো মার্কায থাকে,

তাহলে তা মুমিনের কলব। কেননা, কলব হলো আরশুর রহমান। পৃথিবীর মহাকাশে আরশে আযীম হলো যেখানে আল্লাহ তায়ালা সমাসীন হন।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

রহমান আরশে সমাসীন।

আর নফসের জগতে আরশে আযীম হলো মানুষের কলব, যাতে রাহমানের তাজাল্লি আসে। সুতরাং আল্লাহ মানুষকে কলবের ন্যায় যে মহাদৌলত প্রদান করেছেন, যার ভিতর দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল নকশা-চিত্র উপস্থিত রয়েছে, তার কী প্রয়োজন যে, সে দুনিয়ার নকশা-চিত্রের জন্য ঘুরে ফিরবে।

تو طفلی و خانہ رنگین است

তোমার সবই রঙিন।

তোমার প্রয়োজন নেই। এ কাজে তার কোনো সুযোগ নেই। তার কাজ হলো রুমীয়দের মতো কাজ করা, নিজের অন্তরকে ঘর্ষণ করে দীপ্তিমান বানানো, যাতে সকল বস্তু নিজে-নিজেই দেখা দেয় বা ভেসে ওঠে।

মানবচরিত্রের প্রথম ভিত্তিমূল

কলবে যখন সকল জিনিস উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং ইলম ও মারেফাতের পূর্ণতা সৃষ্টি হয়ে যাবে, তখন বলা যাবে, তার মধ্যে মনুষ্যত্ব এসেছে, এখন তার জন্য শরাফতের রাস্তা উন্মুক্ত হবে। সুতরাং মানুষ তার মাদ্দা দ্বারা উত্তম হতে পারে না, সূরত ও রূপের দ্বারা উত্তম হতে পারে না, পোশাক দ্বারা হতে পারে না। উত্তম হলে অন্তর বা কলব দ্বারাই হয়। তার কালব কখন উত্তম হয়? কালব উত্তম হয় তখন, যখন তা ইলমি তাজাল্লি তাতে পড়তে থাকে আর তার মারেফাত কলবে সৃষ্টি হয়। তখন বলা যাবে, এখন মানুষ সত্যিকার অর্থে মানুষ হয়েছে।

অতএব সূরত আকৃতির দ্বারা মানুষ মানুষ হতে পারে না। সীরাত দ্বারা প্রকৃত মানুষ হতে পারে। আর সীরাতো প্রথম রোকন হলো ইলম। যদি ইলম না থাকে, কলবে শুধু মূর্খতা ভরে থাকে, তাহলে সীরাতের প্রাথমিক সোপান জয় হলো না।

মোটকথা, মানবচরিত্রের প্রথম রোকন বা ভিত্তি হলো, তার মধ্যে ইলম থাকবে। মূর্খতার দ্বারা সীরাত বনে না। সীরাত বনে ইলম দ্বারা বা সীরাত (মেধা, জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি) ব্যতীত সীরাত গঠন হয় না; তার জন্য বাসীরত লাগে আর বাসীরতের

মার্কায হলো মানুষের কলব। ইলম ও মারেফাতের মার্কায হলো মানুষের কলব। সুতরাং মানুষ যখন রুমীয়দের কারিগরি জারি করে, তখন সেটি তার সীরাতের প্রাথমিক সোপান হয়।

এ জন্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْعَالِمُوْنَ

সমস্ত মানুষ ধ্বংস হবে। সকল মানুষ বরবাদ হয়ে যাবে।
যদি কেউ বাঁচে, তাহলে আহলে ইলম বাঁচবে।

ইনসান অর্থ কী? মাদ্দার দৃষ্টিকোণ হিসেবে ইনসান, সূরত-রূপ হিসেবে ইনসান, পোশাক হিসেবে ইনসান? বলা হয়ে থাকে, এগুলো কোনোটাই মুক্তিদাতা হবে না। সৌন্দর্য নাজাত দেবে না, গান্ধা মাদ্দা নাজাত দেবে না, সুন্দর পোশাক নাজাত দেবে না। যদি নাজাতদাতা কোনো জিনিস থাকে, তাহলে তা হলো ইলম, যা দ্বারা মানুষ হক ও বাতিল চিনবে, শুদ্ধ-অশুদ্ধ পার্থক্য করবে, বৈধ ও অবৈধের পার্থক্যের বিধান করবে।

যদি উপরোক্ত জিনিসের ভেদাভেদ না থাকে, অর্থাৎ হালাল-হারামের তমিজ না থাকে, আহার করতে পারে; কিন্তু হালাল-হারাম তমিজ করতে পারে না। পরিধান করতে পারে; কিন্তু হালাল-হারাম জানে না। তাহলে মানুষ আর বলদের মাঝে কী পার্থক্য থাকতে পারে?

বলদও আহার করতে পারে; কিন্তু হালাল-হারাম জানে না। সে বসবাসের স্থান চিনে; কিন্তু হালাল-হারাম চিনে না। সে অন্যের স্থানেও দাঁড়ায়, মালিকে স্থানেও দাঁড়ায়। মালিকের জমি হলেও মুখ লাগায়, অপরের জমি হলেও মুখ লাগায়। তার জায়েয-নাজায়েযের তমিজ নেই। শেষে পরিণত হবে, যদি তার মধ্যে জায়েয ও নাজায়েযের ইলম না থাকে, হালাল-হারামের পার্থন্য না থাকে, তাহলে বলদ ও ইনসানের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। সুতরাং ইনসান ইনসান হয়, যখন তার মধ্যে ইলম থাকে।

ইলমে জরুরির পরিমাণ কতটুকু

আবার ইলম বলতে শুধু জানার নাম নয়। কারণ, অল্প-স্বল্প ইলম-জ্ঞান তো বলদেরও আছে। সেও চিনে, জানে এ লোকটি আমার মালিক কি-না। সে আমাকে ঘাষ পানি দেয় কি-না। বলদ তার মালিকের সামনে মাথা ঝুঁকিয় দেয়, অন্য কারো জন্য নয়। এতটুকু জ্ঞান কুকুরেরও আছে। সে জানে, এই লোকটি আমার মালিক। সে তার সামনে লেজ নাড়াতে থাকে। আর অন্য কেউ এলে

তার উপর হামলা করার জন্য তৈরি হয়ে যায়। তো কুকুর এতটুকু পার্থক্য করতে পারে যে, কে বাড়ির মালিক আর কে মালিক নয়। মালিকের বাড়িতে প্রবেশাধিকার আছে; অন্য কারোর নয়। তবে মালিক যদি কুকুরকে ধমক দেন, তাহলে সে নীরব হয়ে যায়। তার মানে কুকুর বোঝে, মালিক যদি অনুমতি দেন, তাহলে তার প্রবেশাধিকার রয়েছে।

আমাদের হাজী মুহাম্মাদ শফী সাহেব, যার হাবেলিতে আমরা অবস্থান করছি অত্যন্ত শক্তিশালী জংলী কুকুর পালতেন। যদি তাকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হত, তাহলে একদম হামলা করে বসত। কেউ এলে চিৎকার শুরু করত। কিন্তু হাজী সাহেব একটা ধমক দিলে একেবারে চুপ হয়ে বসে যেত। এতে বোঝা গেল, কুকুরটা জানে, বাড়িটা তার নয়– তার মালিকের। মালিক অনুমতি দিলে প্রবেশাধিকার আছে। না দিলে নেই। মোটকথা, এই অল্প-স্বল্প ইলম তো কুকুরেরও রয়েছে। এতটুকু ইলম যদি মানুষের থাকে, তাহলে এতটুকু তো প্রাণীরও আছে। সত্যিকারের ইলম যা দ্বারা মানুষ হালাল-হারামের পরিচয় লাভ করবে, হক-না হক বুঝবে, জায়েয-নাজায়েযের পার্থক্য করবে। এগুলো মানুষের কলবের কাজ, হাত-পায়ের নয়।

কলবের স্বতন্ত্র অনুভূতি

ইমাম শাফেয়ী লিখেছে, মানবদেহের সকল অঙ্গ দুনিয়ামুখী। তার মধ্যে শুধু কলব হলো আখেরাতমুখী। সে হক ও বাতিলের মধ্যে তমিজ করে। এমন হয় না যে, সুদ-ঘুষের সম্পদ হলে হাতে কাঁটা বিঁধবে আর হালাল মাল হলে হাতে ধরতে পারবে। হাত যেমন আনন্দের সাথে হালাল, ধরতে পারে, তেমনিভাবে ঘুষের টাকাও ধরতে পারবে। চুরি-ডাকাতির টাকাও গ্রহণ করতে পারে। তো জায়েয ও নাজায়েযের ব্যাপারে হাতের কোনো তমিজ নেই। হাত বেচারার কাজ শুধু আদান-প্রদান করা। চাই হালাল হোক বা হারাম হোক।

জিহ্বা জায়েয খাবার আহার করলে যে স্বাদ অনুভব করবে, না জায়েযে আহার করলেও একই স্বাদ অনুভব করবে। কেননা, জিহ্বার এই শক্তি নেই যে, সে পৃথক করতে পারে এটা হালাল ওটা হারাম, এটা জায়েয ওটা নাজায়েয।

আপনি মসজিদে গমন করলে পা যেভাবে চলতে পারবে, তেমনিভাবে মদের আড্ডা খানায় গেলেও চলতে পারবে। এমন হবে না যে, মদের আসরে যেতে চাইলে পায়ে বাধা আসবে আর মসজিদে যেতে চাইলে পা তাড়াতাড়ি চলবে। বরং তার উল্টো হবে। মসজিদপানে যেতে চাইলে আস্তে চলবে আর মদের আসরে যেতে চাইলে দ্রুত চলবে। কিন্তু এমনটি তমিযের কারণে নয় বরং

অভ্যাসগত কারণে। অতএব পায়ের হালাল-হারামের তমিযের ক্ষমতা নেই। কিন্তু কলবের মধ্যে অনুভতি রয়েছে। যখন চোর চুরির মাল নিয়ে আসে, তখন কলব তাকে ভর্ৎসনা করতে থাকে যে, হে কমবখত! তুমি খারাপ কাজ করলে। এখন চাই নফ্স তা গ্রহণ করে নেয় বা না নেয়; কিন্তু কালব তাকে সুপরামর্শ দান করে।

অতএব মানবদেহের শুধু কলব হলো আখেরাতমুখী অঙ্গ। সে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং হালাল ও হারামের তমিয করতে চায়। এজন্য কালবকে যদি পরিষ্কার করে নেওয়া হয়, তাহলে কিসে আল্লাহর রেজা আর কিসে তাঁর রেজা নেই তা নিচতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালা কী পছন্দ করেন আর কী পছন্দ করেন না তা বুঝতে পারে। সুতরাং ইলমের প্রাথমিক স্তর হলো তমিয (পার্থক্য করা), যা দ্বারা মানুষ হক-বাতিল ও জায়েয-নাজায়েয পার্থক্য করতে পারে।

ইলমের হাকিকত

ইলমের হাকিকত হলো তমিযের যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়া। অর্থাৎ দুটি বস্তুকে আলাদাাভাবে দেখা। আর যদি দুটি বস্তু মিলে যায় বা সংমিশ্রণ হয়ে যায়, তাহলে বলা হবে এ ব্যক্তির ইলম নেই। যদি ইলম থাকত, তাহলে দুটি বস্তুকে পৃথকভাবে দেখত। দুটি বস্তুকে আলাদা-আলাদাভাবে অনুভব করত। অতএব, দুটি বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করাই ইলমের মর্যাদা।

ইলমুল ফুরকান

ইলম যত বৃদ্ধি পাবে ও বুলন্দ হবে, তমিযের যোগ্যতা ততই বেশি সৃষ্টি হবে। ইলমে কামাল (পূর্ণতা) আসে তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে। যতটুকু তাকওয়া ও পবিত্রতা হবে, ইলমে ততটুকু কামাল সৃষ্টি হতে থাকবে।

কুরআনু কারীমে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং মুত্তাকী হয়ে যাও, তাহলে তিনি তোমাদের মধ্যে ফুরকান সৃষ্টি করে দেবেন। *[সূরা আনফাল আয়াত- ২৯]*

'ফুরকান' অর্থ ভিতরগত এমন শক্তি, যা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে। জায়েযকে নাজায়েয থেকে পৃথক করে দেয়। যখন এই তমিয সৃষ্টি হবে, তখন বলা যাবে তাকওয়া পূর্ণতা লাভ করেছে। তাকওয়ার প্রভাব হলো এমন যে, মানুষের অন্তর নিজেই ভাল-মন্দ ইমতিয়াজ করতে থাকে।

ফতওয়া চাওয়ার শ্রেণীবিন্যাস

ফতওয়া সর্বপ্রথম কার নিকট চাইতে হবে এ সম্পর্কে হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاِنْ اَفْتَاكَ الْمُفْتُوْنَ

যখন কোনো মুয়ামালা বা সমস্যা দেখা দেয়, তখন সর্বপ্রথম তোমার কালব থেকে ফতওয়া নাও, কলব নিজেই বলে দেবে এ কাজটি সঠিক না ভুল। মুফতিদের নিকট পরে যাও; আগে নিজ কালবকে প্রশ্ন করো।

মানুষ কখনও-কখনও চায়, ফতওয়া আমার মন মোতাবেক হোক। ফতওয়া তা-ই হোক যা আমার মন চায়। এজন্য সে তার মন যত প্রশ্ন তৈরি করে মুফতিদের নিকট পেশ করেন। আর মুফতি সাহেব তো তার প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর দিয়ে দেন। সে তার মর্জিমাফিক উত্তর পেয়ে যায় এবং তার উপর আমর করতে থাকে। প্রকাশ্য দৃষ্টিতে আপনি বলবেন, ভাই তো মুফতি সাহেবের ফতওয়া অনুযায়ী আমল করছেন। তিনি তো মাযুর। কিন্তু তিনি শরয়ী মাযুর নন। আল্লাহ তায়ালা জানেন, সে জেনে-শুনে ভুল প্রশ্ন তৈরি করেছিল যে, দুনিয়াবাসীকে দেখানোর জন্য যে আমি ফতওয়ার উপর আমল করছি। আসলে তো নিজের নফসের তাকাজা অনুযায়ী আমল করছে। আর যখন মানুষ নিজ নফ্স থেকে প্রথমে ফতওয়া নিবে, তখন তার অন্তরই বলে দেবে, এটা শুদ্ধ বা এটা ভুল। তারপর মুফতিদের থেকে ফতওয়া নিবে। এজন্যই বলা হয়েছে–

اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاِنْ اَفْتَاكَ الْمُفْتُوْنَ

সুতরাং মানুষের কলবের মধ্যে যখন ইসলামের শক্তি অসতে থাকে, তখন পার্থক্য করার শক্তি সৃষ্টি হতে থাকে। তখন বলা হবে, মানবসীরাতের প্রথম জাওহার কলবে চলে এসেছে। মানবসীরাতের প্রথম স্তর হলো, তার মধ্যে হক-নাহকের ইলম এবং পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া, যা জীবজন্তুর অর্জিত হয় না। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْعَالِمُوْنَ

মানুষ সবাই বরবাদ। তাকে তার মাদ্দা বাঁচাতে পারবে না, পারবে না তার সুন্দর সূরত তাকে বাঁচাতে, তার সুন্দর পোশাক তাকে বাঁচাতে পারবে না। মোটকথা, মানুষ ধ্বংসে পড়ে আছে। বেঁচে যাবে শুধু আহলে ইলমরা, যাদের ভিতর জায়েয-নাজায়েযের ইলম রয়েছে।

মানবসীরাতের দ্বিতীয় জাওহার

কিন্তু যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, শুধু ইলম নাজাতদাতা নয়; বরং ইলম যতই বেশি হবে, ততই ধ্বংস হওয়ার আশংকা রয়েছে। কেন? কারণ, ইলমের এর আসল উদ্দেশ্য হলো আমল। যদি ইলম মোতাবেক আমল না হয়, তাহলে বলা হবে, এই ইলম বেকার, অহেতুক ও অতিরিক্ত বস্তু। ইলমের উদ্দেশ্য হলো তা ব্যবহার করা, তার উপর আমল করা।

اَلشَّيْئُ اِذَا خَلَا عَنِ الْغَايَةِ لَغَا

যখন কোনো বস্তু নিজের উদ্দেশ্য ও পরিণাম থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সেটি বেকার ও অহেতুক হয়ে যায়।

ঘোড়ার উদ্দেশ্য ও পরিণাম হলো আরোহণযোগ্য হওয়া। যখন সে আরোহণের কাজ দেবে বরং ত্রাস সৃষ্টি করবে, দৈনিক হাজারো টাকার খাবার আহার করে; কিন্তু যখন মালিক আরোহণ করতে যায়, তখন লাথি মারতে শুরু করে। তাহলে বলা হবে, উক্ত ঘোড়ার উদ্দেশ্য বা পরিণাম অর্জন হয়নি। এমন ঘোড়াকে গুলি মারা দরকার। এমন ঘোড়া মেরে ফেলার উপযুক্ত। অথচ ঘোড়া বিদ্যমান এবং তার সূরতও শানদার; কিন্তু যতই সুন্দর দেহওয়ালা হোক মালিকের নিকট তা খারাপই লাগবে। যতক্ষণ-না তার উদ্দেশ্য আরোহণ করা পুরা হবে। অতএব কোনো জিনিস যখন তার উদ্দেশ্য হতে খালি হয়ে যায়, তখন সেটি অহেতুক বস্তুতে পরিণত হয় এবং গুলি মারা উপযুক্ত হয়ে পড়ে।

মানুষ বিবাহ করে। তার উদ্দেশ্য হলো, সে ঘরের মালিক হবে, গৃহের কার্যাবলি আঞ্জাম দেবে এবং তার বংশ বিস্তার ঘটাবে। কিন্তু সে যদি এত অযোগ্য ও অকেজো হয় যে, ঘরের পরিবেশকেও ধ্বংস করে আবার বংশ বিস্তারও হবে না, তাহলে স্বামী তাকে কী করবে, হয়ত তাকে তালাক দেবে, না হয় তাকে পাশে রেখে দ্বিতীয় বিবাহ করবে।

তার বিবাহের যে উদ্দেশ্য ও পরিণাম ছিল, তা যদি অর্জন না হয়, তাহলে সে বেকার ও অপদার্থে পরিণত হবে। স্বামী যদি বেশি দিলদার ও হামদর্দ হন, তাহলে তাকে তালাক দেবে না, দৈনিক বার্তা নির্ধারণ করে বলবে, এই ঘরে বসে-বসে আল্লাহ-আল্লাহ করতে থাকো। এছাড়া তোমার কোনো কাজ নেই। আর সে দ্বিতীয় বিবাহ করে নিবে।

মোটকথা, বস্তু যখন তার উদ্দেশ্য ও পরিণাম হতে খালি হয়ে যায়, তখন তা বেকার ও অহেতুক হয়ে পড়ে। তেমনিভাবে ইলম যদি আমলের উপকার না দেয়, তাহলে সেই ইলম বেকার ও অহেতুক বলে পরিগণিত হবে এবং বোঝা মনে হবে, অতিরিক্ত হয়ে যাবে। তো যতক্ষণ ইলমের সাথে আমল যুক্ত না হবে, ততক্ষণ তা বেকার। এতে প্রতীয়মান হয়, শুধু ইলম মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। মুক্তিদাতা বস্তু হলো মানুষের নেক আমল। যে আমল ইলম মোতাবেক হবে, সেই আমলই নাজাত দিতে পারে। এ কারণেই নবীজি ইরশাদ করেছেন-

اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْعَالِمُوْنَ

ইনসান সবাই ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে, বাঁচবে কে? শুধু ইলমওয়ালারা।

তারপর তিনি বলেন–

وَالْعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْعَامِلُوْنَ

আলেমরাও সবাই ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে। বাঁচবে কারা? যারা তার ইলম মোতাবেক আমল করে।

সুতরাং আমল হলো মুক্তিদানকারী। শুধু মূর্খ ইলম মুক্তির মাধ্যম হতে পারে না।

তাজাম্মুলে ইলম-এর ফেতনা

এই মূর্খ ও অন্ধ ইলম তো তাজাম্মুল বা শোভা মাত্র এবং এক ধরনের সমৃদ্ধি মাত্র। হাদিস শরীফে এসেছে, শেষ জমানায় ইলম তাজাম্মুলের মাধ্যম হবে। মানুষ যেমনভাবে সুন্দর পোশাক দ্বারা সৌন্দর্য-শোভা অর্জন করে এবং নিজের রং-লাবণ্য দ্বারা সৌন্দর্য হাসিল করে থাকে, তেমনিভাবে নিজের ইলম দ্বারাও সৌন্দর্য-শোভা বর্ধনে ফিকিরে মগ্ন থাকবে। ইলমকে কাজে লাগিয়ে মানুষ নাজাত ও মুক্তির দিকে ধাবিত হবে না বরং অহংকার ও জাঁকজমকের মাধ্যম বানাবে। এমন ইলম মানুষের জন্য তার জানের বোঝা হবে। এজন্য বলা হয়েছে, আলেমরাও সবাই ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে। শুধু যারা নিজের ইলম

মোতাবেক আমল করবে, তারা রক্ষা পাবে। অতএব, মনুষ্যত্ত্বের উদ্দেশ্যে ও পরিণাম হলো ইলম আর ইলম-এর লক্ষ্য হলো আমল। যদি ইলম না থাকে, তাহলে মনুষ্যত্ব বেকার ও অহেতুক আর আমল না থাকলেও ইলম বেকার ও অনর্থক। সার কথা হলো ইলম মোতাবেক আমল নাজাতের মাধ্যম।

মানবসীরাতের তৃতীয় জাওহার

গভীর চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, আমলও নাজাতের মাধ্যম নয়। কারণ, আমল হলো একটা ধাঁচমাত্র। যতক্ষণ-না তাতে রুহ থাকে। আমল হলো লাশের ন্যায়। আর লাশ কাজে ব্যবহার হয় না। যদি কোনো ধাঁচের বা কাঠামোর মধ্যে রূহ বা আত্মা না থাকে, তাহলে সেটি অতিদ্রুত জমিনে দাফন করার যোগ্য হয়ে যায়। ঐ লাশ যদি জমিনে পড়ে থাকে, তাহলে ফুলবে, ফাটবে, দুর্গন্ধ সৃষ্টি হবে, দেমাগ খারাপ হবে। সুতরাং লাশের জন্য প্রথম কাজ হলো, তাকে অতিদ্রুততার সাথে জমিনে মিশিয়ে দেওয়া বা সাগরে ফেলে দেওয়া। অন্যথায় দেমাগ ঠিক থাকবে না তার দুর্গন্ধে। তেমনিভাবে আমল হলো একটা লাশ এবং ধাঁচ বা কাঠামোমাত্র।

আর তার রূহ হলো ইখলাস লিল্লাহ। অর্থাৎ আমল হবে নিরেট আল্লাহর জন্য। তার মধ্যে শিরকের সন্দেহ বা ঘ্রাণও থাকতে পারবে না। যদি তাতে শিরকের আশংকা থাকে, তাহলে ঐ আমল হবে গায়রুল্লাহর জন্য। অথবা উক্ত আমল অংশীদারযুক্ত। কিছু আল্লাহর জন্য আর কিছু গায়রুল্লাহর জন্য। একটা আত্মাহীন কাঠামোর মতো। আর আত্মাহীন আমল ফুলবে, ফাটবে, গলবে, দুর্গন্ধ ছড়াবে। পরকালে এমন আমলের কোনো মূল্য থাকবে না। অতএব, আমলের রূহ বা আত্মা হলো ইখলাস লিল্লাহ। মানে একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া। তাতে অন্যের রেজামন্দির মিশ্রণ থাকতে পারবে না।

রেজায়ে খালকের পথ

ইবাদাতের মধ্যে গায়রুল্লাহর রেজামন্দি মূল বিষয় না হলেও গায়রুল্লাহ রাজি হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তায়ালা খুশি হলে সকল মাখলুক খুশি হয়ে যাবে। আর যদি গায়রুল্লাহকে খুশি করতে চাও, তাহলে তারাও খুশি হবে না, আল্লাহ তায়ালাও খুশি হবেন না। কেউ খুশি হবে না। আর আল্লাহকে খুশি করার ফিকর করলে তিনি রাজি হবেন, মানুষও রাজি হবে। শুধু মানুষ নয় বরং প্রাণীকূল খুশি হবে, বৃক্ষরাজি খুশি হবে, জড়পদার্থ খুশি হবে।

مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهٗ

যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তার হয়ে যান।

যার আল্লাহ হয়ে যায়, সারা পৃথিবী তার হয়ে যায়। তার সাথে অহংকার করতে পারে না।

تو از حکم داور گردن مپیچ # کہ گردن نہ پیچد ز حکم تو ہیچ

তোমার কর্ম হলো মালিকের আনুগত্য করা; তাহলে সবাই তোমার আনুগত্য করবে।

যদি তুমি মালিকের আনুগত্য না কর, তাহলে কেউ তোমার আনুগত্য করবে না। সবাই তোমার সাথে নেতাগিরি দেখাবে। আল্লাহ তায়ালাকে রাজি করালে সকল মাখলুক নিজে নিজেই রাজি হয়ে যাবে। আর তিনি রাজি না হলে কেউ রাজি হবে না। সুতরাং মানুষের উচিত ঐ এক সত্তাকে খুশি করা।

মালিকের সুদৃষ্টির মর্যাদা

বাদশাহ হারুনুর রশিদের ঘটনা। একদা তিনি খুশি প্রকাশ করে দরবারে ঘোষণা দিলেন, আজ যারা যা চাইবে আমি তাদের তা-ই দেব। মানুষর চাওয়া আরম্ভ করল। কেউ বলল, আমাকে গভর্নর বানান। তিনি বললেন, হ্যাঁ; বানালাম। কেউ বলল, আমাকে অমুক কেল্লার মালিক বানাল। তিনি বললেন, হ্যাঁ; বানালামা। কেউ বলল, আমাকে দশ লক্ষ টাকা দেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ; মঞ্জুর করা হলো। অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ-নিজ মর্জি মোতাবেক প্রার্থনা করতে লাগললেন আর বাদশা হারুনুর রশিদ দিতে থাকলেন।

বাদশা হারুনুর রশিদের পিছনে দাঁড়িয়ে এক দাসী পাখা দ্বারা তাকে বাতাস করছিল। বাদশা তাকে বললেন, তুমি তো এখনও পর্যন্ত কিছু চাওনি? দাসী বলল, আগে এই আহমকদের দিন; তারপর আমি চাইব। হারুনুর রশিদ বললেন, আচ্ছা! আমার রাজত্বের আমির, উযির ও সভাসদ সবাই আহমক!

দাসী বলল, সবাই পাগল ও বেকুফ। তাদের প্রার্থনা করার যোগ্যতা নেই। হারুনুর রশিদ মনে করলেন, নাকিসুল আকল তো; কে তার সাথে কথা বাড়াবে; তাই তিনি চুপ হয়ে গেলেন। মানুষ আবার চাওয়া শুরু করল আর তিনি তাদের দিতে লাগলেন। সবাইকে দেওয়ার পর বাদশা বললেন, হ্যাঁ এবার তুমি চাও; কী চাইবে। দাসী বলল, বেকুফরা তো সবই নিয়ে নিল; এখন আমার নেওয়ার পালা। আমাকে আপনি কী দেবেন?

তিনি বললেন, আজ তো আমি ঘোষণাই করেছি, তোমরা যা চাইবে তাই আমি তোমাদের দেব। দাসী বাদশাহর কোমরে হাত রেখে বলল, 'আমি আপনাকে চাই যে, আপনি আমার হয়ে যান। কারণ, আপনি আমার হয়ে গেলে কিল্লাও আমার হবে, ধন-ভাণ্ডারও আমার হবে, প্রজারাও আমার হবে, দেশও আমার হবে। আর আপনি যদি আমার না হন, তাহলে ধনভাণ্ডার অর্জন হবে না। আর যদি হয়ও, তাহলে এক সময় ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এ কারণে আমি আপনাকে চাই। যারা দশ লক্ষ চেয়েছে, তারা তা পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে তারা আর পাবে না।

যারা কিল্লা চেয়েছে, পেয়েছে; কিন্তু পরে আর কিল্লা পাবে না। আর আমি যা চেয়েছি, তা পেয়েছি। এখন তো সবই আমার। আমি তাদের বেকুফ এ কারণে বলেছি যে, যদি তারা দশ লক্ষ দিনার পেয়ে থাকে, তাহলে তারা শুধু দশ লক্ষই পেয়েছে, অতিরিক্ত তো কিছুই পায়নি। আবার দশ লক্ষের ভিতরও তাদের না পাওয়ার আশংকা রয়েছে। কারণ, হারুনুর রশিদ দৃষ্টি যদি ফিরিয়ে নেন এবং বলে দেন, এ সম্পদ তার থেকে কেড়ে নাও। কাউকে কিল্লা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরে গেছে, তাহেল কিল্লা তো কেড়ে নেওয়া হবে। তেমনিভাবে মন্ত্রিত্ব দেওয়া হয়েছে; কিন্তু কিছুদিন পর নজর অন্য দিকে চলে গেছে, তাহলে মন্ত্রিত্বও থাকবে না। বাদশা বলে দেবেন, তার নিকট হতে এ দায়িত্ব কেড়ে নাও।

তাই আসল ও মূল বস্তু হলো বাদশাহ এবং প্রধানের সুদৃষ্টি। যদি তা ঠিক থাকে, তাহলে সবই ঠিক থাকবে। আর তিনি ঠিক না থাকলে কিছুই ঠিক থাকবে না। কোনো কিছুর মালিক কেউ হতে পারবে না।

সকল সৃষ্টিজীব বশীভূত হওয়া

একই অবস্থা হয় আল্লাহওয়ালা ও দুনিয়াদারদের। দুনিয়াদাররা কেউ কিল্লা প্রার্থনা করে, কেউ লক্ষ চায়, কেউ কোটি চায়। আর আল্লাহওয়ালারা বলেন, 'হে আল্লাহ! আমার তো আপনার প্রয়োজন আর অন্য কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই। আপনি আমার হলে সমগ্র বিশ্ব আমার হবে, সকল কিল্লা আমার হবে, সারাদেশ আমার হবে, সর্বপ্রকার মাখলুক আমার হবে, প্রাণীরা আমার সামনে মাথা নত করবে, মানুষও করবে।'

নবী-রাসূলগণ যদি জড়পদার্থকে আদেশ করতেন তাহলে তারা তাঁদের হুকুম পালনকে গর্ববোধ করত। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন দেখা দিল। স্থানটি ছিল বালুকাময় মরুভূমি, গাছ-পালা ও ঝোপঝাড় ছিল অনেক দূরে। তিনি দু-দিকের দুটি বৃক্ষকে হাতে ইশারা করলেন। দু-দিক থেকে দুটি বৃক্ষ দৌড়ে এসে পরস্পর মিলে গেল এবং নিজেদের শাখা-প্রশাখাগুলো মেলে দিল। ফলে পর্দার আকার ধারণ করল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন সারার পর হাতে ইশারা করলেন; উভয় বৃক্ষ স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করল।

প্রকৃত রাজত্ব তো তাকেই বলে যে, সমগ্র বিশ্বের সব কিছুর উপর হুকুম প্রয়োগ করা। আর তা কিভাবে হবে? তা এভাবে সম্ভব যে, সমগ্র বিশ্বের প্রকৃত মালিক যিনি, তাঁকে নিজের করে নিলে সকল বস্তুই নিজের হয়ে যাবে। নবীদের শান অনেক উঁচু পর্যায়ের ছিল। তাঁদের খাদেম-গোলামদের শানও অনেক উঁচু ছিল। যখন তারা নিজেদেরকে আল্লাহ তায়ালার জন্য সোপর্দ করে দিতেন, তখন সমগ্র বিশ্বজগত তাঁদের আদেশ পালনকে গর্ব মনে করত। নিজেদের জন্য কল্যাণ জ্ঞান করত। তাদের সামনে জড় পদার্থ হাজির হত, বৃক্ষরাজিও হাজির হত, প্রাণীকূলও হাজির হত। এ শক্তি তাঁদের ইখলাস লিল্লাহের বরকতে ছিল। তাঁরা নিজেদেরকে খালেস আল্লাহর জন্য সঁপে দিতেন; অন্য কারো জন্য নয়। তাঁদের কাজের মধ্যে অন্যের মিশ্রণ থাকত না।

মুশরিকদের অন্তরের দোদুল্যমানতা

যখন অন্যের মিশ্রণ থাকবে, তখন অবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে হযরত ঈসা আ. বলেন, দুই মালিকের গোলাম কোনো মালিকেরই খেদমত করতে পারে না। যে ব্যক্তি কয়েকজন মালিকের গোলাম হবে, সে একজনের কাজ করলে তার ভিতর ভয় থাকবে অন্যজন যেন নারাজ না হয়। দ্বিতীয়জনের নিকট গেলে চিন্তা থাকবে তৃতীয়জন যেন নারাজ না হন। তার জন্য সবাইকে একই সময়ে রাজি রাখা দুষ্কর। তো ফলাফল এমন বের হলো যে, চার মালিকের গোলাম কারো খেদমত করতে পারবে না। প্রকৃত খাদেম সেই হতে পারবে, যে একজনের গোলাম। সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিরেট একজনের জন্য হয়ে যাবে। মরলেও তার জন্য, বাঁচলেও তার জন্য। তাহলে এমন সেবা বা ইবাদাতের দ্বারা কলবে শক্তি পয়দা হবে। কারণ, শক্তির মার্কায হলো ইখলাস আর শক্তি একীন থেকে সৃষ্টি হয়।

সন্দেহ এবং দোদুল্যতার দ্বারা অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং মুশরিকদের কলবে কখনও প্রাণশক্তি থাকে না আর একত্ববাদীর কলব কখনও দুর্বল হয় না। একত্ববাদীর অন্তরে তাওহীদের কারণে শক্তি পয়দা হয় অর মুশরিকদের কলবে

প্রাণ থাকে না, অন্তর থাকে। যার কোটি-কোটি দেবতা, সে যদি কারো একজনের প্রতি ঝোঁকে, তাহলে অন্যজনের চিন্তায় পেরেশান থাকতে হয়। তার কলবে প্রাণ থাকে না। তাকে সর্বদা পেরেশান ও অস্থিরতায় ভুগতে হয়।

একত্ববাদীর কলবের বিশ্বাস

একত্ববাদীর অন্তরে শক্তি থাকে। موحّد বলা হয়, যিনি শুধু একজনের জন্য হন আর অন্যদের থেকে সম্পর্ক কর্তন করেন।

موحّد چہ بر پائے ریزی زرش # کہ فولاد ھندی نہی بر سرش
اُمید و ھراسش نباشد ز کس # ہمیں است بنیاد توحید و بس

موحّد কাকে বলে? যার পায়ে লাখ রূপী রেখে দিলে বা তার মাথার উপর ধারালো তলোয়ার উঁচু করে দাঁড়ালেও সে ভীত হবে না এবং কারো সাহায্যের প্রত্যাশা করবে না। কারণ, সে তো এক সত্তার জন্য। তাই লোভ-লালসা ও ভয়-ভীতি তাকে তার অবস্থান থেকে টলাতে পারবে না।

আমলের প্রাণশক্তি

এক সত্তার জন্য হয়ে যাওয়ার নামই ইখলাস। এ ইখলাস দ্বারা আমলের রুহ সৃষ্টি হয়। যে আমলের মধ্যে শিরকের মিশ্রণ বা সন্দেহ রয়েছে, সেই আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না এবং তাতে রুহ বা প্রাণ থাকে না। একাধিক খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপনের নামই শিরক নয় বরং তাঁর সিফাতের (গুণাবলিতে) মধ্যে শরিক করার নামও শিরক। আবার সিফাতের মধ্যে একক মনে করে; কিন্তু আমলে শিরক করে তাও শিরক। কর্মসমূহে একক মনে করে, জাতে-সিফাতেও একক মনে করে; কিন্তু ইবাদাতে শরিক করে, তাহলে তাও শিরক।

আমি বলি, বাহ্যত সিজদা একজনের সামনে দিলেও শিরকের একটা মাকাম থেকে যায়। তাহলো মানুষ যখন ইবাদাত করে, তখন সে মনে-মনে ভাবে, মানুষ আমাকে বড় ইবাদাতগার মনে করবে। এমনটিও শিরক। তা হতে বাঁচাও জরুরি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'রিয়া'

হলো সবচেয়ে বড় শিরক। রিয়া এমন বস্তু, যা বাহ্যত শিরক মনে হবে না; কিন্তু বাস্তবে তা শিরক। হাদিস শরীফে এসেছে–

اَلشِّرْكُ اَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ

কিছু সূক্ষ্ম শিরক রয়েছে। যেমন শক্ত পাথরের উপর পিপিলিকা হাটলে তার পায়ের শব্দ যেমন সূক্ষ্ম হয়, শোনা যায় না এবং অনুভব করা যায় না, তেমনিভাবে শিরকও অনুভব করা যায় না। আর তা এমন যে, মানুষ এক আল্লাহর ইবাদাত করে এবং তাঁকে এক বলে বিশ্বাস করে, তাঁর সিফাতসমূহকেও একক জানে আর রিয়াও করে না; তারপরও এক প্রকার শিরকে লিপ্ত হয়। তাহলো তার মধ্যে অহংকার থাকে। অর্থাৎ ইবাদাত করার সময় তার মধ্যে এ ধারণা জন্মে যে, আমি অনেক বড় আমল করছি। কে আছে, যে আমার সমান ইবাদত করতে পারে! এটি এক প্রকার অহংকার, যা 'রিয়া'র চেয়ে আরো বেশি সূক্ষ্ম কিসিমের শিরক, যা আমলকে ধ্বংস করে দেয়। এতে প্রতীয়মান হয়, শিরক আমলকে ধ্বংস করে আর ইখলাস আমলকে স্থির রাখে। তাই যে বস্তু দ্বারা কোনো জিনিস বেঁচে থাকে, সেই বস্তুই হলো সেই জিনিসের রুহ বা আত্মা।

সুতরাং রুহ দ্বারা যেহেতু শরীর বেঁচে থাকে আর ইখলাস দ্বারা আমল, তাই ইখলাস হলো আমলে রুহ বা আত্মা। যতক্ষণ-না আমলে ইখলাস থাকবে, ততক্ষণ আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। একেই বলে–

وَالْعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْمُخْلِصُوْنَ

আমলকারীরাও সকলেই ধ্বংস ও বরবাদ হবে শুধু ইখলাসের সাথে আমল কারীরা বাঁচতে পারবে। যাঁদের মধ্যে খুলুসে নিয়ত ও ইখলাস বিদ্যমান থাকবে, তারাই বেঁচে যাবে।

সুতরাং মানুষের জন্য মুক্তির কোনো উপায় নেই। মুক্তির প্রথম ধাপ ইলম; ইলমও কাজে আসবে না যথেষ্ট না, দ্বিতীয় ধাপ হল আমল তাও কাজে আসবে না। তৃতীয়ত হল ইখলাস, যখন ইলম আমল ও ইখলা, তিনটি বস্তুর সমাবেশ ঘটবে তখন বলা হবে এখন মনুষত্বের জাওহার তার ভিতর বাস্তবায়িত হয়েছে। এখন তার মধ্যে মনুষ্যত্ব ও পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব এসেছে। তাকে পূর্ণ মানুষ বলা যেতে পারে।

মানবচরিত্রের চতুর্থ জাওহার

কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, এখনও আরেকটি বস্তু অবশিষ্ট রয়েছে। যদি সেই বস্তুটি না থাকে, তাহলে উল্লিখিত তিনটি বস্তু বেকার হয়ে যাবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। ইলম নাজাত দেবে না, আমল নাজাত দেবে না, ইখলাসও দেবে না যতক্ষণ-না ৪র্থ জিনিসটি বিদ্যমান থাকবে।

সেটি কী?

এক ব্যক্তির ইলম আছে, সে বড় আলেম, আমলও করে থাকে, ইখলাস পূর্ণ আমল কিন্তু এমন আমল করার পর নিঃশ্চিন্তে বসে থাকে যে নাজাত তো আমার অধীনে তা তো অবশ্যই মিলবে। সে আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তাহীন হয়ে বসে থাকে। সে এতটুকু চিন্তা-ফিকর করে না যে, আল্লাহ আমাকে ইখলাস দান করেছেন; তিনি যদি কোনো কারণে নারাজ হয়ে যান এবং তা আমার থেকে ছিনিয়ে নেন, তাহলে আমার অবস্থা কী হবে? যিনি দিতে পারেন, তিনি নিতেও পারেন। যে আল্লাহ ইখলাসের ন্যায় নেয়ামত দান করতে পারেন, তিনি তা কেড়েও নিতে পারে। এজন্যই মুখলিস ব্যক্তির কাজ হলো, সে ২৪ ঘণ্ট আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকবে, যাতে মালিকের সুদৃষ্টি পরিবর্তন না হয়ে যায় এবং সকল নেয়ামত সাল্‌ব করা না হয়।

সুতরাং মানুষ যদি মালিককে রাজি-খুশি রাখতে চায়, তাহলে সে যেন বেফিকির না থাকে, ইতমিনানের সাথে বসে না থাকে। বরং সর্বদা চিন্তা করবে, আমার জানা নেই আগামীকাল কী হবে। নিজের ইলম, আমল ও ইখলাসের উপর অহংকার প্রকাশ করবে না। বরং সেগুলোকে আল্লাহর দেওয়া তাওফিক জ্ঞান করবে। যদি সামান্য অহংকার করে ফেলে এবং বলে, এ ইলম আমার, এ বিদ্যা আমার, এ ইখলাস আমার, তাহলে সে তার আমলকে বেকরা করে ফেলল। সে ভাববে, এগুলো হলো আল্লাহর তাওফকী এবং তাঁর দান। যিনি দিতে জানেন, তিনি ছিনিয়েও নিতে জানেন। আমি তাঁর দরবারে ২৪ ঘণ্টা পড়ে থাকব, উপস্থিত থাকব। এমন যাতে না হয় যে, তাঁর সুনজর উঠে যাবে আর তাঁর নেয়ামতরাজি ছিনিয়ে নিবে। এরই নাম ফিকির। যতক্ষণ-না তার মধ্যে এই ফিকির থাকবে এবং অস্থিরতার হালত না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইলম আমল ও ইখলাস টিকে থাকবে না।

মুকাররাবদের আল্লাহর নিকট গ্রেফতার হওয়ার কারণ

যে ব্যক্তি ইলমওয়ালা, বেশি আমলদার ও বেশি মুখলিস, সে বেশি ধ্বংসাত্মক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে যে, সামান্য পদস্খলন হলেই এদিকেও জাহান্নাম, ওদিকেও জাহান্নাম। সে তার ধারণা এবং ওয়াসওয়ার কারণে গ্রেফতার হবে। হাদিস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পূর্বযুগে বনী ইসরাঈলে একজন বড় আবেদ ও যাহেদ অতিবাহিত হয়েছে। হযরত শায়খে জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রহ. স্বীয় কিতাব بدور السافرة فى علوم الاخرة তে সেই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তাতে আখেরাতের অবস্থা, কবরের অবস্থা, বরযখের অবস্থা, হাশর ময়দানের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। তাতে তিনি সেই বুযুর্গের কাহিনীটিও বর্ণনা করেছেন, যিনি সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকতেন, ইবাদাত ও যুহদ ব্যতীত তাঁর অন্য কোনো কর্ম ছিল না।

তিনি ভাবলেন, আমি ইবাদাত তো করি; কিন্তু স্ত্রী আছে, সন্তানাদি আছে, রয়েছে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব। পাশাপাশি উপার্জন ও আহারাদি ইত্যাদি ইহকালীন ধান্দায় লিপ্ত রয়েছি। এগুলো তো আমাকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে বিমুখ রাখে। এমন কোনো পন্থা যদি হত যে, এ সকল ধান্দা খতম হয়ে যেত আর আমি শুধু ইবাদাতে লিপ্ত থাকতাম। তারপর তিনি সকল দোস্ত-আহবাব, আত্মীয়-স্বজন ও বিবি-বাচ্চা পরিত্যাগ করে সমুদ্রের মধ্যস্থলে একটা দ্বীপ বেছে নিলেন। তিনি সেখানে আস্তানা গেড়ে আল্লাহর স্মরণে মশগুল রইলেন।

ইসলামপূর্ব ধর্মে বৈরাগ্য বৈধ ছিল। তাই তিনি বৈরাগ্য ও একাকিত্ব গ্রহণ করলেন, নির্জনতা ও পৃথকতা অবলম্বন করে একস্থানে বসে গেলেন। তিনি একটা ঝুপড়ি নির্মাণ করে তার নিচে অবস্থান নিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর উপর দয়া ও অনুগ্রহ করে তার আহারাদির সুন্দর ব্যবস্থা করলেন। সেখানে তিনি একটা আনার বৃক্ষ উৎপন্ন করলেন। তাতে বড়-বড় আনার হত। ঐ লবণাক্ত সমুদ্রে আল্লাহ তার জন্য পাহাড় থেকে মিষ্টি পানির ঝরনা প্রবাহিত করলেন।

উক্ত আবেদের অভ্যাস ছিল, তিনি দৈনিক ২৪ ঘণ্টায় একটি আনার আহার করতেন এবং এক বাটি পানি পান করতেন আর সারাক্ষণ আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকতেন। কখনও ঘুমাতেন না এবং আরামও করতেন না।

তিনি দীর্ঘ পাঁচশত বছর এভাবে অতিবাহিত করলেন যে, তাঁর ইবাদাতে কোনো প্রকার রিয়া ছিল না। ছিল না রিয়ার সংমিশ্রণ। পাহাড়ের টিলার উপর কাকে দেখাবে? সেখানে তাঁকে দেখবেইবা কে? অএতব তিনি খালেস ইবাদাত

করেছেন, যাতে ইলমও সঠিক ছিল, আমলও সঠিক ছিল, আবার ইখলাসও সঠিক ছিল। এমনকি মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! এখানে তো অন্য কেউ নেই যে, আমাকে গোসল দেবে, কাফন-দাফন দেবে, এখানে শুধ আমি আর আপনার বরকতময় সত্তা উপস্থিত। এজন্য আমার প্রথম আবেদন হলো, আমাকে সিজদারত অবস্থায় মৃত্যু দেবেন, যাতে নিতান্তই খালেস ইবাদাত অবস্থায় আমার ইন্তেকাল হয়।

দ্বিতীয় আবেদন হলো, আমার লাশকে কেয়ামত পর্যন্ত সিজদাবস্থায় সংরক্ষণ করবে, যাতে আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত আকৃতিভাবে তোমার ইবদাগুযার মনে হয়। তুমি আমাকে পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত তোমার ইবদাত করার তাওফিক দান করেছ। এখনও কেয়ামত সংঘটিত হতে হাজারো বছর অবশিষ্ট রয়েছে। সেই সময় পর্যন্ত আমার লাশকে সিজদারত ও অবিকৃত রেখো, যাতে কেয়ামত পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকতে পারি এবং আমার শরীর সিজদারত থাকে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর উভয় দোয়া কবুল করলেন, সিজদারত অবস্থায় মৃত্যু দিলেন এবং তাঁর দেহটাও হেফাজত করলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তাঁর বদন আজও সংরক্ষিত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা উক্ত টিলার উপর বড়-বড় বৃক্ষ উৎপন্ন করলেন। ফলে টিলাটি অন্ধকার হয়ে পড়ে। প্রথমত সেখানে মানুষের পৌঁছার সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত পৌঁছতে পারলেও ভয়ের কারণে ভিতরে যেতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে লুকিয়ে ফেললেন।

উক্ত আবেদ সম্পর্কে রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সেই বান্দাকে আল্লাহর সামনে নেওয়া হলো। তখন তিনি বললেন, হে আমার বান্দা! আমি তোমাকে আমার দয়া ও অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমাকে জান্নাত দান করলাম।

তখন উক্ত আবেদের অন্তরে এক ধরনের ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হলো যে, দীর্ঘ পাঁচশত বছর পর্যন্ত ইবাদত করলাম, খালেস ইবাদাত করলাম, নিজের স্ত্রী-সন্তান ছাড়লাম, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করলাম। এত-এত মেহনত করলাম। তারপরও আল্লাহ আমাকে নিজ দয়া ও অনুগ্রহে ক্ষমা করলেন। অন্তত পক্ষে আমার মনোরঞ্জনের জন্য এতটুকু বলতে পারতেন যে, তোমার ইবাদতের বদলায় তোমাকে জান্নাত দান করেছি; তাহলে অন্তর কিছুটা তো খুশি হত যে আমি কিছু হলেও করেছি। এখন তো মনে হয়, আমি কিছুই করিনি। কারণ, তিনি আমাকে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে ক্ষমা করেছেন। এটা ছিল তার ওয়াসওয়াসা পর্যায়ের অন্তরের ধারণামাত্র।

তো যারা আল্লাহর বেশি নৈকট্য লাভ করেন, তারা তাদের সামান্য কর্মের কারণে এবং খেয়ালের কারণে গ্রেফতার হন যে, তুমি তোমার অন্তরে এমন ধারণা কেন নিলে? আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাকে বললেন, তাকে জান্নাতের স্থলে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও; কিন্তু জাহান্নামে নিক্ষেপ করো না। শুধু এতটুকু দূরে নিয়ে যাও, যেখান থেকে জাহান্নামের দূরত্ব পাঁচ শত বছরের পথ, যেখানে জাহান্নামের গরম বাতাস পৌঁছে। সেখানে পৌঁছে তাকে জাহান্নামমুখী করে দাঁড় করিয়ে দাও।

হাদিস শরীফে এসেছে, ফেরেশতা তাকে নিয়ে গেল। এতটুক দূরত্বে যেখানে জাহান্নামের লু হওয়া আসে। সেখানে দাঁড় করানোর পর তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত শুকিয়ে যায় আর সে পিপাসা-পিপাসা বলে চিৎকার করতে থাকে। হাদিস শরীফে এসেছে, তখন গায়েব থেকে একটা হাত বের হবে, তাতে ঠাণ্ডা পানির একটা গ্লাস থাকবে। লোকটি দৌড়ে তার নিকট আসবে এবং বলবে, হে আল্লাহর বান্দা! এই পানি আমাকে দাও। যতটুকু সে আগাবে, ততটুকু ঐ পানি পিছানে। আওয়াজ আসবে, পানি তো পাবে; কিন্তু মূল্য দিতে হবে। তার মূল্য হলো, যে ব্যক্তির নিকট দীর্ঘ পাঁচশত বছরের খালেস ইবাদাত রয়েছে, সে যদি সেই ইবাদাত দিয়ে দেয় তাহলে এক গ্লাস পানি মিলতে পারে; অন্যথায় নয়।

তখন ঐ আবেদ দৌড়াবে এবং বলবে, সেই ব্যক্তি উপস্থিত। আমার নিকট পাঁচশত বছরের খালেস ইবাদাত রয়েছে। সে তা দিয়ে দিবে এবং এক গ্লাস পানি পান করবে। ফলে দম ফিরে আসবে, জান-প্রাণ ফিরে আসরে। আল্লাহর পক্ষ হতে ফেরেশতাকে বলা হবে, তাকে নিয়ে এসো। তখন সে তাকে নিয়ে ফিরে আসবে।

তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে আমার বান্দা! তোমার পাঁচশত বছরের ইবাদাতের মূল্য তো আমি আদায় করেছি। সে মূল্য নিজেই নির্ধারণ করেছ। অর্থাৎ এক গ্লাস পানি। তো তুমি তোমার দীর্ঘ পাঁচশত বছরের ইবাদাতের মূল্য এক গ্লাস পানি নির্ধারণ করেছ, আমি তা তোমাকে দিয়ে দিলাম। এখন মুয়ামালা সমান-সমান। আমার নিকট কিছুই রইল না, তোমার নিকটও কিছুই রইল না।

আল্লাহ বলবেন, এখন হিসাব দাও; তুমি দুনিয়াতে যত গ্লাস পানি পান করেছ, তার প্রতিটি ফোঁটার বিনিময়ে কতটুকু ইবাদাত নিয়ে এসেছ? আর আনারের লক্ষ-লক্ষ দানা আহার করেছ; প্রতিটি দানার হিসাব দাও। প্রত্যেক দানার পরিবর্তে কতগুলো সিজদা করেছ? আর এ তো শুধু দানা-পানির কথা বলা হলো। আমি তোমার চোখে দৃষ্টিশক্তি দান করেছি, চোখের একেকটি দৃষ্টি দ্বারা হাজারো বস্তু দেখে নিতে। এখন প্রতিটি দৃষ্টির হিসাব দাও। এগুলোর বদলায়

কী কী ইবাদাত নিয়ে এসেছ? আমি তোমাকে ঠাণ্ডা বাতাস দান করেছিলাম, যা দ্বারা তুমি শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়েছ। ফলে তোমার জীবন কায়েম ছিল। এখন তুমি প্রতিটি শ্বাসের হিসাব দাও। এগুলোর পরিবর্তে কী কী আমল নিয়ে এসেছ? আরো বলা হবে, এগুলো তো হলো উপকরণ। এছাড়া আমি তোমাকে ইবাদাতের তাওফিক দিয়েছি, শক্তি দান করেছি। বলো, এগুলোর পরিবর্তে তুমি কী নিয়ে এসেছ?

উক্ত আবেদ থরথর করে কাঁপতে লাগল এবং বলল, হে আল্লাহ! কাউকে কোনো আমল নাজাত দিতে পারবে না, নাজাত দিবে তোমার ফজল ও দয়া। সবাইকে তোমার ফজলেই ক্ষমা করা হবে। এ কারণেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَنْ يُّنْجِيَ اَحَدَكُمْ عَمَلُهٗ

তোমাদের কাউকে কোনো আমল নাজাত দিতে পারবে না, শুধু আল্লাহর ফজল নাজাত প্রদান করবে।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. উক্ত হাদিস শ্রবণ করার পর বললেন–

وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকেও কী আপনার আমল নাজাত দিতে পারবে না?

যে আমলের মূল্য এমন যে, সকল আসমান ও জমিন একটা সিজদার পরিমাণ মূল্যও হবে না। এমন আমলও নাজাত দিতে পারবে না? বললেন–

لَا، اِلَّا اَنْ يَّتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهٖ

না; আমাকেও আমার আমল নাজাত দিতে পারবে না যতক্ষণ-না আল্লাহ তায়ালার ফজল ও করম হস্তক্ষেপ না করে।

তাই যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বললেন, তাহলে আমি ও আপনার কী হাকিকত হতে পারে যে, আমরা কোন ইবাদাতের উপর অহংকার করব?

মোটকথা, এখানে উক্ত আবেদকে এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, কোনো আমল নাজাত দিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর ফজল নাজাত দিতে পারে।

আমলের তাওফিক হওয়া ফজলের নিদর্শন

কিন্তু ভাই! এ কথার মর্ম এমনটি বুঝে নিবেন না যে, যখন আমল দ্বারা নাজাত মিলবে না, তাহলে চলো আজ হতে আর আমল করব না। নামায, রোযা, হজ, যাকাত সবই ছেড়ে দেবে। কারণ, নাজাত তো আমল দ্বারা হবে না। হবে ফজল দ্বারা। আর ফজল সম্পর্কে তো কারো জানা নেই যে, কার উপর করা হবে আর কার উপর করা হবে না। তাহলে এমন বস্তুর উপর ভরসা করায় উপকার কী? যার মুক্তি মিলবে, তা তো ফজল দ্বারাই মিলবে আর না মিললে তো মিলবে না। আমল তো কোনো প্রকার কাজেই আসবে না এ কথার দ্বারা এমন ফলাফল কখনও বের করবেন না।

নিঃসন্দেহে আমল নাজাত প্রদানকারী বস্তু নয়। আমল দ্বারা নাজাত মিলবে না। নাজাত মিলবে ফজল দ্বারা। কিন্তু ফজল পাবে কি-না তা চিনার উপায় হলো আমল। যদি আমল করতে থাকে, তাহলে সেটি আলামত হলো আল্লাহর ফজল তার দিকে মুতাওয়াজ্জুহ রয়েছে। আর যে আমল করে না, তার আলামত হলো আল্লাহর্ ফজল তার দিকে মুতাওয়াজ্জুহ নয়। সুতরাং মুক্তিদাতা হলো ফজল। তবে তার আলামত হলো আমল। যদি আমল না থাকে, তাহলে ফজল নেই। তাই কখনও আমল পরিত্যাগ করা যাবে না। এমনটি কখনও বুঝবেন না যে, যখন আমল নাজাত দেবে না, তাহলে আমল করব না। নিঃসন্দেহে আমল মুক্তিদাতা নয়; মুক্তিদাতা হল ফজল। কিন্তু ফজলের আলাম হলো আমল। যদি আমল থাকে, তাহলে প্রমাণ হলো যে, তার প্রতি আল্লাহর ফজল মুতাওয়াজ্জুহ রয়েছে।

ইহকালে ফজল হওয়ার আলামত আমলের তাওফিক পাওয়া আর পরকালে ফজলের আলামত জান্নাত ও নেয়ামত লাভ করা। অতএব, উভয় জগতে মদদকারী হলো ফজলে ইলাহী। আমলও করছেন ফজলে ইলাহীর কারণে। ফজল মুতাওয়াজ্জুহ না হলে আমল কিভাবে করতেন? কারণ, আমল করতে পারেন তাওফিকের জন্য আর তাওফিক প্রদান করার অর্থ হলো ফজলে ইলাহী আপনার দিকে মুতাওয়াজ্জুহ রয়েছে। তাওফিক না দিলে মানুষ আমল করতে পারত না। সুতরাং মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত তাওফিকে ইলাহী।

কৃতজ্ঞতার আত্মা

হযতর দাউদ আ. কে আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেন–

اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا

হে দাউদ আমার শুকরিয়া আদায় করো। [সূরা সাবা আয়াত ১৩]

নবীগণ আল্লাহর কালামকে পূর্ণরূপে বোঝেন। হযরত দাউদ আ. আল্লাহর সকাশে আরজি পেশ করলেন, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করব। আমার উপর অবশ্যকর্তব্য শুকরিয়া আদায় করা। এমনিতেই ফরজ ছিল। এখন যেহেতু আপনি হুকুম প্রদান করেছেন তো বিলকুল ফরজ হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি চিন্তা করছি, শুকরিয়া জ্ঞাপন কিভাবে করব? কারণ, যখন শুকরিয়া আদায় করতে বসব, তখন ঐ শুকর আদায় করার তাওফিক তো আপনিই প্রদান করেছেন। তাহলে শুকর জ্ঞাপন করার তাওফিকও তো একটি নেয়ামত। তারও তো শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আর যখন তার শুকরিয়া আদায় করতে বসব, তখন তার তাওফিকও তো আপনিই দিয়েছেন। এটিও তো একটি নেয়ামত। তাহলে প্রথমে সেই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর যখন তার শুকর আদায় করতে বসবো, তারও তাওফিক তো আপনিই দিয়েছেন অতএব এটিই তো একটা নেয়ামত। তাহলে এই নেয়ামতের শুকরের পূর্বে আরেকটি শুকর সৃষ্টি হল।

এভাবে প্রত্যেক শুকরের পূর্বে আরেকটি শুকর বের হয়ে আসে। তাই আমি শুকর শুরু করব তো কিভাবে করব? আমি তো শুকর আদায় করতে অক্ষম। ওপর দিক থেকে উত্তর এল, হে দাউদ! যেহেতু তুমি বুঝে নিয়েছ, আমার শুকর তুমি আদায় করতে অক্ষম, তাই তুমি যে হার মেনেছ এটিই শুকর আদায় হয়ে গেছে। তুমি শুকর আদায় করতে পেরেছ।

কোনো বান্দা আল্লাহর হক আদায় করতে পারে না। আমরা তো ফরজ আদায় করতে পারি না; তাহলে হক আদায় করব কিভাবে। তাই আমরা অক্ষম। আর এই অক্ষমতাকে অনুভব করারও আমরা অক্ষম। এরই নাম শুকর আদায় করা। নিজে-নিজে হার মেনে নেওয়া যে, আমরা শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে অক্ষম।

শুকরের সনদ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি সায়্যেদুল হামিদীন (প্রশংসাকারীদের সর্দার) যাঁর চেয়ে বড় কোনো হামদ ও ছানাকারী নেই। পরিশেষে তিনি বলেছিলেন–

اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِىْ ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার হাম্‌দ-ছানা তথা প্রশংসার অনুপরিমাণও আদায় করতে পারব না। আমি তোমার

প্রশংসার শুরুটাই করতে পারব না। সুতরাং সংক্ষিপ্ত কথা হলো, তুমি এমন যেমনটি তুমি নিজে নিজের ব্যাপারে বলেছ।

তোমার ছানা-সিফাত ও হামদ-প্রশংসা জ্ঞাপন করতে আমি অপারগ। কারণ, এগুলো আন-লিমিটেড আর বান্দা হলো লিমিটেড। বান্দার কামাল মাহদুদ, আকল-বুদ্ধি মাহদুদ, তার শক্তি মাহদুদ। সুতরাং সে কিভাবে লা-মাহদুদের শুকরিয়া আদায় করবে?

اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

অতএব অক্ষমের স্বীকৃতি হলো, আমি তোমার হামদ ও ছানা করতে অপারগ। একে বড় সনদ মনে করা হয়। যে ব্যক্তি হার মেনে নেয় এবং অক্ষমতা স্বীকার করে নেয়, সে-ই সবচেয়ে বড় প্রশংসাকারী। এ সম্পর্কে আমার একটি লম্বা কবিতা রয়েছে, যা আমি ভুলে গিয়েছি। তন্মধ্যে একটা পংক্তি মনে পড়েছে–

خدا کی تو ثنا کامل یہی ہے # کہ ہم سے کچھ ثنا ممکن نہیں ہے

আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ ছানা হলো, আমার দ্বারা তাঁর কোনো ছানা-প্রশংসা সম্ভব না।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যখন ফজল করেন, তখন তাওফিক দান করেন। তখন মানুষ আমল করতে পারে। অতএব, আমলও আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, আমাদের পক্ষ থেকে নয়।

ইতিবাচক আমল দ্বারা নেতিবাচক আমল হয়

এজন্য ঐ আমল অধিক গ্রহণযোগ্য, যে আমলে মানুষ বুঝে নেয়, আমি কিছুই করেনি। আর যে ব্যক্তি বলে, আমি নিজেই সবকিছু করেছি, সে কিছুই পায় না। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, কোনো বান্দা যদি আমল করে অহংকার দেখায় এবং বলে, হে আল্লাহ! দেখো, আমি তোমার নাম পড়েছি। হজ করেছি, জিহাদ করেছি। আমি এই কাজ করেছি, ঐ কাজ করেছি, তখন উত্তরে বলা হয়, হে নালায়েক, তুমি কী করেছ? শরীরে শক্তি আমি দিয়েছি, কাজের তাওফিক আমি দিয়েছি, ইচ্ছা আমি সৃষ্টি করেছি; তুমি কী করেছ?

আর কোনো বান্দা যদি সবকিছু করে বলে, হে আল্লাহ! তোমার তাওফিকেই সবকিছু হয়েছে, আমার কোনো শক্তি নেই। لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ কোনো শক্তি

নেই আমার মাঝে, তাওফিক তোমার, শক্তি তোমার, ইচ্ছা তোমার; আমি কিছুই করিনি, তার উত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলেন- না, আমল তুমিই করেছ; মসজিদপানে পা তুলে তুমিই গিয়েছ, তুমিই সবকিছু করেছ।

মোটকথা, যে নিজের আমলকে নেতিবাচক করে, তাকে ইতিবাচক করা হয় আর যে নিজে ইতিবাচক করে, তাকে নেতিবাচক করা হয়। যে নিচু হয়, তাকে উঁচু করা হয় আর যে উঁচু হতে চায়, তাকে নিচু করা হয়, জমিনে নিক্ষেপ করা হয়। কোনো কবি সুন্দর করে বলেছেন-

پستی سے سربلند ہو اور سرکشی سے پست # اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں

ছোট হলে বড় হওয়া যায় আর বড়ত্ব দেখালে ছোট। এটি উন্নতি-অবনতির আশ্চর্য পন্থা।

যে যত নিচু হয়, সে তত বড় হয়। আর যে নিজে-নিজে বড় হতে চায়, তাকে ভূমিকে নিক্ষেপ করা হয়। সুতরাং বড় ও মর্যাদাবান হওয়ার পন্থা হলো মানুষ নিচুতা ও নম্রতা অবলম্বন করবে।

ইজ্জতের পথ ও পন্থা

সম্মানিত হওয়ার পদ্ধতি হলো, নিজের জিল্লতি পেশ করবে; তাহলে ইজ্জত-সম্মান মিলবে। আর যে নিজে নিজের ইজ্জত প্রচার করতে থাকে, তার জন্য তিরস্কার ও জিল্লত মিলবে। কেননা, কেউ ইজ্জতের হকদার নয়। ইজ্জত একমাত্র আল্লাহর। যে ব্যক্তি তাঁর সামনে নত হবে, তার জন্য ইজ্জত মিলবে-

فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

ইজ্জত তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। *[সূরা মুনাফিকূন- ৮]*

অতএব, ইজ্জত আল্লাহর, তাঁর রাসূলের ও মুমিনদের। আর ইজ্জত পাওয়ার পথ ও পন্থা হলো নিজেকে জিল্লত বা তুচ্ছা জ্ঞান করবে। কেউ যদি মাখদুম তথা সেবা পাওয়ার যোগ্য হতে চায়, তাহলে তার পদ্ধতি এই নয় যে, সে বলবে, হে মানুষেরা! আমি মাখদুম হয়েছি; তোমরা সবাই আমার খাদেম ও গোলাম হও। তাহলে লোকেরা বলবে, হে আহমক! তোমার এমন কথা বলতে লজ্জা লাগে না। সে হাতে-হাতে অপদস্থ হবে। মাখদুম হওয়ার পদ্ধতি হলো, অন্যের সেবক হতে হবে। তাহলে মানুষ মাথায় উঠাবে, সম্মান করবে। সে অটোমেটিক মাখদুম হয়ে যাবে। অতএব, মাখদুম হওয়ার পন্থ হলো, কারো খাদেম হওয়া,

মাখদুম হওয়ার দাবি করা নয়। যে মাখদুম হওয়ার দাবি করে, তাকে ঘায়েল করা হয়।

সুতরাং আল্লাহর ফজল হলে তাওফিকও মিলে আর তাওফিক মিললে আমলও হয়। যে ব্যক্তি এ হাকীকত সম্পর্কে অবগত যে, প্রথমে ফজল আসে, তারপর তাওফিক আসে। তারপর আমার ভিতর ইচ্ছা সৃষ্টি হয়, তারপর শক্তি সৃষ্টি, তারপর আমল প্রকাশ পায়। সেই ব্যক্তি কখনও দাবি করবে না, আমি আমল করেছি। সে বলবে, আমি যা করি, তা সবই উপর থেকে হয়– আমার মধ্যে কিছুই নেই।

আমলের পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রাখার ফলাফল

আমলের পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রাখার নমুনা হলো, দু-ব্যক্তি কোনো হাকীমের বিচারালয়ে এল। তারা উভয়ে দাবি করল, এই জমিনে যত ফসল উৎপন্ন হয়েছে, সবই আমার। তাদের উভয়ের দাবি এক ও অভিন্ন। তাদের মধ্য হতে একজনকে হাকীম জিজ্ঞেস করলেন, এই জমির মালিক তুমি? সে উত্তর দিল, না সাহেব! জমিনের মালিক আমি নই। তুমি কি বীজ বপণ করেছিলে? লোকটি বলল, না সাহেব! আমি তা করিনি। তাহলে তুমি কি ক্ষেতে পানি দিয়েছিলে? সে বলল, না সাহেব! আমি পানি দেইনি; তাও সে দিয়েছে। হাকীম বলল, ছয় মাস পর্যন্ত রক্ত-ঘাম এক করেছ তুমি? সে বলল, না সাহেব! তা আমি করিনি, তা করেছে সে। তবে দানা-ফসল আমার।

তখন হাকীম বলবেন, এ পাগলটাকে কান ধরে বের করে দাও। জমি তার নয়, সে বীজ বপন করেনি, পানি দেয়নি, মেহনত করেনি; কিন্তু দানার দাবিদার সে কোত্থেকে দাবিদার হয়ে গেল? যে ব্যক্তি ভূমির মালিক, যে বীজ বপন করেছে, সে মেহনত করেছে, দানা-ফসল তারই হবে।

একজন আমলকারী ভাবে, আমার ভিতর শক্তি নেই, তা আল্লাহ দান করেছেন, আমল করার ইচ্ছা নেই তাও আল্লাহ দিয়েছেন। তাওফিক আমি নিজে সৃষ্টি করিনি; তাও আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। তবে আমলের মালিক আমি। তখন আল্লাহ বলবেন, এই নির্বোধকে কান ধরে বের করে দাও। তাওফিক আমি দিয়েছি, শক্তি আমি দিয়েছি, ইচ্ছাও আমি দিয়েছি, তাহলে সে আমলের মালিক হয় কী করে?

আর যে ব্যক্তি আমলের পূর্ণ সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করে যে, আপনিই ফজল করনেওয়ালা, আপনিই তাওফিক প্রদানকারী, আপনিই শক্তি দানকারী, আপনিই

আমার দ্বারা করিয়েছে; আমার তো কোনো কর্তৃত্ব নেই। এ সকল আপনার ফজল ও করুণা, তখন আল্লাহ বলবেন, না, তুমিই আমল করেছিলে, তুমি মেহনত করেছিলে, তুমিই পায়ে হেঁটে গিয়েছিলে।

মোটকথা, যে নিজেকে নিজেই প্রচার করে, তাকে মিটিয়ে দেওয়া হয় আর যে নিজেকে মিটিয়ে দেয়, তাকে উপরে তুলে দেওয়া হয়, মর্যাদা দান করা হয়।

তাফাক্কুরের দৌলত বা চিন্তার উপকারিতা

উল্লেখিত বয়ান থেকে ফলাফল বের হলো, শুধু ইলমে নাজাত নেই, আমলে নাজাত নেই এবং ইখলাসেও নাজাত নেই যতক্ষণ-না তার সাথে ফিকির যুক্ত হয়। আর তা হলো, কোনো অহংকার নেই, নিজের ওপর ভরসা ও নির্ভরতা নেই, নিজের আমল ও ইবাদাতের ওপর কোনো গর্ব নেই, বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা হবে যে, আমি কিছুই করিনি। এসবই আল্লাহর দেওয়া। যদি তিনি তা ছিনিয়ে নেন, তাহলে আমি কী করব? এমন চিন্তা-ফিকির যে করবে, তার ইখলাস কাজে আসবে, আমল কাজে আসবে, ইলমও কাজে আসবে।

রূহানিয়াতের চার মৌলিক উপাদান

উপরের আলোচনা দ্বারা মানবচরিত্রের মূল উপাদান চারটি বের হয়ে এল।

(১) ইলমে সহি ও ইলমে নাফে' (২) আমলে সহি ও আমলে সালেহ (৩) ইখলাসে কামেল এবং (৪) ফিকরে সালিম। উক্ত চারটি বস্তু কোনো মানুষের মধ্যে সমাবেশ ঘটলে বলা যাবে, সে সঠিক ও পূর্ণ মানুষ। যার মধ্যে ইলম ব্যতীত মূর্খতা থাকবে, তাকে বলা হবে হাইওয়ান। আর ইলম থাকলে, আমল না থাকলে তাকে বলা হবে আমলহীন ও সীমালঙ্ঘনকারী আলেম। আর আমল আছে তবে মুনাফিক, মুখলিস নয়, তাহলে তাকে বলা হবে নির্বোধ। আবার মুখলিসও; কিন্তু ফিকরে সালিম নেই, তাহলে তাকে বলা হবে অত্যন্ত ভ্রান্ত কিসিমের মানুষ। যার মধ্যে ইলম থাকবে, আমল থাকবে, ইখলাস থাকবে এবং পরকালের সহি ফিকিরও থাকবে, সে গ্রহণযোগ্য ও পরিপূর্ণ মানুষ। তাকেই মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি দেওয়া যায় এবং তাকেই বলা যেতে পারে, সে মানুষ। এগুলো হলো মনুষত্বের চারটি মৌলিক অংশ। যেমনভাবে শরীর গঠন হয়েছে চারটি উপাদানে তেমনিভাবে মনুষ্যত্বেরও চারটি উপাদান ইলমে নাফে' আমলে

সালেহ, ইখলাসে কামেল ও ফিকিরে সালিম। এ চারটি বস্তুর সমাবেশ হলে বলা যাবে, সে প্রকৃত ইনসান। অন্যথায় বলা হবে, ইনসানরূপী জানোয়ার।

নববী ইলমই পূর্ণ ইলম

স্পষ্ট হয়ে গেল, এ চারটি বস্তু মনুষ্যত্বের মানদণ্ড। এ মানদণ্ডে যাচাই করলে নবীগণই বেশি কামেল বলে গণ্য হন। কারণ, তাঁদের ইলম শুধু নাফেই নয়; বরং তাঁদের ইলম অকাট্য, যাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তাঁদের ইলম কিতাব হতে অর্জন করা ইলম নয়; বরং তাঁদের ইলম দ্বারা কিতাব রচিত হয়েছে। তাঁরা সরাসরি আল্লাহর ইলমি ঝরনা হতে ইলম অর্জন করেন। ওহীর ইলম তাঁদের উপর আগমন করে, যা অক্ষয় ও অকাট্য সম্পদ, যাতে সন্দেহের মিশ্রণ নেই। নেই মূর্খতা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ধারণা ও কল্পনার সংমিশ্রণ। এ নিরেট ইলম, যা ওহীর ঝরনা হতে বের হয়, ঐ কামেলে ইলম এবং অকাট্য ইলম তাঁদের পবিত্র কলবে ঢেলে দেওয়া হয়।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্পর্কে কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۝ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۝

এই কুরআন বিশ্ব জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে আপনার অন্তরে যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন। *[সূরা আশ-শুআরা আয়াত ১৯২-১৯৪]*

এই কুরআন কী? এটি আল্লাহর নাযিলকৃত বস্তু। হে নবী! এটি আপনার নিজহাতে গড়া বস্তু নয়। এটি মানুষ তৈরি করেনি। কুরআন কোনো পার্লামেন্টের রেজুলেশন নয়। এটি কোনো দল বা কমিটির সিদ্ধান্ত ও সংবিধান নয়।

لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

এটি বিশ্বজাহানের প্রভূর নাযিল করা কালাম। নাযিল করেছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি কার মাধ্যমে নাযিল করেছেন?

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ

রুহুল আমিন বা বিশ্বস্ত আত্মা তা নিয়ে এসেছেন, যার অন্তর খেয়ানত করার বিন্দুমাত্র জযবা নেই। বরং তিনি পরিপূর্ণ আমানতদার ফেরেশতা, যার শান হলো 'আমীন' বা বিশ্বস্ত। তিনি তা নিয়ে এসেছেন।

কোথায় নিয়ে এসেছেন?

عَلٰى قَلْبِكَ

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক কলবে অবতীর্ণ করেছেন।

যে কলবে গায়রুল্লাহর কোনো স্থান নেই। শুধু এক আল্লাহর জন্য এই কলব প্রস্তুতকৃত। তো এমন পবিত্র অন্তরে হযরত জিবরাঈল আমীন নিয়ে এসেছেন আর নাযিলকারী হলেন স্বয়ং আল্লাহ। তিনি কী নিয়ে আসতেন?

আল্লাহ তায়ালার কালাম ও সিফাত নিয়ে আসতেন। আল্লাহ তায়ালার একটি সিফাত নিয়ে এসে পবিত্র বান্দার অন্তরে অবতরণ করতেন। এ সিফাত আল্লাহর পক্ষ হতে গুণান্বিত এবং কামালে খোদা হতে মুকাম্মালকৃত। আর তা আল্লাহর পক্ষ হতে গুণান্বিত হয়ে এমন পবিত্র কলবে নাযিল করা হয় যে, ইলমের মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, আশংকার সুযোগ নেই। নেই ধারণা ও কল্পনার মিশ্রণ। তাই পবিত্র কলবকে ইলম হিসেবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তার ইলম অকাট্য। আর অধিক ইলম হিসেবে দেখলে দেখা যায়–

اُوْتِيْتُ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ইলম একটি মোবারক কলবে একত্রিত করা হয়েছে।

সুতরাং সংখ্যা হিসেবে দেখা যায়, এতবড় আলেম যে তাঁর পবিত্র অন্তরকে পৃথিবী সকল ইলমের ঝরনা বানানো হয়েছে আর অবস্থা হিসেবে দেখলে দেখা যায়, তাঁর ইলম এমন অকাট্য, যাতে সন্দেহের মিশ্রণের কোনো সম্ভাবনা নেই।

অতএব, যাঁর ইলম এতটুকু কামিল যে, তাতে সংখ্যার দিক থেকে কোনো কমতি নেই আবার অবস্থার দিক থেকেও কোনো ত্রুটি নেই, তাহলে তাঁর চেয়ে বড় আলেম বা জ্ঞানী আর কে হতে পারে? তিনিই সবচেয়ে বড় আলেম। এ কারণেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো, সমস্ত সৃষ্টিজীবের মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ন্যায় বড় কোনো আলেম নেই। তিনি আলামুল খালায়েক ও আলামুল বাশার তথা সবচেয়ে বড় আলেম। সকল

মানবজাতি ও ফেরেশতা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিক ইলম দেওয়া হয়েছে। তাঁর ইলমের তুলনায় সারা পৃথিবীর ইলম সমুদ্রের এক ফোঁটা পানির মতো।

তবে একথা তো আবশ্যকীয় যে, নবীর ইলম আল্লাহর ইলমের তুলনা হলো সাগরের সামনে এক ফোঁটা পানির ন্যায়। কারণ, যেমন পার্থক্য রয়েছে খালেক ও মাখলুকের সত্তার মাঝে, তেমন পার্থক্য রয়েছে তাদের সিফাতের মধ্যে। একই পার্থক্য হতে পারে তাদের ইলমের মধ্যে। কিন্তু মাখলুক মাখলুক হিসেবে দেখা হলে কোনো মাখলুক, কোনো নবী, কোনো ফেরেশতা, কোনো অলির মধ্যে এত ইলম নেই, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে রয়েছে। তাঁদের সকলের ইলম একত্রিত করলেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জাতে পাকের ইলমের সমতুল্য হবে না।

এতে প্রতীয়মান হয়, اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ اِلَّا الْعَالِمُوْنَ সকল মানুষ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে আর আলেমরা বেঁচে যাবে। তাহলে যিনি এত বড় আলেম যে সারা বিশ্বে এত বেশি ইলমদারী নেই, তাঁর চেয়ে বেশি নাজাত লাভকারী আর কে হতে পারে? তাঁর চেয়ে বেশি কামালাত ও সফলতা আর কার হতে পারে? তাঁর চেয়ে উন্নত ও পুত-পবিত্র সীরাত আর কার থাকতে পারে?

তো সীরাতের প্রাথমিক স্তর ছিল ইলমে কামিল আর তা তাঁর মধ্যে এত অধিক যে, তার তুলনা হয় না। তাহলে তাঁর সীরাতও এমন হবে, যার তুলনা নেই। সকল নবী-রাসূলের সীরাতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাতের সাথে তাঁদের সীরাতের তুলনা চলে না। সমস্ত নবী ও ওয়ালীদের চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুলুকে আজিমের সাথে কারও তুলনা হয় না।

নবী সা.-এর পূর্ণ আমল

সকল কামিল ব্যক্তিদের আমালে সালেহার প্রতি নজর দিলে দেখা যাবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে সালেহ-এর সাথে তাদের আমলের কোনো তুলনা হয় না। উম্মতে মুসলিমার সহি আকীদা হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি সিজদা সকল উম্মতের কোটি-কোটি সিজদা হতে মূল্যবান ও উত্তম। কারণ সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা আমলের সূরতকে দেখেন না। তিনি দেখেন তার হাকিকত। যে আমলের মধ্যে ইখলাসে

কামিল (পূর্ণ নিষ্ঠা) এবং মারেফাতে কামিল থাকে, সেই আমল ওজনদারও দামি হয়।

তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বেশি ইখলাসওয়ালা আর কে হতে পারে? তাঁর চেয়ে অধিক আরেফ বিল্লাহ, তাঁর চেয়ে বেশি সুন্দর নিয়ত করনেওয়ালা আর কে হতে পারে, যাঁর জুতার সংস্পর্শে লক্ষ-কোটি মুখলিস তৈরি হয়েছে। যাঁর জুতার উসিলায় সুন্দর নিয়ত জাননেওয়ালা সৃষ্টি হয়েছে লক্ষ লক্ষ। তারা জানতে পেরেছে নিয়ত কিভাবে করতে হয়? হুসনে নিয়তের অর্থ কী। সুতরাং যে মোবারক সত্তার মধ্যে এত ইখলাস রয়েছে যে, তার নজির মিলে না। তাহলে তাঁর আমল কতটুকু ওজনদার হবে তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তাঁর একটি সিজদা এত ওজনদার যে, পৃথিবীর সকল সিজদা মিলে এত ওজনদার হতে পারে না। এ কারণেই তাঁর একটা সিজদা পৃথিবীর সকল সিজদা হতে দামি ও ওজনদার। অতএব, সবচেয়ে বড় ইলম তাঁর বরকতময় সত্তায় রয়েছে। আর এটি মানবচরিত্রের প্রথম উপাদান।

আমলের মানদণ্ড

দ্বিতীয় উপাদান কী? দ্বিতীয়টি হলো আমলে সালেহ বা ভাল কর্ম। একথা তো স্পষ্ট যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে সালেহর চেয়ে বড় কোনো আমল নেই। কারণ, তাঁর আমল সকলের আমলের মানদণ্ড। তাঁর আমল অন্যদের জন্য আদর্শ ও কষ্টিপাথর। আলেমের আমলের কষ্টিপাথর হলো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল। তাঁর আমলের মতো হলে গ্রহণযোগ্য; অন্যথায় প্রত্যাখ্যাত।

সারকথা, যাঁর আমল মানদণ্ড ও কষ্টিপাথর হয়, যাঁর আমলকে নিরীক্ষণ করে অন্যদের আমল যাচাই-বাছাই করা হয়, অন্যদের কামেল বা নাকেস বলা হয়, সত্যিকার অর্থে তাকেই কামিল আমল বলে, তার মোকাবেলায় কোনো আমলই আমল নয়। কারণ, এই আমল অন্যান্য আমলের প্রণেতা। এই আমল না হলে অন্যদের আমলই হতো না। অতএব, যে আমল অন্যান্য আমলের উৎস হবে, বীজ হবে যা থেকে আমল বের হবে, উৎপন্ন হবে, এই আমলের দাম ও মর্যাদা কেমন হতে পারে?

সুতরাং তাঁর ইলমের অবস্থা তো এমন যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের সমষ্টিগত ইলমের অধিকারী। আর আমলের অবস্থা হলো, সকল আমলের উৎস ও বীজ যে, যদি তাঁর আমল মোতাবেক হয়, তাহলে সেটি আমল হবে; অন্যথায় হবে না। এ কারণে সীরাতের দ্বিতীয় উপাদান হলো এই পবিত্র আমল। তাঁর

আমল সম্পর্কে বিশ্বাস রাখতে হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামান্য আমল উম্মতের লক্ষ্য বৎসরের আমল অপেক্ষা দামি ও উঁচু।

আমলের সঠিক ও বাস্তব বিষয়

আর নাউযুবিল্লাহ! এ বিষয়টি কোনো কবিত্ব ও অতিরঞ্জন নয় অথবা শুধু সুধারণাহেতু বলা হচ্ছে না। বরং তা বাস্তব ও সঠিক বিষয়। হাদিস শরীফে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, কয়েকজন সাহাবি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পারিবারিক জীবন নিরীক্ষণ করতে চাইল যে, তাঁর ঘরোয়া জীবন কেমন। এ নিয়তে তিনজন সাহাবি এলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে ছিলেন না। কয়েকজন পবিত্রা স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পারিবারিক ও ঘরোয়া জীবন কেমন? তাঁদের মনে ধারণা ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরেও সর্বদা তাসবীহ, তাহলীল ও নামাযে লিপ্ত থাকবেন। তাই তাঁরা জিজ্ঞেস করল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরোয়া বা পারিবারিক জীবন কেমন?

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রা. বলেন, উত্তরে তাঁদের বলা হয়েছিল, একজন সংসারী বা ঘর পরিচালনাকারীর জীবন যেমন হয়ে থাকে, রাসূলের জীবন ঠিক তেমন। তিনি নামায পড়েন, জিকির করেন, সুযোগ ও প্রয়োজন হলে ঘর ঝাড় দেন। হাড়ি-পাতিল মেঝে পরিষ্কার করেন। নিজের জুতা নিজে তৈরি করে নেন। কাপড় ছিঁড়ে গেলে নিজেই সেলাই করতে বসে যান। স্ত্রীদের সাথে বসে গল্পও করেন। কখনও-কখনও কৌতুকও করতেন। কখনও স্ত্রীদের বলতেন, কোনো ঘটনা বা কিসসা শুনাও। অতএব, একজন ঘরওয়ালার যে অবস্থা হয়ে থাকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই অবস্থা ছিল।

তাঁরা তা শ্রবণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজ ও আমলকে কম মনে করতে লাগল। তবে নিজেদের পক্ষ হতে ওজর পেশ করছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তার আগে ও পিছের সকল গুনাহ তো পূর্বেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণে তিনি যদি একেবারেই আমল না করেন, তাহলেও তাঁর মাকাম সবচেয়ে উপরে ও উঁচুতে থাকবে এবং জান্নাতে সবচেয়ে উঁচু মাকাম পাবেন। মর্যাদায় কোনো প্রকার পার্থক্য হবে না। রাসূলের আমল জানার পর তারা পরস্পর অঙ্গীকার করল এবং বলল, রাসূলের আমল তো কম; এখন আমরা আমাদের ঘরোয়া বা পারিবারিক জীবন কিভাবে গড়ব।

তাঁদের একজন বললেন–

أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا

আমি অঙ্গীকার করছি, আমি এখন সারা জীবন কখনও শয়ন করব না এবং সারা রাত নামাযে মশগুল থাকব।

দ্বিতীয়জন বললেন–

أَنَا أَصُومُ النَّهَارَ أَبَدًا وَلَا أُفْطِرُ

আমি ওয়াদা করছি, সর্বদা রোযা রাখব; কখনও রোযা ভাঙ্গব না।

তৃতীয়জন বললেন–

أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا

আমি ওয়াদা করছি, আমি নারী হতে দূরে থাকব– কখনও বিবাহ করব না।

এভাবে তাঁরা তিনজন অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। সর্বদা কিয়াম ও সিয়াম আদায়কারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির তুলনা, যে রাত্রে ঘুমায়ও এবং কিয়ামও করে, দিনে রোযাও রাখে আবার ইফতারও করে, তার থেকে অধিক আমলকারী মনে হয়। তেমনিভাবে বিবাহের পর জিম্মাদারী দায়িত্ব ও স্ত্রী-সন্তানদের কাজ-কর্ম বেড়ে যায় আর ইবাদাতে বাধা সৃষ্টি হয়। তাহলে উক্ত জযবার কারণে বিবাহ পরিহার করা যে সর্বদা ইবাদাত করব, যাতে বিবি-বাচ্চা বাধা না হতে পারে। এই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির তুলনায় উত্তম, যিনি বিবি-বাচ্চার কর্মব্যস্ততার পাশাপাশি ইবাদাত করে থাকেন। তার ইবাদাত উত্তম ও উঁচু মানের মনে হয়। কেমন যেন সে মাখলুকের সাথে সম্পর্কের কোনো পথ রাখেনি। শুধু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখে।

অতএব সংখ্যা হিসেবে এই ইবাদাত উঁচু স্তরের মনে হয়। হাদিস শরীফে এসেছে, ইতোমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং বললেন–

أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ

তোমরা এমন এমন কথা বলেছ! আল্লাহর কসম আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী এবং সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয়কারী।

এই হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা ইবাদাতের মর্ম ভুল বুঝেছ। তোমরা মনে করেছ, রাতভর নামায পড়লে

ইবাদাত হয়, দিনভর রোযা রাখলে ইবাদাত হয়, বিবি এবং বিবাহ পরিহার করলে ইবাদাত হয়। ইবাদাতের প্রকৃত অর্থ হলো, পুরোটা জীবন আল্লাহর আদেশে অতিবাহিত করা। বন্ধুদের সাথে কথা বলাও ইবাদত, ঘরে স্ত্রীর সাথে মুয়ামালা করাও ইবাদত, তাহাজ্জুদ পড়াও ইবাদাত। এসবই ইবাদাতে শামিল। আল্লাহর দেওয়া জীবনকে তাঁর হুকুম মোতাবেক পরিচালনা করাই আসল ইবাদাত।

এজন্য বলা হয়েছে–

فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَنَمْ وَقُمْ

তোমার উপর তোমার শরীরের হক রয়েছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে। তোমার চোখের হক রয়েছে। অতএব, তুমি জাগ্রত হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করো; তাহলে তাঁর হক আদায় হবে। তুমি রাতে শুয়ে পড়ো; তাহলে নফসের হক আদায় হবে।

তুমি জিহাদ করো; তাহলে আল্লাহর হক আদায় হবে আবার তা থেকে ফারেগ হয়ে অল্প সময়ের জন্য বিবি-বাচ্চাদের সঙ্গ দাও; তাহলে তাদের হক আদায় হবে। সুতরাং তুমি ঘুমাও, জাগ্রত থাকো, রোযা রাখো আবার ইফতারও করো। এ সকল কাজ করলে বলা হবে, তুমি ইবাদাত করছ। তোমরা ইবাদাতকে শুধু নামায ও রোযার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছ। নিজের জীবনকে আল্লাহর রেজামন্দির অধীনে ব্যয করার নাম ইবাদাত। নবীদের থেকে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বেশি এমন জীবনযাপনকারী আর কেউ নেই।

নবী সা.-এর পরিপূর্ণ ইখলাস

এখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেননি যে, আমি তোমাদের সকল হতে বেশি নামায পড়নেওয়ালা। কারণ, আমার আজর ও সাওয়াব বেশি এবং আমি তোমাদের সকলের চেয়ে অধিক রোযাদার। বরং যদি গণনা করা হয়, তাহলে উম্মতের নামাযের সংখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের সংখ্যা হতে বেশি হবে। তারা দিন-রাত ইবাদাত করতে থাকে। সুতরাং এখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদাতের সংখ্যা পেশ করেননি। তিনি বলেছেন–

إِنِّيْ أَخْشَاكُمْ بِاللّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ

আমার ভিতর আল্লাহর ভয় তোমাদের চেয়ে বেশি। তাকওয়া তোমাদের থেকে বেশি।

এখানে তিনি আমলের রূহ বা আত্মা পেশ করেছেন যে, এমন কামিল তাকওয়া এবং ভয়ের সাথে এক সিজদা হলে তোমাদের হাজারো বছর ইবাদাত হতে অধিক বড় ইবাদাত বলে গণ্য হবে। কেমন যেন ইবাদাতের মৌলিক বুনিয়াদ হলো ইখলাস লিল্লাহ ও খাউফ লিল্লাহ এবং তাকওয়ায়ে বাতিন তথা একা বসে আল্লাহকে ভয় করা। এমন তাকওয়ায়ে বাতেনির সাথে যে ইবাদাত হবে, তা অবশ্যই উত্তম ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে।

মোটকথা, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলম কামিল এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের ইলমের সমষ্টি আর তাঁর আমলও কামিল; তাহলে ওখানে তাঁর তাকওয়া এবং ইখলাসও এতটুকু কামিল হবে যে, সারা উম্মতের ইখলাস মিলেও এমন ইখলাস হতে পারবে না যে, ইখলাস আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন। কারণ, যেমন পবিত্র কালব আত্মা তাঁকে দেওয়া হয়েছে এমন পবিত্র কালব আর কারো দেওয়া হয়নি। যে পবিত্র শরীর ও রূহ তাঁকে দেওয়া হয়েছে এমনটি অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। সুতরাং ঐ পাত্রে সেই জিনিস ভরবে, তা একমাত্র রাসূলের পাত্রেই ভরতে পারবে– অন্যের পাত্রে নয়।

মোটকথা, তাঁর মধ্যে ইলম ও আমল উভয়ই পরিপূর্ণরূপে রয়েছে। তেমনিভাবে ইখলাস লিল্লাহও পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান।

ফিকরে নববীর পূর্ণতা

রয়ে গেল ফিকরের আলোচনা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে আখেরাতের ফিক্‌র তথা ভয় থাকার অবস্থা ছিল এমন যে, হাদিস শরীফে তিনি ইরশাদ করেছেন, নামায শেষ করে যখন একদিকে সালাম ফিরাই, তখন আমার আশা থাকে না, দ্বিতীয় সালাম ফিরাতে পারব।

তিনি এত পরিমাণ আশংকা এবং আখেরাতের ভয় অনুভব করতেন। আর নিজের মরণের স্মরণ ও আলোচনা এমন পর্যায়ের ছিল যে, তিনি বলতেন, এক সালামের পর দ্বিতীয় সালামের আশা করতে পারি না। এ ছিল তাঁর ফিকরে আখেরাতের অবস্থা।

হাদিস শরীফে এসেছে–

كَانَ دَائِمَ الْفِكْرَةِ حَزِيْنًا

তিনি অধিকাংশ সময় চিন্তাযুক্ত থাকতেন।

যেমন কোনো চিন্তাযুক্ত ব্যক্তি বসে আছেন, কোনো পেরেশান ব্যক্তি বসে আছেন। তা ছিল তাঁর আখেরাতের ফিকির। সর্বদা আখেরাতের চিন্তা সামনে থাকত। এমনটিই ছিল নবীদের কামালাত যে, তাঁরা দুনিয়াবাসীর হক আদায় করবে এবং আখেরাতের ফিকিরে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকবে। তিনি ঘরে যেতেন, বিবি-বাচ্চাদের সাথে মুয়ামালা করতেন। সাহাবাদের সাথে মুয়ামালা হত, রাষ্ট্রের সমস্যার সমাধান দিতেন, বিবাদ মিটাতেন, জিহাদ করতেন, গনিমতের মাল বণ্টন করতেন। কিন্তু এত কিছুর পরও আখেরাতের ফিকির নিয়মতান্ত্রিক কায়েম থাকত। অতএব তাঁর চেয়ে অধিক চিন্তাশীল আর কে হতে পারে?

ঈমানের প্রাণ

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঈমান ভয় ও আশার সমষ্টির নাম। অর্থাৎ শুধু খাউফের নাম ঈমান নয়, আবার শুধু আশার নামও ঈমান নয়। বরং উভয় অবস্থা জমা থাকবে। আশাও থাকবে, ভয়ও থাকবে; তাহলে আখেরাতের ফিকির সৃষ্টি হবে আর এটিই মূলত ঈমানের রূহ বা প্রাণ।

কুরাআনুল কারীমে দুটি বাক্য এসেছে। এক স্থানে বলা হয়েছে–

وَ لَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ۝

তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না। *[সূরা ইউসুফ : ৮৭]*

এ আয়াতে আশার কথা বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যদি আল্লাহর প্রতি আশা না থাকে, তাহলে তোমাদের মধ্যে ঈমান নেই। নিরাশ হওয়া কাফেরদের কাজ। মোটকথা, এখানে ঈমানের একাংশ আশার কথা বলা হয়েছে।

অন্য স্থানে এসেছে–

فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ۝

বস্তুত আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে,
যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে। *[সূরা আরাফ আয়াত : ৯৯]*

যারা আল্লাহর সূক্ষ্ম তদবির থেকে নিশ্চিন্তে বসে থাকবে, তারাই সর্বদা নিশ্চিহ্ন হবে। এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নিশ্চিন্তে বসে থেকো না; বরং খাউফ ও ফিকিরে লেগে থাকো। এখানে ঈমানের দ্বিতীয় অংশ খাউফের কথা বলা হয়েছে।

মোটকথা, প্রথম আয়াতে আশার কথা বলা হয়েছে আর দ্বিতীয় আয়াতে খাউফের কথা বলা হয়েছে। আর খাউফ ও রাজা উভয়ের মাঝে ঈমান। শুধু আশার নাম ঈমান নয় এবং শুধু ভয়ের মাঝে থাকার নাম ঈমান নয়।

ফিকরে আজীম

আমল করলে ঐ ব্যক্তিই করবে, যার মধ্যে আশা বিরাজমান এবং ভীতি বিরাজমান। যে খাদেম শুধু আশার মধ্যে ডুবে থাকে, সে কখনও আমল করতে পারে না। তেমনি যে খাদেম শুধু ভয়ে তটস্থ থাকে, সেও আমল করতে পারে না। যে ব্যক্তির সর্বদা মালিকের প্রতি এমন আশা থাকে যে, মন্দ করি আর ভাল করি চাই হাজারো গুনাহ করি; কিন্তু তিনি তো ক্ষমা করে দেবেন। পরিশেষে তার থেকে ফলাফল এমন মিলবে যে, সে চিন্তা করবে আমল করে কষ্ট সহ্য করার কী প্রয়োজন? যেহেতু মালিক এত দয়ালু যে, তিনি ক্ষমা করে দেবেন, তাহলে আমি কেন অহেতুক কষ্ট করতে যাব। তিনি তো ক্ষমা করে দেবেন। অতএব, যে ব্যক্তি শুধু আশায় ডুবে আছে, সেই ব্যক্তি আমল (কাজ) থেকে বেকার ও অকেজো হয়ে যাবে।

তেমনিভাবে যে সর্বদা ভয়ের ভিতর থাকে, সে কিছু মেহনত করলেও গায়ে জুতা পড়বে। কিছু আমল করলেও পেটানো হবে, তাহলে সে চিন্তা করবে এবং বলবে, তাহলে আমলের কী প্রয়োজন? যখন প্রথমেও জাহান্নাম, শেষেও জাহান্নাম, তাহলে অহেতুক কেন মেহনত করতে যাব। সেও আমল করা থেকে বেকার হয়ে যাবে। সুতরাং শুধু ভয়ে সন্ত্রস্ত ব্যক্তি আমল করতে পারে না এবং আশায় মত্ত ব্যক্তিও আমল করতে পারে না। তাহলে আমল করবে কে?

একদিকে আশান্বিত হয়ে আছে যে, যদি নেক কাজ করি, তাহলে প্রতিদান ও সাওয়াব মিলবে, অপরদিকে ভয়ে আতংকিত যে, যদি পাপ করি, তাহলে মৃত্যুর পর জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে। অতএব, আশা ও ভয় উভয়ের সমন্বয়ে মানুষের আমলের গাড়ি চলে। আশা ও ভয় দুটি পাখার ন্যায়, যার দ্বারা আমল ওড়ে।

সুতরাং ঈমান ভয় ও আশা উভয়ের সমষ্টির নাম। আল্লাহর প্রতি আশাবাদীও থাকবে এবং ভীত-সন্ত্রস্তও থাকবে। এ কারণে শুধু ভয়ের নাম ঈমান নয় এবং শুধু আশার নামও ঈমান নয়। এ দুটির মধ্যস্থলে থাকার নাম ঈমান। এরই নাম তাফাক্কুর। একেই ফিকরে আজিম বলে যে, মনে হয় আমার আমল সহি হবে না, আমি ধরা খেয়ে যাব। সম্ভাবনা রয়েছে, এই পাপ ক্ষমা করা হবে, আমি কেন তাওবা করে ফেলি না; আমার মালিক তো রাহীম ও কারীম। এমন চিন্তা করলে আল্লাহর রহমতের প্রতিও দৃষ্টি থাকবে এবং তাঁর শাস্তির প্রতিও দৃষ্টি থাকবে। এর উপরও নজর থাকবে যে–

نَبِّئْ عِبَادِيْ اَنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

এবং এর প্রতি নজর থাকে যে–

وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَالْعَذَابُ الْاَلِيْمِ

হে পয়গাম্বর! আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন, আমি অনেক বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এবং এও বলে দিন যে, আমার শাস্তিও অনেক কঠিন শাস্তি।

আমি এমন শাস্তি দিতে পারি, যা অন্য কেউ দিতে পারে না। এখানে উভয় কথা বলা হয়েছে যে, তাদেরকে রহমত তালাশকারী বানাবেন আবার শাস্তির ভয়কারীও বানাবেন। তো উভয়টা সমানভাবে মানুষের জন্য উদ্দেশ্য। আর একেই বলে ঈমান। তাই ফিকির কামিল হলে ঈমানও কামিল হবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফিকিরের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়; বলা হয়েছে–

كَانَ دَائِمَ الْفِكْرَةِ حَزِيْنًا

তিনি সর্বদা ফিকরে আখেরাতে ডুবে থাকতেন।

সুতরাং তিনি সায়্যেদুল মুতাফাক্কিরীন, সায়্যেদুল মুফাক্কিরীন। পৃথিবীতে এমন ফিকির কাউকে দেওয়া হয়নি, তাঁকে যা দেওয়া হয়েছে। এত বড় ইখলাস কারো মধ্যে ছিল না, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এত বড় আমলে সালেহ কারো মাঝে ছিল না, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এত পরিমাণ ইলমে নাফে ও ইলমে কামিল কারো ভিতর ছিল না, যতটুকু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছিল।

যেহেতু মানবসীরাত এই চারটি উপাদান দ্বারা ঘটিত হয়, তাহলে যে মানবের মাঝে এই চারটি বস্তু পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকবে, তাঁর সীরাত ও আকমালুস

সিয়ার তথা পরিপূর্ণ সীরাত হবে। তাঁর সীরাত সবচেয়ে উন্নত ও উঁচু মাপের হবে। তাঁর সীরাতের মোকাবেলা কেউ করতে পারবে না। কোনো সীরাত তাঁর নিকট পৌছতে পারবে না।

জীবনের সংবিধান

এমন সীরাতের সম্বোধিত ব্যক্তিরা হলো মুসলমানরা এবং পৃথিবীর সকল মানুষ, যাদের সামনে তা পেশ করা হলো। আর এজন্য পেশ করা হলো, যাতে তার এই সীরাতকে কষ্টিপাথর বানিয়ে নিজেদের সীরাতকে তার উপর যাচাই করতে পারে যে, এই সীরাতের সাথে আমাদের আদত ও খাসলত কতটুকু মিল খায় আর কতটুকু আমরা তা হতে দূরে এবং কতটুকু পরিবর্তিত।

মোটকথা, সীরাতের বয়ান এজন্য হয় না যে, এটি একটি কাহিনী, যা শুনিয়ে দেওয়া হবে অথবা এটি একটি কিস্‌সা, যা পড়ে শুনিয়ে দেওয়া হবে। সীরাত একটি মানদণ্ড এবং জীবনের সংবিধান। তার আলোচনা এজন্য করা হয়, যাতে মানুষ নিজেদের বাড়িতে গিয়ে আপন জীবনকে তার উপর পরিচালিত করতে পারে। তারা পরখ করতে পারে, আমার মাঝে ইলমে নাফে' আছে, না নেই, যা দ্বারা আমি হক ও বাতিলের মাঝে পরখ করতে পারব। আমার মধ্যে আমলে সালেহ আছে, না নেই, যা আমার মুক্তির কারণ হবে। আমার ভিতর কি ইখলাস আছে? নিফাক তো নেই যে, আমার আমল গ্রহণযোগ্য হতে পারে? আমার মধ্যে কি ফিকরে সালিম আছে, না আমি ফিকিরবিহীন জীবন যাপন করছি। আমার অবস্থা কেমন? এই অবস্থাগুলো যাচাই করার জন্য সীরাত হলো কষ্টিপাথর, যা আপনাদের পেশ করা হলো।

কিতাব ও সুন্নাতের বিশাল পাথর

কুরআনুল কারীম আপনার সামনে মূলনীতি পেশ করছে। সে ইলম এবং মুহাম্মাদী কীর্তি পেশ করছে যে, এ হলো কষ্টিপাথর; এতে তোমাদের আমলকে নিরীক্ষণ করো, যাচাই-বাছাই করো। তোমর আকীদা-বিশ্বাসকে কুরআনের কষ্টিপাথরের উপর রেখে যাচাই করো তা সঠিক, না বেঠিক? আর আমলকে জাতে মুহাম্মাদীর উসওয়ায়ে হাসানার (উত্তম আদর্শ) উপর রেখে যাচাই করো যে, তোমার আমল তার সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কতটুকু অসামঞ্জস্য। এ বিষয়টিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِيْ اَبَدًا اَنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا

আমি তোমাদের মাঝে দুটি ভারী বস্তু রেখে যাব। যদি তোমরা সেগুলো দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, তাহলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না, কখনও পথ হারাবে না।

দুটি বস্তু কী?

১. কিতাবুল্লাহ, ২. আমার সুন্নাত।

অর্থাৎ আল্লাহর পাঠানো কিতাব আর আমার সুন্নত ও কর্মপদ্ধতি। এ দুটি বস্তুকে আল্লাহর রাসূল ভারী বস্তু বলেছেন। তা কেন বলেছেন? কারণ, যখন ফেতনার তুফান আসবে এবং ফেতনার, পাপের, কুফরের, অন্যায়ের ও মুনকারাতের নদি জারি হয়ে যাবে, তখন যদি আপনি গাছের একটা ডাল আঁকড়ে ধরেন, তাহলে তুফান তা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সাথে সাথে আপনাকেও নিয়ে যাবে। আর প্রাণরক্ষার জন্য যদি ঘরের কড়িকাঠ আঁকড়ে ধরেন, তাহলে ঝড়-তুফানে তাও টিকে থাকতে পারবে না। সেও ভেসে যাবে, আপনাকেও নিয়ে যাবে। তেমনিভাবে সে সময় যদি আপনি গাছকে আঁকড়ে ধরেন, তাহলে তুফান গাছকে শিকড়সহ উপড়ে নিয়ে যাবে। ফলে সেও ভেসে যাবে, আপনাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যদি এমন পাথরকে আকড়ে ধরেন, যা বিশাল পাহাড়ের ন্যায়, তাহলে যত তুফানই আসুক তাকে টলাতে পারবে না। তখন না পাহাড়কে হেলাতে পারবে না, আপনাকে ভাসাতে পারবে। অর্থাৎ তুফানের কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না।

এ কারণে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলকে ভারী বস্তু বলা হয়েছে। অর্থাৎ এগুলো এত ভারী ও ওজনি বস্তু যে, যত বড়ই ফেতনা ও গোমরাহির ঝড়-তুফান প্রবাহিত হোক-না কেন তখন যে ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাহর পাথরকে আঁকড়ে থাকবে, সে কখনও নিজস্থান হতে নড়বে না। এ ছাড়া যত জিনিসই ধরবে তাকেসহ তা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সেগুলো এত শক্তিশালী ও ভারী হবে না যে, আপনাকে ফেতনার ঝড়-তুফানে টিকিয়ে রাখবে।

তো এখানে এক পার্শ্বে কুরআন রাখা হয়েছে আর অপর পার্শে সুন্নাত রাখা হয়েছে। উভয়ের সমষ্টি অর্থ সীরাতে মুহাম্মাদী এবং উসওয়ায়ে হাসানা বা উত্তম আদর্শ। অতএব হাদিস উসওয়ায়ে হাসানাকে পেশ করে আর কুরআনুল কারীম ইলমকে পেশ করে। তাই কুরআনুল কারীমে নিজের চিন্তাধারাকে নিরীক্ষণ করো যে, তোমার আকিদা সঠিক, না বেঠিক। আর আমলকে নিরীক্ষণ করো উসওয়ায়ে হাসানা দ্বারা। তার মোতাবেক হলে জানবে, সঠিক আছে আর না হলে বুঝবে, ভুল আছে। সেগুলো ইসলাহ ও সংশোধন করে নাও।

উসওয়ায়ে সাহাবা বা সাহাবাদের আদর্শ

এ ব্যাপারটাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো অধিক সহজ ও আসান করে দিয়েছেন যে, তাঁর পবিত্র ও বরকতময় সত্তা তো কষ্টিপাথর। তার উপর ইলম, আকিদা ও আমলকে যাচাই করা যাবে। সাথে সাথে তিনি তাঁর সাহাবীদেরও তাতে শামিল করে নিলেন যে, তারাও তোমাদের মাপকাঠি। যদি তোমরা নিজেদের ইলম ও আমলকে তাদের উপর রেখে নিরীক্ষণ কর, তাহলেও হক ও বাতিল চিনতে পারবে। কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজের জীবন তো অনেক উন্নত ও উপর পর্যায়ের। কেউ তো সেখানে পৌঁছতে পারবে না। এমনকি তাঁর উঁচু মর্যাদা পর্যন্ত দৃষ্টিও পৌঁছতে সক্ষম নয়। কিন্তু সাহাবাদের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মের প্রত্যেক নমুনা বা মডেল বিদ্যমান। তাঁদের কেউ ব্যবসায়ী, কেউ কৃষক, কেউ ফকীহ, কেউ আলেম, কেউ বিচারক, কেউ ঘরে বসবাসকারী, কেউ একাকিত্ব পছন্দকারী, কেউ লোকসমাজে বসবাস পছন্দকারী, কেউ মুজাহিদ, কেউ মুজাহাদাপ্রিয় ইত্যাদি সকল নমুনা তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اصحابی کالنجوم بِاَیِّهِمْ اِقْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ

আমার সাহাবারা তারকার ন্যায় পথপ্রদর্শক। যার আলোতে চলবে, হিদায়াত ও সঠিক পথ পেয়ে যাবে।

অতএব, তিনি সুস্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, আমার জাত তো কষ্টিপাথর আছেই; সাথে সাথে আমার সাহাবিরাও তোমাদের ইলম ও আমল যাচাই করার জন্য কষ্টিপাথার। অর্থাৎ জাতিগতভাবে আমি তো মাপকাঠি আছিই; কিন্তু আমি যাকে মাপকাঠি বলব, সেও মাপকাঠি হবে। তো তিনি তাঁর সাহাবাদের মাপকাঠি বললেন।

সাহাবাগণ সত্যের মাপকাঠি

হাদিস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইয়াহুদী ও নাসারা জাতি বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত তেহাত্তর ভাগে বিভক্ত হবে। তাদের সবাই ধ্বংসে নিপতিত হবে। মাত্র একদল নাজাত বা মুক্তি পাবে। অর্থাৎ পরকালে আমলের কারণে অনেক মানুষ এমন থাকবে যে, তারা সাজাপ্রাপ্ত হবে। পরিশেষে তারা মুক্তি পাবে। কিন্তু আকীদা-বিশ্বাসের কারণে যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তারা বাহাত্তর ফেরকার লোক হবে। আর

তেহাত্তরতম ফেরকার লোকদের উপর আকীদার কারণে কোনো প্রকার শাস্তি হবে না। তবে আমলের মধ্যে কোনো দোষ থাকলে হয় ক্ষমা করে দেবেন, না হয় শাস্তি দেবেন। এ কারণে তিনি বলেছেন–

كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً

সবাই জাহান্নামি হবে; মাত্র একদল জান্নাতি হবে।

এ কথা শ্রবণের পর সাহাবারা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ মুক্তিপ্রাপ্ত ফেরকা কারা? তিনি বললেন–

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

আজ যে বস্তুর উপর আমি ও আমার সাহাবারা রয়েছি।

এইটি মূলত মাপকাঠি বা মাপকাঠি যে, তিনি নিজেকে এবং নিজের সাহাবাদেরকে পেশ করেছেন। তার নির্যাস হলো আমার ও আমার সাহাবিদের আকিদার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, উভয়ের আকীদা এক ও অভিন্ন। আমার আমল ও আমার সাহাবিদের আমলে কোনো অমিল নেই। আমার যে আমল, তাঁদেরও একই আমল। আমার ফিকির ও তাঁদের ফিকিরের মধ্যে তফাৎ নেই। আমার যে মাকসাদ তাঁদেরও একই মাকসাদ। তিনি নিজের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাহাবাদেরকে শামিল করেছেন। তার উদ্দেশ্য হলো, তেহাত্তর ফেরকার মধ্যে হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী একটি মাপকাঠি হলাম আমি নিজে আর আরেক মাপকাঠি হলো আমার সাহাবারা। তাঁদের সামনে তোমরা নিজেদের পেশ করবে, যদি তাঁদের মোতাবেক হয়, তাহলে বুঝবে হকের উপর রয়েছ। আর যদি বিপরীত হয়ে যায়, তাহলে তা সংশোধন করে নাও। তাহলে তোমরা বুঝবে, তোমাদের মধ্যে বাতিল ও নাহক বস্তু রয়েছে। তাই সাহাবাদেরকে মাপকাঠি বলা হয়েছে।

সাহাবা জামাতের পবিত্রতা বর্ণনাকরণ

কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা উম্মতের মধ্যে তবকা হিসেবে শুধু সাহাবাদের তবকা বা দলকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুকাদ্দাস বলেছেন। অনেক ব্যক্তি আসবেন, যারা কামিল ও মুকাম্মিল হবেন। কিন্তু জামাত বাই জামাত মুকাদ্দাস হবে এ ব্যাপারে কোনো তবকাকে পৃথক করেননি। এটি শুধু সাহাবাদের বেলায় করেছেন। এটি তাঁদের জন্য মাপকাঠি। সুতরাং তাঁরা মাপকাঠি হিসেবে প্রমাণিত হলো।

যাদের মধ্যে সাহাবাদের মহব্বত ও আযমাত দেখতে পাবে, তো মনে করবে, সে হকপন্থী। আর যদি মহব্বত না থাকে বরং গাল-মন্দ ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে, তাহলে বুঝে নিবে, তারা হকপন্থী নয়; তাদের হক্কানী বলা যাবে না।

যারা সাহাবাদের ব্যাপারে এমন মনে করবে যে, তাঁরা সবাই মুত্তাকী, পুণ্যবান ও পবিত্র, তাদের নিয়ত সঠিক, তাদের অন্তরের গতি সত্য, তাহলে বুঝে নিবেন, তারা হকপন্থী। আর যে ব্যক্তি বা জামাত (নাউযুবিল্লাহ!) বলবে, তাঁদের মধ্যে মুনাফিক ছিল, তাঁদের মধ্যে তো ভুলকারী, গুনাহগারও ছিল, তাঁদের গাল-মন্দও করে, তাহলে বুঝে নিবেন, তারা হকপন্থী নয়; বরং বাতিলপন্থী।

এখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হক ও বাতিলপন্থী ফেরকা পরিচয়ের জন্য একটা সাদাসিধে মানদণ্ড বলে দিলেন। যারা সাহাবাদের গাল-মন্দ করবে, তারা বাতিল। যারা সাহাবাদের পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পিছনে পড়ে, তারাও বাতিল, যারা বলে থাকে, আমার শরীয়তের মাপকাঠি সাহাবারা নন, আমরা তাঁদের যাচাই-বাছাই করতে পারি, তাঁরা আমাদের যাচাই-বাছাই করতে পারে না, তাহলে বুঝে নিবেন, এগুলো বাতিলপন্থী ফেরকার কথা। কোনো হকপন্থীর কথা এমন হতে পারে না।

মোটকথা, সাদাসিধে একটি মাপকাঠি বলে দিলেন, যা দ্বারা ফেরকাসমূহের হক ও বাতিল এবং ভ্রান্তি ও শুদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যাবে। অর্থাৎ আমাকেও দেখে নাও এবং আমার সাহাবাদেরও দেখে নাও।

সন্তুষ্টির ঘোষণা

কুরআনুল কারীম যে তবকার পবিত্রতা বর্ণনা করেছে, তা হলো সাহাবাদের তবকা। ইরশাদ হয়েছে–

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত ঝরনাসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো বড় সফলতা। [সূরা তাওবা আয়াত ১০০]

অর্থাৎ এই মুহাজির, আনসার ও তাঁদের সাথে যারা পরবর্তীতে মিলিত হবেন, তাঁরা সবাই কারা?

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাজি, তারাও আল্লাহর প্রতি রাজি।

এখানে আল্লাহ তায়ালা উভয় পক্ষের রাজির ঘোষণা করলেন। আল্লাহ তাদের উপর কখনও সন্তুষ্ট হবেন না, যাদের অন্তরে কোনো ত্রুটি ও ছল-চাতুরি হতো। তাঁদের প্রতি সাধারণ সাধারণ সন্তুষ্টির ঘোষণা কখনও করতেন না। রিযা বা সন্তুষ্টির ঘোষণা এটি কুরআনুল কারীমের ঘোষণা। আর কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে এমন কিতাব। অতএব জীবনভর তথা কেয়ামত পর্যন্ত ঘোষণা হতে থাকবে। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত এবং কেয়ামতের পরেও উক্ত ঘোষণা ভুল হতে পারে না। তো কুরআনুল কারীমে এভাবে বারবার পঠিত হতে থাকবে–

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

আল্লাহ তায়ালা এ সকল মুহাজির ও আনসারদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁদের সাথে যাঁরা পরবর্তীতে মিলিত হবে। অর্থাৎ সবাই আল্লাহর সন্তুষ্টের মধ্যে শামিল। এমন একজন নেই, যার প্রতি আল্লাহ নারাজ ও অসন্তুষ্ট। প্রথমে তো সাহাবা জামাতের প্রতি নিজের সন্তুষ্টির ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেননি, প্রথম যুগের আনছার ও মুহাজিরগণ এ হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বরং বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ

যারা পরবর্তীতে পরিপূর্ণরূপে তাঁদের সাথে মিলিত হবে, অনুসরণ করবে এবং তাঁদের দল ভারী হতে থাকবে, তারা সবাই সন্তুষ্টির ঘোষণায় দাখিল হবে।

অর্থাৎ সন্তুষ্টির ঘোষণায় সকল সাহাবার পবিত্রতার বর্ণনা হলো যে, সবাই সন্তুষ্টির অন্তর্ভুক্ত। তারপর স্তর বাই স্তর পবিত্রকরণ করেছেন- সুতরাং এক স্থানে হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ কারীদের ব্যাপারে বলেছেন–

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার হাতে বাইয়াত হলো। [সূরা ফাতাহ আয়াত- ১৮]

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ঐ ঈমানওয়ালাদের উপর সন্তুষ্ট, যারা বৃক্ষের নিচে হে নবী! আপনার হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করেছিল। তাদের জন্যও সন্তুষ্টির ঘোষণা করলেন।

আমলে সাহাবার প্রশংসাকরণ

অপর এক আয়াতে তাঁদের আমলের প্রশংসা করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরদের অবস্থা এই যে, তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। তাদের কর্মপদ্ধতি কী? তাঁদের দেখবেন কখনও রুকু অবস্থায়, কখনও সিজদারত অবস্থায়, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি স্থানে-স্থানে তালাশ করে বেড়াচ্ছে। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর অনুগ্রহ তাদের উদ্দেশ্য থাকে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর রেজামন্দি অর্জনই তাঁদের কাম্য। *[সূরা ফাতাহ আয়াত ২৯]*

সাহাবাদের পরিপূর্ণ মারেফাত লাভ

তাঁদের অন্তরে এত পরিমাণ ঈমান ভরপুর ছিল এবং কালবি মাকামগুলো এত পরিমাণ পবিত্র ছিল যে, যখন কোনো জিনিস দ্বারা পাত্র ভরা হয়, তখন পরিশেষে পাত্রে সেই বস্তুর রং ও ঝলক ফুটে ওঠে। তেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামদের অন্তর এত পরিমাণ ভরপুর ছিল যে, তার রং ও ঝলক তাঁদের কপালে প্রকাশ পেয়ে ছিল। এ বিষয়টিকে আল্লাহ তায়ালা এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ

তাঁদের কপালে সিজদার চিহ্ন ও নিশানা ছিল।

অর্থাৎ ভিতরের ঈমানের চিহ্ন উপরে ভেসে ওঠে এবং ভিতরগত পূর্ণ মারেফাতের আলামত উপর অংশে উদ্ভাসিত হয়েছিল। তারপর বলা হয়েছে–

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ

শুধু এই কুরআনেই তাঁদের গুণাবলির প্রশংসা করা হয়নি। তাদের এই অবস্থা তাওরাতেও ব্যক্ত হয়েছে। ইঞ্জিলেও ব্যক্ত হয়েছে।

অর্থাৎ পূর্ববর্তী মানুষেরা তাঁদের প্রশংসা করে এসেছেন এবং পরবর্তী মানুষেরাও তাঁদের প্রশংসা করতে থাকবেন। তো যারা আল্লাহর সকাশে প্রশংসিত, তারা তাঁর নেক বান্দাদের নিকটও প্রশংসিত। তাদের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় যুগের মানুষ সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত দিতে থাকবেন। তাঁরা হলেন সাহাবাদের তবকা। সুতরাং এই তবকা সম্পর্কে কোনো দোষ-ত্রুটি মেনে নেওয়া যেতে পারে না। অন্যথায় এ সকল আয়াত অপাত্র হয়ে যায় এবং আল্লাহ তায়ালা সকল সন্তুষ্টি নাউযুবিল্লাহ অজায়গায় পতিত হওয়া আবশ্যক হয়।

সাহাবা অন্তরের প্রশংসাকরণ

কেউ যদি বলে, ভাই সাহেব, তাঁদের হালত তো এমনই ছিল। কিন্তু হতে পারে, পরবর্তীতে কিছু খারাবি সৃষ্টি হয়ে গেছে। হতে পারে পরে কোনো দোষ ত্রুটি হয়েছে? তাহলে তাদের এ ধারণা প্রথমত তো ভুল ও ভ্রান্ত এজন্য যে, এটি কুরআনুল কারীমের সাক্ষ্য আর কুরআন জন্মের পর থেকে তার ঘোষণা করে আসছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবে। সুতরাং তাদের এই ধারণা স্রেফ ধারণা। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, কুরআন শুধু তাঁদের আমলের তাকদিস করেনি বরং একস্থানে তাঁদের অন্তরেরও প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۚ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

তারা এই তবকার লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা শোধিত করেছেন, পরীক্ষা করেছেন, তারা পরীক্ষায় সফলকাম হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে কোনো দোষ-ত্রুটি ও খারাবি নেই। তাই তাদের জন্য ক্ষমাও রয়েছে এবং মহাপুরস্কারও রয়েছে। *[সূরা হুজুরাত ৩]*

তো তাদের জন্য দুটি বস্তু রয়েছে। একটি মাগফিরাত, যা আখেরাতে মিলবে আর অপরটি উত্তম পুরস্কার, যা দুনিয়াতে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের ইহকাল ও পরকাল উভয়টাই দুরস্ত।

ফেরকায়ে নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত জামাত

মোটকথা, যে জামাতের কলব বা অভ্যন্তরীন বস্তুর প্রশংসা করা হয়েছে, তাঁদের বহিরাংশেরও প্রশংসা করা হয়েছে। প্রশংসা করা হয়েছে তাঁদের আমলের, প্রশংসা করা হয়েছে পুরো তবকার। সেই তবকা এমন হতে পারে না যে, তাঁদের সম্পর্কে কেউ সামান্য দোষ-ত্রুটি ইয়াকিন বা বিশ্বাস রাখবে অথবা কুধারণা সৃষ্টি হবে। কারণ, তাঁরা হলেন সত্যের মাপকাঠি। যাদের অন্তরে সাহাবাদের আযমত, মহব্বত থাকবে না, সেই ফেরকার লোকেরা 'মুক্তিপ্রাপ্ত' জামাত হতে বের হয়ে যাবে। তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে স্থির হবে, যাদের অন্তরে সাহাবাদের আযমত রয়েছে।

তারা কারা? যারা বলে এবং বিশ্বাস করে–

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ

সকল সাহাবা ন্যায় আস্থাভাজন, মুত্তাকী, নিষ্কলুষ ও পবিত্র।

ইজতিহাদী ভুল

তাঁদের থেকে ইজতিহাদি (উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা) এর ভুল হতে পারে। কিন্তু মুজতাহিদ ব্যক্তির ভুল হলেও তিনি সাওয়াব পান। তার ভুলও শরীয়তে গ্রহণযোগ্য। তাই সাহাবাদের মধ্যে যদি ইজতিহাদি ভুল সংগঠিত হয়ে যায়, তাহলে তা আমাদের ইবাদাত-আনুগত্য থেকে তো উত্তম। কারণ, তাদের ভুলের কারণে প্রতিদান দেওয়া হয়। আর ইজতিহাদি ভুলের দ্বারা তাদের নিয়তের কোনো প্রকার খারাবি সৃষ্টি হয়নি।

দুনিয়াতে যদি তাঁদের কোনো খারাবি প্রকাশ পেয়ে থাকে অথবা কোনো পাপ কর্ম প্রকাশ পেয়েও থাকে, তবে তাঁদের অন্তর খারাবি অথবা নিয়তের দোষ-ত্রুটি থেকে অকাট্যভাবে পবিত্র ছিল। আমলের মধ্যে যদিও কোনো ভুল হয়ে থাকে, তাও দুনিয়াবি আমলের মধ্যে। কিন্তু তাঁরা তার জন্য এত পরিমাণ তাওবা ও ইস্তিগফার করেছেন যে, সম্ভবত আমাদের সারা জীবনের আমলে সেই পরিমাণ সাওয়াব মিলবে না, যে পরিমাণ সাওয়াব তাঁরা তাওবা ও ইস্তিগফারের কারণে পেয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের পদোন্নতির জন্য তাঁদের দ্বারা এমন কর্ম করিয়েছেন। মোটকথা, কোনো খারাবি হলেও দুনিয়াবিদ আমলে হয়েছে।

সীরাতে নববীর তাকদিস

কিন্তু দীনি কর্ম, ইলম ও তাবলিগ এবং আহকাম ও আকাঈদ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা সবাই মুত্তাকী, ইনসাফগার, নিষ্কলুষ ও পবিত্র। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের অন্তর শোধিত করেছেন। সুতরাং যে বরকতময় সত্তার সাগরেদদের অবস্থা এমন হয়, তাদের উস্তাদের অবস্থা কেমন হবে?

হযরত ঈসা আ. বলেছেন, 'বৃক্ষের পরিচয় মিলে ফল দ্বারা। যদি ফল মিষ্টি হয়, তাহলে তা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আর ফল তিক্ত হলে নিন্দাবাদ পাওয়ার যোগ্য।' তাই যে বৃক্ষের ফলের এমন অবস্থা, সেই বৃক্ষের কী শান হতে পারে? যে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার এমন মেহেরবানি, তাদের মূলের মধ্যে কী পরিমাণ অনুগ্রহ থাকতে পারে? সুতরাং যে মোবারক সত্তার তারবিয়াত বা শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা সাহাবারা সাহাবায় পরিণত হয়েছেন, তাহলে সেই সত্তার বুযুর্গী ও পবিত্রতা এবং তাঁর সীরাতের পবিত্রতার কী হালত হতে পারে। অতএব সাহাবাদের সীরাত পরিচয়ের মাধ্যমে সীরাতে মুহাম্মাদীর পরিচয় লাভ হতে পারে, যে পবিত্র সত্তা কম-বেশি এক লক্ষ্য চব্বিশ হাজার নমুনা-আদর্শ নিজের মতো তৈরি করেছেন। একজন মুরুব্বীর কামিল তারবিয়াতের আলামাত যে, নিজের শাগরেদদেরও নিজের মতো বানিয়েছেন। তিনি সাহাবাদেরকে নিজের নমুনা বা মডেল বানিয়ে দিলেন। আর তাঁদের সংখ্যা এক বা দুজন নয়; বরং প্রায় এক লক্ষ্য চব্বিশ হাজার ব্যক্তির নমুনা, যারা পুণ্যবান এক বিরাট জামাত। যাঁরা রাসূলের ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। আর তাঁরাই পৃথিবীকে ইলম ও দীন দ্বারা ভরে দিয়ছেন।

মোটকথা, যে মূলের শাখা-প্রশাখা এমন, সেই আসল কেমন? যে সত্তার ফল এমন, তার বৃক্ষ কেমন? সে ওস্তাদের ছাত্র এমন, সেই ওস্তাদ কেমন? যে শায়েখের তারবিয়াত এমন, সেই শায়েখের পবিত্রতা কেমন?

মুকাম্মাল সীরাত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাতকে মনুষ্যত্বের উসূলে নিরীক্ষণ করলে আমি মানবরচিত্রের যে চারটি মূল উপাদান বর্ণনা করেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কামিল ও মুকাম্মাল হলো রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীরাত। তা হলো আসল বা মূল। আর শাখা হিসেবে দেখলে দেখতে হবে সাহাবাদের। যখন সাহাবাদের সীরাতের পবিত্রতার অবস্থা এমন যে, স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাতের পবিত্রতা ও

শুদ্ধতার অবস্থা কেমন হবে? সুতরাং আসল বা মূল হিসেবে দেখা হলেও রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীরাত মুকাম্মাল এবং শাখা হিসেবে দেখলেও তাঁর সীরাত মুকাম্মাল।

তাই সীরাতের আলোচনা হলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য কাহিনী শুনানো নয়; বরং মাপকাঠি পেশ করা যে, আমরা নিজেদের জীবনকে তার উপর পরখ করে যাচাই করব। মুসলমানদের মাঝে ইলমের ঘাটতি নেই, ফিকিরের ঘাটতি রয়েছে। তাদের ভিতর ইলম যথেষ্ট রয়েছে। রাত-দিন ওয়াজ-নসিহত শ্রবণ করে, কিতাবাদি পড়ে, পত্র-পত্রিকা পাঠ করে। কিন্তু ফিকির নেই যে, সীরাতের নমুনাকে সামনে রেখে চিন্তা-ফিকির করবে এবং নিজেকে ঐ নমুনার উপর পেশ করে দেখবে, তার কথা কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এহেন ফিকির সৃষ্টি না হলে সীরাত শোনা আর না শোনা কোনোটাই প্রতিক্রিয়া হবে না। তাহলে শুধুই কর্নে শ্রবণ করা হবে। অথচ অন্তর ও দেমাগ দ্বারা শ্রবণ করা উচিত, যাতে শ্রবণের মধ্যে অন্তরও শামিল হয়। অর্থাৎ এমনভাবে শ্রবণ করবেন, যেন আমরা নিজেদের নিরীক্ষণ করতে পারি। এমন নয় যে, স্রেফ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করতে থাকবেন। আপনি তাঁর প্রশংসা না করলেও তাঁর প্রশংসা বাধ্যতামূলক। আপনার যদি একজনও তাঁর প্রশংসা না করেন, তাহলেও তিনি মর্যাদাবান ও সম্মানিত থাকবেন, পবিত্র সীরাতের আযমত ও মর্যাদা আপনাদের আযমত করার উপর নির্ভরশীল নয়। আপনারা আযমত না করলেও তা সম্মানিতই থাকবে। প্রশ্ন হলো, সীরাত শ্রবণ করে আপনি নিজের জন্য মনে করে থাকেন যে, সুবহানাল্লাহ বলে-বলে একথা বলে দেব যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবীকে এই-এই আযমত দান করেছেন। তিনি তো আযমতওয়ালা। সর্বদাই আপনি একথা বলেন আর বলেন।

কিন্তু এই আযমত আপনার সামনে কেন পেশ করা হলো? এজন্য যে, যাতে আপনি আযমতওয়ালা হতে পারেন। আপনার ভিতরেও যেন সৌন্দর্য ও কামাল সৃষ্টি হয় এ কারণে সীরাত পেশ করা হয়। কিন্তু এই আগ্রহ আমাদের মাঝে অনুপস্থিত। এজন্য নিজেকে নিরীক্ষণ করার চিন্তা নেই, শুধু প্রশংসা করার চিন্তা। সুতরাং প্রশংসা করা থেকে নিজেকে যাচাই করবেন বেশি এবং সীরাত অনুযায়ী নিজেকে পরখ করবেন। এ কারণেই আমি পবিত্র সীরাতকে দুটি ধারায় বর্ণনা করেছি। একটি সীরাতের আমল হিসেবে যে, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব এই সীরাতে রয়েছে। আর অপরটি শাখাগত হিসেবে যে, ঐ সীরাত হাতে নিয়ে যারা নিজেদের সীরাত বানিয়েছেন তারা হলেন সাহাবাগণ এবং তাঁদের পরবর্তী জন।

যারা অন্যদের পবিত্র বানাতে পারতেন। তাঁদের সীরাতে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন যে, তা সামনে রেখে যে কেউ পবিত্র ও সম্মানিত হওয়ার চিন্তা করতে পারে। সুতরাং উভয় দিক থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাত মুকাম্মাল। আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাওফিক দান করুন, যাতে আমরা নিজেদের যাচাই করার চেষ্টা করতে পারি এবং নিজেদেরকে তাঁর অনুরূপ বানানোর চেষ্টা করতে পারি।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَاَخْرِجْنَا مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ. وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اَللّٰهُمَّ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

(২৮ রবিউসসানি ১৪০৯ হিজরী শুক্রবার উক্ত বয়ানটি লিপিবদ্ধ করা হয়।)

বয়ান : ৬

মুসলিম জাতির ট্র্যাজেডি ও তার প্রতিকার

দেশ যদি স্বাধীনও হয়, ভারত হোক, পাকিস্তান হোক বা অন্য কোনো দেশ হোক; কিন্তু পরিচালনায় যদি বিদেশীদের প্রভাব থাকে যে, যতক্ষণ-না তারা সাহায্য-সহযোগিতা করবে, চলতে পারে না, তাকে কি কর্তৃত্ব বা মর্যাদা বলা হবে? এর ফলাফল এমন হবে যে, আপনি প্রতিটি বিষয়ে ও বস্তুতে অন্যের মুখাপেক্ষী হবেন। রুটির টুকরোতে, ইজ্জত ও শান-শওকতে এক কথায় সব বস্তুতে পরনির্ভর থাকবেন। তো প্রশ্ন হলো, এই বেইজ্জতি সম্পর্কে আপনার মনে এমন প্রশ্ন কখনও কি উদয় হয়েছে যে, আমরা অঙ্গীকারের বিরোধিতা করেছি কি-না? স্রেফ এই অভিযোগ করি যে, আল্লাহ তায়ালা কেন আমাদের দেননি? আমাদের দেশ ও রাষ্ট্র কেন কেড়ে নিলেন? আমাদের মান-মর্যাদা কেন ছিনিয়ে নিলেন? কেন আমরা ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছি? আল্লাহ সম্পর্কে তো আমাদের খেয়াল আসে; কিন্তু নিজেদের ব্যাপারে খেয়াল আসে না যে, আমরাও কিছু একটা করেছি; তাই এহেন অবস্থার হয়েছে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ:

সত্যিকার আবেদন

সম্মানিত উপস্থিতি!

আমি এখন বেশি কথা বলতে পারব না। কিছুটা আমার শারীরিক দুর্বলতার কারণে এবং কিছুটা প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক বয়ান করতে হবে। আমার এতটুকু শক্তি নেই যে, প্রতিদিনের বয়ার পরিপূর্ণ করতে পারব। বোম্বে শহরে আমার আগমনের বড় উদ্দেশ্য ছিল, এখানে এসে ক্লান্তি দূর করব এবং আরাম করব। কিন্তু এখানে আসার পর জলসা প্রস্তুত হয়ে গেল। এজন্য ক্লান্তি ও কষ্টের কারণে বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না। স্রেফ জলসা ও তার ঘোষণা ঠিক রাখার জন্য কিছু কথা পেশ করব।

ব্যাপক দুর্ভাবনা

এই জলসার জন্য যে দাওয়াতনামা পাঠানো হয়েছিল, তাতে লেখা ছিল, বর্তমান সময়ে মুসলিম জাতি পেরেশান ও দুর্ভাবনায় লিপ্ত এবং বিভিন্ন ধরনের ফেতনা ও বিভিন্ন রকমের পেরেশানি তাদের উপর নেমে আসছে। কিছু চারিত্রিক লাইনে,

কিছু রাজনীতির লাইনে, কিছু ঈমান-আদীকার লাইনে, কিছু তাহযিব-তামাদ্দুন ও সামাজিক লাইনে। মোটকথা, বিভিন্ন ডিজাইনের ফেতনা, যা মুসলিমদের দুর্দশাগ্রস্ত, অশান্ত ও পেরেশান করে রেখেছে।

তাতে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ঐ পেরেশানগুলোকে দূর করার জন্য কোনো পথ-পদ্ধতি বের করা হোক এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য কিছু কতা বলা হোক। কারো পেরেশানি দূর করার সক্ষমতা আমার নেই, আমি নিজের পেরেশানিই দূর করতে পারি না। আমি অন্যদের জন্য কি তৈরি করতে পারব। তবে তদবির বা কৌশল বলে দিতে পারব যে, এই তদবির গ্রহণ করলে ফেতনা নিঃশেষ হয়ে যাবে। পেরেশান দূর হবে, মনে প্রশান্তি সৃষ্টি হবে।

তদবিরও আমি কী বের করব; আমি নিজেই ফেতনা ও পেরেশানসমূহে লিপ্ত। তাই আমি কী কৌশল বের করব। তদবির তিনিই বের করতে পারেন, যিনি ফেতনা হতে মুক্ত।

সুতরাং তদবির আল্লাহ ও তাঁর নবীর নিকট থেকে নেওয়া উচিত, তাঁদের নিকট জিজ্ঞেস করা জরুরি। তাঁরা যা বলে দেবেন, সেগুলো আমাদের ফেতনার প্রতিরোধক হবে, সেগুলোই আমাদের ফেতনা দূরীকরণের মাধ্যম হবে। এ সম্পর্কে আমি একটি হাদিস শুনিয়ে দিচ্ছি। তার অনুাদ এবং কিছু ব্যাখ্যা পেশ করছি।

হযরত মুয়ায রা.-এর হাদিস

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. থেকে এই হাদিসটি বর্ণিত। তিনি হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনার পূর্বে ঘটনা বয়ান করেছেন, আমি ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই আরোহণে আরোহী ছিলাম। আরবে সাধারণ নিয়ম ছিল, এক উটে দুটি সিট থাকত। তেমনিভাবে একটি গাধার উপর দুটি সিট থাকত। তাই সেখানে দুই সিটওয়ালা গদি বানানো হতো। তার আগে-পিছনে মানুষ আরোহণ করত।

হযরত মুয়ায রা. বলেন, আমি ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই বাহনে আরোহী ছিলাম এবং আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এত নিকট ছিলাম যে–

لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤَخَّرَةُ الرَّاحِلِ

আমার মাঝে আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না; স্রেফ যিন-গদির একটা লাঠি ছিল। সেটি এমনভাবে থাকত যে, অগ্রে সমাসীন ব্যক্তি লাগাম ধরে বসত আর পিছে সমাসীন ব্যক্তি লাঠি ধরে বসত, যাতে পড়ে না যায়। তাই গদিগুলো এভাবে বানানো হতো, যাতে দুজন বসতে পরে। তার মধ্যস্থলে একটি লাঠি এমনভাবে লাগানো হতো, যাতে পিছনের আরোহী তা ধরে রাখতে পারে। তাকেই مؤخرة الراحل বা গদির মধ্যমাংশ বলে।

হযরত মুয়ায রা. বলেন, আরোহীর আগের সিটে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আর পিছনের সিটে আমি বসা ছিলাম। আমার মাঝে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে ঐ লাঠির দূরত্ব ছিল। এ ছাড়া আর কোনো দূরত্ব ছিল না।

একাধিকবার ডাক

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকলেন–

يَا مُعَاذُ

হে মুয়ায!

আমি বললাম–

لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ

হে আল্লাহর রাসূল আমি উপস্থিত!

তারপর কিছুক্ষণ থেমে আবারো ডাকলেন–

يَا مُعَاذُ হে মুয়ায!

আমি বললাম–

لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ

হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত আমার সৌভাগ্যও উপস্থিত।

তারপর তিনি তৃতীয়বার ডাকলেন–

يَا مُعَاذُ

হে মুয়ায!

আমি উত্তর দিলাম–

لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ

হে আল্লাহর রাসূল! আমি উপস্থিত।

তারপর ঐ হাদিস ইরশাদ করলেন, যা আমি এখন আপনাদের শোনাব।

মাকামে ইশতিবাহ বা সন্দেহের স্থান

এখানে প্রশ্ন জাগে, হযরত মুয়ায রা. কে ডাকার কী প্রয়োজন ছিল? যে দূরে অবস্থান করে তাকে ডাকা লাগে। যে এত নিকটে যে একসাথে মিশে বসেছেন; শুধু একটা লাঠি তাদের আড়াল হয়ে আছে; তাহলে এখানে শব্দ করে ডাকার কী প্রয়োজন। তিনি যা ইরশাদ করার তা ইশরাদ করে দিতেন; ডাকার কী প্রয়োজন ছিল। আবার ডেকেছেন তো একবার নয়; তিন-তিনবার ডেকেছেন। আবার প্রত্যেক ডাকের সাথে সাথে তিনি উত্তরে বলতেন, হে রাসূল! আমি উপস্থিত। সাহাবী উত্তর না দিলে মনে হতো, তিনি শুনেননি; এজন্য দ্বিতীয়বার আওয়াজ দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় আওয়াজ শুনেননি বলে তৃতীয় আওয়াজ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তো প্রত্যেক ডাকেরই উত্তর দিয়েছেন। তাই একথা বলা যাবে না যে, প্রথম ডাক শুনেননি। অতএব প্রশ্ন থেকে যায়, তিনি তিনবার ডাকলেন কেন?

উদ্দেশ্যের প্রতি মন আকর্ষণের জন্য

এমন পরিস্থিত আসলে এমন স্থানে হয়ে থাকে, যেখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয় এবং কোনো আজীমুশ্বান মাকসাদ পেশ করা হয়। তখন তিন-তিনবার মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, মন দিয়ে শ্রবণ করো, যাতে অন্তরে বসে যায়। ডাকা ছাড়া এবং উপস্থিত উপস্থিত আছি বলা ব্যতীত কোনো বিষয় ব্যক্ত করা কখনও এমন হয় যে, এক কর্ণ দিয়ে বললে অন্য কর্ণ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিন-তিনবার মুতাওয়াজ্জুহ বা মনোযোগ করানো, যাতে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং ঐ বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়, যা একটু পরে ইরশাদ করা হবে।

নবী ও নায়েবে নবীগণের বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা প্রথমে অন্তরে আগ্রহ ও স্পন্দন বা উন্মাদনা সৃষ্টি করেন; তারপর মাকসাদ পেশ করেন, যাতে অন্তরে বসে যায়। তলব ও আগ্রহ ব্যতীত কোনো বস্তু বলে দিলে তো মানুষের অভ্যাস হলো তা

দিলে গ্রোথিত হবে না এবং মানুষ তার প্রতি মনোনিবেশ করবে না যতক্ষণ-না অন্তরে বাস্তব তলব হবে। তাই আগ্রহ ও জযবা সৃষ্টির জন্য এহেন পন্থা গ্রহণ করা হয়, যাতে তলব পয়দা হয়ে যায় আর তলবের পর যে জিনিস অন্তরে আসে, তা দিলে শক্তভাবে বসে। তলব ব্যতীত কোনো জিনিস অর্জন হয় না। এজন্য তলবগার ও প্রার্থী হওয়া উচিত।

হযরত রুমি রহ. বলেন–

آب کم جو، تشنگی آور بدست

পানি বেশি প্রার্থনা করো না, নিজের ভিতর পিপাসা থাকলে পানি এমনিতেই মিলবে আর তা পিঠে পড়বে এবং শিরাগুলোকে স্নিগ্ধ ও শীতল করবে। আর পিপাস ছাড়া পানি পান করলে অনেক সময় রোগের কারণ হতে পারে। পেটে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ে বমি হতে পারে।

তাই ক্ষুধা লাগার পর আহার করলে, তা খাদ্যনালীতে পৌঁছে এবং হজম করে। ফলে শরীরের উপকার হয়। আর ক্ষুধা ব্যতীত আহার করলে রোগ সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যম হয়। এজন্যই দানা-পানি তালাশ করার অধিক প্রয়োজন নেই, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সৃষ্টি করা অধিক প্রয়োজন। এ কারণেই পাকস্থলি নষ্ট হয় এবং ক্ষুধাশক্তি কমে যায়। পরিশেষে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। রুটির তন্দূরের নিকট যায় না যে, অনেক রুটি সংগ্রহ করবে বরং ডাক্তারের নিকট যায়, যাতে রুটি আহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পেটের চিকিৎসা করায়, যাতে পাকস্থলিতে তলব ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

আগ্রহ-উৎসাহ সৃষ্টির অপেক্ষায়

আমি শুনেছি, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানুতভী রহ.-এর– যিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা– একজন মুরিদ ছিল। তার নাম ছিল হাফেজ মুহাম্মদ আহসান সাহেব রহ.। তিনি আমাদের প্রিয়ভাজন ছিলেন। তিনি নানুতভী রহ.-এর নিকট বাইয়াত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন যুবক মানুষ। আর সেই যুগে যুবকদের পোশাক ছিল এমন যে, তারা কাঁচের বলয়ওয়ালা পায়জামা পরিধান করত, যা পায়ের সাথে আঁটসাঁটভাবে মিশে থাকত, মাথায় থাকত দু'পাটওয়ালা কাপড়, যার পাড়ে বা কিনারে থাকত সোনালী-রূপালী রশ্মি এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের মেহেদী এবং পুরোপুরি রূপার ব্যাচলাইট। এই ছিল ঐ যুগের নওজোয়ানদের তামাদ্দুন। একই পোশাক ছিল আহসান সাহেবের। তিনি সেই লেবাসে হযরতের মজলিসে আসতেন।

হযরত তাকে কিছুই বলতেন না। ফলে মানুষের অন্তরে এমন প্রশ্ন সৃষ্টি হলো যে, যুবক হযরতের মুরিদ ও খাদেম, আর পোশাক-লিবাস শরীয়তবিরোধী। পুরুষের জন্য মেহেদী লাগানো কবে থেকে জায়েয হলো যে সে মেহেদী লাগায় এবং হাতে রূপার ব্যাচলাইট পরিধান করে? সে তো এ সকল নাজায়েয কাজ করে চলছে। কাঁচের বলয়বিশিষ্ট পায়জামা, যা টাখনুর নিচ পর্যন্ত; শরীয়ত যাকে নিষিদ্ধি করেছে, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'ইসবাল' বলা হয়।

এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, টাখনুর নিচে পায়জামা-লুঙ্গি পরিধানকারী অহংকারী পোশাক পরিধানকারী বলা হয়। কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি রহমতের নজরে তাকাবেন না যে, তুমি দুনিয়াতে ইসবাল করে কাপড় পরিধান করতে, টাখনুর নিচে লুঙ্গি-পায়জামা পরিধান কর; তাই তোমার প্রতি রহমাতের দৃষ্টি করা হবে না।

তিনি হযরতের দরবারে আসতেন এই অবস্থায় যে, তার কাপড়ে ইসবাল বিদ্যমান থাকত, হাতে মেহেদী লাগানো থাকত, হারাম ব্যাচলাইট থাকত। কিন্তু হযরত তাকে কিছুই বলতেন না। তিনি নাহি আনিল মুনকার তথা অন্যায় কর্ম হতে বাধা প্রদান করতেন না। মানুষের অন্তরে এহেন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ-কেউ পরস্পর বলাবালি করতে লাগল; কিন্তু এগুলো হযরতের উপর কোনো রকম প্রভাব পড়েনি। হাফেজ সাহেব আসত এবং মজলিসে অংশগ্রহণ করত।

হযরত তাকে কিছু বলেননি কেন?

অন্তরে শরীয়তের ইত্তেবার আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য। কারণ, তলব আগ্রহ সৃষ্টি হলে তখন হুকুম করা হলে অন্তর কবুল করে নেবে এবং অন্তরে বসে যাবে। তলব ব্যতীত লাখো ওয়াজ করলে, উপদেশ দিলেও কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না। যেমনভাবে বর্তমান বিশ্বে কোটি-কোটি ওয়াজ ও বক্তৃতা হচ্ছে। পূর্বযুগে এত পরিমাণ তাকরির ছিল না। ছিল না এত ওয়াজ ও মাহফিল বর্তমানে মাহফিলের সিজন ও মৌসুম চলছে। তা হাজারে সীমাবদ্ধ হবে না বরং লাখে পৌঁছবে। সবগুলোতেই লোক জমায়েত হবে। কিন্তু অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করে না, কারো ভিতর কোনো পরিবর্তন হয় না। পূর্বে যা ছিল তা-ই থেকে যায়।

একজন ওয়োয়েজ (বক্তা) ওয়াজ করে ওয়াজের এমন পানি প্রবাহিত করে যে, পানির বুদবুদ উঠতে থাকে যে, এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ভিতরে কিছুই পৌঁছে না। কারণ, ভিতরে বাস্তব তলব নেই। স্রেফ আনন্দে মাহফিলে অংশগ্রহণ করেছে। সে শুধু বক্তার ভঙ্গি দেখে যে, তিনি কী বলছেন এবং

কিভাবে বলছেন। তাদের কারো এমন তলব নেই যে, বক্তার থেকে কোনো বিষয় নিয়ে আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে নাজাতের চিন্তা-ফিকির করব। তবে ইল্লা মাশাআল্লাহ হাজার বা লাখের মধ্যে এক-দুজন এমন রয়েছে, যারা অন্তর দিয়ে ওয়াজ শ্রবণ করে। কিন্তু সাধারণভাবে সবাই মন দিয়ে শ্রবণ করে না। বিধায় ওয়াজ কোনো প্রতিক্রিয়া করে না। ওয়াজ তো ভুল ওয়াজ হয় না, কিন্তু অন্তর খোলা থাকলে তার ভিতর কিছু পড়বে আর বন্ধ বা ওল্টো থাকলে তার মধ্যে যা কিছু পড়বে না; এদিক-সেদিক প্রবাহিত হয়ে যাবে, ভিতরে প্রবেশ করবে না।

সুতরাং হযরত তাকে কিছুই বলতেন না। যখন ছয় মাস অতিবাহিত হলো আর তিনি দেখলেন, এখন তার মধ্যে পুরোপুরি বিশ্বাস জাগ্রত হয়েছে এবং অন্তরে বশ্যতা সৃষ্টি হয়েছে আর তাঁর মধ্যে সত্যিকারের তলব পয়দা হয়েছে, তখন একাকিত্বে নিয়ে সুন্দর ও আশ্চর্যভাবে বলেছেন, ভাই! হাফেজ্জী! তুমি আমার দোস্ত, আমিও তোমার দোস্ত। আর দোস্তদের মধ্যে তো মহব্বত-ভালবাসা হয় এবং মহব্বতে প্রত্যেকেই দ্বিতীয়জনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এখন আমার পোশাক তো এই যে, একটা সাধারণ কোর্তা-পাঞ্জাবি এবং এক পাটওয়ালা পা ঢাকার যোগ্য পায়জামা আর একটি দুই পাটওয়ালা টুপি। তোমার মাশাল্লাহ মূল্যবান পোশাক, গোটা ঝুলানো পাগড়ি আছে, পুরোপুরি রূপার ব্যাচলাইটও আছে, আছে উন্নতমানের আসকান ও জুতা। ভাই! দোস্তী আর বন্ধুত্ব যেহেতু হয়েছে. তাই আজ হতে হয় আমিও এই পোশাক গ্রহণ করে নেব যে, আমিও কাঁচের বলয়ওয়ালা পায়জামা পরিধান করব, হাতে মেহেদী লাগাব না হয় তুমি সেই পথ অবলম্বন করে নাও, যে পথ আমি গ্রহণ করেছি। এমনটি ভালো দেখা যায় না যে, দুই বন্ধু একজনের রুখ হল পূর্ব দিকে আর অপরজনের হল পশ্চিম দিকে।

নসিহতের পদ্ধতি

যেহেতু হাফেজ সাহেবের অন্তরে বশ্যতা ও মানার মাদ্দা সৃষ্টি হয়েছিল এবং সত্যিকারের তলব সৃষ্টি হয়েছিল, তাই তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং কিছু না বলে সরাসরি বাড়িতে পৌঁছলেন। বাড়িতে পৌঁছে কাচের বলয় লাগানো পাজামা স্ত্রীকে দিয়ে বললেন, এটি রঙ করে তুমি পরিধান করো আর স্বর্ণ-রূপার গোটাওয়ালা দু'পাট্টাও তাকে দিয়ে বললেন এটি ওড়না বানিয়ে নাও। তিনি পনের দিন পর্যন্ত ঘর থেকে বের হলেন না যতদিন হাতে মেহেদীর রঙ ছিল। ব্যাচলাইট স্ত্রীকে দিয়ে বললেন, এ দ্বারা জেওর বানিয়ে নাও। পনের দিন পর

মেহেদীর রঙ হাত থেকে দূর হওয়ার পর খালেস মৌলবিয়ানা পোশাক পরিধান করে মোগলদের মতো পাজামা কোর্তা এবং দু'পাটওয়ালা টুপি মাথায় দিয়ে হযরতের মজলিসে পৌছলেন। একেবারে এমনভাবে বসলেন, যেমন একজন ছাত্র বসে। হযরত তাকে বুকের সাথে মেশালেন এবং বললেন! ভাই! আজ উভয় বন্ধু এক হয়েছি।

তিনি অত্যন্ত খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করলেন। হযরত দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত আমর বিল মারুফ করলেন না এজন্য যে, তিনি অপেক্ষায় ছিলেন, তার অন্তরে তলব পয়দা হবে এবং বশ্যতা ও মান্যতা সৃষ্টি হবে, তখন বললে প্রতিক্রিয়া হবে, প্রভাব পড়বে। এই পদ্ধতি হলো নবীদের এবং নবীদের খাটি ওয়ারিসদের। এখন তো এমন মানুষ নেই, যাঁরা এক মিনিট তাওয়াজ্জু দিয়ে কায়া পাল্টে দেবে। তারা অতীত হয়ে গেছেন। এখন তো এমন যে, চরিত্র ও বন্ধুত্ব স্থাপন করে কোনো প্রভাব তৈরি করে তলব সৃষ্টি করা তারপর কিছু নসিহত করলে কাজে লাগবে। এ পদ্ধতিতে নসিহত করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। অন্যথায় ওয়াজ-নসীহত দ্বারা কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না।

হিকমতপূর্ণ তারবিয়াত

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব রহ.-এর একজন নওজোয়ান পাঠান মুরিদ ছিল। তার বাড়ি ছিল জালালাবাদে। ঐ যুগে নওজোয়ানদের তামাদ্দুন ছিল, তারা দাড়ি মুণ্ডাত না বরং দাড়ি রেখে দিত এবং লম্বা করত। সে নামায পড়ত না। হযরত হাজী সাহেব রহ.-এর নিকট অভিযোগ এল, হযরত! অমুক আপনার মুরিদ, তবে সে নামায পড়ে না। হযরত তাকে ডাকালেন। তিনি তাকে অত্যন্ত স্নেহের সাথে কোমরে হাত রেখে বললেন, বেটা! নামায পড়া উচিত। নামায দ্বারাই তো মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে পার্থক্য বিধান হয়। নামাযই যদি না পড়, তাহলে মুসলমান থাকবে কী করে?

যুবক বলল, হযরত! আমার তো দাড়ি রাখার করার অভ্যাস। আমি সোয়া ঘন্টাব্যাপী দাড়ি বর্ধনশীল করি। প্রথমে তাতে খামিরা লাগাই। তারপর রৌদ্রে শুকাই। তারপর চিরুনী দ্বারা আচড়াই। এতে সোয়া ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। আর আপনি তো বলবেন, ওযু ছাড়া নামায হবে না। যখন ওযু করব, তখন দাড়ি হতে খামিরা চলে যাবে। এতে প্রত্যেক নামাযের পর আমাকে দাড়ি চড়াতে হবে। হযরত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে লাগে এক ঘন্টা আর পাঁচবার দাড়ি

চড়াতে লাগবে সাত ঘন্টা। এটি তো খুব কষ্টের কাজ। আবার আপনি বলবেন, ওযু ছাড়া নামায হবে না।

এখন তারবিয়াতের হিকমত দেখুন। তালিমের কথা তো এই ছিল যে, তিনি তাকে বলে দেবেন, হ্যাঁ, ওযু ব্যতীত নামায হবে না। হাদিস শরীফে এসেছে–

لَا تُقْبَلُ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

ওযু ব্যতীত কোনো নামায গ্রহণযোগ্য হয় না।

এ হলো তালিমের কাজ বা দায়িত্ব। কিন্তু তারবিয়াতের কাজ ভিন্ন। তালিমের মধ্যে সবার হুকুম এক ও অভিন্ন, যা সবাইকে শুনিয়ে দেওয়া হয়। আর তারবিয়াতের মধ্যে প্রত্যেকের মেজাজ-তবিয়ত দেখতে হয়, বুঝতে হয়। প্রত্যেকের নফ্স অনুযায়ী কথা বলতে হয়। তখন হযরত হাজী সাহেব রহ. দেখলেন, মাসয়ালা তো সে জানে; তাকে মাসয়ালা শুনাব কী। সে তো নিজেই বলছে, আপনি তো বলবেন, ওযু ছাড়া নামায হয় না। তার মাসয়ালা জানা ছিল। এখন তিনি কি করবেন? যা তার জান আছে তা জানাবেন? তিনি তা করলেন না; বরং তারবিয়াতরে হিকমত সামনে রাখলেন।

তিনি বললেন, ভাই! আমি অজুর কথা বলিনি। আমি তো বলেছি, নামায পড়ো। নওজোয়ান বলল, হযরত! ওযু ছাড়া নামায পড়ে নেব? তিনি বললেন, আবার ওযুর আলোচনা; আমি ওযুর নাম কবে নিয়েছি, আমি ওযর আলোচনা কখন করেছি? আমি তো নামায পড়তে বলছি। তখন খান সাহেব উঠে চলে গেলেন। তিনি ওযু ছাড়া নামায পড়তে শুরু করলেন।

হযরত হাজী সাহেব রহ. নিজচোখে দেখেছেন যে, ওযু ব্যতীত নামায পড়ছে; তবুও তাকে টুকলেন না। এ কথা বললেন না যে, আপনার নামায হয়নি। কেননা, মাসয়ালা তো সে জানে যে, তার নামায হচ্ছে না। পনের দিন এভাবে অতিবাহিত হলো। পনের দিন পর তার মস্তিষ্কে নিজেই এই জযবা উদিত হলো যে, তুমি মেহনত করছ আর তা বেকার যাচ্ছে। ওযুবিহীন তো নামায হয় না। কিন্তু সে মনে মনে বলল, নামায তো আমি এখন ছেড়ে দিতে পারব না। কারণ, তা তো পীরের হুকুম। আর পাঠানের জবান থেকে যা বের হবে, তা টলবে না, নড়চড় হবে না। সুতরাং নামায ছাড়ব না। সর্বাবস্থায় নামায আমাকে পড়তেই হবে।

তখন সে এই করল যে, ফজরের নামাযে ওযু করত আর দাড়ি চড়াত এবং ইশা পর্যন্ত সেই ওযু ধরে রাখত। এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ওযু দ্বারা আদায় করত। কিন্তু এটি একজন জোয়ান মানুষের জন্য অনেক কষ্টসাধ্য কর্ম যে, ফজর থেকে

নিয়ে ইশা পর্যন্ত ওযু অবস্থায় থাকবে। তার কষ্ট আরম্ভ হয়ে গেল; পেটে সমস্যা শুরু হয়ে গেল। পেটে গ্যাস জমতে লাগল। এখন তিনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করলেন যে, একবার ওযু করেন ফজরের নামাযের জন্য। আরেকবার ওযু করেন যোহরের নামাযের জন্য। যোহরের ওযুকে ইশা পর্যন্ত ধরে রাখতেন।

মোটকথা, নামায ওযুসহ করা শুরু করলেন। কিন্তু একজন নওজোয়ানে জন্য যোহরের ওযু ইশা পর্যন্ত ধরে রাখা বড়ই কঠিন কম। এতেও তার পেটে ব্যথা শুরু হয়ে গেল। এখন সে বলল, নামায তো ছেড়ে দিতে পারব না যেহেতু পীরের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। আমার জবান পাঠানের, যা বের হয় তা পরিবর্তন হয় না। এজন্য সে ভাবতে লাগল, হয়ত দাড়ি বর্ধন ঠিক রাখব অথবা নামায পড়া কায়েম রাখব। পরিশেষে ফলাফল এই বের হলো যে, দাড়ির যত্ন ছেড়ে দিল। নামায অজুর সাথে পড়তে লাগল। বিশ-পঁচিশ দিন পর হাজী সাহেব রহ. তাকে ডাকালেন এবং অনেক শাবাশি দিলেন আর বললেন, নেককার নওজোয়ান এমনই হয়। তাকে অনেক দোয়া দিলেন। তারপর বললেন, ভাই! ওযু ছাড়া নামায কতদিন পড়েছ? সে বলল, হযরত! পনের দিন। তিনি বললেন, সেগুলো পুনরায় পড়ে নিয়ো, সেগুলো হয়নি। সে বলল, পড়ে নেব।

তারপর তিনি বললেন, ভাই! তোমার বয়স কত?

খান সাহেব বললেন, পনের পূর্ণ হয়ে ষোল বছর শুরু হয়েছে। তিনি বললেন, চৌদ্দ বছর পূর্ণ হলে মানুষ শরীয়তের পরিভাষায় বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হয়, যার উপর নামায ফরজ হয়। এক বছরের নামায হয়ত তুমি পড়নি। সে বলল, হযরত! না, পড়িনি। হযরত বললেন, এগুলো হলো ওমরি কাজা; এগুলোও আদায় করে নাও।

এখন অন্তরে তো ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সরকারী চাকরিজীবী ছিলেন। চাকরি থেকে এক সপ্তাহের ছুটি নিলেন এবং এক বছরের সকল নামায কাজা করলেন।

কেমন যেন বালেগ হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নামায ছাড়েননি। নামায ও রোযার পাকা পাবন্দ হয়ে গেল।

তা কিভাবে হল? হযরত রহ. তাকে পনের দিন ওযু ছাড়া নামায পড়িয়ে আজীবন ওযুসহ নামায পড়ালেন। যদি তিনি প্রথমে বলে দিতেন, ওযু ছাড়া নামায হয় না। তাহলে সে কখনও নামায পড়ত না। সারা জীবন নামায ছাড়া থাকত। এটি তারবিয়াতের হিকমত ছিল যে, পনের দিন ওযুবিহীন নামায

পড়িয়ে আজীবনের জন্য নামাযের পাবন্দ বানিয়ে দিলেন। যদি তারবিয়াতের এই পদ্ধতি গ্রহণ না করতেন, তাহলে সে কখনও নামাযে অভ্যস্ত হতে পারত না। তারবিয়াত করতে গিয়ে কখনও কোনো খারাপ এবং মুনকার বা নিষিদ্ধ বস্তুকে সহ্য করতে হয়। চুপ থাকতে হয়, তবিয়তে যোগ্যতা সৃষ্টি হলে বলতে হয়। তবিয়ত দুরস্ত হওয়ার পর নসিহত করলে এহেন যোগ্য হবে; অন্যথায় হবে না।

তারবিয়াতের বৈশিষ্ট্য

হাদিস শরীফে তার উদাহরণ পাওয়া যায়। একটি গোত্র, যাদের লোক সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এসেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমাদের বরকত দান করুন।

তারা বলল, হযরত! ইসলাম গ্রহণ করার প্রথম শর্ত হলো, আমরা ফজরের নামায পড়ব না। দ্বিতীয় শর্ত হলো ইশার নামাযও পড়ব না। স্রেফ তিন ওয়াক্ত নামায পড়ব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের শর্ত গ্রহণ করা হলো। অথচ যেমনিভাবে তিন ওয়াক্ত নামায ফরজ, তেমনিভাবে বাকি দুই ওয়াক্তও ফরজ। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের শর্ত মঞ্জুর করে নিলেন। তারা তিন ওয়াক্ত নামায পড়ত আর দুই ওয়াক্ত অনুপস্থিত থাকত। তিনি তাদের বলেননি, কেন পড়বে না? এমনটা নাজায়েয, নিষেধ, হারাম এমন কিছুই বলেননি।

এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি হলো যে, যেমনিভাবে তিন ওয়াক্ত নামায ফরজ, তেমনি ফজর-ইশাও তো ফরজ। তো আমরা অর্ধেক দীন মানব আর অর্ধেক মানব না, নষ্ট করে দেব, এমনটি কখনই উচিত নয়। সুতরাং মাসাধিককাল পর তারা অবশিষ্ট দু'ওয়াক্ত নামাযও পড়তে শুরু করল। তারপর তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং নামাযের পুরোপুরি পাবন্দ হয়ে গেল। অতএব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'ওয়াক্ত নামায পড়ার শর্ত মেনে নিয়ে তাদেরকে আজীবন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার অভ্যস্ত বানিয়ে দিলেন। এটি তালিম ছিল না; বরং তারবিয়াত ছিল।

তালিমে মাসয়ালা হয় ব্যাপক। তথা সবার জন্য সমান হুকুম। আর তারবিয়াতের মধ্যে প্রত্যেকের মেজায-তবিয়ত বুঝে ঔষুধ দেওয়া হয়। আপনি যদি কোনো ডাক্তারের কাছে তালিমের জন্য যান, তাহলে সবার জন্য একই মাসয়ালা বর্ণনা হবে, যা কিতাবে রয়েছে। তা সবার জন্য সমান। কিন্তু ডাক্তার যখন চিকিৎসা করবেন, তখন এমন হবে না যে, একটি ব্যবস্থাপত্র দিয়ে সবাইকে পার করে দেবে। প্রত্যেক রোগীর শিরা-রগ পৃথক-পৃথক, মেজায-তবিয়ত পৃথক। তাই সেই মোতাবেক প্রেসক্রিপশন নির্ধারণ করতে হবে।

মোটকথা, তালিম হয় ব্যাপকভাবে আর তারবিয়াত হয় বিশেষভাবে। এ কারণে কলবের মুরুব্বীগণ কখনও কখনও অপেক্ষা করেন, তার নফ্স বা খায়েশ প্রত্যক্ষ করে তার মন্দের ওপর কোনো বাদ্য বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন না। কারণ, প্রথমে তার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে, তার অন্তরে বশ্যতা ও মান্যতা সৃষ্টি করতে হবে। তারপর বললে মেনে নেবে।

যাহোক হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা.কে তিনবার ডাকলেন। অথচ তিনি তাঁর কোমরের সাথে মিলে বসে আছেন। কারণ, তিনবার ডেকে তার অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য ছিল যে, সামনে একটা গুরুত্বপুর্ণ বিষয় ব্যক্ত করব। তিনবার ডাকার ফলাফল এই হল যে, তার অন্তরে তলব ও তৃষ্ণা সৃষ্টি হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলবেন যে, তিনি তিনবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন!

আল্লাহ ও বান্দার পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟

হে মুয়ায! বান্দাদের ওপর আল্লাহর কী অধিকার রয়েছে জান?

তিনি বললেন–

اَللهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন যে, বান্দাদের ওপর আল্লাহর কী হক রয়েছে।

বললেন–

বান্দার ওপর আল্লাহর হক হলো এই–

يَعْبُدُوا اللهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

ইবাদাত শুধু আল্লাহর জন্যই করবে; তাতে কাউকে শরিক করবে না; তাহলে আল্লাহর হক আদায় হবে।

তারপর বললেন–

هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ

তুমি জান কি আল্লাহর ওপর বান্দার কী হক?

মুয়ায রা. বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

বললেন, বান্দার হক হলো, যখন বান্দা এক সত্তার দিকে ধাবিত হবে এবং শিরক একেবারেই পরিহার করবে, সারাটা জীবন তাওহীদ ও একত্ববাদের উপর অতিবাহিত করবে, একজনকেই হর্তা-কর্তা মনে করবে, এক সত্তাকেই উপকারী ও অপকারী জ্ঞান করবে, তাঁকেই রাজ্জাক এবং বিজয়দাতা বুঝবে, তাঁকেই মুশকিল আসানকারী বিশ্বাস করবে এবং তাঁকেই মুসিবাত দূরকারী জানবে, একজনকেই মুশকিলাত রহিতকারী বুঝবে। যখন বান্দা এমন হ, তখন সে আল্লাহর হক আদায় করল। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমাদের হক আমার ওপর হলো এই যে, আমি তোমাদের রিজিক দেব, প্রকাশ্য রিজিক ভাত-ডাল এবং অপ্রকাশ্য বা বাতিনি রিজিক রাষ্ট্রক্ষমতা, ইজ্জত, আযমাত, প্রথাগত মর্যাদা, দুনিয়াবাসীর উপর প্রভাব ইত্যাদি তোমাদের দান করব।

তিনি বান্দাদের থেকে অঙ্গীকার নিলেন, তোমরা এমন ইবাদাত করো, যাতে শিরকের লেশ নেই; তাহলে আমি তোমাদের এমন রিজিক দেব, যাতে ঘাটতির লেশ নেই। এ কেমন যে, আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে! তোমরা আমার স্মরণে লেগে যাও, আমি তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করব।

বদল বা প্রতিদানের বিধান

আল্লাহ তায়ালার নিকট বদলা দেওয়ার বিধান হলো, তুমি যেমন করবে তেমন ফলাফল পাবে। বলা হয়েছে–

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ

তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমিও তোমাদের স্মরণ করব।

اِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ

তোমরা আল্লাহর দীনকে সাহায্য করলে আমি তোমাদের সাহায্য করব।

مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ لِقَاءَهٗ

আল্লাহ বলেন, যদি তোমাদের এমন আশঙ্কা হয় যে, আমার সাথে মিলিত হবে এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেবে, তাহলে আমারও এমন আকাঙ্ক্ষা হয় যে, আমার বান্দা কবে আসবে এবং আমার সাথে মিলিত হবে। তোমাদের মধ্যে যদি আমার মহব্বত থাকে, তাহলে আমার মধ্যেও তোমাদের মহব্বত থাকবে। মানে আদল-বদল বা বিনিময়। এতে বুঝা যায়, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে চুক্তি হয়, তোমরা আমার ইবাদাত বা গোলামী করলে, আমাকে একচ্ছত্র সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও কার্যকরী বুঝলে আমাকে একক সম্রাট এবং সত্যিকারের মালিক ভাবলে, আমি তোমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রিজিক প্রদানি করব, খাদ্য ও বাসস্থান দেব, ক্ষমতা ও ইজ্জত দেব, রাজত্ব দেব এবং তোমাদের বিজয়ী জাতি বানাব। একস্থানে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ

এখানে আল্লাহ নিজে ওয়াদা করেছেন এবং বান্দাদের থেকে এই ওয়াদা নিয়েছেন যে, তোমরা শুধু আমার সামনে মাথা নত করো, কাউকে কর্তা ভাববে না, একমাত্র আমাকেই ভয় করবে, ইবাদাত-দাসত্ব আমারই করবে, চাইলে আমার নিকটই চাইবে, আমি ছাড়া অন্য কেউ তোমার কষ্ট দূর করতে পারব না। গায়রুল্লাহর নিকট তোমার সুযোগ নেই, আমার নিকটই সকল সুযোগ-সুবিধা। আমিই তোমাকে দেব।

বান্দার চুক্তিভঙ্গ ও অবাধ্যতা

অঙ্গীকারনামার নিয়ম হলো, যদি এক পক্ষ নিজের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলে, তাহলে অপর পক্ষের ওপর আবশ্যক থাকে না, সে নিজের অঙ্গীকার পুরা করবে। দুটি রাষ্ট্র চুক্তিবদ্ধ হলো। এক রাষ্ট্র গাদ্দারি করল, তাহলে দ্বিতীয় রাষ্ট্র বলবে, এখন আমরা চুক্তিপত্রের অনুগত নই। এখন আমরা যুদ্ধ করতে পারব অথবা তোমাদের রাষ্ট দখল করে নিতে পারব। যতক্ষণ চুক্তিবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ উভয় পক্ষে একে অপরের সাহায্য করে, রেয়ায়েত করে চলে। তেমনিভাবে বান্দা ও আল্লাহর মাঝে চুক্তি হয়েছে। বান্দা ওয়াদা করেছে, আমি আপনার হয়ে

যাব। আল্লাহ বলেছেন, তাহলে আমিও তোমার হয়ে যাব। তুমি আমার ইবাদাত ও গোলামি করো, আমি তোমাকে সবকিছু দেব।

এখন যদি বান্দা ঐ ওয়াদা ভঙ্গ করে, এক আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত ব্যতীত হাজারো বস্তুর সামনে মাথা নত করা আরম্ভ করে, এক সত্তার বন্দেগী ব্যতীত কখনও কারো মাজারে মাথা নত করে, কখনও কোনো পাথর বা মূর্তির সম্মুখে সিজদা করে বসে, কখন স্বর্ণ-রূপার সামনে মাথা নত করে, তাহলে সুস্পষ্টরূপে সে ওয়াদা ভেঙ্গে দিল। আর যখন সে ওয়াদা ভেঙ্গে দিল, তখন তার সাথে যে ওয়াদা ছিল তার অনুসরণ অবশিষ্ট থাকল না। তখন বলা হয়, আমার কী প্রয়োজন যে, তোমাকে রিজিক দেব, আমার কী দরকার যে, তোমাকে ক্ষমতা দেব। তুমি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অবাধ্য হবে আর আমি তোমাকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দেব। তুমি খালিক ও মালিক মনে কর খাদ্যকে, গম ও ধানকে এবং মানুষকে আর আমি তোমাকে ইজ্জত ও শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করব এটা হবে কেন।

أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُونَ

আমি কি আমার রহমত তোমার উপর চাপিয়ে দেব যে, তুমি তা নিতে চাচ্ছ না।

আমার রহমতের প্রয়োজন নেই। আমি কোথায় রহমত নিতে যাব, তোমারই তা লাখবার প্রয়োজন হবে। তুমি নাকে খত দাও, আমি তোমাকে রহমত দেব, যখন তুমি পাক্কা ওয়াদা করনি, তখন আমিও ওয়াদার পাবন্দী করব না।

যতকাল ওয়াদার পাবন্দি বা অনুসরণ ছিল সাহাবাদের যুগে, তাবেঈদের যুগে, তাবে-তাবেঈদের যুগে ততকাল ক্ষমতা ছিল, ইজ্জত ছিল আর এমন কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব হাসিল হয়েছিল, যার দৃষ্টান্ত বর্তমান পৃথিবী পেশ করতে অক্ষম। বর্তমানে আপনারা গর্ব করেন যে, আরব আমাদের, ইরাক আমাদের, মিশর ও তুর্কিস্তান আমাদের, আফগানিস্তান, শাম ও জর্ডান আমাদের। এগুলো পূর্বপুরুষদের জুতার বদৌলতে অর্জিত হয়েছিল। আজ আপনারা বলতে পারছেন, ঐ রাষ্ট্রগুলো আমাদের। সেগুলো আপনারা নিজেরা বিজয় করেছেন? আপনারা কী সেগুলো আপন বাহুবলে আয়ত্ত করেছেন, নাকি ঐ বুযুর্গগণ, যারা আল্লাহর চৌকাঠে মাথা নাত করত? আপনারা স্রেফ গর্ব করছেন–

چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا

مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہان ہمارا

চীন, আরব ও হিন্দুস্তান আমাদের, আমরা মুসলিম জাতি, সারা বিশ্ব আমাদের এই গৌরব আমরা পেয়েছি তাঁদের জুতার বদৌলতে। এখন আপনাদের যুগে হলে তা সম্ভব হত না।

অতএব জাতি যতক্ষণ আপন ওয়াদার উপর ছিল, ততক্ষণ রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল, ইজ্জত ছিল, সম্মানের রিজিক ছিল। এখনকার ফেতনা ছিল না। আপনারা দায়ী ছিলেন; অন্যরা ছিল মাদউ; (যাদের দাওয়াত দেওয়া হয়)। যখন আপনার দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দিলেন, তখন অন্যরা দায়ী হয়ে গেল আর আপনারা মাদউ হলেন। আপনারা ক্ষমতাবান ছিলেন; অন্যরা ছিল আপনাদের অধীন, যখন আপনারা ক্ষমতা ও নেতৃত্বের উপকরণ ছেড়ে দিয়েছেন, তখন আপনারা অধীনে পরিণত হলেন আর অন্যদেরকে আপনাদের উপর বিজয়ী করা হলো।

এই ওয়াদখেলাফী আপনারা নিজেরা করেছেন। তাই যখন ফেতনা আসে, পেরেশানি ও দুর্দশা আসে, তখন বলেন, তদবির ও কৌশল বলুন, বাঁচার উপায় বের করুন। তদবির তো আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, তোমরা আমার হয়ে যাও; আমি তোমাদের হয়ে যাব। এ ছাড়া আর কী তদবির হতে পারে? কারণ, হুকুমাত ও রাজত্ব তো তাঁরই হাতে। রিজিক তাঁর হাতে, ইজ্জত তার হাতে, তাঁর রবারে মাথা নত করলে এগুলো এমনিতেই আসবে। আল্লাহর চৌকাঠ ছেড়ে যখন অন্যের সামনে মাথা নত করতে শুরু করেছি, তখন তারা আমাদের অবশিষ্ট ইজ্জতটুকুও আয়ত্ত করে নিয়েছে, অবশিষ্ট খাবারটুকুও কব্জা করে নিয়েছে এবং আমাদেরকে ও আপনাদেরকে ফেতনা-ফাসাদের ময়দানে ছেড়ে দিয়েছেন। এখন কেউ খাদ্য দিতে অস্বীকার করছে, কেউ পানি দিতে অস্বীকার করছে, কেউ চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করছে।

কেন অস্বীকার করছে? কারণ, যখন একজনের দরবারকে পরিত্যাগ করেছি, তখন পঞ্চাশজনের দরজায় মাথা নত করতে হচ্ছে। আর ঐ দরজাগুলোতে কিছুই নেই যে আপনাক দেবে। ফলে এখন কোনো পথ রইল না। উভয় পথই হারালাম।

মাথা ও চৌকাঠের আযমত

আমার একটি কবিতাংশ মনে পড়ল। সেটি বাস্তবে অনেক দরকারি কথা। কবিও অত্যন্ত সাহিত্যপূর্ণভাবে ব্যক্ত করেছেন। যিনিই তা বলে থাকেন না কেন অত্যন্ত উঁচু মাপের কথা বলেছেন। তিনি দুটি বাক্যে অনেক মূল্যবান বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। কবি বলেন–

سر جس پہ نہ جھک جائے اُسے در نہیں کہتے

চৌকাঠ তো তাকেই বলে, যাকে দেখলেই মানুষের মন চায় নত হতে। তাহলো নবীদের চৌকাঠ, আল্লাহওয়ালাদের চৌকাঠ। এমনিতেই কী অন্তর চায় যে, মাথা নত করবে; সেখানে তো অস্বীকার করার কোনোই উপায় নেই।

কবি বলেন–

سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے
ہر در پہ جو جھک جائے اُسے سر نہیں کہتے

মাথা যেখানে নত হবে না, তাকে চৌকাঠ বলে না। আর যে মাথা প্রত্যেক চৌকাঠে নত হয়ে যাবে, তাকে মাথা বলা যাবে না।

ওয়াদা ভঙ্গের লাঞ্ছনা

যে ব্যক্তি পঞ্চাশজনকে নিজের মনিব বানিয়েছে, সে কোনো মনিবের সেবা করতে পারবে না। মনিব একজন হলে সেবা হতে পারে। যদি আপনার পঞ্চাশজন মনিব থাকে, তাহলে কখনও একজনের চৌকাঠে মাথা নত করতে হবে, কখনও আরেকজনের চৌকাঠে মাথা ঝোঁকাতে হবে। কখনও তার নিকট ভিক্ষা চাইতে হবে, কখনও অপরজনের নিকট ভিক্ষা চাইতে হবে। মুসলিম জাতি তো দুনিয়াতে ভিক্ষা করতে আসেনি। তারা দুনিয়া থেকে কিছু চাওয়ার জন্য আসেনি। তারা এসেছে দুনিয়ায় কিছু দেওয়ার জন্য। তারা মুহসিন হয়ে এসেছে, সায়েল ভিক্ষুক হয়ে আসেনি। যখন তারা ইহসানের পথ বন্ধ করে দিয়েছে, তখনই প্রার্থনাকারী ও ভিক্ষুক হতে হয়েছে।

এখন আপনাদের অবস্থা হলো, আপনারা কোনো বিজাতির সামনে মাথা নত করছেন, আমাদেরকে তাহযিব-তামাদ্দুন ভিক্ষা দিন। কারো সামনে নত হচ্ছেন, আমাদেরকে রাজনীতি ভিক্ষা দিন, কারো সামনে মাথা নত করছে, আমাদেরকে উত্তম চরিত্র ভিক্ষা দিন। অথচ আপনাদের মাথার টুকরিতে রিজিক আছে, সবকিছুই আছে। কিন্তু দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করে ফিরছেন। এতটুকু তাওফিক ও যোগ্যতা আপনাদের নেই যে, হাত উত্তোলন করে মাথা থেকে নিবেন। যা ভিক্ষা করে ফিরছেন তা সবই তাতে রয়েছে। অর্থাৎ কুরআন ও হাদিস মাথায় রয়েছে। আর দুনিয়ার দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা চাচ্ছেন। অথচ কুরআন ও হাদিসে সব কিছুই

বিদ্যমান। আর কুরআন ও হাদিসই পৃথিবীতে আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তার প্রসার ঘটিয়েছে–

یک سبد پر زنان تر اپر فرق سر

تو ہمی جوئی لب ناں در بدر

মাথায় রুটিভর্তি টুকরি আর আমরা রুটির টুকরা ভিক্ষা করতে দ্বারে-দ্বারে ফিরছি।

এ কারণেই যখন অন্যের চৌকাঠে মাথা ঝোঁকাবেন, তখন পরিণামে ভিক্ষুক হবেন। মুসলিম জাতি পৃথিবীতে এসেছে জাতিকে কিছু দেওয়ার জন্য। কিন্তু আজ তারা ভিক্ষুক ও ভিখারী হয়ে গেছেন। আর এখন ভিক্ষা মিলছে না বলে এদিক -ওদিক কোনোটাই হলো না।

এমন পরিস্থিতি কেন হলো?

তার কারণ একটাই। আর তাহলো ওয়াদা ভঙ্গ করা। ঐ ওয়াদা ভেঙ্গে দিয়েছে, যা তারা আল্লাহর সাথে করেছিল। তিনি বলেছিলেন, একমাত্র আমারই উপর ভরসা করো, আমাকেই তোমাদের বাদশাহ মনে করো, আমাকেই খালিক ও মালিক মনে করো, আমরাই বিধিবিধান সারা দুনিয়াতে সম্প্রচার করো, সবার নিকট পৌঁছাও। আপনারা যখন আল্লাহর আইন ছেড়ে দিয়েছেন, তখন দুনিয়ার অন্যান্য জাতি আপনাদের উপর ধর্মহীন কানুন চালু করেছে। যেগুলো তবিয়তবিরোধী, আকল ও যুক্তিবিরোধী এবং বুদ্ধি ও অনুভূতিবিরোধী। এক কথা অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু আপনাকে আগে বেড়ে করতে হচ্ছে। আপনি জবরদস্তি করে যাচ্ছেন আবার বলেছেন, এগুলো ভাল নয়। তবুও অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে।

তাই জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হলে আপনাকে অপারগ হয়ে মেনে নিতে হবে। কারণ, যখন নিজেদের আইনকে পরিত্যাগ করেছেন, তখন অন্যদের আইনের উপর চলতে হবে। যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ আইন করে, তবুও মানতে হবে। কারণ, ইসলামি বিধানকে পরিহার করেছেন, তা পিছনে ফেলে দিয়েছেন। তাই দুনিয়াবাসীর সামনে মাথা নত করতে হবে।

ইসলামি আইনের কার্যকরী অনুসরণ আবশ্যক

যদি আপনারা ইসলামি আইনের আমলকারী হতেন, শুধু আকিদাগতভাবে নয় বরং বাস্তবক্ষেত্রে আমল করতেন, তাহলে কারো সুযোগ ছিল না তাতে ফাঁক বা ছিদ্র বের করবে। যখন আমল ছেড়ে দিলেন, তো কথায় আছে–

خانۂ خالی را دیو می گیرد

যখন ঘর বিরান ও খালি হয়, তখন শয়তান তাতে রাত যাপন করে। এজন্য বাস্তব ও স্থিতিশীল একটিমাত্র চিকিৎসা বা প্রতিকার যে, আল্লাহ তায়ালা যে বিধান দিয়েছেন চোখ বন্ধ করে সেগুলোর উপর আমল করতে থাকা। তাহলে দেখবেন, কিভাবে পরিবর্তন সাধিত হয়। আপনারা তো চান স্রেফ পরিদর্শন দ্বারা কোনো বস্তুকে অর্জন করে নিতে, দেমাগ ও মনকে খুশি করতে। কাজের কোনো খবর নেই। মনে করেন, কিছু করতে হবে না। মনে রাখবেন, দুনিয়াতে কর্ম ব্যতীত কারো কিছু অর্জন হয় না। দুনিয়া কর্ম ও উপার্জনেরই স্থান। যতটুকু কর্ম ও মেহনত-পরিশ্রম করবেন, ততটুকু সম্পদ হস্তগত হবে।

উপকরণ ও মাধ্যম ছেড়ে দিয়ে যতবড় ধনী হওয়ার জন্য বসে থাকবেন, পরিশেষে তত ছোট গরীব ও মুহতাজ হবেন। আপনি কিছুই পাবেন না। দুনিয়াটা তো জান্নাত নয় যে, ধারণা করলেই চলে আসবে। এটি দুনিয়া। এখানে মেহনত-পরিশ্রম ব্যতীত সম্পদ অর্জন হবে না। কৃষক যদি ছয় মাস রক্ত-ঘাম একাকার না করে, তাহলে সে চারটি দানাও ঘরে তুলতে পারবে না। কেননা, দুনিয়া কর্মক্ষেত্র। কৃষক যদি বর্ষাকালে ভাবে, ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে, কঠিন হীম-শীতল মৌসুম; সুতরাং এই চার-ছয় মাস শুয়ে-ঘুমিয়ে পার করে ফেলব, তাহলে বীজ বপনকাল চলে যাবে, বৃষ্টির মৌসুম শেষ হয়ে যাবে, তখন যখন অন্য কৃষকরা তরকারির স্তূপ নিয়ে বাজারে আসবে, তখন সে বসে-বসে কাঁদবে আর বলবে, আমি বীজ বপনের সারা মৌসুম ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি, তাই আমার এই পরিণতি।

এখন ফসল তোলার সময় এসেছে। যারা মেহনত করেছে, তারা দানা তুলছে আর আমি বঞ্চিত ও খালি হাতে বসে আছি। এখন বসে-বসে কাঁদবে। কিন্তু কাঁদলে কী হবে। ভর্ৎসনাকারীরা তো ভর্ৎসনা করবে যে, হে হতভাগা! তুমি ঐ ছয় মাস কেন পরিশ্রম করনি? তাই যখন পরিশ্রম করনি, এখন বসে-বসে কাঁদো।

মোটকথা, দুনিয়ার বাজার, দুনিয়ার মাঠ কৃষি কাজের জন্য। আল্লাহ তায়ালা কল্যাণের বীজ অন্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ঈমান-আমল মজবুত করে সেগুলো কার্যকর করো; তাহলেই দুনিয়া ও আখেরাতে তার ফলাফল প্রকাশ পাবে।

যদি আপনি বীজে পানি না দেন, সেচ না দেন, তাহলে দেখা যাবে, কিছু দিন পর বীজ শুকিয়ে যাবে। জমিতে পানি না দিলে বীজ জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কল্যাণের যে বীজ অন্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো আপনি নিজেই নষ্ট করে চলেছেন। সেগুলোকে আমলের পানি দিয়ে উৎপন্ন করার চিন্তা-ফিকির করছেন না। আর এখন প্রশ্ন করছেন- আমাদের দানা-পানি কেন মিলে না? আমাদের খাদ্যাভাব কেন? ভাই! তোমরা উৎপন্ন না করলে কিভাবে মিলবে? যখন তোমরা রোপনই করনি, তাহলে দানা-ফসল কোথা হতে মিলবে?

ইজ্জত ও কর্তব্য-নেতৃত্ব অর্জনের কৌশল

সবার মনে একই প্রশ্ন, আমি শান্তি কিভাবে পাব? আমার স্থিরতা ও প্রশান্তি কিভাবে লাভ হবে? আমার ইজ্জত-সম্মান ও সামাজিক প্রভাব কিভাবে অর্জন হবে? ক্ষমতা-নেতৃত্ব কোন পন্থায় পাব? কিন্তু সবাই কাজ করে আগে বাড়তে চায় না। উন্নতি লাভ করতে চায় না।

এগুলো আকাঙ্ক্ষা করা ঐ কৃষকের মতো হলো, যে কল্পনা করে বসে আছে আর বীজ বপনের মৌসুম শুয়ে-বসে নষ্ট করেছে। তাহলে তার ঘরে কে দানা নিয়ে আসবে? তাকে ভিক্ষা চাইতে হবে যে ভাই! আমি আমার ভূমিতে ফসল উৎপন্ন করিনি; তাই তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এক স্তূপ ফসল দাও। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এক টুকরা খাবার দাও। আমাদের অবস্থা একই রকম হয়ে গেছে। যখন কাজ করার সময়, তখন তা আরাম করে নষ্ট করি। না আছে আমাদের দীনের খবর, না আছে বিধিবিধানের খবর, না আছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য। না আছে, মনে ঐ অঙ্গীকার, যা আমরা আল্লাহর সাথে করে এসেছি। আর যখন কিছুই করিনি; ফলে ফেতনা এসে গেছে আর ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে, সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে, রাষ্ট্রও হাতছাড়া হয়েছে, এখন আমরা ভিক্ষা করে ফিরছি, আমাদের নেতৃত্ব দিন, রাষ্ট্র দিন।

রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব, দৌলত ও ইজ্জত পাওয়ার যে সকল উপায়-উপকরণ ছিল, সেগুলোকে পরিহার করেছি আর এখন বলছি কী তদবির ও কৌশল হতে পারে? তদবির তো আছে, করতেও হবে, করার সময় এসেছে, তদবির আমাদের তৈরি করতে হবে না। তা তো নবী দিয়ে গিয়েছেন, আল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ইসলামি রাষ্ট্রগুলো বিধর্মী নির্ভরশীল

সারকথা, যখন আপনার ওয়াদা ভঙ্গ করলেন, তখন আল্লাহ বললেন, আমার উপর জরুরি নয়, আমি আমার ওয়াদা পুরা করব। আমার ওয়াদা তো শর্তযুক্ত যে, তোমরা আমার বন্দেগী করবে, তোমরা আমার কানুন মোতাবেক আমল করবে, তোমরা নিজেদের জীবনকে নবীর মোবারক সীরাত মোতাবেক গড়ে তুলবে এবং তাঁর জীবনী ও সংবিধানকে পথ চলার মশাল বানাবে। তোমরা তা করবে বলে ওয়াদা করে দুনিয়াতে এসেছিলে। যখন তোমরা তোমাদের ওয়াদা পুরা করনি, তখন আমার ওয়াদা পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা রইল না যে, তোমাদের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব দেব, ইজ্জত দেব, খাদ্য দেব। এ কারণেই ঐগুলো হাতছাড়া হতে চলছে। আস্তে-আস্তে রাষ্ট্রও হাতছাড়া হচ্ছে। আজ এক দেশ হাতছাড়া হচ্ছে, কাল এক দেশ হাতছাড়া হচ্ছে।

আবার দেশ হাতছাড়া না হলেও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হাতছাড়া হচ্ছে। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব চলে গেছে কাফেরদের হাতে। আপনি আপনার দেশে থেকে কিছুই করতে পারছেন না যতক্ষণ-না অন্যের ইচ্ছা বা অনুমতি হয়। সুতরাং আপনারা তাদের ইচ্ছার গোলাম ও অধীন। আপনি বলবেন, সাহেব! আমাদের দেশ স্বাধীন দেশ এবং আমাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে। কিন্তু আপনাদের ক্ষমতা কতটুকু? আপনারা তো অর্থের মুহতাজ। তারা যদি বলে, যতক্ষণ সন্তান জন্ম বন্ধ না করবে, ততক্ষণ আমরা অর্থ দিব না, ঋণ দেব না, তাহলে আপনাদের অবশ্যই করতে তা হবে। এটা কেমন স্বাধীনাতা?

স্বাধীনতা, ক্ষমতা ও নেতৃত্ব

কর্তৃত্ব বলা হয়, যা নিজশক্তিতে শক্তিমান। অন্যের শক্তিতে শক্তিমান হওয়াকে শক্তিমান বলে না। আপনারা কী সক্ষম যতক্ষণ অন্যদের শক্তি ব্যবহার না করেন? তাহলে আপনারা সক্ষম ও শক্তিমান নন। এটি কেমন শক্তি? শক্তি তো বলা হয়, যা নিজের মধ্যে থাকে এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারে। মনে যা চায় বলতে পারবে। সুতরাং তা শক্তি নয়। তাহলে আপনারা সক্ষম ও শক্তিমান হলেন কবে?

দেশ যদি স্বাধীন হয়, হিন্দুস্তান হোক, পাকিস্তান হোক বা অন্য কোনো দেশ হোক, কিন্তু পরিচালনা ও প্রভাব অন্যদের হাতে, যতক্ষণ তারা সাহায্য-সহযোগিতা না করে, চলতে পারে না। তাকে কি কর্তৃত্ব বলা হবে? এমন

কর্তৃত্বের ফলাফল হলো, আপনারা প্রতিটি বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী। রুটি, রিজিক খাদ্য-খাবার এবং ইজ্জত ও কর্তৃত্ব সব কিছুতেই।

দলাদলির অশুভ পরিণতি

আমার প্রশ্ন হলো, এহেন বেইজ্জতি, লাঞ্ছনা ও রিজিকহীনতা সম্পর্কে আপনাদের অন্তরে কখনও কি এমন প্রশ্ন জাগ্রত হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর সাথে করা ওয়াদার বিপরীত কোনো কিছু করেছি কি-না? শুধু অভিযোগ করছেন, আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি? আমাদের থেকে দেশ কেন ছিনিয়ে নিল? আমাদের ইজ্জত-সম্মান কেন কেড়ে নিল? আমাদের খাবার কেন ছিনিয়ে নিল? আমরা কেন ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছি?

আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কে তো বলতে পারেন আর নিজের সম্পর্কে বলতে পারেন না যে, আমরাও কিছু করেছি। এই পরিণতি নিজেদের কৃতকর্মের কারণে। ড. ইকবাল রহ. বলেছেন–

برق گرتی ہے تو بے چارے مسلمان پر

جو آفت آتی ہے وہ انہیں پر آتی ہے۔اب روتے ہیں

আকাশ হতে বজ্র পতিত হয় তো বেচারা মুসলমানদের উপর পতিত হয়। বিপদ এলেও তাদের উপর আসে। তারপর তারা কাঁদে।

তারা ভাবে না, চিন্তা করে না যে, বজ্রপাত হলো কেন? তারা বলে দেয়, আল্লাহ তায়ালা তা পাঠিয়েছি। আল্লাহই পাঠান। কখন পাঠান? যখন তোমরা আল্লাহর রইলে না, তিনি বজ্রপাত ঘটাবেন, দুর্ভিক্ষ দেবেন, রিজিক ছিনিয়ে নিবেন। তোমরা ওয়াদা ভঙ্গ করেছ, তো তিনিও ওয়াদা ভঙ্গ করবেন, তা পূর্ণ করবেন না। তাঁর ওয়াদা ততক্ষণ যতক্ষণ ঈমান ও আমলের শর্ত পুরা হবে।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ

সুতরাং ঈমান, আমলে সালেহ এবং পরস্পর আস্থা ও মহব্বত-ভালবাসার শর্ত পুরা হলে ওয়াদা পূরণ হবে। আপনারা তো ঝগড়া করেই কূল পাই না। ঐক্যবদ্ধ কিভাবে থাকব? মতভেদ ও বাকবিতণ্ডা সব কাজে। এখন মুসলমানদের নিত্য কাজে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি কাজে ঝগড়া-লড়াই। কোনো মাসয়ালা সামনে এলে আমরা লড়াই-ঝগড়াতে লিপ্ত হই, কোনো শরয়ী

হুকুম এলেও ঝগড়া-লড়াইয়ের জন্য দাঁড়িয়ে যাই। প্রতিটি বিষয়ে যুদ্ধ-লড়াই, প্রত্যেক কাজে দলাদলি, প্রত্যেক কাজে দোষ খুঁজে বের করা ইত্যাদি। এমন জাতি ও সম্প্রদায়ের তো এহেন পরিণাম হবেই যে, তারা কাঁদতে থাকবে।

জাতীয় অনীহা

সবার মনে একই প্রশ্ন, সাহেব! আমরা ঐ সকল ফেতনায় লিপ্ত। এখন কী করব? কিন্তু সবার অন্তরে বদ্ধমূল যে, আল্লাহ তায়ালাই ফেতনা বর্ষণ করেছেন। আল্লাহর উপর অভিযোগ সবার মনে উদয় হয়। নিজের নফসের প্রতি কারো অভিযোগ হয় না যে, আমি এই-এই করেছি।

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবার এহেন অভিযোগ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁর দরজা সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। গ্রহণকারী তো কেউ থাকতে হবে। আল্লামা ইকবাল রহ. তাঁর জাওয়াবে শেকওয়ায় আল্লাহর পক্ষ হতে অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন–

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں

راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں

আমি তো অনুগ্রহে আগ্রহী। কোনো প্রার্থী তো থাকতে হবে। রাস্তা দেখাব কাকে, পথিক তো থাকতে হবে। কোনো প্রার্থনাকারী না থাকলে তিনি কিভাবে দেবেন।

হাদিস শরীফে এসেছে, প্রতিদিন রাতের এক তৃতীয়াংশের পর আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার আকাশে আপন তাজাল্লি দেন এবং কুদরতি হাত প্রসারিত করেন এবং বলেন–

اَنَا الرَّازِقُ مَنْ ذَالَّذِیْ یَسْتَرْزِقُنِیْ

اَنَا الْغَافِرُ مَنْ ذَالَّذِیْ یَسْتَغْفِرُنِیْ

আমি রিজিকদাতা, কেউ আছে রিজিক প্রার্থনাকারী?

আমি ক্ষমা প্রদানকারী, কেউ আছে কী ক্ষমা প্রার্থনাকারী?

যাকে আল্লাহ তায়ালা তাওফিক দেন, তিনি প্রার্থনা করেন এবং তাকে আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তিগতভাবে দেন। কিন্তু জাতি গাফেল। তারা প্রার্থনা করেও না, তাদের অর্জনও হবে না।

মোটকথা, আল্লাহ হাত প্রসারিত করে বলতে থাকেন, কেউ আছে কি প্রার্থনাকারী? তো আল্লামা ইকবালের কথা সঠিক প্রমাণিত হলো যে–

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائیں کسے، رہروِ منزل ہی نہیں
جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں

আমি তো অনুগ্রহ করতে আগ্রহী। অনুগ্রহ প্রার্থী তো নেই, পথ দেখাব কাকে, পথিক তো নেই। যে মাটি দিয়ে আদম বানাল, সেই মাটি তো আর নেই। যে মাটি দ্বারা মানুষ তৈরি করা হলো, সেই মাটিতেই নেই ফসল। তো শয়তানী আত্মা ভিতরে প্রবেশ করেছে, তো মূলই শয়তানের সাথে মিলে গেল।

জীবনের জরিপ নেওয়া জরুরি

এখন আপনাদের মস্তিষ্কে এ কথা বদ্ধমূল যে, আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য জাতিকে সব কিছু দিয়েছেন আর আমাদের নিকট হতে সবকিছু ছিনিয়ে নিচ্ছেন। এ কথা আসে না, কেন কেড়ে নিলেন? আমরা কী কী করেছি? তাই এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় বিষয় হলো, নিজেদের জীবনের জরিপ নেওয়া। আমাদের ওপর ফরজ হলো আমাদের জীবনকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরিকায় পরিচালনা করা। আর তা সম্ভব নয় কিছু তালিম ও তারবিয়াত না থাকলে। সুন্নাত তো আকাশ থেকে বর্ষিত হয় না যে, তা ঘরে-ঘরে পৌঁছে যাবে। সুন্নাত তো তালিমের মাধ্যমে অর্জন হয়, আজ মুসলিম জাতি হতে দীনি শিক্ষা হারিয়ে গেছে। আমাদের মাঝে কতজন রয়েছে যে, যারা বাস্তবে কুরআনুল কারীমকে এই নিয়তে পড়ে বা শ্রবণ করে যে, আমাদের আমলের তাওফিক নসিব হোক? এমন অনেক রয়েছে, যারা কুরআন পড়তেই পারেন না। তারা কুরআনের শব্দ উচ্চারণের তালিম পায়নি অর্থ ও তাফসীর তো দূরের কথা। শতকরা নিরানব্বইজন এমন বের হবে, যাদের জানা নেই, দীন কাকে বলে, দীন কী জিনিস। কিন্তু দাবি করে, সাহেব! আমরাও দীনদার। মনে হয় একশতের মধ্যে দু-চারজন দীনদার বের হবে। আর কওমের বেলায় নেককার কওম বা জাতি বলা হবে তখনই, যখন কওমের অধিকাংশ নেককার হয়। হাজারে দশ-বিশ ব্যক্তি দীনদার হলে ঐ কওমের সম্মানের মাথা

উঁচু হয় না। এটি তাদের ব্যক্তিগত সম্মান। কওমের সম্মানের মাথা উঁচু হবে, নাম-কাম হবে যখন তাদের অধিকাংশ অথবা অর্ধেকাংশ দীনদার হবে।

আজ আমাদের অবস্থা এমন যে–

مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

মুমিন কম, ফাসিক ও পাপিষ্ট অধিক।

আর মুমিন যতটুকু আছে, তাদের ব্যাপারে কুরআনুল কারীমের অভিযোগ হলো–

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ•

অনেক মানুষ রয়েছে যারা ঈমানা গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাস্তবে তারা মুশরিক। অন্তরে এখনও গায়রুল্লাহর আযমত-মহব্বত জমে আছে। মালিকের আযমত নেই। *[সূরা ইউসুফ ১০৬]*

কেউ বলছে পীর সাহেব আমাকে সন্তান দেবে, কেউ বলছে ফকির সাহেব আমি যা চাই তা-ই দেবে। তারা আল্লাহর আযমত ফকির ব্যক্তিকে সোপর্দ করেছে। তাহলে এমন জাতি কিভাবে নৌকা পার হবে? সবাই বলে ফেতনা থেকে বাঁচার পথ বলে দিন। এই কথা বলে না, আমাদেরও কিছু করতে হবে।

সর্বনিম্ন হিম্মত

বড়জোর বলবে, হযরত! একটি তাবীজ লিখে দিন, যাতে দোকানে বরকত হয়। আমি বলি, তোমার কিছুই করতে হবে না। যা করার তাবীজই তা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে করবে আর তুমি আরামে বসে থাকবে। তুমি আমল নষ্ট করতে থাকো, তাবিজ সবকিছু তৈরি করে দেবে। অথবা কোনো দোয়া লিখে ঝুলিয়ে দাও। দোয়া কাজে লাগে তখন, যখন নিজে মধ্যে কিছু থাকে। অন্যথায় তা এমন যে, কেউ কারো নিকট গেল যে, হযরত! দোয়া করেন আমার যাতে সন্তান হয়। অথচ বিবাহের নাম-গন্ধও নেই, স্ত্রী নিকটে থাকে না। ভাই! দোয়া তখনই কাজে আসে, যখন মানুষ উপকরণ প্রস্তুত করে। দোয়া শুধু ফলাফলের জন্য করা হয় যে, উপকরণ যেন ফলদায়ক হয়। এমনটি হবে না যে, উপকরণ ও দোয়া দ্বারা হাতে এসে যাবে, মিলে যাবে। আমাকে কিছুই করতে হবে না।

হযরত থানভী রহ.-এর খেদমতে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, হযরত! আমাকে নামায পড়ার জন্য একটি তাবিজ লিখে দিন! থানভী রহ. বললেন, ভাই! আমি এমন কোনো তাবিজ লিখতে পারি না যে, তা লিখে তাতে দুজন

সিপাহী বসিয়ে দেব; যখন নামাযের সময় হবে তখন তারা তোমাকে ডাণ্ডা মেরে বলবে, মসজিদে চলো। আমার নিকট এমন তাবিজ নেই যে, তাতে দুজন সিপাহী বসে থাকবে। তারপর তিনি তাকে ধমকালেন, নালায়েক! যা তোমার কাজ তা কি তাবিজে করবে। তুমি চেয়ারে হেলান না দিলেও আরাম পেয়ে যাবে? তাবিজ তোমাকে সব কিছুই করে দেবে?

অতএব তাবিজ কাজে আসবে যখন আপনি উপকরণ সংগ্রহ করবেন। তাবিজ তো ফলাফল পাওয়ার জন্য। আর দোয়া হয়, আল্লাহ যেন ফলাফল দান করেন, যাতে মেহনত বেকার না যায়। মেহনতের জন্য তো তাবিজ বানানো হয় না যে, সাহেব! আমার দ্বারা কাজ করিয়ে নিন। কান ধরে আমার দ্বারা আমল করান। আমল তো আপনার হিম্মত করবে, অন্যজন কান ধরে কাজ করাতে পারবে না।

মজবুত ও দৃঢ় হিম্মতের প্রয়োজন

দীন ও শরীয়তে আসল বস্তু হলো হিম্মত। মানুষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে যে, এটা আমাকে করতেই হবে; তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। আর যদি এমন হয় যে, কাজ করছে, পেরেশানির সাথে তাতে দৃঢ় হিম্মত নেই, তাহলে তাতে সাহায্যও আসবে না। সুতরাং আপনাদের মধ্যে তামান্না তো বিদ্যমান যে, ফেতনা দূর হোক। কিন্তু মজবুত হিম্মত নেই যে, আপনারা তা দূর করবেন। এ কারণে প্রত্যেক কাজে দৃঢ়তা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। দুনিয়াবিদ কাজের বেলায় যদি স্রেফ তামান্না হবে যে, আমার প্রতি মাসে হাজার টাকা আমদানি হবে, তাহলে কখনও হবে না। কিন্তু যখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হবে যে, আমার প্রতি মাসে হাজার টাকা উপার্জন করতেই হবে। চাই ব্যবসার মাধ্যমে হোক, চাই কৃষি কাজের মাধ্যমে হোক, চাই চাকরির মাধ্যমে হোক, আমার এক হাজার টাকা উপার্জন করতেই হবে। আর যদি সেই কাজে লেগে যান, তাহলে আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য আসবে। ফলে অবশ্যই এক হাজার টাকা উপার্জন হবে।

কিন্তু যদি দোকানে না যান, অফিসে না যান, ক্ষেতে না যান আর তামান্না করেন, প্রতি মাসে হাজার টাকা উপার্জন করতে হবে। তাহলে প্রতি মাসে এক হাজার টাকার বৃষ্টি বর্ষণ হবে না। তা কাজ করে উপার্জন করতে হবে।

উপকরণ ব্যতীত দোয়ার তাসির হয় না

দোয়া তখনই কাজে আসে, যখন মানুষ উপকরণ প্রস্তুত করিয়ে দোয়া করায় যে, সাহেব! আমি তো এতটুকু কাজ শুরু করেছি যে, ওযু করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গমন করে আদায় করি। এখন আপনি দোয়া করুন, যাতে এ কাজে টিকে থাকতে পারি, মজবুত থাকতে পারি। হ্যাঁ এমন সময় দোয়া করা যেতে পারে। কিন্তু যে বলে, আমার তো নামায পড়ার ইচ্ছা নেই, আপনি দোয়া করুন যাতে আমি নামাযী হতে পারি। দুনিয়াতে এমন কোনো নিয়ম নেই।

এজন্য এমন দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে, যাকে ইচ্ছার ওপর ন্যস্ত করা হয়। এভাবে বলা হয়–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ اِنْ شِئْتَ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ اِنْ شِئْتَ

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি চাইলে। হে আল্লাহ! আমার উপর দয়া-অনুগ্রহ করো যদি তুমি চাও।

রহম ও ক্ষমা তিনি তখনই করবেন, যখন তিনি ইচ্ছা করবেন। আর আপনার একথা বলা যে, আপনি যদি চান, তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দিন, তার অর্থ হলো আপনার ক্ষমা তো আমার দরকার নেই; তো আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দিন। অথবা আমার তো আপনার রহমতের প্রয়োজন নেই; তবে আপনি যদি চান, তাহলে আমার উপর রহম করুন। এমন কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ দোয়াকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর শর্তযুক্ত করে কখনও দোয়া করো না যে, আপনি চাইলে দিয়ে দিন; আমার প্রয়োজন নেই। এভাবে দোয়া করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

তিনি বলেছেন, দোয়া করো এমন অনুনয়-বিনয়ের সাথে এবং এমন মনোবলের সাথে যে, আমি আল্লাহর নিকট থেকে নিয়েই উঠব। কারীম আল্লাহর দুয়ারে এসেছি; বঞ্চিত হয়ে ফিরব না। তুমি নাছোড় হয়ে দোয়া করো; তাহলে অবশ্যই কবুল হবে এবং মিলবে। তুমি ভিক্ষুক হয়ে এবং নাছোড় হয়ে প্রার্থনা করো এবং চৌকাঠে মাথা লাগিয়ে বলো, আমাকে না দিলে মাথা উঠাব না; তাহলে এমন বান্দার দোয়া অবশ্যই কবুল হয়।

একবার হজ করার সময় দেখলাম, এক গ্রাম্যলোক যে কিনা একেবারেই লেখা-পড়া জানে না, বাইতুল্লায় এল এবং দোয়া করল আশ্চর্যজনকভাবে। তিনি বলল–

يَارَبِّ الْبَيْتِ يَارَبِّ الْبَيْتِ جِئْتُكَ وَالْاَهْلُ فِي الْبَيْتِ اَنْ تَغْفِرْلِيْ اَنْ تَغْفِرْلِيْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার ঘরে এসে গেছি এবং বিবি-বাচ্চা রেখে এসেছি, ইহসান করেছি। স্ত্রী-সন্তানদের ঘরে রেখে এসেছি তারা ঘরে রয়েছে আর আমি তোমার ঘরে এসে গেছি। সুতরাং ক্ষমা করতে হবে। ক্ষমা ও মাগফিরাত ব্যতীত ফিরে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি মাগফিরাত নিয়েই ফিরব।

বাস্তবে এমন ব্যক্তিদেরই মাগফিরাত ভাগ্যে জোটে।

মোটকথা, কাকুতি-মিনতি থাকবে, কান্না থাকবে, অন্তরের ঝোঁক থাকবে, পাশাপাশি ইতস্ততাবোধও থাকবে।

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ

যে ব্যক্তি অসহায় হয়ে কাকুতি-মিনতির সাথে দোয়া করবে, আমি অবশ্যই তার দূর করব, তার ওপর থেকে ফেতনা দূর করব এবং পৃথিবীতে শক্তি ও রাজত্ব দেব এবং ক্ষমতা ও নেতৃত্ব দেব। *[সূরা নামল- ৬২]*

সুতরাং প্রার্থনাকারী কথা ও কাজে উভয় সূরতে প্রার্থনা করবে। সে এমন আমল করবে, যাতে শিরকের লেশ থাকবে না, দোয়া করবে এমনভাবে যাতে অমুখাপেক্ষিতার লেশ থাকবে না। অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় করে প্রার্থনা করবে। তাহলে অবশ্যই পাবে। এখন আপনারা দোয়া হতে বেনিয়ায, তালিম হতে বেনিয়ায, তারবিয়াত হতে বেনিয়ায পড়ালেখা হতে বেনিয়ায, পরিশ্রম হতে বেনিয়ায, তবে আশা করেন সবকিছু পেয়ে যেতে। এমনটা আল্লাহ তায়ালার নিয়মের বিপরীত।

ইজ্জত ও ক্ষমতা লাভের সাধারণ বিধিবিধান

পৃথিবীর কোনো সম্প্রদায়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই যে, তাদেরকে পৃথিবীর কর্তৃত্ব দিয়ে দিবেন। তিনি তো উসূল ও কানুন বাতলে দিয়েছেন। যারা তা ফলো করবে, তারা তা পাবে। যারা অনুসরণ করবে না, তারা পাবে না। তিনি আমভাবে কানুন ঘোষণা করে দিয়েছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـُٔوْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

মুসলিম হোক, সাবেঈ হোক, ইয়াহুদী হোক, নাসারা হোক বা অগ্নিপূজক বা অন্য কোনো জাতি যারা-ই ঈমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে, তাদেরই জন্য সাওয়াব রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই, চিন্তা নেই, আবার তারা বঞ্চিতও হবে না। *[সূরা বাকারা আয়াত-৬২]*

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তদবির বলে দিয়েছেন। আমি আপনাদে কী তদবির বলব? আমি কী বলব? এবং কোনোটা আগে বলব? এখন কী হযরত জিবরাঈল আ. বলতে আসবেন? না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাব পাঠিয়ে দিয়েছেন। তা পড়ে জ্ঞানার্জন করো, বিধিবিধান সম্পর্কে অবগতি লাভ করো। শিক্ষা গ্রহণ না করতে পারলে, জানা না থাকলে, আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করে-করে জেনে নাও এবং সাথে সাথে ইত্তেবা করার জযবা রাখো যে, যা জানব অনুসরণ করব। চাই পড়ালেখা করে জ্ঞানার্জন করি, চাই আলেমদের নিকট থেকে ফতোয়া নিয়ে-নিয়ে অর্জন করি, চাই প্রশ্ন করে-করে নিজেকে সান্ত্বনা ও আশ্বস্ত করি যে, আমাকে করতেই হবে। আর এতটুকু ইলম আমাকে অর্জন করতে হবে, যার উপর আমি আমল করতে পারব। আর তা অর্জন করতে যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। মানুষের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি হলে ইলম অর্জনের জন্য দশ পদ্ধতি গ্রহণ করবে।

কোনো মহিলার স্বামী দূরে চাকরি করতে গেলেন। তিনি হাজার-হাজার মাইল দূরে চাকরি করেন। মহিলা তার স্বামীকে অনেক ভালবাসেন। তিনি লেখা-পড়া জানেন না। যদি স্বামীর পক্ষ হতে কোনো পত্র আসে, তাহলে নিজে তো পড়তে পারেন না; কিন্তু স্বামীর সাথে যেহেতু ভালবাসা ও সুসম্পর্ক রয়েছে, তাই পাড়া-মহল্লায় পত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ান যে, কোনো আল্লাহর বান্দা আছে কি, যে আমার স্বামীর পত্রটি পড়ে শুনাবে তিনি তাতে কী লিখেছেন? যদি তার স্বামীর প্রতি ভালবাসা না থাকত, তাহলে পত্র নিয়ে এভাবে মহল্লায় ঘরে-ঘরে উঁকি মারত না। যেহেতু তিনি নিজে লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু যেহেতু গভীর মহব্বত রয়েছে তাই স্বামীর নিকট থেকে একটা কার্ডের টুকরো আসায় তা নিয়ে মানুষের দুয়ারে ঘুরে ফিরছেন যে, কেউ কি আছে আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এই পত্রের বিষয়বস্তু বুঝাবে। আমাকে জানাবে, আমার স্বামী কী লিখেছেন?

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে আপনার ঘরে পত্র এসেছে। আর তা হলো কুরআনুল কারীম, যা আল্লাহর বাণী। আপনার অন্তরে যদি কুরআনের প্রতি মহব্বত থাকত আর আপনি মূর্খ বা অজ্ঞ হতেন, তাহলে আপনি ইলমের ঘরে-ঘরে তথা মাদরাসায় উঁকি-ঝুকি দিতেন আর বলতেন, আমাকে কুরআনের মর্ম বুঝিয়ে

দিন। এটি আমার মালিকের ফরমান। এটি আমার মালিকে চিঠি। মোটকথা, মহব্ব থাকলে সব কিছু হয় আর না হলে মানুষ মাতাল হয় না। তখন সে দুঃখ ও পেরেশানির মধ্যে পড়ে।

যিকরুল্লাহর বৈশিষ্ট্য

পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

যদি তোমরা অন্তরের প্রশান্তি ও স্থিরতা চাও, তাহলে আল্লাহর জিকির করো। আমার কথা স্মরণ করো; আমি শান্তি দেব। আল্লাহর জিকিরে প্রশান্তি লুকিয়ে আছে। আজ দুনিয়ার সকল উপকরণ একত্রিত করলেও মনে প্রশান্তি অর্জন হবে না। যে ব্যক্তি আজ দুনিয়ার সকল উপকরণ ও মাধ্যম একত্রিত করেছে, সে অন্তরের পেরেশানিতে আপনার চেয়ে বেশি ভোগে। সে সর্বদা অস্থিরতায় থাকে যে, কোনো উপকরণ-সামগ্রী যাতে হাতছাড়া না হয়। কর্তৃত্ব যাতে অন্যের হাতে চলে না যায়। সে রাত-দিন সারাক্ষণ মসিবতে লিপ্ত থাকে।

আর যে আল্লাহর জিকির করে, তার উপর ভরসা করে আছে, তার কোনো চিন্তা-ফিকির নেই, সে অত্যন্ত প্রশান্তি ও স্থির মনে বসবাস করে। আপনি যদি মনের প্রশান্তি গায়রুল্লাহ বা দুনিয়ার উপকরণে অন্বেষণ করেন, তাহলে তা কখনও হাসিল হবে না। তার একটিমাত্র পথ রয়েছে। আর তাহলো আল্লাহর জিকির ও তাঁর স্মরণ। তাতে অন্তরে প্রশান্তি আসে। আপনি যতই মসিবতে পড়েন এবং পেরেশানিতে থাকেন; কিন্তু যখন মসজিদে গমন করেন এবং একটি সিজদা করেন, তখন অন্তর স্থির ও শান্ত হয়ে যায় যে, আমি আমার মালিকের সামনে আরজি পেশ করেছি। তাই ঘরে শান্তি না এলে মসজিদে আসে। সুতরাং যিকরুল্লাহর বৈশিষ্ট্য হলো অন্তরে প্রশান্তি ও স্থিরতা সৃষ্টি করা।

যিকরুল্লাহ ও স্টালিন

স্টালিন কমিউনিস্টদের নেতা ছিলেন এবং কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। লোকটা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করত, দীন-ধর্মকে অস্বীকার করত। কিন্তু তার মরণ ঘনিয়ে এলে তার মুখে আল্লাহ আল্লাহ জিকির জারি হলো। সে আল্লাহ-আল্লাহ বলতে লাগল। লোকেরা তাকে বলল, ভাই! তুমি তো আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে; এখন তুমি কিভাবে তাঁর নাম উচ্চারণ করছ? সে বলল,

ভাই! আমি এখনও অস্বীকার করি। সে কমবখ্‌ত বঞ্চিত ছিল। তাই মরণকালেও বলল, আমি এখনও অস্বীকার করি। কিন্তু আমি নিরুপায়। কী করব, তাঁর নাম ছাড়া তো অন্তরে শান্তি ও স্থিরত আসে না। প্রশান্তির তো কোনো মাধ্যম নেই। যদি আমি স্ত্রীদের নাম স্মরণ করি, টাকা-পয়সার কথা স্মরণ করি, কেল্লার কথা স্মরণ করি, তাহলে অন্তরে প্রশান্তি আসে না। সকল বস্তু আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আমার থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। যখন আমি আল্লাহর নাম স্মরণ করি, তখন মন থেমে যায়। তো আমি এখনও অস্বীকার করি; কিন্তু তারপরও অন্তরের প্রশান্তি ও স্থিরতা তাঁর দ্বারাই অর্জন হয়।

একজন স্বঘোষিত নাস্তিক একথা অনুভব করতে পারল যে, প্রশান্তি আল্লাহর নামের মধ্যে রয়েছে। আর একজন আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকারকারী মুসলিম যদি স্বীকার না করে, প্রশান্তি আল্লাহর নামের মধ্যে, সে যদি ফিকির ও জিকির কোনোটাই না করে এবং অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ না করে, তাহলে যখন মুসলমান এতটুকু গাফেল ও বেপরোয়া হয়ে যায়, তাহলে তাদের প্রশান্তির ফলাফল, রিজিকের উপকরণ এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উপকরণ কিভাবে পাবে।

আমার ভাইয়েরা আমার নিকট আবেদন করেছিলেন, মুসলমানেরা মসিবতে লিপ্ত; তাদের কী চিকিৎসা হতে পারে? ভাই! চিকিৎসা ত-ই যা আমি বর্ণনা করেছি। সবার জন্য আবশ্যক নয় যে, সবাই আলেম হয়ে যাবেন এবং সবাই ইমাম গাযযালি হয়ে যাবেন। তবে এতটুকু তো জরুরি যে, আল্লাহ তায়ালা যা সবার ওপর ফরজ করেছেন, সেগুলোর পাবন্দী করবেন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বেন, সামর্থ্যবান ও নেসাবের মালিক হলে যাকাত ও সদকা দ্বারা মুসলিম ভাইদের সেবা করবেন। রোযা রেখে নিজ আত্মাকে পবিত্র করবেন। সামর্থ্য ও সক্ষমতা থাকলে হজ করে নিজের ইশকের জযবাকে প্রকাশ করবেন। সবার সাথে সদ্ব্যবহার করবেন, সবাইকে ভালবাসবেন। সবার প্রতি সুধারণা রাখবেন। এগুলো করে দেখুন জাতি ঐক্যবদ্ধ হয় কি-না?

প্রত্যেকের অন্তরে এমন বদ ধারণা রয়েছে যে, অমুক নিষ্কর্মা এবং অকেজো আর আমি কর্মঠ। সে নালায়েক, অপদার্থ আর আমি যোগ্যতাসম্পন্ন। যখন এমন জযবা অন্তরে থাকবে, তখন পরস্পর মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

নিজের মন্দের অনুভূতি সবার সামনে নেই। দুনিয়ার মন্দ সবার সামনে। আমি এত পবিত্র যে, আমার মধ্যে কোনো প্রকার খারাবি নেই, সমস্ত খারাবি দুনিয়ার সকল মানুষের মধ্যে। এগুলো হলো বদ ধারণা। এই বদ ধারণা দ্বারা একতা কায়েম হয় না এবং মহব্বত-ভালবাসাও কায়েম হয় না। আর সুধারণা হলো

সবচেয়ে ভাল জিনিস, যা দ্বারা মানুষ নিজেকে নিচু মনে করে আর অপরকে বড় মনে করে। ফলে পরস্পর সুধারণা সৃষ্টি হয়; একতা-মহব্বত সৃষ্টি হয়।

কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অর্জনের মাপকাঠি

আপনাদের সর্বশেষ বাদশা যফর, যিনি মোগল বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন। তিনি কিছুটা ব্যক্তিগতভাবে সুফি মানুষ ছিলেন আর কিছুটা গরীবি হালতের কারণে সুফি হয়েছিলেন। তিনি একটি দামি কথা বলেছেন, যা বাস্তবেই বড় নসিহতযোগ্য কথা। তিনি বলেন–

نہ تھی حال کے جب ہمیں اپنی خبر # رہے دیکھتے اوروں کے عیب وہنر

پڑی اپنی خرابیوں پر جو نظر # تو نگاہ میں کوئی بُرا نہ رہا

যখন আমার নিজের অবস্থার খবর ছিল না, তখন ছিল অন্যদের দোষ-গুণের খবর। আর যখন নজর পড়ে আমার দোষের প্রতি, তখন আমার নজরে কারো দোষ থাকেনি।

দুনিয়াবাসীকে তখনই খারাপ মনে হবে, যখন নিজের দোষ-গুণের খবর না থাকবে। আর যখন নিজের দোষ ও গুণের খবর থাকবে, তখন প্রত্যেককে পাক-পবিত্র ও দোষহীন দেখতে পাবেন। তখন প্রত্যেকে অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষী হবে।

যখন দেখবেন, অন্যকে উপদেশ দিচ্ছে নিজের দিকে সম্বোধন করে, তাহলে তার কাজ চলবে না। দুনিয়ার বিষয়ে সর্বদাই আপনার থেকে নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির প্রতি নজর থাকার চাই যে, সে তো মাসিক উপার্জন করতে পারে একশত টাকা আর আমার উপার্জন হাজার-পাঁচশত টাকা। তাহলে শুকরিয়া আদায় করতে পারবেন। আর দীনের বিষয়ে আপনার থেকে উচ্চ পর্যায়ের প্রতি নজর দিতে হবে যে, সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পাবন্দীর সাথে নিয়মিত পড়তে পারে; শত আফসোস আমি তা পারি না। সুতরাং দুনিয়ার ব্যাপারে আপনার চেয়ে গরীবের প্রতি তাকাবেন আর আখেরাতের বেলায় আপনার চেয়ে উত্তমের দিকে তাকাবেন; তাহলে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে।

এখন মানুষ একেবারে উল্টাটা করে থাকে। দীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিম্নমানের দিকে তাকায় যে, আমার নামায অনেক আর সে তো নালায়েক মানুষ। সে নামায পড়ে না অন্য কোনো আমল করে না। আর দুনিয়ার বিষয়ে নিজের চেয়ে ধনীদের দেখে যে, আমার শত টাকা আমদানি হয় আর অমুকের

অনেক টাকা হয়। আমার প্রতিদিন দুশত টাকা আমদানি করা জরুরি। এতে মানুষের লোভ-লালসা বেড়ে যায় আর লোভের পরিণতি ভাল হয় না।

মোটকথা মানুষেরা সম্পূর্ণ বিপরীত করে। অতএব, দীনের ব্যাপারে নিজ হতে উত্তমকে দেখতে হবে, যাতে দীনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর দুনিয়ার ব্যাপারে নিজের থেকে নিম্নমানের প্রতি তাকাতে হবে, যাতে শুকরের জযবা সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সবকিছু দিয়েছেন। এজনই যফর বলেছেন–

نہ تھی حال کے جب ہمیں اپنی خبر # رہے دیکھتے اوروں کے عیب وہنر

پڑی اپنی خرابیوں پر جو نظر # تو نگاہ میں کوئی بُرا نہ رہا

তিনি আগে বেড়ে আরো বলেন–

ظفر آدمی اس کو نہ جانئے گا ب # گو ہو کیسا ہی صاحب فہم وذکا

যফর বড় মুদাব্বির, নেতা, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান; তা মানুষেরা জানবে না, তাহলে কিভাবে বলছ–

ظفر آدمی اس کا نا جانئے گا # گو ہو کیسا ہی صاحب فہم وذکا

جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی # جیسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

> সে মানুষ নয় যে, আরামে-আয়েশে নেয়ামতদাতার প্রতি তাকায় না। আরাম-আয়েশে নেয়ামতদাতার দিকে ধাবিত হও এবং তার হক আদায় করো। তাকে ভয় করতে থাকো। যিনি দিতে পারেন, তিনি কেড়ে নিতে পারেন।

মানুষ যত শুকরিয়া আদায় করবে, তার চেয়ে বেশি পাবে। আর নাশুকরি করবে তো নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা হলো–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

> নেয়ামত পেয়ে যদি শুকরিয়া আদায় কর, তাহলে আমি নেয়ামত বাড়িয়ে দেব।

وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

> আর যদি নাশুকরি কর, তাহলে আমার শাস্তি খুব কঠিন। তারপর নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

মুসলমানদের কর্তৃত্ব লাভের উপকরণ

সবচেয়ে বড় কথা হলো আল্লাহ তায়ালার প্রতি সুধারণা রাখা। তাঁর আনুগত্যে থেকে সামান্য ইবাদাতে অনেক শুকরিয়া জ্ঞাপন করা, যাতে ইবাদাত বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিজ আনুগত্যের উপর গর্ব প্রকাশ করবে না যে, আমি কিছু করেছি। হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, যখন মানুষ নামায পড়ে বা কিছুক্ষণ জিকির করে বলে, হে আল্লাহ! আমি নামায পড়েছি, তেলাওয়াত করেছি, যিকিকর করেছি, অর্থাৎ গর্ব ও অহংকার প্রকাশ করে যে, আমি বড় কাজ করেছি। তখন আল্লাহ বলেন, নির্বোধ! তুমি কী কাজ করেছ? তোমাকে শক্তি আমি দিয়েছি, ইচ্ছা আমি সৃষ্টি করেছি, উপকরণ আমি সংগ্রহ করেছি, তুমি কী করেছ? মোটকথা, যা করা হবে তাও অস্বীকার করা হবে।

আর যদি সবকিছু করে একথা বলে যে, হে আল্লাহ! আমার থেকে কিছুই হয়নি; আল্লাহ বলেন, না; পায়ে হেটে মসজিদে তুমি গমন করেছ, শক্তির ব্যবহার তুমি করেছ, হজের জন্য সফরের ইচ্ছা তুমি করেছ, তুমিই সব কিছু করেছ। সুতরাং যে সব কিছু করে বলে, আমি কিছুই করিনি, তার উত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলেন, না, তুমিই সবকিছু করেছ। তুমিই সবকিছু পাবে। আর যে অল্প-স্বল্প করে বলে, আমি এই করেছি, সেই করেছি, তাকে বলা হয়, হে নালায়েক! তুমি কী কাজ করেছ? শক্তি আমার দেওয়া, ইচ্ছা আমার দেওয়া, উপকরণ আমার দেওয়া; তুমি কী করেছ?

এজন্য আমাদের কাজ হলো, মালিকের সামনে মাথা নত করা, তারপর গর্ব না করা। সর্বপদে এই মনে করবে যে, কিছুই করতে পারিনি। তাওবা করবে, ইস্তিগফার করবে। তাহলে জাতি আগে বাড়তে পারবে, উন্নতি লাভ করতে পারবে। যখন জাতির ভিতর এমন জযবা থাকবে, তখন উন্নতি লাভ করতে পারবে। আর জযবা না থাকলে, লাখো আমল করতে পারবে; কিন্তু কখনও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব লাভ করতে পারবে না। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা শুধু তামান্না দ্বারা অর্জন হয় না। তামান্না দ্বারা ইজ্জতও মিলে না। উপকরণ ছাড়াও ইজ্জত অর্জন হয় না। ঐ সকল উপকরণ দ্বারা ইজ্জত-সম্মান অর্জন হবে, যেগুলো আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুসলিমার জন্য নির্ধারণ করেছেন। অমুসলিমদের সাথে এক ধরনের ব্যবহার, মুসলিমদের সাথে আরেক ধরনের ব্যবহার। আর যারা এমন দাবি করে যে, আমরা আপনার, তাদের সাথে ভিন্ন রকম ব্যবহার।

দুশমনের সাথে আল্লাহর মুয়ামালা

আর যে একথা বলে যে, আমি আপনার নয়, তার সাথে ভিন্ন মুয়ামালা করেন। দুশমনের গালি মানুষ সহ্য করে নেয় এই বলে যে, সে তো দুশমন; তার কাজই হল গালি দেওয়া। কারো ছেলে যদি তার পিতার প্রতি বাঁকা চোখে তাকায়, তাহলে পিতা তাকে চড়-থাপ্পর মারে আর বলে, তোর থেকে এমনটা আশা করি না। এজন্যই মুসলিমের সামান্য জিনিসের জন্য ধরা খেতে হবে। তাকে বলবে, তুমি আমার ছিলে; তুমি দাবি করতে আমি একজন মুসলিম, আমি আল্লাহর আনুগত্যকারী বান্দা। তারপর তুমিই এমন কাজ করলে?

এক সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে, আমরা আল্লাহকে মানি না, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, তাদের সবকিছু দাও। একটা সময় এমন আসবে যে, হঠাৎ তাদের উপর আযাব আপতিত হবে। তখন তাদের খবর হবে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা দুশমনকে অবকাশ ও সুযোগ দেন; কিন্তু বন্ধুকে অবকাশ দেন না। ভুল করলে সাথে সাথে শাস্তি দেন। আর কাফেরদের শাস্তি দেন না, তাদের ঢিল দেন। অথচ তারা গালি দেয়, দীনকে অস্বীকার করে, দীনকে বিদ্রূপ করে। তাদের তিনি সুযোগ দেন যে, তাদের খারাবিয় শেষ পরিণতি ঘনিয়ে আসছে।

আমার এ কথা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ভাই! তদবীয় তো সবাই জিজ্ঞেস করেন; কিন্তু কারো মধ্যে এই জযবা তৈরি হয় না যে, এই তদবিরকে আমলে পরিণত করবে? তারা বলে, আমল করার জন্য ইয়াহুদী ও নাসারা জাতি রয়েছে। তবে আমাদেরকে তার তদবির বলে দিন, যাতে আমাদের অন্তরে ও দেমাগে প্রশান্তি লাভ হয় যে, আমরা তার তদবির জানতে পেরেছি। আমল করার প্রয়োজন নেই। আমল করা অন্য জাতির কাজ। যখন অন্যরা আমল করবে, তো তারা তা পাবে। তাহলে আপনারা ঈর্ষা করেন কেন যে হযরত! তারা সব কিছুই পেয়েছে আর আমরা কিছুই পাইনি? তারা কিছু করেছিল বলে কিছু পেয়েছে। আপনারা করেননি; তাই পাননি।

আমলের তদবির বা কৌশল

ইসলাম শব্দের অর্থ মুসলমান হওয়া আর মুসলমান অর্থ সত্যের অনুসারী। যখন আপনি বলবেন, আমি মুসলমান, তার অর্থ হলো, আমি আপনার পালনকর্তার আনুগত্যকারী। তারপর তাঁর আনুগত্য করে দেখান। হাদিসে মুয়ায-এ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন–

هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟

হে মুয়ায! তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর কী হক?

তাহলো এই–

اَنْ يَّعْبُدُوا اللهَ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا

আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন হবে, তাঁর বিধান মতে চলবে, তাঁর নবীর সুন্নাতের অনুসরণ করবে এবং তার অন্তরে এমন জযবা ও ভালবাসা থাকবে যে, আমি আমার রবের আনুগত্য করব এবং অন্যকে তাঁর সাথে শরিক বানাব না। তাহলে সে আল্লাহর হক আদায় করল। তারপর বললেন–

هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟

তুমি কি জান, আল্লাহর ওপর বান্দার হক কী?

তিনি বলেন, বান্দার হক হলো, আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন, যখন তোমরা আবেদ হবে, তখন তোমাদের সবকিছু দেব। দৃশ্যগত রিজিক দেব, অদৃশ্যগত রিজিক দেব, জাহেরী রিজিক দেব এবং অনুভবগত রিজিক দেব। এক কথায় সবকিছুই দেব। উভয় প্রকারের বস্তু হস্তগত হবে। এই হাদিসে সমস্ত তদবির বলে দেওয়া হয়েছে। যদি আমল করা হয়, তাহলে এই একটি হাদিসই জীবন দুরস্ত করার জন্য যথেষ্ট। আর আমল না করলে এক হাজার ওয়াজও যদি আপনি এক বসায় শ্রবণ করেন, তাহলে কোনো ফল হবে না। বরং সেই ওয়াজ তার জানের জন্য আপদ হয়ে দাঁড়াবে।

দুনিয়াদার আলেম

কারণ, ওয়াজের ভিতর কিছু মাসয়ালাহ জানা হয়ে যায়। মানুষ যদি অজানাবশত ভুল করে, তাহলে তার একটা ওজর আছে যে, আমার এই বিষয়টি জানা ছিল না। আর জানা থাকার পর না করলে সেটি তার জন্য মসিবত ও বোঝা হিসেবে গণ্য হবে।

মুতানাব্বী তার দেওয়ানে একস্থানে বলেছেন–

وَاِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِىْ فَتِلْكَ مُصِيْبَةٌ # وَاِنْ كُنْتَ تَدْرِىْ فَالْمُصِيْبَةُ اَعْظَمُ

যদি তুমি মূর্খ থাক, না জান, তাহলে তা একটা মসিবত। আর যদি জানা থাকে, তারপর আমল না কর, তাহলে ডাবল মসিবত। এ কারণেই নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলকে বদ দোয়া দিয়েছেন একবার আর আলেমকে সাতবার।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

وَيْلٌ لِلْجَاهِلِ مَرَّةً وَوَيْلٌ لِلْعَالِمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ

জাহেলের জন্য একবার ধ্বংস ও বরবাদি আর আলেমের জন্য সাতবার, যার ইলম আছে তারপরও আমল করে না।

আলেম, যার হালাল-হারামের ইলম রয়েছে বৈধ-অবৈধের ইলম রয়েছে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির পাবন্দী করবেন, অন্যের সন্তুষ্টি তালাশ করবেন না। এখন কোনো মৌলবী সাহেব যদি বলেন, হযরত! নিশ্চয় মাসয়ালা তো এমন, যা আপনি বলেছেন; কিন্তু অর্থ আমদানির সম্পর্ক তো অমুকের সাথে। সুতরাং কী অসুবিধা হতে পারে যদি তার মনোতুষ্টির জন্য তার মন মোতাবেক মাসয়ালা প্রদান করি; তাহলে সেই আলেম আল্লাহর বান্দা থাকবেন না, ইবলিসের বান্দায় রূপান্তরিত হবেন। ফলে যার থেকে দু-চার পয়সা পাওয়া যাবে, তার মনমতো ফতুওয়া দিয়ে দিবেন।

তাহলে এমন মাসয়ালা হবে মোমের মাথার ন্যায়। দুনিয়ার উদ্দেশ্য যেভাবে আসবে সেভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে। এমনটা কোনো আলেমের কর্ম নয়, তা জাহেল ও মূর্খের কর্ম। সে শুধু অহেতুক আলেমের জুব্বা পরিধান করেছে। যিনি প্রকৃত আলেম, তিনি অনেক বড় সম্পদ। যে ব্যক্তি আলেম; কিন্তু নিজের প্রয়োজন অন্যদের নিকট পেশ করে এবং অন্যের সন্তুষ্টির প্রতি আগ্রহী যে, দু-চার পয়সার পরিবর্তে শরীয়ত বিকৃত করতে পরোয়া করবে না। এমনটি কোনো ইলম ও ইলমধারীর শান হতে পারে না। এমন মানুষ প্রকৃত আলেম নয়। তারা নামসর্বস্য আলেম এবং আলেমের জুব্বা পরিধান করেছে মাত্র।

وَاِنْ كُنْتَ تَدْرِىْ فَالْمُصِيْبَةُ اَعْظَمُ

জেনে ও বুঝে আমল না করলে ডাবল মসিবত।

এ কারণেই আল্লাহর রাসূল জাহেলকে একবার বদ দোয়া দিয়েছেন আর আলেমকে দিয়েছেন সাতবার।

চেষ্টা ও মেহনতের ফলাফল

অতএব, এ ব্যাপারে কিছু বলার ছিল যে, নিঃসন্দেহে ফেতনা তো অতিরিক্ত আকার ধারণ করেছে। চতুরদিকে পেরেশানি বেষ্টন করে আছে। কিন্তু এগুলো সবই আমাদের হাতের কামাই। আল্লাহ তায়ালা তো সেগুলো বর্ষণ করেননি। তবে তিনি সৃষ্টি করেন। আর তিনি তা-ই সৃষ্টি করেন, যা বান্দা কামাই করে। সুতরাং উপার্জনকারী হলো বান্দা আর আল্লাহ হলেন সৃষ্টিকারী। আমরা কোনো কাজে চেষ্টা ও মেহনত করলে আল্লাহ তা সৃষ্টি করবেন। সুতরাং তোমাদের কাজ হলো নিজেরা চেষ্টা-মেহনত করো এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো, তাহলে তিনি সৃষ্টি করবেন। তো ফেতনার ব্যাপারটিও এমন। এগুলো তোমাদের আমাদের হাতের কামাই। আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন–

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ

তোমাদের উপর যে মসিবত পতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে হয়। *[সূরা শুরা আয়াত : ৩০]*

তোমাদের কৃতকর্মের ফসল হলো এই। অর্থাৎ যা আমরা করেছি তার বিপদ প্রকাশ পেয়েছে। আর যদি নেক কর্ম করি এবং নেক পথে চলি, তাহলে ভিন্ন কথা ভাল ফলাফল প্রকাশ পাবে। ফলাফল তো আল্লাহ তায়ালা দেন। তিনি ন্যায়বিচারক। তাঁর কাছে ন্যায়বিচার পাওয়া যায়। তাঁর চেয়ে বড় ন্যায়বিচারক আর কেউ নেই। তিনি কারো মেহনতকে নষ্ট করেন না।

فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

তিনি কোনো মুহসিনের ইহসান ও আমলকে নষ্ট করেন না।

অতএব আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। কিছু চেষ্টা-মেহনত করতে হবে। কিছু দিন তালিম নিতে হবে এবং নিজের তারবিয়াতের প্রতি নজর দিতে হবে। কোনো আল্লাহওয়ালা মুরুব্বীর সাথে সম্পর্ক করে নিজের চরিত্র সংশোধন করতে হবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ কল্যাণ ও খায়ের প্রকাশ পাবে।

আর কিছু না হলে কিছু হয় না। এখন আমি আমার কথা ইতি টানছি এবং কবির কবিতা আবৃতি করছি–

نا نصیحت بجائے خود کریم # روزگارے درین بسر بردیم

گر نیاید بگوش رغبت کس # بر رسولاں بلاغ باشد و بس

কবি বলেন, আমি অনেক উপদেশ করেছি- আমি দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছি, উপদেশ দিয়েছি। এখন যদি কারো কর্ণে তা না পৌঁছে এবং অন্তরে পতিত না হয় তাহলে উপদেশদাতার কাজ শুধু তাবলিগ ও পৌঁছে দেওয়া। মানানো বা আমল করানো তার কাজ নয়। মানলে সে আন্তরিক জযবা দিয়ে মানবে। এ কারণে তদবির আমি পেশ করেছি, আমল আপনাদেরই করতে হবে। এখন তদবিরও বলব আবার আমলও করব। ভাই আমি যদি জানতে পারতাম, আমার আমল করার দ্বারা সারা জাতির মুক্তি মিলবে, তাহলে আমি আমল করে ফেলতাম। কিন্তু জাতির আমল দ্বারাই জাতির মুক্তি মিলবে। কারো আমল দ্বারা কারো মুক্তি মিলবে না।

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى

যে চেষ্টা করবে, সে-ই পাবে।

একজন চেষ্টা করবে অন্যজন পাবে এটি আল্লাহ তায়ালার নিয়মের বিপরীত। যে করবে, সে পাবে। এ কারণে আমি এখন শেষ করছি। ফেতনা ও মসিবত বাস্তব। তবে তার চিকিৎসাও তেমনই বাস্তব আর তা আমি পেশ করেছি। তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন যে, আমল কিভাবে করব? উদাহরণস্বরূপ ইবাদাত করবেন তো জিজ্ঞেস করতে হবে নামায কিভাবে পড়তে হবে? আর সামাজিক আমল করতে চাইলে জিজ্ঞেস করবেন, দুনিয়ার সকল জাতির সাথে কেমন ব্যবহার করব। এটিও কুরআনের নিকট জিজ্ঞেস করবেন। কুরআন তা বলে দেবে। রাজনৈতিক আমল করবেন, তাও কুরআনের নিকট থেকে জেনে নিবেন। কুরআন বলে দেবে যে রাজনীতির দ্বারা জাতীয় কর্তৃত্ব লাভ হয়। কুরআনে সব কিছুই রয়েছে। তবে তার জন্য যে আমল করবে, চেষ্টা-মেহনত করবে।

ঈমানের জন্য স্বর্ণের প্রয়োজন

যদি বলি, আপনি খালি পকেটে যাচ্ছেন, তো বাজারে চাই কোটি টাকার মাল-সম্পদ থাকুক, তাহলেও একথা সঠিক হবে। কারণ, পকেট খালি। সেখান থেকে তো তারাই সামগ্রী নিয়ে আসবে, যারা পকেটে টাকা নিয়ে যাবে। তাই আপনি যদি বাজারে গমন করেন আর আমি এমন বলি যে, বাজারে কিছুই নেই শুধু কাক উড়ছে, তাহলে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে চাই লাখ-লাখ সামগ্রী থাকুক কিন্তু তোমার জন্য কিছুই নেই। কারণ, তোমার পকেটে তো টাকা নেই। পয়স থাকলে তো কিছু নিয়ে আসতে পারবে। মোটকথা, অন্তরের পকেটে ঈমানের

স্বর্ণ থাকা উচিত। ঈমানের জযবা থাকা উচিত। তাহলে দুনিয়ার বাজারে সব কিছুই মিলবে। আর যদি অন্তর খালি করে যাও, যাতে আল্লাহর উপর ঈমান নেই, আমলে সালেহ নেই, সুন্নতের অনুসরণ নেই, তাহলে দুনিয়াতে লাখ-কোটি থাকলেও তোমার জন্য কিছুই নেই। খালি হাতে ফিরতে হবে।

হে আল্লাহ তায়ালা তুমি আমাদেরকে নেক আমলের উপদেশ গ্রহণ করে আমলে জযবা ইখতিয়ার করার, আমলের হিম্মত করার, হিম্মতের উপকরণ সৃষ্টি করার, নেককারদের সংশ্রব গ্রহণ করার, কিতাব মুতালায়া করার, প্রশ্ন করার তাওফিক দাও, যাতে ইলম বৃদ্ধি পায় এবং আমলে উন্নতি হয়।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ. اَللّٰهُمَّ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ. وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

এই দোয়া করে দিলাম। সবাই এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফিরলেন যে, তার উপর আমল করবেন এবং এই অনুসন্ধানে লাগবেন যে, আমাকে ইলমে দীন ও আখলাকে দীন অর্জন করতে হবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহর সাহায্য পাবেন। পরিশেষে আরেকটি আরজি পেশ করছি যে, সাধারণত অভ্যাস হলো, মানুষ মুসাফাহা করে থাকে। আমি এখন দুর্বল ও কমজোর হয়ে পড়েছি। আপনাদের প্রত্যেকের সাথে হাত মিলাতে হবে। তাতে পাঁচশতবার হাত বাড়াতে হবে। আমার মধ্যে এত শক্তি নেই যে, এতবার হাত বাড়াব। সুতরাং মুসাফাহা করা হতে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমাকে আরামে যেতে দিন। আপনাদের সাথে আমার অন্তর মিলে গেছে এতটুকুই যথেষ্ট। হাত মিলানোর প্রয়োজন নেই।

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّنَا وَرَسُوْلِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

বয়ান : ৭

নারীশিক্ষা

দীন পুরুষদের জন্য খাস নয়। তবে কিছু জিনিস এমন রয়েছে, যেগুলো শুধু পুরুষদের জন্য খাস, পুরুষদের সাথে বিশেষিত। যেমন– রিসালাত ও প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব। নারীগণ রাসূল কিংবা প্রধান বিচারপতি হতে পারে না। কারণ, এগুলোর যোগ্যতা তাদের মধ্যে নেই। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কামালের বস্তু হলো নবুওয়াত, যার বিশাল একটি জামাত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনও নারী ছিলেন না।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا• اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ • اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ.

উন্নতির প্রথম ধাপ[১]

প্রিয় বালকেরা, মুহতারামা বোনেরা ও স্থানীয় ভাইয়েরা! আপনাদের এই মাদরাসায় এসে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও খুশি হয়েছি। তালীম ও শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর কোনো জাতি শিক্ষা ব্যতীত উন্নতি লাভ করতে পারেনি। কোনো সম্প্রদায়ের উন্নতির প্রথম সোপান হলো শিক্ষা। ইসলাম ধর্মেও সর্বপ্রথম তালীমের আয়াত নাযিল হয়েছে। বলা হয়েছে–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

---

১. ৫ মুহাররামুল হারাম ১৩৮২ হিজরী জুমার দিন জামিয়া খাইরুল মাদারিস মুলতান-এ মহিলা শাখায় এই বয়ান পেশ করেন।

ইসলামপূর্ব যুগ চরিত্রহীনতা, অন্যায় ও খারাপ জিনিসে ভরপুর ছিল। কিন্তু সেই যুগের নাম বদ-আখলাক বা বদ-আমল ইত্যাদি রাখা হয়নি; বরং তার নাম রাখা হয়েছে জাহেলিয়াতের যুগ। এতে প্রতীয়মান হয়, সকল খারাবির উৎসস্থল হলো জাহালাত বা মূর্খতা। তার বিপরীতে ইসলামে বুনিয়াদি উৎসস্থল হলো শিক্ষা। আল্লাহ তায়ালা তালীম সম্পর্কে যতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেছেন অন্য কোনো বিষয়ে ততটুকু গুরুত্ব প্রদান করেননি। তিনি হযরত আদম আ.কে সৃষ্টি করে প্রথমে তাঁর জন্য পরিধেয় বস্তুর ইন্তেজাম করেননি; বরং সর্বপ্রথম তাঁর জন্য তালীমের ব্যবস্থা করেছেন।

যেমন বলা হয়েছে–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

আদম আ.কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়ে ফেরেশতাদের সাথে প্রতিযোগিতা করালেন এবং তিনি সফলকাম হলেন। তারপর তাঁকে খেলাফত দ্বারা ভাগ্যবান করলেন এবং খেলাফতের মুকুট মাথায় পরালেন। তারপর বললেন–

اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

তুমি স্ত্রীসহ জান্নাতে বসবাস করো।

তো তিনি প্রথমে তালীমের ব্যবস্থা করলেন। তারপর বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করলেন। এতে বুঝা যায়, তালীমের মর্যাদা অনেক বেশি।

দুনিয়াটা একটা শিক্ষাকেন্দ্র

তালিম ব্যতীত মানব আর দানবের মাঝে পার্থক্য করা যায় না। তালিম শুধু পিতার উপর সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং সন্তানদেরও তালিম দিয়েছেন। হাদিস শরীফে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আ. -এর পিঠে ডান হাত মারলেন। তখন নেককার সন্তান বের হয়ে এল এবং বাম হাত মারার পর বদকার সন্তান বের হয়ে এল। তারপর সবাইকে 'ওয়াদিয়ে বারানে' একত্রিত করে ঐ রুহগুলোকে সম্বোধন করে বললেন–

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى

আমি কী তোমাদের প্রভু নই? তারা সবাই বলল, হ্যাঁ।

এই ব্যবস্থাপনা দ্বারাও আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে এ কথা শিক্ষা দেওয়া যে, আমি তোমাদের রব । সুতরাং এতেও তালিমের গুরুত্ব বুঝে আসে।

কেমন যেন দুনিয়াটা একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা মাদরাসা। আর সকল মানুষ তার ছাত্র। আর আল্লাহ তায়ালা হলেন তার ওস্তাদ এবং নবী-রাসূলগণ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ শাগরেদ ও ছাত্র। অতএব দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো তালিম। তারপর ইবাদত, সুন্দর মুয়ামালা ও মুয়াশারাত। আর তালিমের ক্ষেত্রে ছাত্রদের জন্য প্রয়োজন হয় আহারাদির। তাই তাদের জন্য ভূমি ও নদী-সাগর সৃষ্টি করলেন। কিতাব মুতালায়ার বা অধ্যয়নের প্রয়োজন হয় আলোর। তাই তিনি চাঁদ, তারকা ও সূর্য সৃষ্টি করলেন। তারপর দুনিয়া ত্যাগ করে যখন আমরা কবরে যাব, তখন সেখানে দুনিয়ার শিক্ষার প্রশ্ন হবে–

مَنْ رَبُّكَ

তোমার প্রভু কে?

তার পরীক্ষা হবে।

এটি হলো মানুষের প্রথামিক পরীক্ষা। ফাইনাল পরীক্ষা হবে হাশরের ময়দানে। সেই পরীক্ষায় কিছু মানুষ সফলকাম হবে, পাশ করবে আর কিছু ফেল করবে। যারা কামিয়াব হবে, তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে, জান্নাত দেওয়া হবে। আর যারা ফেল করবে, তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। উক্ত পরীক্ষায় সবাই অংশগ্রহণ করতে হবে। তাতে বৃদ্ধ, যুবক ও শিশু কোনোটারই খেয়াল করা হয়নি। যদিও রুহের জগতে সকল রুহ এক ধরনের ছিল; কিন্তু সর্বশেষ বয়স হিসেবে যারা জন্ম গ্রহণের পর দ্রুত মরে যাবে, তাদের শিশু বলে। যারা জওয়ান হওয়ার পর মরে, তাদের যুবক বলে। যারা বৃদ্ধ হয়ে মরে, তাদের বৃদ্ধ বলে। সুতরাং রুহের জগতেও তাদেরকে তাদের বসয় অনুপাতে রাখা হয়েছিল। এ কারণে শিক্ষার মধ্যে এতটুকু খেয়াল রাখা হয়েছে যে, জওয়ান, বৃদ্ধ ও শিশু সবারই পরীক্ষা হবে। তাই তালিম একটি বুনিয়াদি বস্তু আর দুনিয়াকে আবাদ ও বাসযোগ্য বানানোর উদ্দেশ্য এটিই।

মহিলাদের তালিমী দায়িত্ব এবং তার প্রভাব ও ফলাফল

তালিম ও শিক্ষা মহিলাদের জন্যও অতি জরুরি। কারণ, প্রাথমিক তালিম ও তারবিয়াত তাদের দ্বারা শুরু হয়। জাতির শিক্ষা নির্ভরশীল মায়ের শিক্ষার উপর। জাতির মায়েরা শিক্ষিতা হলে জাতির সন্তানেরা শিক্ষিত হবে। তারা মূর্খ হলে জাতি মূর্খ হবে। তবে যাদের জন্মগত স্বভাব সুস্থ হয়, তারা শিক্ষিত হলে তাদের সন্তানও শিক্ষিত হবে। আর মূর্খ মায়ের অন্তর যদি তালিমের প্রতি আগ্রহ বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার সন্তানের মধ্যেও তার আগ্রহের প্রভাব পড়বে। আর

যদি মায়ের মধ্যে আগ্রহ না থাকে, তাহলে সন্তানের মধ্যে আগ্রহ থাকবে না। এ কারণে শিশু জন্মের সাথে সাথে সর্বপ্রথম তার তালিমের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। তার ডান কর্ণে আযান দেওয়া হয়, যাতে তাওহীদ, রিসালাত ও ইবাদাতের তালিম রয়েছে। সুতরাং আযানের দ্বারা তাকে সর্বপ্রথম মৌলিক ও শাখাগত আকাঈদ ও আমলের তালিম দেওয়া হয়। আর حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বাক্য দ্বারা তার পরিণাম বাতলে দেওয়া হয় যে, ফালাহ ও সফলতা যা তুমি পরকালে পাবে।

এসব আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় ইসলাম ধর্মে শিক্ষার মর্যাদা ও গুরুত্ব কতখানি। এ কারণেই শিক্ষার প্রতি জোর গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহর রাসূল বলেছেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

ইলম অর্জন প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর ফরজ।

যাতে ইলম অর্জনের পর প্রত্যেক নর ও নারী জানতে পারে যে, আমি কেমন মুসলমান, মুসলমানের আখলাক-চরিত্র কেমন হওয়া উচিত। ছোটদের প্রতি আদর ও স্নেহ আর বড়দের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা আর বসবাস, মুয়ামালা ও মুয়াশারাতের কর্মপদ্ধতি জানতে পারবে। এ কারণেই তালিমকে ফরজ করা হয়েছে নারী-পুরুষ সকলের উপর।

তারপর অন্যান্য আমলের তালিম দেওয়া হয়। যেমনটি হাদিস শরীফে এসেছে, যখন সন্তানের বয়স সাত হবে, তখন তাকে ইবাদাতের প্রতি মনোনিবেশ করাও। তো এই সমস্ত মাকসাদ বা উদ্দেশ্য মহিলাদের দ্বারাই অর্জন হয়। যখন মা তালিমপ্রাপ্তা হবেন, তখন তিনি সন্তানদেরও তালিম দ্বারা পরিচিত করবেন, গড়ে তুলবেন। তাদের চরিত্রকে সংশোধন করবেন। আর মা যদি বাচ্চাদের তালিম না-ও দেন; কিন্তু মা নেক্কার ও সচ্চরিত্রা হলে তার নেক কর্মের এবং সুন্দর চরিত্রের বরকতে সন্তানরাও দীনদার হবে। হাদিস শরীফে এসেছে, যে জাতি আমার আনুগত্য করে, আমি তাদের সাত পুরুষ এবং সাত বংশ পর্যন্ত রহমত পাঠাই। আর যারা আনুগত্য করে না বরং নাফরমানি করে, তাদের সাত পুরুষ পর্যন্ত অভিশপ্ত প্রেরণ করি।

উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাতাপিতার নেক কর্ম বা বদকর্মের অনেক বড় প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া রয়েছে, যা সাত পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছায়। আর এই কারণেই মাতাপিতা যেমন হন, তেমনই তাদের সন্তানের উপর তাদের প্রভাব পড়ে। যদি মাতাপিতা আলেম হয়, তাহলে সন্তারে মধ্যে ইলমের প্রভাব পড়ে যে, সেও জায়েয ও নাজায়েয মোতাবেক কথা বলবে এবং শ্রবণ করবে। আর

ব্যবসায়ী হলে সন্তানের মধ্যে ব্যবসার প্রভাব হিসাব ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। তারা কৃষক ও গৃহিণী হলে সন্তানের মধ্যেও তাদের কর্মের প্রভাব পড়বে। অর্থাৎ মাতাপিতার পরিবেশের প্রভাব বাচ্চার উপর প্রভাব করবে।

মানুষের প্রথম হক হলো নিজের নফসের বা আত্মার। আর দ্বিতীয় হক সন্তানের শিক্ষা, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে। তথা মাখলুকের হক। তৃতীয় হক হলো মুয়াশারাহ তথা জীবনযাপন। আর এ তিনটি হক ইলমের উপর নির্ভরশীল। তাই তারা যতটুকু ইলম অর্জন করবে, তাদের বংশধর ততটুকু ইলমি হতে থাকবে এবং পরিবেশ সুন্দর হতে থাকবে।

রানীর তাকওয়ার প্রভাব তার সন্তানের উপর

কাবুল অধিপতি জনাব আমির আব্দুর রহমান খান-এর দাদা আমির দোস্ত মুহাম্মাদের ঘটনা। তার দেশে কোনো বাদশা হামলা করল। তখন তিনি তাদের পরাজিত ও বিতাড়িত করার জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত শাহাজাদার নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠালেন। দু-তিন দিন পর খবর এল, শাহজাদা পরাজিত হয়েছে এবং সে দৌড়ে রাজ্যের দিকে পালাচ্ছে আর শত্রুবাহিনী তাকে ধাওয়া করছে। এতে বাদশা অনেক কষ্ট ও ব্যথা পেলেন এবং অনেকগুলো চিন্তা তাঁর মাথায় ঝেঁকে বসল। পরাজয়ের চিন্তা, শাহজাদার দুর্বলতা এবং জাতির ভর্ৎসনা।

বাদশা এ সকল চিন্তায় চিন্তিত হয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং রানীর নিকট এসে সম্পূর্ণ ঘটনা সবিস্তারে শোনালেন। রানী ঘটনা শ্রবণের পর বললেন, এই ঘটনা সবটুকুই মিথ্যা ও ভুল। আমির সাহেব বললেন, গোয়েন্দা রিপোর্ট কিভাবে ভুল হতে পারে। কিন্তু বেগম তাদের রিপোর্ট মানলেন না। তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, না, পরাজয় হতে পারে না। তো বাদশা এই ভেবে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন যে, সে তো মহিলা তাদের তো মুরগীর এক পা হাঁকাবে। দ্বিতীয় দিন সংবাদ এল, গতকালের সংবাদ ভুল ছিল। শাহজাদা বিজয়ী বেশে ফিরে আসছে। তখন রানী শাহজাদার নিরাপদ ও বিজয়ী বেশে ফিরে আসায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

বাদশা তার বেগমকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে জানতে পেরেছিলে, শাহজরাদা পরাজিত হয়নি? তোমার নিকট কী প্রমাণ বিদ্যমান যে, তুমি আমার পুরা হুকুমতকে মিথ্যা বলে দিলে? তিনি বললেন, না, কিছুই না, স্রেফ আল্লাহ তায়ালা আমার মান রেখেছেন। এ হলো আমার গোপনীয় বিষয়। এগুলো আমি প্রকাশ করতে চাই না। পরিশেষে বারবার পীড়াপীড়ি করার পর বললেন, যখন

এই শাজহাদা আমার পেটে আসে, তখন থেকে আমি অঙ্গীকার করেছিলাম, আমার পেটে যাতে সন্দেহযুক্ত কোনো খাবার না ঢোকে। কারণ, হালাল খাদ্য দ্বারা ভাল তবিয়ত ও নেক আখলাক সৃষ্টি হয়। আর হারাম খাদ্য দ্বারা নষ্ট তবিয়ত ও নিম্নমানের আখলাক সৃষ্টি হয়। এই শাহজাহাদা দীর্ঘ নয় মাস পর্যন্ত আমার উদরে ছিল। আমি নয় মাস পর্যন্ত এমন কোনো খাবার আহার করিনি, যাতে হারামের সন্দেহ থাকতে পারে। এ কারণে তার আখলাক-চরিত্র নিম্নমানের ও খারাপ হতে পারে না। শহীদ হওয়া ভাল চরিত্রের কর্ম আর পিঠ প্রদর্শন ভাল চরিত্রের কর্ম নয়। তাই শাহজাদা শহীদ হতে পারে, আহত হয়ে মরে যেতে পারে; কিন্তু পিঠ প্রদর্শন করে ভাগতে পারে না।

আমি এতটুকু করেই ক্ষান্ত হইনি; বরং যখন এই শাহজাদাকে দুধ পান করাই, তখনও সন্দেহযুক্ত খাবার গ্রহণ করিনি, যাতে ঐ খাদ্য দ্বারা দুধ তৈরি হয়ে তার চরিত্রে প্রভাব না পড়ে। আবার যখন দুধ পান করাতাম, তখন প্রথমে ওযু করে দু'রাকাত নামায পড়ে দুধ পান করাতাম। এই কারণে শাহজাদার চরিত্র অনেক উঁচুমানের হওয়া উচিত। আর এই কারণেই আপনার সারা সৈন্যবাহিনী ও হুকুমতের কথাকে আমি মিথ্যা বলেছি; তবু নিজ কথা হতে ফিরে আসিনি।

যখন আমির দোস্ত মুহাম্মাদের বেগম এত বড় মুত্তাকী হতে পারে, যার নিকট আরাম ও আয়েশের সকল উপকরণ বিদ্যমান; সিংহাসনে বসে তিনি মুত্তাকী-পরহেযগার হতে পারেন, তাহলে আমাদের মা-বোনেরা ঝুপড়িতে বসবাস করে কেন কামিল ও মুত্তাকী হতে পারবে না? মুত্তাকী হওয়ার যে সকল প্রতিবন্ধক তার ছিল, সেগুলো তো তোমাদের নেই। কিছু মানুষ রয়েছে, যারা হিলা-বাহানা তালাশ করে। তারা প্রতিটি কাজে ও কথায় হিলা তালাশ করে বেড়ায়। কিন্তু হিলা তালাশের দ্বারা কিছুই পাওয়া যাবে না। এই সকল লোক কেয়ামত দিবসেও হিলাবাজি করবে এবং বলবে যে, আমরা সময় পাইনি। এ কারণে তোমার আনুগত্য ও ইবাদত করতে পারিনি। অথচ তারা ধন-দৌলতে লিপ্ত ছিল। তাই তারা সুযোগ পায়নি। তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত সুলাইমান আ. ও হযরত ইউসুফ আ.কে পেশ করে বলবেন, এরা দুনিয়ার এত ধন-দৌলত ও দায়িত্ব থাকার পরও আল্লাহর মাকবুল বান্দা ও নবী ছিল।

হযরত আয়েশা রা.-এর ইলমি মাকাম

সাহাবায়ে কেরাম যেমন সাহসী পুরুষ ছিলেন, তেমনিভাবে তাদের নারীরাও সাহসিনী ছিলেন। তেমনি ছিলেন নবীপত্নীগণও।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার ওহীর অর্ধ ইলম সকল সাহাবা হতে আর অবশিষ্ট অর্ধেক ইলম শুধু হযরত আয়েশা রা. হতে শিখে নাও। এ কারণেই অনেক বড়-বড় তাবেয়ী ও সাহাবায়ে কেরাম যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মতো লোক তাঁর শাগরেদ হয়েছিলেন বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আয়েশা রা. ওহীর অর্ধেক ইলম শিখতে পারলে বর্তমান মেয়েরা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার এবং মুয়াযের ইলমও কি অর্জন করতে পারবে না? ইমাম আবু জাফর ত্বহাবী রহ.-এর হাদিসের কিতাবের অনুলিপি তাঁর মেয়ে লিখেছিলেন। আজ সমস্ত উম্মতের উপর তার ইহসান রয়েছে। আর আরেকজন মহিলা হযরত রাবেয়া বসরি রহ. বড় মাপের সুফি ছিলেন।

মহিলা ও ইফতার মর্যাদা

ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাব বাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থের লেখার কারণ ছিল, একজন মুহাদ্দিসের মেয়ে বড় আলেমা ও মুহাদ্দিসা ছিলেন। আবার তিনি অনিন্দ্যসুন্দরীও ছিলেন। অনেক বড়-বড় আলেমের পক্ষ হতে বিবাহের প্রস্তাব এল। এমনকি রাজা-বাদশাদের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব এল। কিন্তু সকলের চেয়ে ঐ মেয়ের ইলম বেশি ছিল এই কারণে প্রস্তাব গ্রহণ করা হত না। এ কারণে সেই মহীয়সী নারী শর্ত জুড়ে দিলেন, সকল বিবাহপ্রার্থী আলেম ফিকাহ বিষয়ে কিতাব লিখবেন। যারা কিতাব আমার পছন্দ হবে, তাকেই আমি বিবাহ করে নেব। এতে হাজারো ফিকাহর কিতাব লিপিবদ্ধ হলো। তিনি বাদায়েউস সানায়ে কিতাব পছন্দ করে তার লেখকের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

বর্তমানে আমাদের বোনেরা এত পরিমাণ যোগ্যতা অর্জন না করতে পারুক; কিন্তু কম করে হলেও হক ও অধিকারসমূহের ইলম তো অর্জন করতে পারবে যে, স্বামীর এই হক, সন্তানের এই হক।

ইলমের মাকসাদ

ইতিহাসের কিতাবে লেখা রয়েছে, সেলজুকি বংশের রাজত্বকালে মাদরাসায়ে নিযামিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। শায়েখ তকী উদ্দীন ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ. সেই মাদরাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অনেক দিন পর বাদশা জানতে পারলেন, ছাত্রদের নিয়ত খারাপ। তখন তৎকালীন বাদশা মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তিনি খেয়াল করলেন, বন্ধ করার পূর্বে আবার দেখে নিই,

বাস্তবেই সবার নিয়ত খারাপ কি-না। একদিন রাতে নিযামুল মুল্‌ক নিজে মাদরাসায় আগমন করলেন এবং এক-এক করে সকল ছাত্রকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, তুমি কেন পড়ালেখা করছ? কেউ উত্তর দিল, আমার পিতা বাদশার বিচারপতি। আমি এজন্য পড়ছি, যাতে আমিও বিচারপতি হতে পারি। কেউ বলল, আমার বাবা অনেক প্রসিদ্ধ ও নামকরা আলেম। পৃথিবীর সকল প্রান্তে তার প্রসিদ্ধি রয়েছে, তাই আমি এই জন্য পড়ছি, যাতে আমারও এমন প্রসিদ্ধি লাভ হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিযামূল মূল্‌ক দেখলেন, সকল ছাত্রর নিয়ত খারাপ। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, মাদরাসা বন্ধ করে দেবেন। আমার লাখ-লাখ রূপি অহেতুক নষ্ট হচ্ছে। সহি নিয়তে কেউ পড়ে না যে, সাওয়াব অর্জনের জন্য পড়ছি। তিনি মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করে ফেললেন। তখন দেখলেন, এক ছাত্র মুতালায়ায় নিমজ্জিত। তিনি তার নিকট গেলেন। কিন্তু সেই ছাত্র সামান্য মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরাননি। তিনি বললেন, তুমি বড় অমুখাপেক্ষী। ছাত্র বলল, আমার উদ্দেশ্য তো কিতাব অধ্যয়ন করা। কারো মুখমণ্ডল মুতালায়া তো আমার উদ্দেশ্য নয়। নিযামুল মুল্‌ক বললেন, হে বৎস! তোমার দু-একটা মিনিট নষ্ট হবে। বলো তো তোমার এখানে পড়ার মাকসাদ কী?

তিনি বললেন, আমি মাতা-পিতা থেকে শ্রবণ করেছি, আমাদের একজন আল্লাহ আছেন, যিনি আমাদের জীবন দান করেছেন। তিনি মুহসিন ও অনুগ্রহকারী। তাঁর হকসমূহের ব্যাপারে আমার জানা নেই। তাই আমি মুহসিনের হক জানার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করছি। নিযামুল মূলক বললেন, আমার ইচ্ছা ছিল, এই মাদরাসা বন্ধ করে দেব এবং ভেঙ্গে ফেলব। কিন্তু যতক্ষণ তুমি এই মাদরাসায় অধ্যয়ন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাদরাসা চালু থাকবে। ঐ ছাত্রটি ছিলেন বিশ্বসেরা আলেম হযরত ইমাম গাযযালি রহ.। এতে প্রতীয়মান হয়, ইলম অর্জনের আসল ও প্রকৃত মাকসাদ হলো হকসমূহ আদায় করা। আর আমাদের মধ্য হতে কে আছে, যার উপর কোনো হক নেই? পুরুষ হোক, নারী হোক, ছোট হোক, বড় হোক সকলের উপর অপরের হক রয়েছে। তাই হকসমূহ জানার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

তালিম ফিতরাত ও আকল উভয়ের হক

তালিম একটি ফিতরি তথা সহজাত বিষয়। আর ফিতরত চায় মুহসিনের পাওনা আদায় করতে। তালিম একটি আকলি তথা অনুভূতিসম্পন্ন বস্তু। তো যে মূর্খ,

সে আকল ও ফিতরত উভয়টার বিপরীত করছে এবং শরয়ী ও আকলি উভয় আহকামের বিরোধিতা করছে। আমরা আমাদের সন্তানদের থেকে আশা করি না, তারা মুহসিনের হক নষ্ট করবে এবং ফিতরাত ও আকলে মূর্খতার আগুন ধরাবে।

মহিলার যোগ্যতা

অধিকাংশ নারীর মধ্যে এই সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এ উন্নতি, ইলম ও মর্যাদার ময়দান স্রেফ পুরুষদের জন্য। নারীরা তো ঘরে বসে থাকার বস্তু; তাদের ইলমের কী প্রয়োজন? তাদের এই ধারণা সঠিক নয়। ইতিহাস তাদের দাবিকে মিথ্যা বলে। বরং কিতাব অধ্যয়নে নারীদের অনেক দায়িত্ব আছে বলে জানা যায়।

সানফুওয়াতুস সাফওয়া নামে এক গ্রন্থে মহিলাদের জন্য পৃথক একটি অধ্যায় রয়েছে। তাতে তাদের নেতৃত্ব, শিক্ষা ও জিহাদের বর্ণনা রয়েছে। এমনকি মহিলাদের কুস্তির কথাও উল্লেখ আছে। তারা কুস্তিতে বড়-বড় বীর-বাহাদুর পুরুষকেও চিৎপাত করেছে। অতএব, ইতিহাস তাদের ধারণাকে মিথ্যা বলে। বরঞ্চ মহিলারা যুদ্ধের ময়দানে কাজ করেছে।

মহিলাদের নবুওয়াত

দ্বিতীয় কথা হলো, দীন পুরুষদের জন্য খাস নয়। তবে কিছু জিনিস এমন রয়েছে, যেগুলো পুরুষদের জন্য খাস। যেমন– রিসালত ও প্রধান বিচারকের পদ। মহিলারা রাসূল এবং প্রধান বিচারপতি হতে পারে না। কেননা, এগুলোর যোগ্যতা মহিলাদের মধ্যে নেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় কামালের বস্তু নবুওয়াত। সেই ব্যাপারে একটা বড় জামাতের অভিমত হলো মহিলাদের নবুওয়াত মিলতে পারে। ইবনে হজরম বলেন, যদিও অধিকাংশের অভিমত হলো মহিলাদের নবুওয়াত পাওয়ার যোগ্যতা নেই; তারা নবী হতে পারে না। যারা বলেন, নবী হতে পারেন, তাদের দলিল হল, হযরত ঈসা ও মূসা আ.-এর মায়েদের নিকট ওহী আসত। তাহলে তারা নবী ছিলেন। তেমনি ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়ার নিকটও ওহী আসত। তিনিও নবী ছিলেন।

সুতরাং তাদের অভিমত মোতাবেক যদি মহিলারা নবুওয়াতের ন্যায় একটি উচ্চ পর্যায়ের কামাল লাভ করতে পারে, তাহলে তাদের আর কী প্রয়োজন? তাহলে আর কোন মর্যাদা ও ফযিলত থাকতে পারে, যা তারা অর্জন করতে পারবে না?

কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

এই আয়াত নারী-পুরুষকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ইবাদাত, আখলাক ও মুয়ামালাতে পুরুষ-মহিলা সমান। সুতরাং সূচনাস্থল হিসেবে কোনো পার্থক্য নেই। আকল ও বর্ণনা তাকে মিথ্যা বলে। সারকথা, আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হলো তালিম।

মহিলাদের দীনি উন্নতি

নবীগণও তালিম ও শিক্ষার গুরুত্বারোপ করেছেন। উম্মতের বড়-বড় মনিষীরাও তার গুরুত্ব দিয়েছেন। তাহলে কোন কারণে আমরা আমাদের সন্তানদের মূর্খতায় ঠেলে দেব– তালিমের প্রতি নিয়ে যাব না। আমি খাইরুল মাদারিসের মহিলা শাখা দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে, ওখানে মহিলা ও শিশুরা উন্নতিতে অংশগ্রহণ করছে এবং দীনের তালিম অর্জন করতে পারছে। তালিম গ্রহণ করাই আসল উন্নতি।

মহিলাদের বিশেষ তালিম

একটা যুগ এমন অতিবাহিত হয়েছে, যখন ঘরে খাসভাবে তালিম দেওয়া হত। মায়েরা সন্তানদের তালিম দিতেন। কিন্তু এখন তা নেই। খাইরুল মাদারিসের এই শাখা চালুর জন্য ধন্যবাদ। মহিলারা তাতে তালিম গ্রহণ করবে। ফলে আগত প্রজন্ম নেককার হবে। মহিলাদের জন্য সুযোগ এসেছে তা থেকে উপকৃত হওয়ার। আমি দোয়া করি, আল্লাহ যেন এই শাখাকে দিন-দিন উন্নতি দান করেন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

ইলম ও হিকমতের উপকারিতা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا ! اَمَّا بَعْدُ

আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার মূলনীতি

ঐ যোগ্যতাসমূহের মানদণ্ড হলো তায়াল্লুক বা সম্পর্ক। সম্পর্ক যত কম হবে, তত তাড়াতাড়ি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা যাবে। আর সম্পর্ক বৃদ্ধি পেলে মন তাতে বসে যাবে, একনিষ্ঠতা কমে যাবে। তাতে যোগ্যতা থাকলেও পৌঁছা বিলম্ব হবে।

এ কারণে তাঁরা যে সকল মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন, তাহলো চারটি।

১. কিল্লাতে ত্বয়াম। আহার কম করা। আহার কম করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, যা তার খোরাক তা অর্ধেক করে ফেলবে। বরং তা হতে দু'চার লুকমা কমিয়ে ফেলবে। বিশেষ করে বর্তমানকালে।

প্রথম যুগ, যা সাহাবায়ে কেরামদের যুগ; তাঁদের খাবার ছিল সাধারণত শুকনো রুটির টুকরো, খেজুর ইত্যাদি। এমনকি জিহাদে যাচ্ছেন আর ব্যাগের ভিতর কয়েকটি রুটির টুকরো পড়ে আছে। এছাড়া কোনো রসদ ছিল না যে, জিহাদের ময়দানে কেক ও রুটি মিলবে। কতকের নিকট কিছু খেজুর পড়ে থাকত। বেশি ক্ষুধা পেলে তা বের করে খেয়ে নিতেন। কতকের নিকট এতটুকুও থাকত না। তখন শুকনো খেজুরের বীচি মুখে দিয়ে চুষতেন এবং মনকে বোঝাতেন, কিছু আহার করছি। মোটকথা, তাঁদের খাবার তো ছিল এমন আর মুজাহাদা ছিল বড় ও কঠিন। সারা দিন জিহাদে কাটাতেন আর সারা রাত মুজাহাদায় কাটাতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন–

إِنَّهُمْ يَبْعَرُوْنَ بَعْرًا وَاَنْتُمْ تَضْلِطُوْنَ صَلْطًا

> তাঁদের অবস্থা ছিল এমন যে, বাথরুম করতে গেলে তাঁদের ভিতর হতে ছাগলের মলের ন্যায় কিছু বের হত। তাঁদের খাবারই ছিল না। আর তোমরা পাত্র ভরে পাকাও।

এ কথা তিনি বলেছেন তাবেয়ীনদের প্রতি লক্ষ্য করে। সুতরাং প্রত্যেক যুগের কিল্লাতে ত্বয়াম বা কম আহার ভিন্ন-ভিন্ন। বর্তমানকালে যদি কেউ সাহাবা ও তাবেয়ীদের কিল্লতে ত্বয়াম অবলম্বন করতে চায়, তাহলে সে বিছানায় পড়ে যাবে এবং সে দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যাবে। অর্থাৎ সহ্য করতে পারবে না। তাঁরা সহ্য করতে পেরেছেন। কারণ, তাঁদের পক্ষে সহ্যের ক্ষমতা ছিল। নবুওয়াতের ফয়েজ সরাসরি মুতাওয়াজ্জুহ থাকত। আর তার চেয়ে বেশি শক্তি আর হতে পারে না। বর্তমান সময়ের কিল্লাতে ত্বয়ামের অবস্থা হলো এমন যে, যা আমাদের মাওলানা থানুভী রহ. একবার বলেছেন, আমি দুজন লোককে দিল্লী পাঠালাম। তাদের আসা-যাওয়ায় ব্যয় হয় পাঁচ রুপী। কিন্তু আমি তাদের পঞ্চাশ রুপী দিয়ে বললাম, বেশি করে আহার করবে এবং বেশি করে কাজ করবে। এক কথায় বর্তমানকালে কিল্লতে ত্বয়াম হলো, বেশি কম করবে না। দু-চার লুকমা কম খাবে।

২. আরেকটি উসূল হলো, কিল্লাতে মানাম তথা কম ঘুমানো। এতেও একই কথা যে, তাঁদের ঘুম ছিল অপারগতাবশত। তারা জাগ্রত থেকে সারা রাত ইবাদত করতে ও যিকরুল্লাহয় মশগুল থাকতে চাইতেন। হযরত উম্মে সালামা রা. মসজিদে নববীতে বসে জিকির করতেন। তার পাশে একটা রশি মসজিদের ছাদে ঝুলানো ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে বললেন, এ রশিটা কেন? তিনি বললেন, যখন ঘুমের ধাক্কা বেশি আসতে থাকে, তখন নিজেকে উক্ত রশি দ্বারা বেঁধে ফেলি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমনটি করার কী প্রয়োজন? যখন গুম আসে তো ঘুমিয়ে যাও। আবার যখন জাগ্রত হবে তখন পুনরায় জিকির শুরু করো। তবিয়তকে চেঁপে ধরার প্রয়োজন নেই। তাকে স্বাভাবিক থাকতে দাও।

তাই শরীয়ত তবিয়তকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রত্যেকের তবিয়ত ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। তাতে কমতি বা ঘাটতি হলে তার প্রতিক্রিয়া খারাপ হয়। বিশেষ করে বর্তমানকালে। এ কারণে যার অভ্যাস ঘুমানোর, তাতে কমতি করবে না। হাদিস শরীফে এসেছে–

لَا تُفَرِّطْ فِي النَّوْمِ

নিদ্রায় কমতি করবে না।

প্রত্যেকের অভ্যাস মোতাবেক ঘুম পুরা করে নাও এবং নিজের প্রাত্যহিক কাজও করে নাও। কিন্তু নিদ্রায় এতটুকু সময় ব্যয় করো যতটুকু তোমার স্বাভাবিক অভ্যাস। প্রত্যেকের তবিয়ত-অভ্যাস ভিন্ন-ভিন্ন হয়। এ কারণে প্রত্যেকের

কিল্লতে ত্বয়াম ও কিল্লতে মানামও ভিন্ন-ভিন্ন। আবার যুগ ও অবস্থা ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। এজন্যই এক তবকাকে অপর তবকার সাথে তুলনা করা যাবে না।

৩. তৃতীয় উসূল বা মূলনীতি হলো কিল্লতে কালাম। তথা কম কথা বলা। অর্থাৎ প্রয়োজন মোতাবেক কথা বলা। প্রয়োজনের সময় কথা বলাও জরুরি। কিন্তু অহেতুক ও নিষ্প্রয়োজন বৈঠক এবং আমোদ-প্রমোদের কথা ও কাজে সময় নষ্ট হয়। আর সম্পর্ক বেশি হয়ে যায়। ফলে নিজ মামুলাত বা রীতি-নীতিতে তার মন্দ প্রভাব পড়ে।

৪. চতুর্থ উসূল হলো, কিল্লতে ইখতেলাত মাআল আনাম। তথা মানুষের সাথে মেলামেশা কম করা। বিশেষ করে মুজাহাদাকালে। মেলামেশা, আনন্দানুষ্ঠান, ওঠা-বসা ইত্যাদি ক্ষতি করে থাকে। হাদিস শরীফে এসেছে–

مَنْ سَكَتَ سَلِمَ وَمَنْ سَلِمَ نَجَا

যে চুপ থাকল, সে নিরাপদ রইল। আর যে, নিরাপদ রইল, সে মুক্তি পেল।

সারকথা, প্রয়োজন ব্যতীত কথা নয়। শরীয়ত তা পছন্দ করে না। যেমন– এক বর্ণনায় এসেছে, অনারবদের বাজে কথা ও প্রলাপ থেকে বেঁচে থাকো। তারা প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে। স্রেফ বুলি আওড়াতে থাকে। এ কাজ ভ্রান্ত কাজ। প্রয়োজনের সময় চুপ থাকা মন্দ এবং চুপ থাকার স্থানে কথা বলা খারাপ। প্রয়োজন মোতাবেক চুপ থাকতে হবে, প্রয়োজন মোতাবেক কথা বলতে হবে।

সবগুলো উসূলের নির্যাস হলো মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতা কম হলে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা দ্রুততর হয় এবং যিকরুল্লাহর প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হয়।

বাতেনি মুজাহাদার দৃষ্টান্ত

বাতেনি মুজাহাদার উদারহণ এমন যে, ছাত্র ইলম শিখতে এল। তার জন্য অধিক মেলামেশা মন্দ জিনিস। সে যদি বন্ধুত্ব করে, বিভিন্ন মাহফিলে যোগদান করে, তাহলে মুতালায়া বা কিতাব পড়বে কে? যোগ্যতা কিভাবে সৃষ্টি হবে? মোটকথা, যে কোনো মাকসাদ বা উদ্দেশ্য অর্জনের আবশ্যক হলো, অন্তরে ঐ মাকসাদের মহব্বত থাকা। তার প্রতি আশেক থাকা এবং মাকসাদ ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর প্রতি ঘৃণা থাকা। তাহলে মাকসাদ অর্জন হতে পারে। যেমন– হযরত মূসা আ. ওয়াজ করছিলেন আর মানুষের চোখে পানি প্রবাহিত হচ্ছিল এবং আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ হচ্ছিল। তখন জোশে মাতাল হয়ে একজন বলে উঠল, হে মূসা! দুনিয়াতে আপনার চেয়ে বড় কি কোনো আলেম আছে?

অর্থাৎ নেই। তিনি বললেন, না। আমার চেয়ে বড় আলেম বর্তমান পৃথিবীতে নেই। হযরত মূসা আ.-এর এ দাবি ১০০% সত্য ছিল। কারণ, যুগের নবীর চেয়ে বড় কোনো আলেম হতে পারে না। তাঁর মাধ্যমে অন্যরা ইলম পায়। সুতরাং হযরত মূসা আ. আপন যুগে সর্বোত্তম মাখলুক ছিলেন। তিনি গর্ব ও অহংকার করা ব্যতীতই সত্য কথা বলেছেন যে, আমিই বড় আলেম। আল্লাহ তায়ালা বানিয়েছেন। এটি কোনো অহংকার ছিল না। কিন্তু অহংকার ও গর্বের প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে গেল, দাবি আকারে কথাটি বের হল যে, আমিই বড় আলেম। এটি আল্লাহ তায়ালার পছন্দ হলো না। আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি দাবি করছ, তোমার চেয়ে কোনো বড় আলেম নেই।

بَلٰى عِنْدَنَا عَبْدُنَا هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ

আমার একজন বান্দা রয়েছে, যার ইলম তোমার চেয়ে বেশি।

তুমি তার নিকট গিয়ে ইলম শিক্ষা করো। তখন তিনি হযরত ইউশা ইবনে নূন-এর সাথে বের হলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিদর্শন বলে দিলেন, অমুক দুই সাগরের মিলনস্থলে যখন পৌঁছবে, তখন ঐ বান্দার সাক্ষাত পাবে।

হযরত মূসা আ. তখন বলেছিলেন, যা আমার এখানে উদ্দেশ্য–

حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا•

আমার দুই সাগরের মিলনস্থলে পৌঁছতেই হবে। এতে লাখ বছর লেগে গেলেও তবু আমাকে যেতে হবে এবং ঐ বান্দা হতে ইলম অর্জন করতে হবে।

এমনটিই হলো মাকসাদের প্রতি মহব্বত। যে চায় তা অর্জন করতে লক্ষ-লক্ষ বছর অতিবাহিত হোক। মোটকথা, একজন ছাত্রের তথা তালেবে ইলমের যখন চূড়ান্ত মাকসাদ নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার প্রতি ভালবাসা ও ইশ্‌ক হয়, তখন সেই মাকসাদ হাসিলে ডুবে যাবে, অন্যান্য মাকসাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। সুতরাং মাকসাদের প্রতি ভালবাসা ও ধ্যান-খেয়াল আসল জিনিস।

যখন ইলমে জাহের তথা প্রকাশ্য ইলমের মধ্যে মাকসাদপ্রিয়তা জরুরি, তাহলে ইলমে বাতিনের মধ্যে তার প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি। মানুষ বুঝে নেবে এবং প্রতিজ্ঞা করবে, হযরত নূহের আ. জীবনের ন্যায় দীর্ঘ জীবন শেষ হয়ে গেলেও যে কোনো উপায়ে আমার মাকসাদ বা উদ্দেশ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছতেই হবে। তাহলে আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করবেন। ফলে মাকসাদ অর্জন হয়ে যাবে।

সারকথা, প্রথম কথা হলো প্রথমে মাকসাদের প্রতি মহব্বত থাকতে হবে। তারপর তার জন্য ত্যাগ ও কুরবানি জরুরি যে, মানুষ তার সকল চাওয়া-পাওয়া পেতে নিঃশেষ করে দেবে। আর তার অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে রাত-দিন আহার করে, পান করে এবং অন্যান্য আরামের ফিকির করে, তার মাকসাদের সাথে কী সম্পর্ক থাকতে পারে? মানুষ যখন মাকসাদ অর্জনে লিপ্ত হয় এবং অন্যান্য বস্তু হতে নজর ফিরিয়ে নেয়, তখন আল্লাহর সাহায্য আসে।

প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে–

ہمت مرداں مددِ خُدا

হিম্মত করলে আল্লাহর সাহায্য আসে।

হীনবল হয়ে ঘরে বসে থাকলে আল্লাহর সাহায্য আসবে না।

যোগ্যতার ভিন্নতা

তো মাকসাদ অর্জনে হালত ও ভিন্ন-ভিন্ন হয়, যোগ্যতাও আলাদা-আলাদা হয়, ইচ্ছাও ভিন্ন-ভিন্ন হয়। কতক আছেন, তাদের মধ্যে চূড়ান্ত মহব্বতের ইচ্ছা থাকে। আর কিছু আছে, তাদের মধ্যে হালকা মহব্বত থাকে। তাদের মাকসাদ পর্যন্ত পৌঁছতে দেরি হয়, অনেক দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। তার কোনো নির্ধারিত নিয়ম-নীতি নেই। নীতির বিষয় এতটুকু যে, নিসাব শেষ হয়েছে তো ফারেগ হয়ে গেছে। এখন কথা হলো কার মধ্যে কতটুক ইলমিশক্তি ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়টি প্রত্যেকের আলাদা-আলাদা। তেমনিভাবে মুজাহাদার ক্ষেত্রেও তাই যখন কারো মুজাহাদা ও চিন্তা-গবেষণা সঠিক পদ্ধতি সম্পূর্ণ হবে, তখন শায়েখ বা পীর সাহেব বলে দেবেন, ভাই! তুমি নিয়ম মোতাবেক মাকসাদে পৌঁছে গেছ। এখন কথা হলো, তোমার ভিতর জযবা-আগ্রহ কতটুকু সৃষ্টি হয়েছে, আল্লাহর ইশ্‌ক কতটুকু সৃষ্টি হয়েছে। এই হালতগুলো প্রত্যেকের ভিন্ন-ভিন্ন।

অঙ্গ প্রতিস্থাপন

মূলত এ বিষয়টি নির্ভর করে একথার উপর যে, আমরা কি আমাদের শরীরের মালিক, না আমাদেরকে ধার হিসেবে দেওয়া হয়েছে উপকার গ্রহণের জন্য। সুস্পষ্ট কথা হলো, শরীর একটি সরকারী মেশিন, যা আল্লাহ তায়ালা তৈরি করেছেন। যদি আপনারা মালিক হতেন অথবা আপনাদের আয়ত্তে থাকত, তাহলে আপনারা তাকে কখনো অসুস্থ হতে দিতেন না। কখনো কোনো অঙ্গকে

নিজ স্থান হতে নড়তে দিতেন না। কিন্তু আপনারা তার মালিক নন। তাই অসুস্থ হলেও মেনে নেন, সুস্থ হলেও মেনে নে।

মোটকথা, প্রথম প্রশ্ন হলো, আপনি কি শরীরের মালিক, নাকি আপনাকে ধার হিসেবে দেওয়া হয়েছে? মালিক তো নন। ধারা হিসেবে উপকার লাভের জন্য দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা দেন; তারপর নিয়ে নেন। যদি নিজে মালিক হতেন, তাহলে নিজ বদনকে কখনো অন্যের নিকট হস্তান্তর করতেন না। এমনকি আল্লাহ নিতে চাইলেও দিতেন না। যদি আল্লাহ তায়ালা নিতে চাইতেন, তাহলে তাঁকে বলতেন, হে আল্লাহ! যখন আমাকে মালিক বানিয়ে দিয়েছেন, তখন আপনি অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ কেন করবেন?

এতে প্রমাণিত হলো, আমাদের স্বত্ব বা অধিকার নেই। যেহেতু স্বত্ব নেই, তাই আসল মালিকের নিকট জিজ্ঞেস করতে হবে। তিনি যদি অনুমতি প্রদান করেন, তাহলে আমরা কোনো অঙ্গকে স্থানান্তর করতে পারব। তিনি সম্মতি না দিলে করা সম্ভব নয়। তাহলে দেখতে হবে, অনুমতি প্রদানের দায়িত্বশীল আপনার নিকট কেউ আছে কি-না? আপনি অনুমতি পেয়েছেন কি-না? যদি ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে অনুমতি মিলে যায়, তাহলে ঠিক আছে। আর যদি অনুমতি না পান, তাহলে আপনার কোনো অধিকার নেই তাতে হস্তক্ষেপ করার। তারপর তাতে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, আপনি কাউকে একটা চোখ দিয়ে দিলেন। কিয়ামতের সে আপনাকে বলল, এখন যেহেতু সেটি আমার স্বত্ব হয়ে গেছে, অতএব আপনি অন্ধ থাকুন।

আবার আল্লাহ বলবেন, যখন তুমি তোমার একটা অঙ্গ স্থানান্তর করে ফেলেছ, তো ফেরত নেওয়ার তোমার অধিকার নেই। আর যেহেতু ফেরত নেওয়ার অধিকার নেই, তাই তুমি অন্ধ থাকো। তখন ওখানে আপনি কী করবেন। আর বদন বরযখে থাকুক বা আখেরাতে থাকুক, আযাব তো বদনের উপর হবে। তাহলে আপনার কী অধিকার রইল যে, কোনো অঙ্গ অন্যকে দান করে দেবেন? প্রথমত আপনি স্বত্বাধিকারী নন। দ্বিতীয়ত মালিক না হওয়ার কারণে যে হস্তক্ষেপ বরযখে অথবা হাশরে হবে, তাও তো সেই বদনের উপরই হবে। আর যখন আপনি বদন অন্যকে দিয়ে দিলেন, তখন সেই কাজটি এমন হলো যে, কেউ নিজের বদন পুড়িয়ে রেখে দিল, যা তার অধিকারে নেই।

দীনের বুনিয়াদ মাসয়ালার উপর; মাসলেহাতের উপর নয়

এখন কথা হলো অঙ্গদানে তো উপকারিতা তথা উপকারিতা ও যৌক্তিকতা রয়েছে। দীনের বুনিয়াদ মাসলেহাতের ওপর নয়; বরং মাসয়ালার উপর। এমন কোনো অন্যায় কর্ম নেই, যাতে কোনো-না-কোনো উপকারিতা নেই। মদপানে তো উপকারিতা রয়েছে। তাতে স্বাস্থ ভাল হয়। কখনো শরীরে শক্তি বৃদ্ধি পায়। জুয়া খেলায়ও তো উপকারিতা আছে। একসাথে মাল বৃদ্ধি পায়। এক পয়সা ব্যয় করে হাজার পয়সা উপার্জন করা যায়। কুরআনুল কারীমও এগুলোর উপকারিতাকে স্বীকার করেছেন–

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

লোকেরা আপনার নিকট জিজ্ঞেস করে মদ ও জুয়া সম্পর্কে। আপনি বলে দিন, এতদুভয়ের মধ্যে কিছু উপকারও রয়েছে, কিছু ক্ষতিও রয়েছে। কিন্তু উপকার অপেক্ষা ক্ষতি বেশি।
[সূরা বাকারা আয়াত-২১৯]

মোটকথা, কুরআনুল কারীমও উপকারকে স্বীকার করেছে। এমন কোনো জিনিস নেই, যাতে উপকার নেই। কিন্তু উপকার ও অপকার এ-দুয়ের উপর যদি বিধান নির্ভর করত, তাহলে মদ বৈধ হত। কেননা, তাতে উপকার রয়েছে। জুয়া জায়েয হত.। কারণ, তাতে উপকার ও লাভ রয়েছে। কিন্তু উপকার থাকা সত্ত্বেও নাজায়েয করা হয়েছে।

সারকথা, আপনি যদি তামাদ্দুন বা সামাজিক রীতির মাসলেহাতে কোনো উপকারিতা প্রমাণিত করেন, তাহলে তা বৈধ হবে না। কারণ, দীন লাভ ও ক্ষতির উপর নির্ভরশীল নয়। দীনের বুনিয়াদ মাসয়ালার উপর। অন্যথায় আপনি কিছুদিন পর বলবেন, হযরত! তামাদ্দুনিভাবে মদের ভিতর উপকারিতা রয়েছে। অতএব মদকে জায়েয হিসেবে অনুমতি দিয়ে দিন। জুয়া খেলাতেও লাভ রয়েছে; অনুমতি দিয়ে দিন। এভাবে অনুমতির ধারাবাহিকতা কখনো বন্ধ হবে না। আর তা শুধু চোখ, নাক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং নফসের খায়েশের উপর আসবে, স্বভাবজাত তাকাজার মধ্যেও আসবে যে, এগুলোতেও উপকারিতা রয়েছে। যদি আমার-আপনার নির্ধারণকৃত মাসলেহাতের উপর দীনের বুনিয়াদ হত, তাহলে সবকিছুর অনুমতি হত। কিন্তু দীনি আহকামের বুনিয়াদ তো আমাদের নির্ধারণ করা মাসলেহাতের উপর নয়। তবে হ্যাঁ; দীনি আহকাম সামগ্রিক মাসলেহাতের নির্ভর। অর্থাৎ সকল বনি আদমের

মাসলেহাতের প্রতি লক্ষ্য করে মাসয়ালা তৈরি হয়েছে। পৃথক জায়েদ, ওমর ও বকরের উপকারিতা দেখা হয়নি।

শরীয়তের কানুন যখন গঠন করা হয়েছে, তখন সাধারণ ও ব্যাপক উপকারিতা সামনে রেখেই করা হয়েছে। পৃথক কোনো ব্যক্তির জন্য করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ রেলওয়ের নিয়ম হলো, এক টিকিটে আপনি ২৫ কেজি মাল বহন করতে পারবেন। এখন যদি কেউ এ কথা বলে যে, আমি দুই মণ ওজন বহন করতে সক্ষম; তাহলে আমার জন্য কেন ২৫ কেজির শর্ত লাগানো হয়েছে? তখন তার কথা মানা যাবে না। কারণ, এখানে সকলের উপকারিতার রেয়ায়েত করতে হবে। কে শক্তিশালী, কে দুর্বল তা দেখা যাবে না। সুতরাং দুনিয়াবি কানুনে যেহেতু আম-জনতার মাসলেহাতের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, তাহলে যে দীনি কানুন সকল বনি আদমের সাথে সম্পর্কিত, সেগুলো তো অবশ্যই সকল বনি আদমের মাসলেহাতের রেয়ায়েত করা হবে। শুধু গুটিকয়েক মানুষের মাসলেহাতের রেয়ায়েত করা হবে না।

জন্মনিয়ন্ত্রণ

জন্মনিয়ন্ত্রণ সর্বসম্মতিক্রমে সকল উলামায়ে কেরামের নিকট নাজায়েয। কেননা, তা দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা হয় এবং মানুষের বদনে এমন কাজ করা হয়, যা ফিতরাত অনুমতি দেয় না। আবার তা দ্বারা সন্তান হওয়ার শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। কারো অধিকার নেই সন্তান হওয়ার ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেওয়ার। আর পুরুষাঙ্গ পরিবর্তনেরও কোনো অধিকার নেই। আর জন্মনিয়ন্ত্রণ হলো ইখতিয়ারী বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর অবস্থা যদি এমন হয় যে, যদি সন্তান জন্ম বন্ধ না করে, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ স্ত্রী অনেক বেশি অসুস্থ। যদি সন্তান হয়, তাহলে প্রাণনাশের আশংকা রয়েছে। অথবা স্বামী অসুস্থ অথবা এমন গরীব যে, রিজিক সংগ্রহের কোনো উপায় নেই আবার প্রতিবছর সন্তান হচ্ছে। ফকীহগণ বলেন, এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরামর্শক্রমে সন্তান নেওয়া কমাতে পারবে। তবে এটি নিছক পারিবারিক বিষয়। শরীয়তের আহকাম তাতে প্রভাবিত করবে না। তবে শরীয়ত অধিকার দেবে, এহেন সংকটময় মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রীর পরামর্শ ও অঙ্গীকারক্রমে সন্তান নেওয়া কমাতে পারবে।

মোটকথা, জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা সন্তান হওয়ার যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। একাজে কারো অধিকার নেই। আর জন্মনিয়ন্ত্রণ ইখতিয়ারী বস্তু। ইচ্ছা করলে বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তে স্বামী-স্ত্রী সন্তান কমানোর চেষ্টা করতে পারে। তবে তাও কোনো

বিধানগত ও আইনগত বিষয় নয়। আখলাকি ও ব্যক্তিগত বিষয়। কেননা, প্রত্যেক ঘরের মধ্যে পৃথক-পৃথক মুয়ামালা হয়ে থাকে।

সন্তান কম নেওয়ার সাধারণ প্রক্রিয়া

সন্তান কম করা তথা জন্মনিয়ন্ত্রণের সাধারণ পদ্ধতিগুলো হলো, ঐ সকল মাধ্যম ও উপকরণ বন্ধ করতে হবে, যা দ্বারা সর্বদা যৌনচাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে আর যা দ্বারা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সন্তান হতে থাকে। এমনকি বৈধ ও অবৈধভাবে সন্তান হতে থাকে। যখন বেহায়াপনা ব্যাপক হয়ে যাবে, পর্দাহীনতা ও উলঙ্গপনা ব্যাপক আকার ধারণ করবে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ব্যাপকহারে বেড়ে যাবে, তখন সন্তান নিয়ন্ত্রণ করার কোনো প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অবশিষ্ট থাকে না।

পূর্বযুগেও মানুষ ছিল। কিন্তু তাদের এত সন্তান হত না। কারণ, তাদের মধ্যে কুদৃষ্টি ছিল না। এখন যেহেতু দিন-রাত সর্বদা মহিলাদের দেখে, অবাধ মেলামেশা হয়, তাই সেক্স তার নিজস্থানে কায়েম থাকে না। তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এজন্যই মানবসমাজ জায়েয ও নাজায়েয কাজে লিপ্ত হচ্ছে। আর যখন কোনো জিনিস তার সীমানা অতিক্রম করে ফেলে, তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো শক্তি বা উপায় থাকে না। তাই সেক্স যখন নিয়ন্ত্রণে থাকে না, তখন মানুষ সর্বদা সেক্স মেটাতে লিপ্ত থাকবে। সে তখন জায়েয-নাজায়েয দেখবে না। এহেন পরিস্থিতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না।

জন্মহার কমানোর একটা বিশেষ পদ্ধতি তো স্ত্রীর এমন অসুস্থতা ও দুর্বলতা, যার ফলে বাচ্চা নিলে মরণের আশংকা দেখা দেবে। এ পদ্ধতিটি হলো বিশেষ পদ্ধতি। আর সাধারণ পদ্ধতি হলো, কেউ যদি জন্মহার হ্রাস করতে চায়, তাহলে তার জন্য এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যা দ্বারা ঐ উপকরণ খতম হয়ে যায়। সেসকল কারণে সেক্স স্বস্থানে কায়েম থাকে না। সেগুলো হলো পর্দাহীনতা, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, অবাধ মেলামেশা ও অবৈধ প্রেম ইত্যাদির পথ রুদ্ধ করতে হবে; তাহলে কুদরতিভাবে সর্বশক্তি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

আসল মাকসাদ জন্মহার বৃদ্ধিকরণ : নিয়ন্ত্রণকরণ প্রাসঙ্গিক বিষয়

সন্তান কমানো মাকসাদ নয়। মাকসাদ হলো সন্তান বাড়ানো। উম্মাতে মুহাম্মাদী যত বেশি হবে ততই ভাল। কিন্তু তাকলীল মাকসাদি বিষয় নয়। তা হয়ে থাকে কোনো বিশেষ কারণবশত যখন কোনো বিশেষ অবস্থার সম্মুখিন হয়; যেমনটি আমি পূর্বে পেশ করেছি। স্ত্রী অসুস্থ, স্বামীর ভিতর যোগ্যতা অবশিষ্ট নেই।

অথবা অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ। মোটকথা, তাকলীল আসল মাকসাদ নয়, তাকছীরই আসল ও মূল মাকসাদ। সবাই নিজের পরিবারের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। তাই যার-যার অবস্থা নিজেরাই দেখে নিবে।

এখন ব্যাপকভিত্তিক ও আইনি কথা হলো জন্মহার কম হোক বা বেশি হোক সর্বাবস্থায় মুনকারাতকে দুনিয়া হতে উৎখাত করতে হবে। উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা, পর্দাহীনতার উৎস্থল বন্ধ করতে হবে। তাহলে সন্তান প্রজনন শক্তি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। বর্তমান তামাদ্দুন– যা পশ্চিমাদের তামাদ্দুন হতে আমদানিকৃত– সম্পূর্ণরূপে ইসলামি তামাদ্দুনের বিপরীত। ইসলামে কুদৃষ্টি হারাম আর পশ্চিমা সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামে অপরিচিতার সাথে একাকিত্ব সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ কাজ আর পশ্চিমাদের নিকট তামাদ্দুনের অংশ। পশ্চিমা সমাজে কারো স্ত্রী যদি ঘরে থাকে, এমতাবস্থায় কোনো অপরিচিত ব্যক্তির জুতা বাইরে পড়ে থাকে, তাহলে স্বামীর অধিকার নেই ঘরে প্রবেশ করার এবং তার স্ত্রীকে অন্যায় কর্ম থেকে বাধা দেওয়ার। এহেন মুহূর্তে ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না। এটি তাদের একটা তামাদ্দুনি তথা সামাজিক রীতি। সারকথা, এই ব্যাপারে তাদের তামাদ্দুন ও ইসলামি তামাদ্দুন একেবারেই ভিন্ন।

তামাদ্দুনিক জটিলতা

এখন আমাদের জন্য জটিলতা হলো, তামাদ্দুন তো পশ্চিমাদের তৈরি। তাতে আমরা ইসলামি তামাদ্দুন সংযুক্ত করব। তবে কিভাবে যুক্ত করব? তাদের তামাদ্দুনের ভিত্তি হলো নফ্সানিয়াত তথা বিলাসিতা, আড়ম্বরতা ও জৈবিক চাহিদার উপর। আর ইসলামি তামাদ্দুনের বুনিয়াদ আখলাক ও রুহানিয়াতের উপর যে, মানুষ উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়ে কীর্তিমান হবে, সকলে আল্লাহর ভয়, তাকাওয়া ও পবিত্রতার প্রতিচ্ছবি হবে। এক কথায় তাদের ভিত্তি ভিন্ন আর মুসলিমাদের ভিত্তি ভিন্ন। তাদের নিকট আসল মাকসাদ দুনিয়ার আরাম-আয়েশ আর ইসলামে আসল মাকসাদ পরকালের আরাম-আয়েশ। তবে প্রয়োজনমাফিক উপার্জনের অনুমতি শরীয়ত প্রদান করে। যেহেতু পশ্চিমা তামাদ্দুন ও আমাদের তামাদ্দুন পরস্পর বিপরীত; তাই জোড়া কিভাবে লাগাব?

ওয়াজ-নসিহত দ্বারা ব্যক্তিগত পরিবর্তন আসে

কারো ভিতর আল্লাহর ভয় বিদ্যমান থাকলে ওয়াজ-নসিহতে কাজ হয়। কিন্তু স্রেফ ওয়াজ-নসিহত দ্বারা তাহযিব-তামাদ্দুনে পরিবর্তন সৃষ্টি হয় না। ইনকিলাব

আসে প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষাশক্তি দ্বারা। কিছু জিনিস শক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়– শুধু ওয়াজ-নসিহত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ কারণে ইসলাম ধর্মে খেলাফতব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলাম যেহেতু একটি সামাজিক জীবন ব্যবস্থার নাম, তাই তাতে খেলাফতব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে দণ্ডবিধি ফৌজদারি শাস্তি।

মোটকথা, অনেক জিনিসের মূল উৎপাটন করতে পারে শক্তি তথা প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। ওয়াজ-নসিহত তা করতে পারে না। ওয়াজ-নসিহত দ্বারা বেশি থেকে বেশি ইবাদাতের প্রতি মনোনিবেশ হতে পারে, মুয়ামালা শুধরে নিতে পারে। কিন্তু তামাদ্দুনি ইনকিলাব সৃষ্টি করতে শক্তির প্রয়োজন।

খিলাফতে আখলাকি

এক হলো সাধারণ খেলাফত। যেমন– খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফত, যা শক্তিশালী খেলাফত। আরেক খেলাফত হলো আখলাকি খেলাফত। যেমন– কোনো পীর সাহেব তার মুরিদকে খেলাফত দিলেন। একে খিলাফতে বাতেনী বলা হয়। সারকথা, অন্তর সংশোধন করা সম্ভব; কিন্তু পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ তায়ালা যদি এমন কোনো রূহানিয়াতওয়ালা সৃষ্টি করেন, যিনি সারা পৃথিবীকে পাল্টে দেবেন, তাহলে তা তিনি করতে সক্ষম। যেমন হযরত মাহদীর আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে বলা হয়, তাঁর এত বড় রূহানী শক্তি থাকবে যে, সারা বিশ্বের তামাদ্দুন পাল্টে যাবে এবং ব্যাপক ইনকিলাব সৃষ্টি হবে। সকলের ভিতর আল্লাহভীরুতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। সকলেই মুত্তাকী হয়ে যাবে। এমনকি মানুষ যাকাতের মাল বিলানোর জন্য নিয়ে বের হবে; কিন্তু কাউকে গ্রহণকারী পাবে না। সবাই বলবে, আমাদের অনেক আছে। পৃথিবীতে এত বরকত হবে যে, আঙ্গুরের একটি গুচ্ছ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

সুতরাং পৃথিবীতে যখন পূর্ণ ইনসাফ কায়েম হবে, তখন বরকতও সৃষ্টি হবে, জুলুম-অন্যায়ের সাথে বরকত প্রকাশ পায় না। মোটকথা, সাধারণ খেলাফত ভিন্ন জিনিস; তাকে খেলাফতে কুবরা তথা বড় খেলাফতও বলে। আর খিলাফতে ছুগরা বা ছোট খেলাফত হলো কোনো ব্যক্তির উপর আপনার বিশ্বাস সৃষ্টি হলো যে, তার অন্তর সংশোধন হয়ে গেছে; সে অন্যকেও সংশোধন বা ইসলাহ করতে পারবে; তাকে আপনি খেলাফত দিয়ে দিলেন। এটি খেলাফতে বাতেনী। এটি সাধারণ খেলাফত বা রাষ্ট্রীয় খেলাফত নয়।

ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের আলামত

ইমাম মাহদীর প্রকাশ পাওয়ার সময় নির্ধারণ করা হয়নি। তার নিদর্শন বলে দেওয়া হয়েছে। যখন সেই আলামত প্রকাশ পেতে থাকবে, তখন বুঝবেন, ইমাম মাহদী অচিরেই প্রকাশ পাবেন। প্রথম আলামত হলো–

مُلِئَتِ الدُّنْيَا ظُلْمًا وَجَوْرًا

সারা দুনিয়ায় জুলুম ও অবিচার ভরপুর থাকবে, ইনসাফ ও প্রশান্তির চিহ্নটুকু কোথাও অবশিষ্ট থাকবে না। জুলুম ও অত্যাচারে দুনিয়া ভরে যাবে আর এহেন অবস্থা ব্যাপকহারে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। কোনো অঞ্চলের সাথে তা বিশেষিত নয়। আরেক আলামত হলো, আরবে স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ পাবে। সেটি ইমাম মাহদীর প্রকাশের সময় হবে। সুতরাং ইমাম মাহদী প্রকাশ পাওয়ার কিছু নির্দশন বলা হয়েছে– সময় নির্ধারণ করা হয়নি। তিনি কখন আসবেন তা আল্লাহ জানেন। যেমন– কিয়ামতের আলামত বলা হয়েছে– সময় বলা হয়নি।

বিশ্বাসের মাধ্যমসমূহ

যে স্তরে পৌছতে পারেন, পৌছে যান। এই জ্যোতিষীরা ধারণার উপর তীর চালনা করে। আমি বলি, বেটার মতো কাজ করেছে ইউরেপীয়নরা। তারা উড়োজাহাজে চড়ে চাঁদের দেশে পৌছতে পেরেছে। শক্তি থাকলে সেখানে পৌছে অবস্থা জেনে নাও। বাকি কৌশলবিদ্যা বা বিজ্ঞাননীতি দ্বারা যে সকল আনুমানিক কথা বলা হয়, সেগুলো খেয়ালী ও সন্দেহযুক্ত জিনিস– অকাট্য জিনিস নয়। এগুলো পরিহারযোগ্য বিষয়। কারণ, বিশ্বাসের মাধ্যম হবে হয় স্বচোখে দেখা অথবা সত্যবাদী ইসলামের খবর, যা চোখে দেখা হতে অধিক বিশ্বাসযোগ্য বস্তু। তো হয়ত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খবর অথবা আপনার নিজ চোখে দেখা। বাকি অমুক দার্শনিক বলেছেন এই, অমুক বলেছেন এই; এগুলো কোনো গ্রহণযোগ্য বস্তু নয়। তারা যদি কিছু বলে, তাহলে আমরাও তাদের বিপরীত কিছু বলতে পারি। আমাদের অভিমত হবে অন্য। তাই অভিমতের উপর তো দীন নির্ভরশীল নয়। যা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক রাখে, সেগুলোকে কাল্পনিক ও সন্দেহযুক্ত বলা হয়। তা গ্রহণযোগ্য নয়। সঠিকও হতে পারে, ভ্রান্তও হতে পারে। অকাট্য কথা তো তা, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অথবা আপনি স্বচোখে দেখেছেন। এ নিয়ে মানুষ কেন ঝগড়া করে?

রাসূল সা. -এর ব্যক্তিগত অভিমতের বিধান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝

দীনি যত কথা সবই তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেন। তা সবই ওহী; সেগুলো মানা ফরজ। এই আয়াতে একথা বলা হয়নি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তিগত রায় হতে পারে না। অনেক বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগত রায় পেশ করেছেন, যেগুলো ওহী ছিল না। তিনি বুদ্ধিমত্তা দ্বারা অনেক তদবির বলে দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে অনেককে পরামর্শ দিয়েছেন।

সুতরাং উসূল হলো, যেগুলো তিনি ওহীর মাধ্যমে বলেছেন, সেগুলো বিশ্বাস করা ওয়াজিব, মান্য করা ফরজ। আর যেগুলো ব্যক্তি অভিমত থেকে বলেছেন, সেগুলো মান্য করা ফরজ নয়। তবে এটি ভিন্ন বিষয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযমত ও মহব্বতের কারণে সেগুলোকেও আদেশ মনে করব। কিন্তু আইনগতভাবে সেগুলোকে মানা ওয়াজিব নয়।

ব্যক্তিগত অভিমতের উপর আমল না করা সম্ভব। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বেআদবীমূলক কথা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। মানা না মানা সেটি ইখতিয়ারী বিষয়। কিন্তু সমালোচনা বা দোষ ধরা কোনোটাই জায়েয নয়। চাই সেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তিগত অভিমত হোক। তাও তাঁর আযমাতের কারণে মাথার উপর রাখার যোগ্য।

যেমন– হযরত বারিরাহ রা.– যিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর বাদী ছিলেন– হযরত মুগিস রা.-এর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মাঝে মিল ছিল না। হযরত আয়েশা রা. তাঁকে আযাদ করে দিলেন। আযাদ হওয়ার পর মাসয়ালা হলো, বিবাহিতা বাদী আযাদ হওয়ার পর বিবাহ তার আয়ত্তে চলে আসে। সে ইচ্ছা করলে পূর্বের বিবাহ ঠিক রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে ভেঙ্গেও দিতে পারে। তাঁদের মাঝে পূর্ব থেকে সম্পর্ক ভাল ছিল না। তাই হযরত বারিরাহ রা. চাইলেন বিবাহ ভেঙ্গে দিতে। অপরদিকে হযরত মুগিস রা. তাঁকে শতপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। তিনি তখন বিভিন্ন স্থানে বসে-বসে কাঁদতেন এবং বলতেন, বারিরাহ! বিবাহটা তুমি ভেঙ্গে দিও না। কিন্তু হযরত বারিরাহ রা. তাঁর কথা রাখলেন না। অবশেষে হযরত মুগিস রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিই তো আমাদের বিবাহ করিয়েছিলেন। আপনি বারিরাহকে হুকুম করুন, সে যেন বিবাহ না ভাঙ্গে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারিরাহ রা.কে বললেন, বারিরাহ! বিবাহটা ভেঙ্গো না। হযরত বারিরাহ অনেক বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি কি শরয়ী হুকুম, না আপনার ব্যক্তিগত অভিমত? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শরীয় হুকুম নয়; বরং এ আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ। তিনি বললেন, তাহলে আমি মানতে পারব না। অবশেষে বিবাহ ভেঙ্গে দিলেন। এতে প্রমাণিত হলো, নবীগণ যদি ব্যক্তিগত রায় পেশ করেন, তাহলে মানা না মানা মানুষের ইখতিয়ারভুক্ত বিষয়। তবে মহব্বতের তাকাজা হলো, ব্যক্তিগত রায়কেও হুকুমের পর্যায়ে রেখে মেনে নেবে। কিন্তু আইন ও বিধানমতে মানা জরুরি নয়।

তামাদ্দুনিক বিষয়ে রাসূল সা. -এর রায়ের শরয়ী বিধান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু'ধরনের কথা প্রমাণিত। ব্যক্তিগত পরামর্শ বা ব্যক্তিগত অভিমত। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন–

أَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ

আমারও এমন ভুলচুক হয় যেমন তোমাদের হয়।

আমার ব্যক্তিগত অভিমত মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছাধীন। কিন্তু ওহীর মাধ্যমে যা বলব, তা অকাট্য; তাতে ভুল হওয়া সম্ভব নয়। তার উপর আমল তোমাদের জন্য ফরজ। উদাহরণস্বরূপ খেজুর গাছের তাবির সম্পর্কে আরবে এমন নিয়ম ও প্রথা ছিল যে, সেগুলোতে কলম লাগানো হত। আরবরা নর-মাদা পার্থক্য করতে পারত। পুরুষ গাছ মহিলা গাছ উভয় দ্বারা কলম লাগালে ফল আসত। অন্যথায় ফল আসত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, এটি হয়তো আরবদের পুরানো কোনো আকিদা যে, এটি নর আর ওটি মাদা। তাই তিনি আদেশ দিলেন, কলম লাগানো যাবে না। সাহাবারা লাগালেন না। ফলে সেই বছর ফল এল না। সাহাবারা আরজি পেশ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ বছর তো ফল এল না!

তখন তিনি জানতে পারলেন, এটি জীবন যাপনের একটি তামাদ্দুনি বস্তু যে, এক বৃক্ষকে অপর বৃক্ষের সাথে যুক্ত করে কলম তৈরি করা হয়। ফলে বৃক্ষে ফল ধরে। এটি অনুভবযোগ্য বিষয়ক উপকরণ। এবার তিনি বললেন–

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ

ভাই! এ তো দুনিয়াবি বিষয় এ ব্যাপারে তোমরাই বেশি অভিজ্ঞতা রাখ। যা ভাল মনে কর তাই করো।

তিনি প্রথমে নিষেধ করেছিলেন এই মনে করে যে, এটি হয়তো কোনো জাদু অথবা ভ্রান্ত আকিদা। পরে জানতে পারলেন, না এটি জাদু বা ভ্রান্ত আকিদা নয়; বরং ইন্দ্রিয়-অনুভববিষয়ক উপকরণ। তাই পরে অনুমতি দিলেন।

মোদ্দাকথা, এক হলো নবীদের ব্যক্তিগত রায় ও পরামর্শ। এগুলো মানা না মানার ব্যাপারে মানুষ ইচ্ছাধীন। আরেক হলো, শরয়ী হুকুম, যা ওহী দ্বারা হয়ে থাকে। এগুলো মানা মানুষের জন্য ওয়াজিব। সুতরাং কখনো নবীগণ জাতিগত রায়ের উপর আমল করান। তারপর ওহী আসার পর নিষিদ্ধ হলে নিষেধ করেন।

নবুওয়াত মানবগুণ ও ফেরেশতাগুণের সমষ্টি

নবীগণের মধ্যে মনুষ্যত্ত্বের গুণও বিদ্যমান, ফেরেশতাগুণও বিদ্যমান। মনুষ্যত্বে যে সকল পরিস্থিতি দেখা দেয়, সেগুলো নবীদের মধ্যেও দেখা দেয়। যেমন– আহার, পান, ঘুম, জাগ্রত, সুস্থ ও অসুস্থ ইত্যাদি। আরেকটি হলো ফেরেশতাগুণ। যেমন– তাঁদের উপর ওহী পাঠান, নিজের মুকাররাব বানান। সেখানে নবীগণ ফেরেশতাকূল হতে উত্তম ও উচ্চ মর্যাদাবান ফেরেশতারাও সেই মাকামে পৌঁছতে পারে না। উক্ত দুই মাকাম বর্ণনা করেছেন নিচের আয়াতে-

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

আমি তোমাদের মতো মানুষই। তবে আমার উপর ওহী পাঠানো হয়।

এটি হলো নবুওয়াতের আযমত। তো তাদের মনুষ্যত্বও রয়েছে, নবুওয়াতও রয়েছে। উভয় পদমর্যাদা বিদ্যমান। মানুষ হিসেবে মনুষ্যত্বে সকল আবশ্যকীয় বস্তু প্রকাশ পায়। আবার ফেরেশতাগুণ হিসেবে আল্লাহর ওহী আসে। আর উভয় পদমর্যাদা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ও প্রিয়ভাজন। এখন যদি কেউ শুধু يُوحَىٰ إِلَيَّ অংশকে গ্রহণ করে আর মনুষ্যত্বের গুণকে অস্বীকার করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ ছিলেন ন,তাও কুফরি। মধ্যমপন্থী কথা হলো, মানুষ হিসেবে মানবে; তবে সাধারণ মানুষ নন বরং বিশেষ মানুষ, যাঁর উপর ওহী নাযিল হয়, মুজেযা প্রকাশ পায়। সারকথা, তিনি সৃষ্টিগত হিসেবে মানুষ আর নবী আর আল্লাহপ্রদত্ত দান হিসেবে নবী। তার আযমত ফরজ এবং মানুষ হিসেবেও তাঁকে মানুষ মানা ফরজ। উভয় পদমর্যাদা তাঁর মাঝে বিদ্যমান।

হযরত আলী রা.-এর জিয়াফতের হাদিস

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قَالَ اَضَافَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاَسْوَدَيْنِ اَلتَّمْرِ وَالْمَاءِ

(اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিয়াফত করলেন দুটি কাল জিনিসের– খেজুর ও পানির। তিনি খেজুর খেয়ে উচ্ছিষ্টটুকু আমাকে আহার করিয়েছেন এবং পানি পান করে আমাকে পান করিয়েছেন। তারপর নিম্নের হাদিস বর্ণনা করেছেন–

مَنْ اَضَافَ مُؤْمِنًا فَكَاَنَّمَا اَضَافَ اٰدَمَ

যে ব্যক্তি দুজন মুমিনকে জিয়াফত করল, সে যেন হযরত আদম ও হাওয়া আ. উভয়কে জিয়াফত করল।

তারপর বললেন, যে ব্যক্তি তিনজন মুসলমানকে জিয়াফত করল, সে যেন হযরত জিবরাঈল, মিকাঈল এবং ইসরাফিল আ.কে মেহমান বানাল। আর যে ব্যক্তি চারজনকে জিয়াফত করল, সে যেন তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও কুরআনকে পড়ে নিল। অর্থাৎ এগুলো খতম করলে যে পরিমাণ সাওয়াব মিলে সে সেই পরিমাণ সাওয়াব পাবে।

যে লোক পাঁচজন ব্যক্তির মেহমানদারি করল, সে ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে, যে জন্মের পর থেকে জামাতের সাথে নামায পড়তে থাকে এবং এভাবে হাজারো বছর নামায পড়ে। এই ব্যক্তি সেই পরিমাণ সাওয়াবের ভাগী হবে, পাঁচজন দাওয়াতকারী ব্যক্তি সেই পরিমাণ সাওয়াব পাবে।

তারপর বললেন, যে ব্যক্তি ছয়জন মানুষকে দাওয়াত করে আহার করাল, সে যেন হযরত ইসমাঈল আ.-এর বংশের ছয়জন গোলামকে আযাদ করল। যে সাতজনকে দাওয়াত করল, তার জন্য জাহান্নামের সাতটি দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আর যে আটজনকে দাওয়াত খাওয়াল, সে যেন জান্নাতের আটটি দরজা খুলে নিল। যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আর যে নয়জনকে দাওয়াত করল, সেই ব্যক্তি জন্মের পর থেকে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গুনাহের সমপরিমাণ নেক অর্জন করল। এখানে গুনাহের কথা এজন্য বলা হয় যে, নেককার কম হয়ে থাকে। গুনাহকারী বেশি হয়। এজন্য আধিক্য গুনাহে রয়েছে। তারপর বললেন, যে দশজনকে

জিয়াফত করল, তার জন্য আল্লাহ তায়ালা এত বড় বদলা দেবেন যে; যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্ব ও উমরা করে এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত করতে থাকে, তাদের সমপরিমাণ সাওয়াব দশজন দাওয়াতকারীকে দান করবেন।

উক্ত হাদিসের উদ্দেশ্য মুসলমানদের মাঝে পরস্পর সাহায্য, সহযোগিতার উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। এক তো হলো নিজে নামায পড়ে নিজের জান্নাত কামাই করা। আরেক হলো মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ রাখার কাজ করার উপকরণ জোগানো, যা দ্বারা সারা উম্মতে মুসলিমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তার উপকরণের মধ্যে একটি হলো জিয়াফত তথা মেহমানদারি, পরস্পর সহযোগিতা ও হামর্দদী।

যেমন বলা হয়েছে–

وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ

আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তাদের ভাইদের সাহায্য করতে থাকে।

সুতরাং নামায হলো ব্যক্তিগত আমল। আর পরস্পর সাহায্যের সম্পর্ক উম্মতের সাথে। আর নবীদের উদ্দেশ্য ছিল উম্মাতের ভিতর একতা সৃষ্টি করা এবং অনৈক্যের পরিবর্তে এক্য সৃষ্টি করা, যা দ্বারা শক্তি সৃষ্টি হবে, আল্লাহর দুশমনরা পরাভূত হবে, দীনের কালিমা সমুন্নত হবে। এ কারণেই দাওয়াতের আমলকে অনেক বেশি মূল্য ও মর্যাদা দান করা হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবে দেখলে মনে হবে, একজন হজ ও উমরা করল, আরেকজন দশজন মানুষকে খাবার খাওয়াল। এটি প্রকাশ্যভাবে হজ-উমরা হতে বড় ও দামি নয়; কিন্তু যদি বুনিয়াদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, হাজারো নামায যা আপনি পড়েছেন তা সবই নিজের জন্য। আর মেহমানদারি, সাহায্য-সহযোগিতা ও হামদর্দী দ্বারা উম্মতে মুসলিমার মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হবে। আর শরীয়তের মাকসাদ হলো উম্মাতে মুসলিমার মধ্যে যেন ঐক্যবদ্ধতা ও পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকে, যাতে আল্লাহর দুশমনরা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের সামনে আল্লাহর বিধান পেশ করা যায়।

আল্লাহ না করুন, আল্লাহর দুশমনরা যদি বিজয়ী হয়ে যায়, সবল হয়ে যায়, তাহলে তারা তাদের কালিমাকে আপনাদের সামনে পেশ করবে। আপনাদের কথা তারা কেন শুনতে যাবে। শক্তি ও ক্ষমতার কারণে মানুষ অন্যের কথা শুনে ও মানে। সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে পরস্পর একতার শক্তির প্রভাব উম্মতের মধ্যে পড়ে। আর হজ ও উমরার প্রভাব যে করে তার উপরই পড়ে শুধু সেগুলো

যত বড়ই আমল হোক না কেন। এ কারণেই মেহমানদারির সাওয়াবকে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

একজন হাজারো হজ পালন করেছে; কিন্তু এমন একটি আমলও করেছে, যা দ্বারা উম্মতের মধ্যে একতা সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে তার প্রতিদান হাজারো হজ থেকে বেশি হবে। কেননা, শরীয়তের আসল মাকসাদ হলো ঐক্যবদ্ধতা। এজন্যই এমন সন্দেহ করা যাবে না যে, দাওয়াত খাওয়ানো কিভাবে এত দামি হলো? মোটকথা, এই জিয়াফতের হাদিসটি হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত, যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই আমল উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি খেজুর ভক্ষণ করে তাকে খাওয়ালেন, পানি পান করে তাকে পান করালেন। তারপর হাদিস বর্ণনা করলেন। হযরত আলী রা.-এর শাগরেদ তাঁকে বললেন, হযরত! আপনিই আমাদের দাওয়াত করেন। তারপর উক্ত হাদিস বর্ণনা করেন। তো হযরত আলী রা. তাকে দাওয়াত করলেন। খেজুর ও পানি খাওয়ালেন। তারপর হাদিস বর্ণনা করলেন।

পরবর্তীতে শাগরেদ হতে শাগরেদ এভাবে উক্ত হাদিসের সিলসিলা হযরত মাওলানা খলিল আহমদ রহ. পর্যন্ত পৌঁছলে তাকে মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম রহ. দাওয়াত দিলেন এবং নিজে পান করে তাকে পান করালেন। নিজে খেজুর খেয়ে তাকে খাওয়ালেন। আমার ওস্তাদও তা-ই করলেন। আমাকে দাওয়াত করে খেজুর খেয়ে খাওয়ালেন, পানি পান করে পান করালেন। তারপর হাদিস শুনালেন এবং এজাযত দিলেন। এখন দুটি হাদিস শব্দগতভাবে শুনে নিলেন। একটি মুসালসাল বিল মুসাফাহ, অপরটি মুসালসাল বিল মারাওয়াত তামার। এখন আমলি অংশ রয়ে গেল যে, যাকে এজাযত দেওয়া হবে, তার সাথে মুসাফাহা করতে হবে এবং খেজুর খেয়ে খাওয়াতে হবে, পানি পান করে অবশিষ্টটুকু পান করতে হবে। এখন কথা হলো, এখানে এত বেশি মানুষ যে, এত পরিমাণ খেজুর আমি আহার করতে পারব না যে, কিছু-কিছু খেয়ে বাকি অংশ আপনাদের খাওয়াব। এ কারণে একটা, অর্ধেকটা খেজুর খেয়ে এই খেজুরগুলোতে মিশিয়ে দেব; ইনশাআল্লাহ তাতে বরকত হবে। আর পানি পান করে জগে ঢেলে দেব; তা হতে সবাই পান করে নিবেন। অন্যথায় প্রত্যেক গ্লাস হতে এক-এক ঢোক পান করলে পঞ্চাশ ঢোক পান হয়ে যাবে। এতে আমার পেটের কী অবস্থা হবে। ইসলাম ধর্মে একতার ব্যবস্থাপনা আছে। হাদিস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ

ঐক্যবদ্ধতা ছাড়া ইসলাম হয় না।

ইসলামের সকল কাজে ঐক্যবদ্ধতা রয়েছে। এমন কোনো ইবাদাত নেই, যাতে ঐক্যবদ্ধতা বা জামাতবদ্ধতা নেই। নামাযে ইমামের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, ইকিতদা বা অনুসরণ রাখা হয়েছে, জামাতবদ্ধতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে সবাই মিলে একসাথে নামায আদায় করে।

তেমনিভাবে যাকাতের নিয়ম হলো, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম থাকলে যাকাত বাইতুল মালে তথা সরকারী কোষাগারে একত্রিত করা হবে। তারপর গরীবদের মাঝে বণ্টন করা হবে, যাতে সারা উম্মতের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া পৌঁছে। এখন যেহেতু ইসলামি হুকুমত নেই, তাই উলামা এবং মুফতিগণকে তার কায়েম মাকাম করা হয়েছে, যাতে তাদের ফতুয়া অনুযায়ী বণ্টন করা হয়। তেমনিভাবে হজও ঐক্যবদ্ধতার নাম। তাতে ইমাম রাখা হয়, ইমামের ইশারা-ইঙ্গিতে বা নেতৃত্বে হজের কার্যাবলি আদায় হয়।

জিহাদেও ইমাম-আমীর রয়েছে। যতক্ষণ আমীর সাহেব অনুমতি না দেবেন, ততক্ষণ আপনি সামনে অগ্রসর হতে পারবেন না এবং পিছুও হঠতে পারবেন না। তেমনিভাবে পরিবার সম্পর্কে বলা হয়েছে–

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ

তোমাদের মধ্য হতে সবাই নিজ ঘরের বাদশাহ। এ কারণে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি তোমার প্রজাদের (পরিবারের লোক) জন্য কেমন বন্দোবস্ত করেছ, তাদেরকে দীনি তারবিয়াত দিয়েছিল কি-না? ইসলাম ঘরেও ইজতেমায়ী নীতি রেখেছে।

একইভাবে কোথাও সফরে বের হলে এ বিষয়টি সুন্নাত করা হয়েছে যে, কয়েকজন মানুষ হলে একজনকে আমীর বানিয়ে নেবে আর সবাই তার হুকুম মোতাবেক কাজ করবে, যাতে সফর নিয়ম ও শৃঙ্খলার সাথে সমাপ্ত হয়। মোটকথা, ইসলাম প্রত্যেক জিনিসে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা রেখেছে, শৃংখলা ও ঐক্যবদ্ধতা রেখেছে। এ কারণে বলা হয়েছে–

لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِالْجَمَاعَةِ

ইসলাম হতে পারে না যতক্ষণ-না তাতে ঐক্যবদ্ধতার রং প্রবল হয়।

আর যতগুলো বস্তুতে ইজতিমায়ী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সেগুলোতে একাকি গাসল করা থেকে বেশি সাওয়াব রাখা হয়েছে, যাতে পুরা জামাত তাতে শরিক হয় বা জড়িয়ে পড়ে।

ইফতা পদের নাজুকতা

অনেক আনুষাঙ্গিক বিষয় রয়েছে, যেগুলোর একটা অপরটার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে; তবে হুকুম ভিন্ন-ভিন্ন। এটার এক হুকুম, ওটার আরেক হুকুম। মুফতি সাহেব জানেন, এগুলোর মধ্যে কেমন সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, যার কারণে এ দুটির হুকুম আলাদা-আলাদা হয়েছে। যেহেতু মুফতি সাহেবের হৃদয়পটে সকল আনুষাঙ্গিক বিষয় উপস্থিত থাকে এবং তিনি বিষয় সম্পর্কে অবগত, তাই তিনি সেগুলোতে পার্থক্য করতে পারেন।

সবচেয়ে অধিক জটিল বিষয় হলো ফতুওয়া দেওয়া এবং আমলিভাবে মাস্আলা প্রদান করা। সকল শিক্ষিত বরং শিক্ষকরাও এই কাজ করতে পারেন না। এগুলো মুফতিদের কাজ। তাদের আল্লাহ তা'অলা এ কাজের যোগ্যতা দিয়েছেন। এজন্যই আমি বুযুর্গদের দেখেছি, তারা ফতুওয়া দেওয়ার দুঃসাহস করতেন না। একবার হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহ.-এর নিকট কেউ মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে তিনি মাসয়ালা বলে দিলেন। পরে জানতে পারলেন, তিনি ভুল মাসয়ালা প্রদান করেছেন। এতে তিনি বহু পেরেশান হয়ে পড়েন। তিনি রোদ্রে এবং বৃষ্টিতে সারা শহরে ঐ লোককে খুঁজে বেড়ান। পরিশেষে খুঁজতে-খুঁজতে রাতে পেলেন। তখন তাকে বললেন, ভাই! আমি ভুল মাসয়ালা বলেছিলাম। আসল মাসয়ালা হলো এমন। তখন তাঁর মন শান্ত হলো।

হযরত মাওলানা থানুভী রহ.-এর দরবারে আন্-নুর নামে একটা রিসালা ছিল, তাতে ভিন্ন একটা অধ্যায় ছিল। নাম তার তারজীহুর রাজেহ্ তথা প্রাধান্য পাওয়া মাসয়ালা। যদি কোনো মাসয়ালার মধ্যে ভুল হয়ে যেত, তাহলে তিনি প্রচার করতেন, আমার ভুল হয়েছে; উক্ত মাসয়ালার আসল হুকুম হবে এই আর এটিই অগ্রগণ্য। লোকেরা তার উপর আমল করত। অতএব সবচেয়ে জটিল বিষয় হলো ফতুওয়া দেওয়া। এটি মুফতিদের কাজ। প্রত্যেক মুদাররিস ও আলেমের কাজ নয়।

তাদরিস ও তাবলিগের দায়িত্ব

ইফতার দায়িত্ব হতে সহজতর দায়িত্ব হলো দরস্ বা শিক্ষা প্রদান। দরস প্রদানের সময় কিতাব সামনে থাকে; তা দেখে-দেখে বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়। তা বেশি জটিল ও কষ্টের কর্ম নয়। তার চেয়ে বেশি সহজ ওয়াজ-নসিহত করা। কারণ, যেকোনো একটি বিষয় যা স্মরণ থাকে, তাই ইলমিভাবে বর্ণনা দেওয়া। তার চেয়ে আরো সহজ ঐ লেকচার, যা ইলমি বা জ্ঞানগর্ভ হয় না- স্রেফ দুনিয়া সম্পর্কিত কথা। এদিক-সেদিক ঘটনা বলে লেকচার দিয়ে দেওয়া সবচেয়ে সহজ কর্ম। অতীত ঘটনাসমূহ এই হয়েছে, এই হয়েছে বর্ণনা করা। আর তারও চেয়ে আরো বেশি সহজ হল প্রশ্ন করা ও সমালোচনা করা। কারণ, এতে কোনো কষ্টের প্রয়োজন হয় না। যার মন চায় সমালোচনা করে দিল, যার মনে চায় সন্দেহ করে বসল। একজন গণ্ড মূর্খও সমালোচনা করতে পারে। তাতে কোনো প্রকার জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

এ বিষয়টি আমি এজন্য তুলে ধরছি যে, কিছু মানুষ রয়েছে, যারা মাসয়ালা জিজ্ঞেস করেন। তখন আমি বলি, ভাই! মুফতি সাহেবের নিকট জিজ্ঞেস করেন; আমি বলতে পারব না। মাসয়ালা জানা থাকা সত্ত্বেও আমি মাসয়ালা বলে দেওয়ার সাহস করতে পারি না। মুফতিদের হৃদয়পটে সকল বিষয় উপস্থিত থাকে। কিছু মানুষ খারাপ ভাবে যে, তিনি মাসয়ালা বলে দিলেন না। ভাই! আমি যদিও মাসয়ালা বলে দিলাম না; কিন্তু উপায় তো বলে দিলাম যে, মুফতির নিকট জিজ্ঞেস করো। প্রত্যেকের মাসয়ালা বলার প্রয়োজন নেই। যারা বলতে পারেন, তারা বলবেন, যাদের মাসয়ালার জ্ঞান আছে, যোগ্যতা আছে। এ তো খারাপ মনে করার কোনো বিষয় নয়। আমি সর্বদা ফতুওয়া দেওয়া থেকে বেঁচে থাকি। ফতুওয়া দেওয়া আমার কাজ নয়।

ইলম ও আমলের পার্থক্য

কোনো মাসয়ালার জ্ঞানগর্ভ তাহকীক বা প্রকৃত প্রমাণ বের করে দেওয়া ভিন্ন বিষয় এটি অস্বীকার করি না। যা নিজের মস্তিষ্কে উপস্থিত থাকে তা বলে দেব। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয় আমল কী করব? এটি মুফতিদের কাজ। তারা ফতুওয়া দেবেন, অমুক সাইডে এই আমল করো অমুক সাইডে এই আমল করো। এ কারণে যদি কতক হযরত প্রশ্ন করেন আর আমি মাসয়ালা না বলি, তাহলে তা খারাপ মনে করবেন না। কেননা, এটা তো জরুরি নয় যে, আমার মাসয়ালার ইলম থাকতে হবে। আর ইলম যদি থাকেও তাহলে আমি মাসয়ালা দেওয়া

সতর্কতার খেলাফ মনে করি। কারণ, ফিকহী আনুষাঙ্গিক বিষয়ের উপর আমার তেমন দক্ষতা নেই। তা তাদেরই হতে পারে, যারা রাত-দিন সর্বদা ফিক্‌হ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আমি সতর্কতা ও বিধান পেশ করলাম। এটি খারাপ মনে করার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দিষ্ট একটা মাকাম থাকে। আমি এমন উপযুক্ত নই যে, মাসয়ালা দেব। কোনো যোগ্য ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞেস করলেই তো ভাল হয়।

হায়াতুন্নবী একটি সর্বসম্মত বিষয়

আমার বুঝে আসে না, লোকেরা হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেন অস্বীকার করে? আমার সারসংক্ষেপ ধারণা হলো 'হায়াতুন্নবী' বিষয়টি সর্বসম্মত বিষয়। অর্থাৎ উম্মাতে মুসলিমার মধ্যে কেউ তার অস্বীকারকারী নেই। হায়াতুন্নবীর কায়ফিয়ত বা গুণাবলিতে কথা থাকতে পারে যে, তিনি জীবিত আছেন তো কী অবস্থায় এবং কী বৈশিষ্ট্যে আছেন। তাই কেউ যদি কায়ফিয়ত নিয়ে মতভেদ করে, তাহলে তাকে মূল বিষয়ে মতভেদকারী বলা যাবে না।

হায়াতুল আম্বিয়ার বিষয়টি সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত–

اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ

নবীগণ নিজেদের রওজায়ে পাকে জীবিত আছেন; তাঁরা নামায পড়েন।

অথবা বলা হয়েছে–

وَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ -

আর আল্লাহর নবী জীবিত; তাঁকে খাবার দেওয়া হয়।

এতে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই হায়াত দ্বারা যদি ঐ হায়াত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যা সাধারণত আলমে বর্যখে সবার জন্য হবে, তাহলে নবীদের ব্যাপারে বিশেষভাবে 'হায়াত' উল্লেখ করার কোনো অর্থ হতে পারে না।

আর نَبِيُّ اللهِ حَيٌّ বা اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ বলার পর একথা বলা জরুরি নেই যে اَلْمُسْلِمُوْنَ اَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ অথবা اَلنَّاسُ اَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ মুসলমানরাও তাদের কবরে জীবিত আছে। কেননা হায়াতে বরযখে সবাই সমান। কিন্তু নবীদের খাস করা এবং তাদের ব্যাপারে 'হায়াত' শব্দ ব্যবহার করার দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাঁদের জন্য বিশেষ হায়াত রয়েছে, যা সর্বসাধারণের জন্য নেই।

হায়াতে কামিল

এখানে 'হায়াত' শব্দটিকে শর্তযুক্ত করে আনা হয়নি। একথা বলা হয়নি যে, নবীগণ তাদের পদমর্যাদায় জীবিত অথবা অমুক দিক থেকে জীবিত। বরং সাধারণভাবে ﷺ বলা হয়েছে। সুতরাং কোনো জিনিস সাধারণভাবে বলা হলে তা দ্বারা ফরদে কামিল বা পূর্ণ একক উদ্দেশ্য হয়। তারপর ফরদে কামিল-এর সুরত তা-ই হবে যে, দুনিয়াতে আমরা যেভাবে জীবন যাপন করে থাকি, ঠিক তেমনভাবে তাঁরাও জীবন যাপন করেন। তাঁরা দুনিয়াতে যেভাবে জীবিত ছিলেন, সেইভাবে জীবিত আছেন। অন্যথায় বিশেষভাবে নবীদের কথা বলা এবং হায়াত শব্দ সাধারণভাবে বলার কোনো অর্থ থাকে না। অতএব বিশেষভাবে উল্লেখ করা এবং হায়াত শব্দ থেকে সাধারণ রাখা উভয় দ্বারা প্রমাণিত হয়, নবীদের জন্য বিশেষ ও উচ্চ পর্যায়ের হায়াত যা অন্যদের জন্য নয়। এখন প্রশ্ন হলো হায়াতের কায়ফিয়াত কী?

আত্মা কবজ করার বৈশিষ্ট্য

আমি কায়ফিয়ত সম্পর্কে অবগত নই। আমি তার সম্পর্কে জানাতে পারব না। তা আমার আয়ত্তে নেই। আমি এতটুকু জানি, নবীদের মৃত্যু আমাদের জনসাধারণের মৃত্যুর মতো নয়। তাঁদের জীবন আমাদের জীবনের মতো নয়। তাঁদের মরনের অবস্থা হলো প্রথমে মালাকুল মাউত তাঁদের থেকে অনুমতি নিতে আসেন। যতক্ষণ অনুমতি না মিলে এবং তাদের না জানানো হয় যে, আপনার মৃত্যু নিকটবর্তী এবং আমরা আপনার রুহ কব্জ করার জন্য আসছি, ততক্ষণ পর্যন্ত মউতের কাজ শুরু করা হয় না। সাধারণ মুমিনদের থেকে এমন কোনো অনুমতি নেওয়া হয় না বা অনুমতি দেওয়া হয় না।

নবী সা.-এর হাত মোবারকের বৈশিষ্ট্য

নবীগণের ইহকালীন জীবন যাপন অন্যান্য সাধারণ লোকদের জীবনের সাথে মিলে না, তাহলে তাঁদের মরনের পরের জীবনও মিলবে না। যদিও বলা হয়েছে–

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

আমি তোমাদের মতো একজন মানুষই।

কিন্তু এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও আমাদের মনুষ্যত্ব ও নবীজির মনুষ্যত্বের মধ্যে কেমন পার্থক্য বিদ্যমান, তা তার সীরাত দেখলে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আমরা বলে থাকি, আমাদের হাত আছে, নবীদেরও হাত রয়েছে। তাঁদের হাত শারীরিক হাত। কোনো রূহানী বা অদৃশ্য হাত নয়। কিন্তু তাঁদের হাতসমূহে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যদের হাতে নেই। আমাদের হাত দ্বারা কাউকে থাপ্পর মারলে সে ব্যথা পাবে আর নবীদের হাতে কাউকে চড় দিলে তাতে ব্যথা অনুভব হোক বা না হোক; কিন্তু তা দ্বারা মৌলিক হায়াত সৃষ্টি হবে। আমি যদি আপনার বুকে হাত দ্বারা আঘাত করি, তাহলে আপনি ব্যথা পাবেন এবং আমাকে গাল-মন্দ করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর ফারুক রা.-এর সিনায় হাত মারার কারণে তাঁর সিনা খুলে গেল। তাঁর সামনে আকাশ পর্যন্ত সকল বস্তু উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

হাদিস শরীফে হযরত উমর রা.-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রা. নিজ মহল্লার ইমাম ছিলেন। তিনি নামায পড়ালেন আর উমর রা. তাঁর কিরাত শ্রবণ করলেন। তিনি নিজ গোত্রের পটনরীতি অনুযায়ী কিরাত পড়লেন। হযরত উমর রা. নিজ গোত্র কুরাইশের কিরাত জানতেন। তিন ছিলেন আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে কঠোর স্বভাবের মানুষ। তিনি খাব্বাব ইবনে আরাত রা.-এর উভয় বাহু ধরে টেনে-হেঁচড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে নিয়ে এলেন এবং বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন; আমি মুনাফিকের গর্দানটা আলাদ করে ফেলি। কারণ, সে কুরআনুল কারীম ভুল তেলাওয়াত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাব্বাব রা.কে বললেন, তুমি পড়ো। তিনি তেলাওয়াতকৃত আয়াত নিজ ভাষায় তেলাওয়াত করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

هٰكَذَا اُنْزِلَتْ

এভাবেও এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

اُنْزِلَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ

সাত ভাষায় কুরআন তেলাওয়াতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে বনি তামিম, বনি তাই, কুরাইশ ইত্যাদি গোত্রসমূহের ভাষা শামিল ছিল। এগুলো ছিল আরবের সর্বজনস্বীকৃত সাবলীল ও সাহিত্যপূর্ণ সাতটি পঠনরীতি। কুরআনুল কারীম এই সাত ভাষায় পড়ার অনুমতি ছিল। এই ভাষাগুলোর মধ্যে পরস্পর শব্দের ভিন্নত থাকত। কিন্তু অর্থ ও মর্মের কোনো পরিবর্তন হতো না। তাই হযরত উমর ফারুক রা.-এর তেলাওয়াতের পর বললেন–

هٰكَذَا اُنْزِلَتْ

হ্যাঁ এভাবেও নাযিল হয়েছে।

এই কারণে হযরত উমর ফারুক রা.-এর অন্তরে কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি হল যে, এটি কেমন কুরআন, যে যেভাবে পড়ে তাকে বলে দেওয়া হয়, হ্যাঁ এভাবেও নাযিল হয়েছে। এমন সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বুকে হাত মারলেন এবং বললেন, হে খাত্তাবের বেটা?

হযরত ফারুকে আযম রা. বলেন, সিনায় হাত স্পর্শ করার পর আমার বক্ষদেশ এত বেশি খুলে গেল যে, সারা আকাশ আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গেল এবং মনের সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসা একেবারেই শেষ হয়ে গেল।

অতএব, আমি আপনি কারো সাথে হাত মারলে ব্যথা পাবে এবং পয়গম্বর মারলে সিনা খোলার দৌলত নসীব হয়।

তাই–

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

বলাও সঠিক; কিন্তু এ সাদৃশ্য প্রকারভেদে। তবে ব্যক্তিগত পার্থক্য এত বেশি যে, তা হাত পর্যন্ত দৃশ্যমান।

নবীজি সা. -এর যবানের বৈশিষ্ট্য

আমার-আপনার জিহ্বা গোস্ত ও চামড়ার তৈরি এবং নবীগণের জিহ্বাও গোস্ত-চামড়ার তৈরি। কিন্তু আমরা যদি কোনো কিছু ভক্ষণ করি, তাহলে জিহ্বা দ্বারা টক এবং মিষ্টি অনুভব করতে পারি, যা জন্মগত রুচি। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার করলে তাঁর জিহ্বা স্বাদ অনুভব করার সাথে সাথে হালাল-হারামও অনুভব করতে পারত।

হাদিস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, কোনো এক আনসারী সাহাবীর ইন্তেকালের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযায় গেলেন। মাইয়াতের কাফন-দাফনের পর তার উত্তরাধীরা আবেদন পেশ করেন হে আল্লাহ রাসূল! আমাদের বাড়িতে কিছু আহার করে যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আবেদন গ্রহণ করলেন। তিনি তাদের বাড়িতে আগমন করলেন। তাঁর সামনে গোস্ত পরিবেশন করা হলো। অন্যান্য লোকেরা ভোজন করতে লাগল। তিনি গোস্ত ছাকলেন এবং বললেন, এই গোস্ত মনে হয় আত্মসাতের মাল। তখন দাওয়াতকারী মহিলা ঘটনা খুলে বলল যে, আমি

আমার স্বামীকে বলেছি, অমুক স্থান হতে বকরি খরিদ করে নিয়ে আসেন, যা যবেহ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করব। কিন্তু ওখানে বকরি পেলেন না। তারপর একজন প্রতিবেশীর নিকট মূল্য পাঠালাম যে, আপনি একটা বকরি কিনে দিন। তিনিও পেলেন না। তারপর প্রতিবেশীর স্ত্রীকে বললাম, তুমি কোথাও হতে একটা বকরি খরিদ করে দাও। তখন সে তার নিজের বকরি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত আমার নিকট নিয়ে আসে। সেই বকরি আমি যবেহ করে রান্না করেছি। তার গোস্তকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিহ্বা চিনে ফেলেছে যে, তা আত্মসাতের মাল, যা অনুমতি ব্যতীত যবেহ করা হয়েছে।

তারপর তিনি বললেন, এগুলো বন্দীদের আহার করিয়ে দাও; আমি তা খাব না। অতএব জিহ্বার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে গোস্ত ও চামড়াও জন্মগত হওয়া হিসেবে এবং ভিন্নতাও রয়েছে এই হিসেবে যে, আমাদের জিহ্বা শুধু বাহ্যিক স্বাদ অনুভব করার ক্ষমতা রাখে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক জিহ্বা বাহ্যিক স্বাদের সাথে সাথে অদৃশ্য স্বাদও অনুভব করতে পারে, যা দ্বারা হালাল-হারাম জায়েয, না জায়েয এবং উত্তম ও অনুত্তম পার্থক্য করতে পারেন। তাই ভিনত্ম ও অভিন্নতা উভয়ই রয়েছে।

সিয়ামে নবীর বৈশিষ্ট্য

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের মত একজন মানুষই। কিন্তু তিনি হাদিস শরীফে ইরশাদ করেছেন, তিনি তাঁর উম্মতকে সাওমে বিসাল তথা ইফতার করা ছাড়া রোযা রাখতে নিষেধ করেন। আর স্বয়ং তিনি একের পর এক রোযা রেখে যেতেন। এভাবে অনেক রোযা রাখতেন। তখন সাহাবারা আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে রোযা রাখতে নিষেধ করেন আর আপনি নিজে রোযা রাখেন। তিনি বলেন–

أَيُّكُمْ مِثْلِيْ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيُسْقِيْنِيْ

তোমাদের মধ্যে আমার মতো কে আছ। আমাকে তো আমার পরোয়ারদেগার খাওয়ান, পান করান।

সুতরাং আয়াতের মধ্যে একথা বলা যে- إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ আমি তোমাদের মতো মানুষই। আর হাদিস শরীফে একথা বলা যে- أَيُّكُمْ مِثْلِيْ তোমাদের মধ্যে আমার মতো কে আছে। আমার সাথে আমর পরওয়ারদেগার ভিন্ন মুয়ামালা করেন।

অতএব সাদৃশ্যও আছে ভিন্নতাও আছে। সাদৃশ্যও রয়েছে এবং পৃথক শানও রয়েছে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

নবীজির চোখের বৈশিষ্ট্য

আমার ও আপনার চোখ দেখে। এগুলো জন্মগত চোখ। কোনো বস্তুর আকৃতি ও সূরত আমরা দেখতে পারি। নবীদের এবং সায়্যেদুল আম্বিয়াকেও জন্মগত চোখ মোবারক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হাদিস শরীফে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার নামাযে কিছু মানুষের ভুল হয়েছিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সতর্ক করলেন এবং বললেন–

إِنِّيْ أَرَى خَلْفِيْ كَمَا أَرَى بَيْنَ يَدَيَّ

তোমরা মনে করেছ, আমি দেখিনি। আমি সামনের জিনিস যেভাবে দেখি, পিছনের জিনিসও সেভাবে দেখি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখ মোবারক উভয় দিকে দেখতে পারত। সামনে ও পিছনে সমানভাবে দেখতে পারত। সুতরাং চোখ চোখ হিসেবে তো সদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু চোখের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনো সদৃশ্য নেই। নবীদের চোখ মোবারক ভিন্ন, উম্মতের চোখ ভিন্ন।

হায়াতে নবীর বৈশিষ্ট্য

তেমনিভাবে যখন প্রতিটি অঙ্গ এবং জীবনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখার সাথে সদৃশ্য দাবির সাথে সাথে অসাদৃশ্য এবং পৃথক ও ভিন্ন শান বিদ্যমান, আমরা যদি বলি, সমষ্টিগত হায়াতে নিঃসন্দেহে সদৃশ্য রয়েছে যে, আমরাও জীবিত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জীবিত। কিন্তু তাঁর হায়াতে যে সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা আমাদের কখনো অর্জন হবে না। তাই আমরা বলতে পারি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে প্রতিটি অংশে বিশেষ ও পৃথক শান বিদ্যমান।

ইন্তেকালের পর হায়াতের বৈশিষ্ট্য

এমনিভাবে ইন্তেকালের পর সম্পর্কে আমরা বলব, মৃত্যুর পরবর্তী যে হায়াত লাভ হয়, তাতে অবশ্যই সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু ভিন্নতা রয়েছে। মৃত্যুর পর আমরা এমন হায়ত পাব না, যেমনটি নবীগণ পাবেন।

হায়াতের কিছু নিদর্শন

এ বিষয়টিকে এভাবে বুঝে নেওয়া যেতে পারে যে, হায়াত বা জীবন্ত পরিচয়ের জন্য দুটি জিনিস রয়েছে, যা দ্বারা বোঝা যায় লোকটি জীবিত। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তিসহ জীবিত। আরেক জীবন হলো মৌলিক জীবন যে, আত্মা বিদ্যমান আছে। এটি সবার জন্য যে, যার রুহ আছে সে জীবিত। কারো রুহ মরে না। ইমাম গাযযালী রহ.-এর দাবি হলো মানুষ তো আযলী নয়; তবে আবাদী অবশ্যই। অর্থাৎ সর্বদা তো ছিল না; সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টি হওয়ার পর আর নিঃশেষ হবে না; বরং সর্বদা জীবিত থাকবে। তার হাকীকত ও রুহ কায়েম ও অবশিষ্ট থাকবে। শুধু কায়া ও শরীর বদল হবে আর আসল নফ্স বা আত্মা ঠিক থাকবে।

অতএব হায়াত পরিচয়ের দুটি আলামত একটি খাওয়া ও পান করা, খাওয়া-দাওয়া প্রত্যক্ষ করে সবাই বলে লোকটি জীবিত। আর যার খাওয়া-দাওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমরা বলে থাকি, ভাই! তার আবার জীবন কী সে তো অচিরেই মরে যাবে। কারণ, তার জীবনের উপকরণ উঠে গেছে হারিয়ে গেছে তো তার জীবনের কী বাকি আছে। এখন মরে যাবে। সুতরাং খাবার হলো অনুভবযোগ্য উপকরণ, যা হায়াত বাকি থাকার আলামত।

হায়াতের দ্বিতীয় আলামত হলো, নড়াচড়া ও স্থানান্তর হওয়া। কেউ যদি বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে, তাহলে আমরা প্রথম দফায় বলে থাকি, লোকটি মারা গেছে। কিন্তু যদি সে নড়তে থাকে, দুলতে থাকে, চলতে-ফিরতে থাকে, তাহলে কেউ বলে না, লোকটি মৃত্যুবরণ করেছে। কারণ নড়াচড়া ও চলাফেরা করা হায়াতের বড় আলামতসমূহ হতে একটি আলামত। তো হায়াতের দুটি নির্দশন। একটি হলো, খাওয়া ও পান করা, অপরটি নড়াচড়া তথা চলাফেরা। অর্থাৎ বিভিন্ন কাজ করা, যার দ্বারা বোঝা যায়, সে জীবিত।

নবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ

নবীগণ তাঁদের কবরে জীবিত আছে।

কেন জীবিত? তার আলামতস্বরূপ বলা হয়েছে, তাঁদের নড়াচড়া পাওয়া গিয়েছে যে, তাঁরা নামায পড়েন। এক ধরনের নড়াচড়া হলো মাদ্দী যে, আমরা সওদা খরিদ করার জন্য বাজারে যাই বা পড়ার জন্য মাদরাসা যাই। এগুলো মাদ্দী বা জন্মগত নড়াচড়া। আবার নামায পড়তে হরকত বা নড়াচড়ার দরকার হয়,

তাকে রূহানী ও ইবাদাতী হরকত বলা হবে। আর তা বাজারে যাওয়ার হরকত থেকে অবশ্যই উত্তম হরকত হবে, খাওয়া-দাওয়ার হরকত হতে অবশ্যই উত্তম হবে। কারণ, এ হরকত দ্বারা আল্লাহর সামনে মাথা নত করা হয়।

সুতরাং উক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওজায়ে পাকে জীবিত আছেন। কারণ, শরীরের হরকত জীবিত থাকার আলামত বা নিদর্শন। আবার এমন হরকত, যা কামিল হরকত এবং ইবাদাতের হরকত খাওয়া দাওয়া বা বাজারে যাওয়ার হরকত নয়। এমনিভাবে হযরত মূসা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى مُوْسَى يُلَبِّيْ

আমি হযরত মূসা আ.কে স্বচক্ষে দেখেছি; তিনি লাব্বাইক লাব্বাইক বলতে আরাফাত ময়দানে যাচ্ছেন।

এতে বোঝা যায়, নবীগণ হজ পালন করে থাকেন।

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, আমি ইউনুসকে স্বচক্ষে দেখেছি, লাল উটের উপর আরোহণ করে আছেন, তাঁর হাতে পশম ও মোটা কাপড়ের তৈরি লাগাম। তিনি লাব্বাইক-লাব্বাইক বলতে-বলতে যাচ্ছেন এবং হজ করছেন। অপর এক হাদিসে এসেছে, মাতাফের মধ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এক ব্যক্তি তাওয়াফ করছেন, যিনি সুঠাম দেহের অধিকারী, বক্ষদেশ প্রশস্ত এবং এত সুন্দর ও সতেজ রঙের দেহ যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ

কেমন যেন তিনি এখন হাম্মামখানা থেকে গোসল করে বের হয়েছেন এবং শরীর হতে টপটপ করে পানি পড়ছে। এমন তরতাজা ও সতেজ আকৃতি, সুঠাম দেহ, মধ্যম উচ্চতা এবং তাওয়াফে লিপ্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল আ.কে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কে? তিনি বললেন, লোকটি হযরত ঈসা আ.।

ঈসা আ.কে তাওয়াফ করতে দেখলেন, হযরত মূসা আ.কে লাব্বাইক পড়া অবস্থায় দেখলেন এবং হযরত ইউনুস আ.কে লাল উষ্ট্রীর উপর দেখলেন যে, তিনি লাব্বাইক বলতে-বলতে যাচ্ছেন। আবার তিনি আমভাবে বলেছেন–

اَلْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ

নবীগণ সবাই তাঁদের রওজায় জীবিত; তারা নামায পড়েন।

অতএব, নামায পড়া প্রমাণিত হলো। হজ করেন প্রমাণিত হলো, বদনের নড়াচড়া প্রমাণিত হলো। আর এমন হরকত, যা ইবাদাতের হরকত, শুধু আসা-যাওয়ার হরকত নয়। অর্থাৎ পরিপূর্ণ ইবাদতি হরকত।

অন্য হাদিসে এসেছে–

وَنَبِيُّ اللهِ يَرْزُقُ

আল্লাহর নবী জীবিত এবং তাঁকে রিজিক দেওয়া হয়।

অতএব খাবার দেওয়া হায়াত ও জীবিত থাকার আলামত। কেননা, খাওয়া ও পান করা হলো জীবিত থাকার দ্বিতীয় আলামত।

এখন কথা হলো কেমন খাবার দেওয়া হবে? তা আল্লাহ তায়ালাই জানেন। আমরা বলতে পারব না, কী ধরনের খাবার। তার ধরন বা সুরত কেমন? তা কি পোলাও, জর্দা না অন্য কোনো রিজিক, তা আল্লাহ ভাল জানেন। কিন্তু রিজিক বলা হয়েছে। আর রিজিক হলো আহারযোগ্য বস্তু। অতএব, নবীগণ আহার করেন এবং নড়াচড়া করেন। উত্তম নড়াচড়া যা ইবাদতি নড়াচড়া। তো সম্ভাবনা রয়েছে, তাঁদের খাবারও উত্তম হবে, জান্নাতি খাবার হবে, দুনিয়ার খাবার হবে না। সুতরাং যেহেতু নড়াচড়া প্রমাণিত হলো, পানাহারও প্রমাণিত হলো; তাহলে হায়াত বা জীবিত থাকা সম্পর্কে এখন আর দ্বিধা থাকতে পারে না। কেননা, জীবিত থাকার নিদর্শন হতে বিশেষ দুটি নিদর্শন বিদ্যমান। অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন 'হায়াতুন্নবী'।

হায়াতে শুহাদা

তেমনিভাবে কুরআন শহীদদের হায়াতকে প্রমাণ করেছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ•

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদের কখনো মৃত বল না, অর্থাৎ তারা মৃত্যু তো নয় তোমাদের বলার অনুমতিও নেই, বললে বেয়াদবি হবে। বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝ না অনুভব করতে পার না। *[সূরা বাকারা ১৫৪]*

অর্থাৎ তাদের জীবিতের ধরন তোমরা বোঝ না, তাঁরা কেমন জীবিত আছে। তো কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো, শহীদগণ জীবিত। এখন কষ্টিপাথর দ্বারা যাচাই ও নিরীক্ষণ করতে হবে। আমি পূর্বে বলে এসেছি, জীবিত বা হায়াত

পরিচয়ের দুটি আলামত। পানাহার ও নড়াচড়া। তাঁরা সেখানে আহার করেন, নড়াচড়া করেন। কিন্তু তাদের আর নবীদের মাঝে পার্থক্য কী? নবীদের হরকত ছিল ইবাদতি তথা নামায পড়া। তাঁদের হরকত রুজি যোগাড় করার জন্য নয় যে, তাঁরা খোরাক আনতে জান্নাতে যাবে। আর শহীদদের নড়াচড়া হলো খাওয়া ও পান করার। তাঁরা জান্নাতে যাবে, খাবে এবং ঘোরাফেরা করবে।

নবীদের খাবার তাদের রওজায় পৌঁছে যায়। আর শহীদের খাবার জান্নাত হতে সংগ্রহ করতে হয়। আর যেহেতু তাঁদের বদল হিসেবে জান্নাত দেওয়া হয়নি, এজন্য তাঁদের পাখির ডাইস দেওয়া হবে, তাদের আসল বডি দেওয়া হবে না। আসল বডি কেয়ামতের পরে দেওয়া হবে এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। সুতরাং হায়াতের নিদর্শনের উভয় বস্তুই শহীদদের জন্য প্রমাণিত হলো। নড়াচড়া ও পানাহার। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, নবীদের জন্য রুজি যোগাড়ের হরকত নয় বরং ইবাদাতের হরকত। আর শহীদদের জন্য রুজি রোজগারের হরকত তথা খোরাক নিতে জান্নাতে যেতে হবে। নবীদের নিকট রিজিক পৌঁছে যাবে, শহীদদের নিকট পৌঁছবে না। তাদের রিজিকের নিকট পৌঁছতে হবে। যেহেতু তাদের যেতে হবে, তাই তারা দ্বিতীয় স্তরের জীবিত।

হায়াতে সালেহীন

তাঁদের ব্যাপারে কী বলা হয়েছে, যারা সাধারণ মুমিন-মুসলমান, যাদেরকে সুলাহায়ে উম্মত বলা হয়; তারা গোনাও করে থাকে, নেকও করে থাকে। তবে নেক কর্ম বেশি করে। তাদের জন্য নকল-হরকতের অনুমতি নেই; বরং তারা ইল্লিইন নামক স্থানে অবস্থান করবে। তাদের জন্য যাওয়া-আসার অনুমতি নেই এবং পানাহার করাও এজাযত নেই। এক কথার দলিল কী হতে পারে?

তার প্রমাণ এমন যে, যখন কোনো মাইয়েতকে কবরে রাখা হয় আর সে সাওয়াল-জাওয়াবে উত্তীর্ণ হয়, তখন প্রথমে তার সামনে জাহান্নামের দরজা খুলে দেওয়া হয়। ফলে সে তার ঠিকানা দেখতে পায়। তাকে বলা হয়, এ ছিল তোমার ঠিকানা। কিন্তু তুমি যেহেতু আমলে সালেহ ও নেককর্ম ইখতিয়ার করেছ, তাই আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য এই ঠিকানা সর্বদার জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন। তারপর ফেরেশতারা তার জন্য জান্নাতের কপাট খুলে দেন। তখন দূর থেকে জান্নাতের রুহ, রায়হান ও নেয়ামতরাজি দেখা যাবে এবং তার সুগন্ধি ও সুবাতাস আসতে থাকবে, যা দিল ও দেমাগকে সুগন্ধময় ও শক্তিশালী করবে। সুতরাং সালেহীনে উম্মতকে আহার করানো হবে না, দূর হতে দেখানো হবে, জান্নাতী খাবারের আশা সৃষ্টি করা হবে এবং কিছু সুঘ্রাণ আসবে, যার দ্বারা

দেমাগে শক্তি সৃষ্টি হবে। তাদের পাকস্থলির রাস্তা দিয়ে কিছুই প্রবেশ করবে না বরং দেমাগে বসিয়ে দেওয়া হবে, যাতে তা দ্বারা সুগন্ধি সৃষ্টি হবে। তাদের নকল-হরকতের ক্ষমতা দেওয়া হবে না। তবে দূর থেকে দেখতে পাবেন। যাতে তাদের মনে আকাঙ্ক্ষা মজবুত থাকে। অতএব, তারাও জীবিত; কিন্তু তাদের জীবন অনেক নিম্ন পর্যায়ের।

প্রকৃত মৃত্যু কাফিরদের জন্য

আর কাফিরদের অবস্থা এমন হবে যে, তারা না পারবে নিজ স্থান হতে সরতে, না পারবে নড়াচড়া করতে, না পাবে কোনো প্রকার খাবার। এমনকি তাদের খেয়ালশক্তিও হরকত করতে পারবে না। অর্থাৎ মস্তিষ্কে কিছুই উদয় হবে না। খেয়াল বা ধ্যানশক্তি যদি কাজ করে, তাহলে মানুষ অন্তত বসে চিন্তা করতে পারে যে, আমি তো বন্দি; তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী হতে পারে। আর মুক্তি যদি না মিলে, তাহলে মনকে তো কিছুটা প্রবোধ দিতে পারে, যতসামান্য আশা করতে পারে যে, যদি আমি এমন করি, তাহলে আমি মুক্তি পাব। সুতরাং জাহান্নামীরা এতটুকুও অনুমতি পাবে না যে, চিন্তা-ফিকর করার সুযোগ পাবে। তাদের খেয়ালও বন্ধ থাকবে, রহিত করা হবে। তারা বুঝতেই পারবে না, কিভাবে মুক্তি মিলতে পারে।

কাফেরদের দেহ নড়াচড়া করতে পারবে না, তাদের খেয়ালশক্তি নড়াচড়া করতে পারবে না, তাদের কোনো প্রকার খাবার জুটবে না, খাবারের কল্পনা করতে পারবে না। অতএব, সঠিক অর্থে কাউকে মৃত্যু বললে কাফেরকে বলতে হবে, তার প্রকৃত অর্থে মৃত; তাদের না আছে কোনো প্রকার নড়াচড়ার অনুমতি, না আছে পানাহারের এজাযত।

হায়াতের স্তর

হায়াত সাধারণ মুমিন-মুসলমানদের জন্যও প্রমাণিত, শহীদগণের জন্যও এবং নবী-রাসূলগণের জন্যও প্রমাণিত। তবে স্তর বাই স্তর স্টেপ বাই স্টেট। মোদ্দাকথা, নবী-রাসূলগণ জীবিত। তাঁদের নড়াচড়া ইবাদত এবং তাদের খিদমতে আহারাদি পৌঁছানো হয়। শহীদরাও জীবিত। তাদের নড়াচড়া জন্মগত। তাদেরও খাবার দেওয়া হয়। তবে তাদের খাবার অন্যত্র গিয়ে সংগ্রহ করতে হয়। আর সাধারণ মুমিনরাও জীবিত। কিন্তু তাদের নড়াচড়া করার এজাযত নেই। তারা তাদের স্থানে অবস্থান করবে। তবে ইজ্জত ও সম্মানের সাথে থাকবে। তাদেরকে জান্নাতের নেয়ামতরাজি দেখানো হবে, যাতে তাদের

খেয়ালশক্তি মজবুত ও দৃঢ় থাকে এবং উচ্চ পর্যায়ের আশা-ভরসা সৃষ্টি হয় যে, ইনশাআল্লাহ অল্প কিছু দিন পর আমরা ঐ নেয়ামতসমূহে পৌঁছে যাব। তাহলে নেয়ামত থেকে নেয়ামতের আশা বেশি হবে। দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে যাবে যে, অচিরেই আমরা জান্নাতী নেয়ামত পেয়ে যাব। আর মুমিনদের জন্য খেয়ালশক্তিকে রহিত করা হবে না। তাদের খেয়ালশক্তি স্বাধীন থাকবে। তারা তা দ্বারা স্বাদ হাসিল করবে।

অতএব নড়াচড়া ও খাওয়া-দাওয়া এই দুই কষ্টিপাথর দ্বারা নিরীক্ষণ করলে প্রমাণিত হয়, হায়াত তিন প্রকার। সবচেয়ে শক্তিশালী হায়াত নবীদের জন্য। মধ্যম হায়াত শহীদদের জন্য। সর্বনিম্ন হায়াত সাধারণ মুমিনদের জন্য। যে যে স্তরের হায়াত পাবে, তার জন্য সেই স্তরের প্রভাবও রয়েছে। দুনিয়াতেও তার প্রভাব পড়বে।

নবী-রাসূলদের হায়াত এত পরিপূর্ণ ও শক্তিশালী যে, দুনিয়াতে তার প্রভাব এমনভাবে পড়ে যে, তাঁরা দুনিয়া হতে চলে গেলও তাঁদের স্ত্রীগণ বিধবা হন না। তারা অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারেন না। আর তাদের ইন্তেকাল হওয়ার পরও তাদের সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে বন্টন হয় না। কারণ, জীবিতদের মালে মিরাসী বন্টন হয় না। তাই তাঁদের মাল উত্তরাধিকারসূত্রে বন্টন হয় না এবং তাঁদের স্ত্রীগণও অন্যত্র বিবাহ করতে পারেন না। আর শহীদদের বেলায় এমন হুকুম নেই যে, তাদের স্ত্রী বিবাহ করতে পারবে না, তাদের মাল বন্টন হবে না। তা সবই হবে; কিন্তু তাদের দেহকে এমন কিছু শক্তি প্রদান করা হয় যে, দুনিয়াতে তাদের কিছু দেহাংশ সংরক্ষিত থাকে, যদিও তা সুস্পষ্ট নস বা দলিল দ্বারা প্রমাণিত নেই। তবে অভিজ্ঞতা দ্বারা এতটুকু প্রমাণিত যে, সালেহীনদের দেহও সংরক্ষিত থাকে। তাদের দেহে অনেক কম পরিবর্তন হয়। অনেকের পরিবর্তন হয়ই না। আর সাধারণ মুমিনদের জন্য দুনিয়াতে কোনো প্রকার প্রভাব নেই। তাদের দেহ গলে মাটি হয়ে যাবে।

অতএব, যে যে স্তরের হায়াত আলমে বরযখে পাবে। সেই স্তরের প্রভাবও দুনিয়াতে পাওয়া যাবে। এ কারণে দুনিয়ার মাপকাঠিতে দেখলেও পার্থক্য দেখা যাবে। নবীদের হায়াতই বেশি শক্তিশালী হবে। আর আলমে বরযখের কষ্টিপাথরে দেখলেও হায়াতে ভিন্নতা দেখা যাবে। সেখানেও নবীদের হায়াত সবচেয়ে শক্তিশালী।

এতে বোঝা গেল, সাধারণ লোকদের জন্য আলমে বরযখে কোনো হায়াত নেই। আর দুনিয়াতে নবীদের হায়াত সাধারণ মানুষদের মতো ছিল না। এখানে হায়াতের প্রকার বা ধরন ভিন্ন।

নবীজন্মের বৈশিষ্ট্য

সাধারণত সবার জন্ম এভাবে হয় যে, বাচ্চা মায়ের পেট হতে ক্রন্দনরত অবস্থায় এবং উপুড় হয়ে বের হয়। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জন্ম এমনভাবে হয়েছে যে, তাঁর চেহারা মোবারক আকাশমুখী ছিল এবং শাহাদাত আঙ্গুল উপরের দিকে উঠানো ছিল। কেমন যেন তিনি আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের ঘোষণা প্রদান করে দুনিয়াতে আগমন করেছেন। কোনো প্রকার ব্যথা অনুভব হয়নি। পূর্ণ নয় মাস পর্যন্ত মায়ের পেটে ছিলেন। কিন্তু কোনো ভার-বোঝা অনুভব হয়নি। বরং হালকা-পাতলা মনে হত। জন্মের সময় পূর্ণ নূর ও বরকত প্রকাশ পেয়েছে। জন্মের প্রাক্কালে এমন নূর উদ্ভাসিত হয়েছে যে, হযরত আমিনা রা. বলেন, আমি ঐ আলোতে রাজপ্রাসাদ দেখতে পেলাম। সাধারণত এভাবে কারো জন্ম হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও জন্ম হয়েছে, মানুষেরও জন্ম হয়। কিন্তু তাঁর জন্মও সাধারণ মানুষের জন্মের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

শিশুকালের স্বাতন্ত্র্য শান

সাধারণ বাচ্চাদেরও শিশুকাল অতিবাহিত হয়, নবী-রাসূলদের হয় এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও হয়েছিল। কিন্তু তাঁর শিশুকালেরও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও শান রয়েছে, যা অন্যান্য শিশুদের ভাগ্যে জোটেনি। কখনো বক্ষ বিদারণ হয়েছে, অন্তর ধুয়ে পরিষ্কার করে নূর ও ঈমান ভরে দিয়েছেন। কখনো বরকতের নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। কখনো দুধমাতা হযরত হালিমার উষ্ট্রী যা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও শিশু নবীর আরোহণের ফলে এত দ্রুত দৌড়াতে ছিল যে, অনেক তেজস্বী ঘোড়াকে পিছনে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। দুর্ভিক্ষ ছিল: কিন্তু যখন দুধ পান করানোর জন্য শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে গেল, তখন সেই বৎসর এত পরিমাণ ফল উৎপন্ন হলো, যা ইতোপূর্বে কখনো উৎপন্ন হয়নি। এমন বরকত প্রকাশ পেল, যা সাধারণ শিশুদের বেলায় হয় না।

হায়াতে বরযখের বৈশিষ্ট্য

তেমনিভাবে নবীজির যৌবনকাল। এমন যৌবনকাল অন্যদেরও এসেছে, কিন্তু নবীজির যৌবন ও তাদের যৌবনের মধ্যে আকাশ-পাতাল হতেও বেশি পার্থক্য। অর্থাৎ তাঁর প্রভাব ও বরকতসমূহ অন্যদের চেয়ে ভিন্ন ও আলাদা। তেমনিভাবে ইন্দ্রিয়শক্তির প্রতি নজর দিলেও দেখা যায়, যা আমি ইতঃপূর্বে বর্ণনা করে

এসেছি যে, নবীজির দৃষ্টিশক্তি ছিল এমন শক্তিশালী যে, তিনি সামনে-পিছনে সমানভাবে দেখতেন। আমাদের স্পর্শ, ইন্দ্রিয় ও হাতের শক্তি স্রেফ শক্ত ও নরম অনুভব করতে পারে। আর নবীজির হাতের শক্তি অদৃশ্যতা ও সিনা খুলে যাওয়ার কাইফিয়াত বা অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।

আমাদের জিহ্বা জন্মগত জিহ্বা। কিছু আস্বাদন করলে শুধু টক, মিষ্টি ও ঝাল অনুভব করতে পারে। আর নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিহ্বা মোবারক এগুলোর পাশাপাশি হালাল-হারামও জেনে নিতে পারে। সুতরাং সাদৃশ্যের পাশাপাশি অনেক বৈশিষ্টও রয়েছে, যেগুলোর উপর অন্যান্যদের তুলনা চলে না। তেমনিভাবে আলমে বরযখেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হায়াত অত্যন্ত শক্তিশালী এবং পরিপূর্ণ যে, দুনিয়ার হায়াত হতেও অধিক শক্তিশালী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার কায়ফিয়ত বা অবস্থা বর্ণনা করতে পারব না। হাদিস শরীফের ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারা যতটুকু বলা যায়, তা বলে দিয়েছি। এখন একথা জানতে চাওয়া যে, তার প্রকারভেদ ও ধরন কেমন এ বিষয়টি আমার শক্তির বাইরে। এটিই সারকথা।

হায়াতের প্রকারভেদ বা ধরন

হায়াতুন্নবী তথা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু হায়াতের প্রকারভেদ নিয়ে মানুষ দুভাগে বিভক্ত। কতক আলেম বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওফাতের পর পুনরায় হায়াত প্রদান করা হয়েছে। আর তা এমনই দেওয়া হয়েছে, যা দুনিয়াতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা ওফাত ও রূহ কবজ করার পর দেওয়া হয়েছে। আর তা এভাবে যে, প্রত্যেক মানুষকে ওফাত দেওয়া হয় এবং রূহ কব্জ করা হয়। তেমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওফাত দেওয়া হয়েছে এবং রূহ কবজ করা হয়েছে। এখন যখন কবর মোবারকে পৌঁছলেন, তখন কবরে সাধারণ মুমিনদের শান হলো তাদের পুনরায় জীবিত করা হয়। নবীদেরও জীবিত করা হয়। তো সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা এমন হয় যে, তাদের জিন্দা করে আবার ওফাত দেওয়া হয়। তারপর পুণর্বার কেয়ামত দিবসে জীবিত করবেন। আর নবীদের ওফাত দেওয়া হয় না। তাঁরা তা থেকে মুক্ত। তারা যখন কবরে জিন্দা হবেন, তখন কেয়ামত পর্যন্ত এমনকি অনন্ত-অসীমকাল পর্যন্ত জিন্দা থাকবেন। তারপর আর ওফাত আসবে না। তাই হযরত ছিদ্দীকে আকবর রা. বলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর দুবার মৃত্যু আসা থেকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং আপনার জন্য একই মৃত্যু, যা

এসেছে। তারপর যে জীবন আসবে, তা অনন্ত জেন্দেগী হবে। তারপর আর মৃত্যু হবে না।

আর সাধারণ মুমিনদের উপর দুবার মৃতু আসবে। একবার দুনিয়াতে, যাকে আমরা মউত বলে থাকি। অপরটি আলমে বরযখে জীবিত করার পর আবার মউত দেওয়া হবে আর বলা হবে–

نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ

এমনভাবে ঘুমাও যেমনভাবে নবদুলহানরা ঘুমায়।

একদল তো বলে, নবীগণ জীবিত দুনিয়ার জীবনের মতো। কিন্তু মউত তার মাঝে ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু পরে যে হায়াত আসবে, তাও দুনিয়ার হায়াতের মতো কিন্তু তা আবাদী হবে। আর আরেক জামাত বলেন, মাঝখানে মউতের মাধ্যম এসেছে। কিন্তু তা দ্বারা রুহ একেবারে রহিত করা হয়নি। অর্থাৎ মৃতু হয়েছে। কেননা, মৃতু তো অকাট্য জিনিস; তা তো হবেই। কুরআনুল কারীমও সাক্ষ দিয়েছে–

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ

সুতরাং মউত হয়েছে। কিন্তু মউত হওয়া এক বিষয় আর হায়াত রহিত হওয়া আরেক বিষয়। মৃতু হয়েছে এবং হায়াত একেবারে রহিত হয়নি এটি সম্ভব। কারণ, মউত অস্থায়ীভাবে হয়েছে আর হায়াত নবীদের মূলের ভিতর ঢেলে দেওয়া হয়। তাই তা একেবারে রহিত হয় না। তবে মৃতু হয়। তার উদাহরণ এরূপ যে, পানি পানি হিসেবে তার জাতের মধ্যে ঠাণ্ডা রয়েছে। তা দ্বারা আগুন নিভানো যায়। কিন্তু পানিতে অস্থায়ীভাবে গরম আসতে পারে। যদি আপনি তা আগুনের উপর তাপ দেন, তাহলে তা এত গরম হবে যে, যেকাজ আগুন করতে পারে, সেই কাজ পানি করতে পারবে। কিন্তু পানিকে গরম অবস্থায়ও আগুনে ঠেলে দিলে আগুন নিভে যাবে।

এতে প্রমাণিত হলো, পানির সত্তাগত ঠাণ্ডা গরম হওয়া সত্ত্বেও এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। যদি সর্বোচ্চ গরম হয়ে পানি হতে তার জাতিগত ঠাণ্ডা রহিত হয়ে যেত, তাহলে আগুন নিভাতে পারত না। কিন্তু টগবগে গরম পানিও আগুনকে নিভিয়ে দিল। এতে বোঝা যায়, ঠাণ্ডার মাদ্দা বিদ্যমান রয়েছে। যা তার আসল মূল ধাতুতে কায়েম ছিল, তা এখনও বের হয়নি। যদিও তাতে গরমতা বিদ্যমান। তদ্রূপ নবীদের জওহারে হায়াত রাখা হয়। মৃতু যখন প্রকাশ হয়, তখন সম্পূর্ণরূপে হায়াত রহিত হয় না। মউত তো থাকে, হায়াতও থাকে,

উভয়টাই একসাথে বিদ্যমান থাকে। যেমন গরম পানিতে গরমও আছে, ঠাণ্ডাও আছে। উভয়টা রয়েছে একসাথে। একটা স্থায়ীভাবে আছে, আরেকটি অস্থায়ীভাবে আছে।

মোটকথা, একদল আলেমের অভিমত হলো মউত হলেও হায়াত সম্পূর্ণরূপে রহিত হয় না; বরং হায়াত বিদ্যমান থাকে। তার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। কেননা, হায়াত হলো আসল ও স্থালী আর মউত স্রেফ অস্থায়ীভাবে এসেছে। কিন্তু উভয় দল এ বিষয়ে একমত যে, আলমে বরযখে নবীগণ জীবিত যেমনভাবে দুনিয়াতে জীবিত থাকতেন। তবে একদল বলে, তাঁরা সর্বদা জীবিত আর অপর দল বলে হায়াত কর্তন হয়ে পুনরায় আবার সৃষ্টি হয়। তাদের উভয় দলের শেষ কথা এক যে, তাঁদের হায়াত দুনিয়ার হায়াতের মতো।

নিরাপদ মত

এই মতভেদ উলামায়ে কেরামদের মতভেদ। এ সম্পর্কে আমার কোনো কথা নেই। আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমরা এ কথা বলব এবং বিশ্বাস করব, বরযখে নবীগণ এমনভাবে জীবিত, যেমনভাবে আমরা দুনিয়াতে জীবিত। এখন কথা হলো, এই হায়াত নতুন করে এসেছে, না তা পূর্ব থেকেই চলে আসছে। এ বিষয়টি আলেমদের উপর ছেড়ে দিতে হবে। তাদের অভিমত, তাদের যুক্তি, তাদের দলিল, ইঙ্গিত-ইশারা ইত্যাদি না আমরা খণ্ডণ করতে পারব, না বিরোধিতা করতে পারব। আমরা তাদের মত মেনে নিব। ব্যস আমরা তাদের কথার সাথে এতটুকু একমত হয়ে যাব যে, নবী-রাসূলগণ জীবিত। কিভাবে জীবিত তার কায়ফিয়াত আমাদের জানা নেই। যে উলামায়ে কেরাম এ কথা বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর মৃত্যু একবারই এসেছে এবং তারপর যে হায়াত বা জীবন এসেছে, তা আজীবনের জন্য যেমনটি হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রা.-এর. অভিমত হতে দলিল নেয়া যায়। তারা বলেন, এটি নবীগণের বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মুসলমানদের এমন হয় না। তাদের উপর দুবার মৃত্যু আসে।

প্রথম মৃতু, যাকে আমরা সংক্ষেপে ইন্তেকাল বলি। দ্বিতীয় মৃতু হলো যা কবরে সাওয়াল-জাওয়াবে বলা হবে–

ثُمَّ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ

তোমরা মৃত ছিল। তারপর তোমাদের জীবিত করলাম। এখানে মৃত্যু অর্থ হায়াতকে পরিপূর্ণ রহিত করা নয় বরং বিদ্যমান না থাকা। অর্থাৎ তোমরা

বিদ্যমান ছিলে না। সর্বসাধারণের নিকট মৃত্যু বলে হায়াত ছিনিয়ে নেওয়াকে অথবা হায়াতের মধ্যে কম করাকে।

এতে সুস্পষ্ট হয়ে গেল, প্রাথমিক মউতের অর্থ হায়াত না থাকা। তাকেই আমরা মউত বলি। আর কুরআনুল কারীম যাকে মউত বলেছে, তার অর্থ এই নয় যে, হায়াতকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। বরং তার অর্থ হলো, তখনো পর্যন্ত হায়াত দেওয়া হয়নি। অতএব-

رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ

উক্ত আয়াত দ্বারা দুই মউত উদ্দেশ্য। একটি দুনিয়াতে অপরটি করবে জিন্দা করার পর।

বরযখ উন্মুক্ত হওয়া

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. আনফাসুল আরেফীন নামক কিতাবে স্বীয় সম্মানিত পিতা হযরত শাহ আব্দুর রহীম সাহেব রহ.-এর খাদেম– যার নাম ছিল আশিক– সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি ঐ আশিক, যিনি হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ লেখার প্রেরণা দানকারী ছিলেন। আনফাসুল আরেফীন কিতাবে একটি ঘটনা লেখা রয়েছে, যা হযরত শাহ আ. রহীম রহ. লিখেছেন যে, আমি কোনো এক জঙ্গলে গেলাম। সেখানে দেখতে পেলাম, কিছু ঘোড়সাওয়ার, যারা মূল্যবান কাপড় পরিহিত তাদের ঘোড়াগুলোও শানদার। তারা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তারা প্রত্যেকের মধ্যে এমন কিছু আকৃতি রয়েছে, যেমন গোয়েন্দাদের থাকে এবং তাঁরা কিছু একটা তালাশ করে ফিরছে মনে হলো। আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের একজন বলল, তুমি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এদিকে তাশরিফ রাখতে দেখেছ?

আমি আরজ করলাম, আপনি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আমার নাম আবু হুরায়রা। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করছি। তিনি বলেছিলেন, আমি আশিকের কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের জন্য যাচ্ছি। আমরা তাঁর খোঁজে বের হয়েছি। এ কথা বলে ঐ আরোহী অদৃশ্য হয়ে গেল।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. উক্ত ঘটনাকে স্বীয় পিতার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন। হতে পারে, এটি আলমে বরযখে সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু কখনো-কখনো আলমে বরযখ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ফলে তার আকৃতি আমরা দুনিয়াতে

বসে দেখতে পারি। তবে এমন হয়নি যে, তারা বরযখ থেকে নেমে দুনিয়াতে এসেছেন। বরং আমাদের দৃষ্টিশক্তি সে পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং ওখানকার অবস্থা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

সিজ্জিন উন্মুক্ত হওয়া

হযরত হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম রহ. স্বীয় কিতাব কিতাবুর রূহ-এর মধ্যে এমন অনেক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। একস্থানে তিনি লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. উটে চড়ে সফর করছিলেন। যখন বদর প্রান্তরের ঐ স্থানের নিকট পৌঁছেন, যেখানে নিহত কাফিরদের লাশ ফেলে দেওয়া হয়েছিল– সময়টি ছিল মাগরিবের পূর্বক্ষণ– তখন তিনি দেখতে পেলেন, বদর প্রান্তরের কূপ হতে একজন বিশ্রী ও কালো চেহারাধারী ভয়ংকর রূপ ধারণ করে বের হয়ে এসেছে। লোকটি হযরত ইবনে ওমরের দিকে দৌড়াচ্ছে আর বলছে–

يَا عَبْدَ اللهِ اِسْقِنِيْ

আব্দুল্লাহ! আমাকে পানি দাও।

সে এই কথা বলছিল। এমন সময় কূপের ভিতর হতে একটা জিঞ্জির বের হলো এবং তার পাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে নিচের দিকে টেনে নিয়ে গেল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. উক্ত ঘটনা দেখে বেহুশ হয়ে যান এবং উটের গলায় হাত দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ঝুলে পড়েন। উষ্ট্রী দৌড়তে-দৌড়াতে তাকে নিয়ে মদীনায় পৌঁছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর হুশ ফিরে আসার পর ঘটনা শোনালেন। তখন খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান রা. অর্ডার জারি করলেন, আজ থেকে কেউ রাতের বেলা একা সফর করতে পারবে না। বিশেষ করে কোনো সঙ্গী-সাথী না থাকলে এমন ঘটনা প্রকাশ হয়। এতে এটি উদ্দেশ্য নয় যে, তারা সিজ্জিন হতে বের হয়ে দুনিয়াতে এসে পড়েছে। কিন্তু সিজ্জিন উন্মুক্ত ও খুলে গেছে। আর ইবনে ওমর রা. এ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, যা সীজ্জিনে হচ্ছে। সারকথা, এমন অনেক ঘটনা হযরত ইবনে কাইয়্যেম রহ. বর্ণনা করেছেন হাদিসের নমুনায়।

আলমে মানাম বা স্বপ্নের জগৎ

তেমনিভাবে অনেক স্বপ্নের কথাও বর্ণিত হয়েছে। যেমন- হযরত ইবনে আবিদ্দুনিয়া রহ. যিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন তার স্বপ্নের কাহিনী বর্ণিত

হয়েছে। এক আরেফ বিল্লাহ একব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনিও একজন আরেফ বিল্লাহ ছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার উপর কী অতিবাহিত হচ্ছে? এবং আপনার সাথে কেমন আচরণ করা হচ্ছে? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীবাসীদের উত্তম প্রতিদান দেন। তারা আজর ও সাওয়াবের স্তূপ আমাদের জন্য পাঠাচ্ছে, যা আমাদের নিকট পাহাড় সমতুল্য। তারপর তিনি বলেন, আমাদের নিয়মমাফিক কাজ হলো, আমরা প্রতি সপ্তাহে একদিন হযরত ইবনে আবিদ্দুনিয়া রহ.-এর মজলিসে উপস্থিত হই। আর ওখানে পৌঁছে দুনিয়াবাসী আমাদের জন্য যা পাঠায়, তার তোহফা গ্রহণ করি। মোটকথা, কিছু স্বপ্ন এবং কিছু হাদিসতুল্য ঘটনা তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে।

মাইয়েতের মাকাম উন্মুক্ত হওয়া

একবার আমার ফার্সী কিতাবের ওস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব রহ.-এর নিকট হতে নিজ কর্ণে শ্রবণ করলাম। তিনি আপনাদের পাকিস্তানের মুফতিয়ে আযম মাওলানা মুহাম্মাদ শফী সাহেব রহ.-এর পিতা ছিলেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের ফার্সী বিভাগের ওস্তাদ ছিলেন। তিনি ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমারও ওস্তাদ ছিলেন। তিনি একটা ঘটনা শোনালেন। সেই ঘটনার সার-সংক্ষেপ এমন ছিল যে, মাওলানা সায়্যিদ আহমাদ দেহলভী রহ. নামে দারুল উলুমের একজন ওস্তাদ ছিলেন। তিনি খুব জায়্যিদ আলেম ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হত, তিনি যুক্তিবিদ্যার ইমাম ছিলেন। তিনি অনেক মেধার অধিকারী ছিলেন।

তিনি এক সময় ছয় মাস পর্যন্ত দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তার এক সাহেবজাদা ছিল। তার নাম ছিল মৌলভী মোস্তফা রহ.। তিনি আমাদের সম্মানিত ওস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব রহ.-এর ছাত্র ভাই ছিলেন। তারা একই সাথে লেখাপড়া করেছেন। তিনি বলেন, মৌলভী মোস্তফা সাহেব আমার নিকট নিজের দেখা ঘটনা বর্ণনা করেছেন আর মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব রহ. আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বর্ণনাকারী আমার মাঝে ও আমার উস্তাদের মধ্যে স্বয়ং ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী।

মাওলানা ইয়াসিন সাহেব রহ. বলেন, মৌলভী মোস্তফা সাহেব যখন নিজ মাতৃভূমি দিল্লীতে পৌঁছেন, তখন যমুনা নদীতে বন্যার পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন যমুনা পাড়ের অনেক গোরস্তান ভেঙ্গে ভেসে যায়। তন্মধ্য হতে একটি কবর ভেঙ্গে যাওয়ার পর তার লাশ প্রকাশ পায়। পানি চলে যাওয়ার পর লাশ

রয়ে যায়। মৌলভী মোস্তফা সাহেবের বর্ণনা এমন যে, লাশের আশপাশে অনেক ধোপা যারা নদীতে কাপড় ধৌত করতে এসেছিল তারা দল ভেদে একত্রিত হলো। আর যখন সব স্থানে ঘটনা রটে গেল, তখন শহর হতেও মানুষ দেখতে এল। লাশের সুরতহাল তিনি এরকম দেখেছেন যে, ঐ লাশের কপালে একটা অচীন পোকা বসে আছে আর সেটি অল্পক্ষণ পর পর তাকে ছোবল মারছে। যখন ছোবল মারত, তখন লাশটা কেঁপে উঠত এবং দেহের রং পাল্টে যেত। তারপর কয়েক মিনিট পর আবার আসল হালতে ফিরে আসার পর আবার ছোবল মারত। তো আবার তার লাশ বিবর্ণ হয়ে যেত এবং কেঁপে উঠত।

লোকেরা এ তামাশা দেখছিল। তাদের মধ্যে এক ধোপা ঐ লাশের প্রতি দয়া দেখাতে গিয়ে একটা পাথর নিয়ে ঐ পোকাটার উপর নিক্ষেপ করল। পাথর পোকার গায়ে না লেগে তার পার্শ্বে গিয়ে লাগল। তখন পোকাটা আকস্মাৎ লোকটির কপালে বসে তাকে ছোবল মারল। তারপর পুনরায় লাশের কপালে গিয়ে বসল।

মৌলভী মোস্তফা সাহেব বলেন, ধোপা চিৎকার দিল এবং বলল, কিছু আশ্চর্যজনক আগুন আমার ভিতর জ্বলছে, আমি বলতে পারছি না। আমাকে কি সাপে কেটেছে, না বিচ্ছু ছোবল দিয়েছে, না ভিতরে কোনো আগুন জ্বলছে আমি কিছুই বলতে পারছি না। তবে এতটুকু বলতে পারব যে, আমার দেহের সকল রগে-রগে হাজারো বিচ্ছু বসে আছে। তারা ছোবল মারছে। তারপর তার হাত-পা ইত্যাদি বাধা হলো। তখনও মানুষের জমায়েত রয়ে গেছে। মৌলভী মোস্তফা বলেন, আমার মাথায় এক ধরনের বুদ্ধি এল। আমি বুঝতে পারলাম, এটি দুনিয়ার কোনো পোকা নয় বরং আল্লাহর পক্ষ হতে এই মৃত ব্যক্তির জন্য আযাব। তাই আমি তাকে পাথর মেরে তাড়ানোর চিন্তা না করে তার পাশে বসে সূরা ইয়াসিন পাঠ করা শুরু করলাম এবং আরো কিছু সূরা যা আমার মুখস্থ ছিল সেগুলো পাঠ করলাম। আমি পাঠ করছিলাম আর ঐ পোকাটা ধীরে-ধীরে শান্ত হচ্ছিল। এভাবে আমি প্রায় আধা ঘন্টা পর্যন্ত পড়লাম আর ঐ পোকাটা নিঃশেষ হযে ছাইয়ের মত পড়ে রইল। তারপর আমি সেই লাশকে পুনরায় দাফন করে দিলাম। আর ঐ ধোপা দু-তিন দিন জীবিত ছিল। সে বলত, আমি আমার কষ্ট, ব্যথা ও অস্থিরতার ধরন ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না।

এ ধরনের ঘটনার সম্পর্ক আলমে বরযখের সাথে। তবে দুনিয়াতে বরযখ চলে আসে না। আবার মৃত ব্যক্তিও নিজের স্থান ছেড়ে চলে আসে না। সে তার জন্য নির্ধারিত স্থানেই থাকে। কিন্তু কখনো-কখনো আল্লাহ তায়ালা আলমে বরযখের বস্তু উন্মুক্ত করে দেন। ফলে মানুষ তা চোখে দেখতে পারে। সুতরাং আলমে

বরযখের জিনিস এমনভাবে দেখা যায়, যেমনভাবে আমরা স্বপ্নযোগে অন্যান্য জগতের বস্তু দেখতে পারি।

যেমন– আলমে মিসাল (দুনিয়ার নমুনা দুনিয়া) স্বপ্নে পৃথিবীতে চলে আসে না। কিন্তু পৃথিবীবাসী কতক সময় ঘুমিয়ে স্বপ্নযোগে আলমে মিসালে চলে যায় এবং ওখানকার বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা দেখতে পারে। এ কারণে বলা হয়েছে–

اَلنَّوْمُ اَخُ الْمَوْتِ

ঘুম মউতের ভাই।

অর্থাৎ যে অবস্থা মৃত্যুতে প্রকাশ পায়, সেগুলো ঘুমে জাহির হয়। শুধু সবল ও দুর্বল, স্থায়ী ও অস্থায়ীর পার্থক্য রয়েছে। অতএব ঘুমন্ত ব্যক্তি যখন স্বপ্ন দেখে, আমি কোনো কঠিন আযাবে লিপ্ত আর মানুষর আমাকে মারছে, তখন কখনো সে চিৎকার করতে থাকে। তখন চিৎকার অবস্থায় কখনো তার আওয়াজ জাগ্রত লোকেরা শুনতে পায়। তখন বলে থাকে, কী হলো? সে উত্তরে বলে, ভাই আমি ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেছি। সুতরাং আমরা পাশে বসেও জানতে পারি না, সে কোথায় গিয়েছিল। অথচ সে আলমে মিসালে গিয়েছিল এবং সেখানে কষ্ট করেছে ও এত চিৎকার করছে যে, পৃথিবীতে তার আওয়াজ চলে এসেছে। ফলে দুনিয়াবাসীরা তার আওয়াজ শুনেছে। এ কারণেই বরযখের কিছু আওয়াজ সেখান থেকে শুরু হয়। কিন্তু আমাদের কান পর্যন্ত এসে শেষ হয়। অতএব, যখন জাগ্রত অবস্থা এমনটি হতে পারে, তাহলে নসিহত গ্রহণার্থে স্বপ্নওয়ালা ব্যক্তি অন্য জগতে পৌঁছতে পারে এবং ওখানকার বস্তু দেখতে পারে, শুনতে পারে। তেমনিভাবে তাও সম্ভব যে, কোনো মাইয়েত নিজ স্থানে থাকে এবং তার আযাব বা সাওয়াব কখনো প্রত্যক্ষ করনেওয়ালারা প্রত্যক্ষ করতে পারে। চাই স্বপ্নের মাধ্যমে হোক, চাই কাশফের মাধ্যমে হোক উভয় অবস্থায় সম্ভব। সুতরাং কেউ যেন এমন না বোঝে যে, আলমে বরযখ হতে কারো রূহ স্থানান্তর হয়ে চলে এসেছে। অথবা কেউ নিজেই চলে এসেছে। তা হতে পারে না। মাইয়েত তার নির্ধারিত স্থানেই রয়েছে। তবে তার মাকাম এখানে উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

একাধিক আসমান ও জমিন

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ

আল্লাহ তায়ালা সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং সেই পরিমাণ জমিনও সৃষ্টি করেছেন। [সূরা আত ত্বালাক ১২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর আছারে রয়েছে, তিনি বলেন, প্রত্যেক জমিনে আবাদী রয়েছে এবং নবীরাও এসেছেন। এখন কথা হলো, ওখানে কি এই চাঁদ, এই সূর্যই আলো প্রদান করে, নাকি তাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক চাঁদ-সুরুজ রয়েছে। এ বিষয়টি আল্লাহ্ তায়ালাই ভাল জানেন। যখন আপনারা দুনিয়ার অনেক অঞ্চল সম্পর্কে জানেন না যে, সেখানে এই সূর্যের আলো পৌঁছে কি-না। যদি আপনি উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্তী জনবসতিগুলোর প্রতি লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানে ছয়-ছয় মাস এবং নয়-নয় মাস রাত থাকে। সূর্য উদিত হয় না। ওখানকার লোকেরা অন্ধকারে বসবাস করে। এখন কথা হলো, তখন তারা কি বাতি জ্বালায়, না অন্য কোনো উপায় গ্রহণ করে। যা কিছুই করে ঐ ভূখণ্ড এমন স্থানে, যেখানে এই সুর্যের আলো পৌঁছে না অথবা পৌঁছে; কিন্তু কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর। অতএব, যে সূর্য পৃথিবী নামক ভূখণ্ডের সকল স্থানে আলো পৌঁছাতে পারে না, তার সম্পর্কে কিভাবে বলেন যে, এই সূর্য সাত জমিনে আলো পৌঁছাবে। এই সূর্যই আলো পৌঁছাবে এটি কোনো জরুরি বিষয় নয়। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন যে, ঐ জমিনগুলোতে অন্য সূর্য রয়েছে হয়তো।

মাইয়েতের জ্ঞান ও বোধশক্তি

মুসনাদে আবি হানিফা নামক গ্রন্থে স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা রহ. যেখানে কবর যিয়ারতের আদব লিখেছেন, সেখানে তিনি লিখেছেন, কবর এভাবে যিয়ারত করবে যে, কিবলার দিকে পিঠ দেবে এবং মাইয়েতের কবরের দিকে চেহারা ফিরাবে। কারণ, মৃত ব্যক্তি যিয়ারতকারীকে দেখে এবং স্তর বাই স্তর হিসেবে তারা সেখানে পরিচিত হয়। যদি সে দুনিয়াতে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হয়, তাহলে সেখানে ব্যক্তিগতভাবে চিনবে। আর যদি আমভাবে পরিচিত হয়, তাহলে আমভাবে চিনবে। যেখানে সামনাসামনি হয়, সেখানে মৃত ব্যক্তি দেখে। ফেরেশতাদের মাধ্যমে রূহকে মুতাওয়াজ্জুহ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ যেমন আপনি জেগে আছেন। চোখ খোলা অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু ধ্যান অন্য দিকে; তাহলে চোখ খোলা থাকাবস্থায়ও আপনি কিছুই দেখবেন না। কখনো আমরা বাজারে যাই, চোখ তো খোলাই আছে, পাশে বিশাল তামাশা হচ্ছে। যখন ঘরে ফিরে আসি, তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করে, কেমন তামাশা দেখলেন? তখন বলে থাকি, কেমন তামাশা? যে তামাশা বাজারে হয়েছে। তখন আমরা বলে থাকি, আমি তো তামাশা দেখিনি। লোকেরা বলে, মিয়া! তুমি তো চোখ বন্ধ করে

বাজারে যাওনি। তখন বলেন, আল্লাহর কসম আমার তো খেয়াল নেই, খবর নেই। আমার খেয়াল তখন অন্য দিকে ছিল।

এতে প্রমাণিত হলো, দেখনেওয়ালা বস্তুটি চোখ নয়; বরং ধ্যান ও খেয়াল। যদি ধ্যান-মন অন্যদিকে থাকে আর চোখ খোলা থাকে, তাহলে কখনো দেখতে পারবেন না। তবে ধ্যান-মন মুতাওয়াজ্জুহ হলে চোখ দেখার কাজ করবে। আর আপনি যদি অমনোযোগী হন, তাহলে চোখ -কান খোলা থাকলেও আওয়াজ আপনার কর্ণকূহরে পৌছবে না। মনোযোগী হলে কর্ণে শব্দ পৌছবে। কতক সময় আযান শুনতে পান না, তখন ধ্যান-খেয়াল অন্যদিকে মনোনিবেশ থাকে আর আপনি তাতে ডুবে থাকেন। তাই আযান হওয়া সত্ত্বেও শুনতে পান না। অতএব ধ্যান ও খেয়ালশক্তিকে ইন্দ্রিয়গুলোর প্রতি ফিরালে সেগুলো কাজ করতে পারে; অন্যথায় পারে না।

সুতরাং হতে পারে, ফেরেশতা দ্বারা মাইয়েতকে তায়াজ্জুহ দেওয়া হয়। তারপর তাদের খেয়াল ও অনুভবশক্তি কাজ করে। অন্যথায় কাজ করতে পারে না। আর এমন অবস্থা তখনই হয়, যখন মৃত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া হবে। সাধারণত কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেই কবরবাসীরা মুতাওয়াজ্জুহ হবে না। সালাম দিতে হবে।

ইল্লিইন ও সিজ্জিনের অবস্থান

ইল্লিইনের সম্পর্কে আপনার মস্তিষ্কে এমন ভৌগোলিক অবস্থান কেন মনে করেন যে, তা সপ্তম আকাশে উপস্থিত। বরং ইল্লিইন ও সিজ্জিন এ জগতেই লুকিয়ে আছে, ঢুকে আছে। যেমনভাবে আমাদের রূহ-আত্মা আমাদের দেহে ডুবে আছে, ঢোকানো আছে। যদি দেহকে পৃথক করা হয় আর রূহ দেখার কোনো যন্ত্র থাকে, তাহলে রূহের কাজ-কর্ম দেহের ভিতরেই দেখা যাবে। তেমনিভাবে ইল্লিইন ও সিজ্জিনের অবস্থান এই পৃথিবীর মূল বুনিয়াদে রূহের জগতের ন্যায় আড়াল হয়ে আছে, গোপন হয়ে আছে। পর্দার আড়াল হয়ে আছে। যদি পর্দাগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সকল সাওয়াব বা আযাব এখানেই দেখা যাবে। উপরে যেতে হবে না।

মোটকথা, এগুলো দৃষ্টিশক্তির বস্তু। তাই দৃষ্টিশক্তি ভৌগোলিক অবস্থান বানিয়ে ফেলে যে, যেহেতু ইল্লিইন ও সিজ্জিন মনে হয় সপ্তম আকাশে হবে। এটি জরুরি নয়। এগুলো দুনিয়াতে ঢুকে আছে, পর্দার পেছনে আড়াল হয়ে আছে। যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এখানেই দেখতে পাবেন।

কাশফের দলিল ও প্রমাণ

কিছু আহলুল্লাহ ও আরেফ বিল্লাহর নিকট কবরের আযাব পরিদৃষ্ট হয়ে যায়। তারা কবরের আযাব দেখতে পান। তাদের অন্তর চোখে কাশফ হয়ে যায়। হযরত শাহ আব্দুল আযিয রহ. লিখেছেন, যখন শাহ আব্দুল কাদির রহ.-এর ওফাত হলো, তিনি এত বেশি মকবুল ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন যে, আমার কাশফ হলো। ঐ দিন তাঁর সম্মানে দিল্লীর সকল কবরের আযাব বন্ধ করে দেওয়া হলো।

এখন কথা হলো, এগুলো কাশফসংক্রান্ত কথা। শরীয়তের কোনো হুজ্জত বা দলিল নয়। আর কাশফকে রদ করার মতো কোনো দলিল তো নেই। বেশির চেয়ে বেশি বলা যেতে পারে, এগুলো শরীয়তের হুজ্জত বা দলিল নয়। তবে কাশফের ওজুদকে অস্বীকার করা যায় না।

সুফিগণ বলেন, কাশফ অন্যের জন্য দলিল হতে পারে না। কিন্তু নিজের জন্য দলিল হতে পারে। যখন মানুষ তা অকাট্যভাবে সরাসরি দেখে। তারা এ কথাও বলেন যে, হুজ্জত বা দলিল হওয়ার অর্থ এমন যে, তারা যদি কাশফের তাকাজা অনুযায়ী আমলনামা করেন, তাহলে পরকালে কোনো প্রকার ক্ষতি হবে না, শাস্তি বা ধরপাকড় হবে না। কারণ, পরকালের লাভ-ক্ষতি, শাস্তি-শাস্তির সম্পর্ক নসের সাথে। তথা শরয়ী বিধানের সাথে। কাশফের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু কাশফ মোতাবেক আমল না করলে দুনিয়াতে অবশ্যই ক্ষতি হবে। কোনো জিনিস বাস্তবে হওয়ার ছিল; তা দেখানো হয়েছে। তখন তার দাবি বা তাকাজা অনুযায়ী আমল না করলে দুনিয়াবি ক্ষতি হবে। তার পরকালে সামান্যতম ক্ষতিও হবে না।

আর ইল্লিইন ও সিজ্জিনের ভৌগোলিক সীমানার আলোচনা ইসলামি শরীয়তের কোনো আলোচ্য বিষয় নয়। তবে আহলুল্লাহ ও কাশফধারী ব্যক্তিগণ এ সম্পর্কে কিছু বলেন ও লিখেন। যদিও তা শরয়ী হুজ্জত বা দলিল নয়। কিন্তু যদি তার বিপরীত কোনো দলিল খাড়া করানো না যায়, তাহলে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

জান্নাত ও জাহান্নামের ভৌগোলিক অবস্থান

শায়েখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী রহ. এ সম্পর্কে এতটুকু লিখেছেন যে, আসমান হতে পৃথিবীর জমিন পর্যন্ত এবং সাত জমিনের নিচ পর্যন্তজাহান্নামের এরিয়া। আর কেয়ামত দিবসে আগুন দ্বারা এই এলাকায় তাপ দেওয়া হবে এবং তাতে

সাপ, বিচ্ছু ও অন্যান্য সকল আযাব থাকবে। আর আসমানের উপর জান্নাতকে রাখা হবে। আসমান হতে জমিন পর্যন্ত এই পাঁচশত বছরের দূরত্বের স্থানে থাকবে আরাফ। সুতরাং কেয়ামত দিবসে উপরে থাকবে জান্নাত এবং নিচে থাকবে জাহান্নাম। বর্তমানে জান্নাতের অবস্থান সপ্তম আকাশে আর জাহান্নামের অবস্থান সপ্তম জমিনে।

সহি মুসলিম শরীফের এক হাদিসে রয়েছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদরাতুল মুনতাহায় তাশরিফ নিলেন, যা হলো মাকাকে জিবরাঈল আর সেটি সপ্তম আকাশে অবস্থিত। অতএব হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো, সিদরাতুল মুনতাহা সপ্তম আকাশে। আর কুরআনুল কারীম ঘোষণা করে–

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ۝

সিদরাতুল মুনতাহার নিকট জান্নাতুল মাওয়া।

সুতরাং উক্ত আয়াত ও হাদিসের বর্ণনা একত্রিত করলে এরূপ ফলাফল বেরিয়ে আসে যে, জান্নাতসমূহের শুরু সপ্তম আকাশে এবং তার উপরে ও নিচে আরো শত স্তর বা তলা রয়েছে। অর্থাৎ জান্নাতসমূহের এলাকা সপ্তম আকাশের ওপরে আর জাহান্নামের এলাকা সপ্তম জমিনের নিচে। আর কিয়ামত দিবসে জাহান্নামকে টেনে উপরে নেওয়া হবে। যেমনটি হাদিস শরীফে এসেছে যে, সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রত্যেকে আলাদা রশ্মি ধরে টানে আর জাহান্নামের সত্তর হাজার রশ্মি বা চেইন থাকবে। তাকে টেনে উপরে উঠানো হবে আর জান্নাতকে কিছুটা নিচে আনা হবে। আর যদি নিচে নামানো না হয়, তাহলে প্রথম আসমানকে ভেঙ্গে ফেলা হবে, যাতে জান্নাতের পূর্ণ অবস্থান দেখা যায়, যা এখন পর্দাসমূহের আড়ালে রয়েছে। অতএব জান্নাত উপরে থাকবে। সবাই দেখতে পাবে। আর জাহান্নাম জমিনের উপরে থাকবে; সবাই দেখতে পাবে।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হাশরের ময়দানে সবার সামনে দুটি বস্তু থাকবে। একটি জাহান্নামের ভয়াবহ ও বিকট আওয়াজ, যা আসতে থাকবে। আর অপরটি প্রত্যেকের নিজ-নিজ আমল, যেগুলোকে দেহ বা অবয়ব দেওয়া হবে। তারা সবাই লাইন করে দাঁড়াবে। এ দুটি বস্তু সকলের সামনে থাকবে। এতে প্রতীয়মান হয়, জাহান্নামকে নিকটে নিয়ে আসা হবে এবং তার আওয়াজকে ভয় দেখানোর জন্য শোনানো হবে।

মোটকথা, কেয়ামত দিবসে কিছুটা পরিবর্তন করা হবে। জাহান্নামকে উপরে নেওয়া হবে আর জান্নাতকে নিচে নেওয়া হবে। অথবা উপরেই থাকবে। তবে মাঝখান থেকে আকাশকে ভেঙ্গে ফেলা হবে, যাতে জান্নাতের পর্দাগুলো খুলে

যায়। এদিকে জাহান্নাম দেখা যায় ওদিকে জান্নাত দেখা যাবে। প্রত্যেকে আপন-আপন ঠিকানা অনুভব করতে থাকবে যে, এটি আমার ঠিকানা। অতএব সেই সময় জমিন ও আসমান আর বাধা হবে না।

বর্তমানে জমিন ও আসমান আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এজন্য কিছুই নজরে পড়ে না। আর এখন যদি দেখা যেত, তাহলে বিশ্বাসের প্রয়োজন থাকত না। কারণ, ঈমান-আকিদা তো বলে, মানুষ গায়েব ও অদৃশ্যকে বুঝবে এবং তার উপর ঈমান আনবে বিশ্বাস স্থাপন করবে।

রূহের অবস্থান মাকাম

জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করার পূর্বে রূহগুলো নিজ-নিজ স্থানে অবস্থান করবে আর জায়গাগুলো হল ইল্লিইন এবং সিজ্জিন। আর শহীদগণকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদেরকে সবুজ পাখির আবরণ বা খোল পরিধান করানো হয়েছে। তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে পুরাপুরি প্রবেশ করবে কিয়ামত দিবসে। এখন তাদেরকে কবর থেকে তাদের ঠিকানা দেখানো হয়। আর জান্নাতের নাজ-নেয়ামত, ফুল-ফল ও সুগন্ধির সুঘ্রাণ সেখান থেকে আসতে থাকে।

জিন্নাতের সাথে বিবাহের বিধান

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া হারানী রহ. 'আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান্ন' নামক একটি গ্রন্থ লিখেছেন। তাতে তিনি জিন্নাতের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি এক স্থানে উল্লেখ করেছেন, দুনিয়ার সর্বত্র জিন্নাত বসবাস করে। কোথাও খালি নেই। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, যারা খারাপ, তাদের খারাপ আচরণের কারণে মানুষর বুঝতে পারে, তারা জিন এবং দুষ্ট আত্মার প্রভাব। আর যারা নেককার, তারা নিজ-নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে। আমরা তাদের অনুভব করতে পারি না; দেখতে পারি না। কিন্তু সব স্থানে আছে। তাদের মধ্যে খারাপ চরিত্রের বেশি হয়– ভাল কম হয়। তাদের ভিতর খারাপের মাদ্দাই প্রবল আর মানুষের ভিতর খারাপের মাদ্দা বেশি নয়; বরং উভয়টা সমান। তাদের মধ্যে খারাপ প্রকৃতির সংখ্যা বেশি। ভালোর সংখ্যা কম।

ফকীহগণ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন যে, জিন্নাতকে বিবাহ করা যাবে কি-না। কতক বলেছেন, জায়েয নেই। কারণ, তারা ভিন্ন জাত। তা এমন যে, কেউ ছাগী ও গাভীকে বিবাহ করল; তাহলে তা সিদ্ধ হবে না। আর কতক

বলেন, যখন তারা মানবরূপী থাকবে, তখন বা জাত পাশাপাশি হওয়ার কারণে বিবাহ জায়েয হবে।

হযরত হাকীমুল ইসলামের সাথে এক জিনের সাক্ষাত

কান্দাহারে আমার সাথে একজন জিনের মোলাকাত হয়েছিল। ওখানকার একজনের উপর জিনের আছর হত। তার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল, যখন তার উপর জিনের আছর হত, তখন তিনি মূর্খ থাকা সত্ত্বেও কুরআন শরীফের বিভিন্ন রুকু তেলাওয়াত করতেন এবং অনেক ইলমি মাসয়ালা বর্ণনা করতেন। আর যখন আছর থাকত না, তখন পূর্বের ন্যায় মূর্খ হয়ে যেতেন। তার থেকে কিছুই বের হতো না। কোনো মাসয়ালা বলতে পারতেন না।

আমি একবার সেখানে গিয়েছিলাম। আমি ফজর নামায বাদ বসে আছি। এমন সময় লোকেরা বলল, হুজুর ঐ জিনে সাক্ষাত করতে চায়। আমি বললাম, আমার সাথে জিনের কী প্রয়োজন? আমার উপরও আছর করবে নাকি? সে যদি সাক্ষাত করতে চায়, তাহলে নিয়ে আস। তখন ঐ ব্যক্তি এল। তার কিছু কাজ কারবার এমন ছিল, যা সাধারণত হুশসম্পন্ন মানুষের হয় না। যেমন বেহুশ ও মাতাল মানুষের ন্যায়। যখন সে বসল, তখন তার চক্ষুদ্বয় এত উপরে ওঠে গেল যে, চোখের মণি দেখা যাচ্ছিল না। এত উপরে ওঠেছিল যে, শুধু সাদা অংশ নজরে পড়ছিল। তার চোখ দেখে ভয়-ভয় লাগছিল। আর তার শ্বাস কমছিল আবার বাড়ছিল। এ অবস্থায় সে বেহুশ হয়ে পড়ে গেল।

একটু পর সে ওঠে বসল। তখন তার শ্বাস স্বাভাবিক ছিল না। চোখ ছিল উপরে উঠানো। কিন্তু তখন কিছু বলতে শুরু করল। তার আওয়াজে এক প্রকার আতঙ্ক ভাব ছিল। সে আমাকে সালাম দিল। আমি তার সালামের উত্তর দিলাম। তারপর সে আমার সাথে মুয়ানাকা করতে চাইল। আমি বললাম, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! আমি জিনের সাথে কি মুয়ানাকা করব? কিন্তু কিছু ইচ্ছায় ও কিছু অনিচ্ছায় মুয়ানাকা করলাম। এতে কোনো প্রভাব পড়ল না। তারপর সে বসে গেল। আমি বললাম, আপনার নাম কী? সে মনে হয় আব্বাস বা এজাতীয় কোনো নাম বলেছে। আমি বললাম, আপনি থাকেন কোথায়? সে বলল, বোম্বের নিকটবর্তী একটা দ্বীপ রয়েছে; সেখানে বসবাস করি।

আমি বললাম, আপনি এই ব্যক্তিকে কেন কষ্ট দেন? সে বলল, না আমি তাকে কষ্ট দেই না। আমার তার সাথে সম্পর্ক রয়েছে। তারও আমার সাথে সম্পর্ক রয়েছে। আমি না এলে সে আমাকে নিজেই তালাশ করে বেড়ায়। তারপর

বললাম, আপনি আমাদের কী উপকার করতে পারেন? আমরা তো আপনাদের অনেক উপকার করি।

সে বলল, কিভাবে উপকার করেন? আমি বললাম, আপনারা অনেকে আমাদের শাগরেদ। দারুল উলুম দেওবন্দে আমাদের বুযুর্গদের নিকট অনেক জিন পড়া-লেখা করেছে। মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব রহ.-এর যুগে কিছু প্রকাশ হয়েছে। আমি বললাম, আপনারা আমাদের ওস্তাদও এবং শাগরেদও। শাগরেদ এভাবে যে, আপনারা দারুল উলুমে পড়েন। আর ওস্তাদ এই হিসেবে যে, শাহ ওয়ালি উল্লাহ রহ. হাদিসুল জিন বর্ণনা করেছেন আর তিনি শ্রবণ করেছেন জিনদের কাজীর নিকট হতে। তাই আপনারা আমাদের ওস্তাদও এবং অনেকে শাগরেদও। আপনারা দারুল উলুমের কী উপকার করতে পারেন?

সে চুপ হয়ে গেল। বলল, আমি দারুল উলুমের কোনো উপকার করতে পারব না। আমি বললাম, তাহলে জিন হলেন কেন? তারপর সে চুপ হয়ে বসে গেল আর কিছুই বলল না। সে আধা ঘন্টা পর অনুমতি চাইল চলে যেতে। আমি বললাম, যান। লোকেরা তাকে বলল, তুমি তো অনেক কিছু বলে থাক; এখন বলছ না কেন? সে বলতে থাকল; কিন্তু আমার কিছুই বুঝে এল না। আল্লাহই ভাল জানে যে, সে প্রকৃতই জিন ছিল, নাকি অন্য কিছু। তবে নিদর্শন এমন ছিল যে, সে মানবিক স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। যখন জিনের আসর শুরু হতো তখন অন্যরকম হয়ে যেতো। সে কখনো কুরআন পড়ত; অথচ হাফেজ ছিল না। তেমনিভাবে মাসয়ালা বর্ণনা করত; অথচ সে আলেম ছিল না।

মহব্বতের প্রকার

আলেমদের মতে মহব্বত তিন প্রকার। (১) মহব্বতে তবয়ী (২) মহব্বতে আকলি (৩) মহব্বতে ইশ্‌কি।

১। মহব্বতে তবয়ী হলো মাদ্দি মহব্বত বা জন্মগত মহব্বত। যেমন পিতামাতা সন্তানদের মহব্বত করেন, সন্তানরা মাতাপিতাকে মহব্বত করে।

২। মহব্বতে আকলির অপর নাম ঈমান।

হাদিস শরীফে এসেছে–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ مِنْ وَّلَدِهٖ وَوَالِدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

তোমরা কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ-না আমাকে তোমার মাতাপিতা ও সন্তানাদি হতে বেশি ভালবাসবে।

প্রকাশ থাকে যে, নবীদের সাথে যে মহব্বত হয়, তা হলো মহব্বতে আকলি। এটি তবয়ী নয়। কারণ, মহব্বতে আকলির ভিত্তি দলিলের উপর আর ঈমান নিজে ইস্তেদলালী বস্তু, যার দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যায় ও দেওয়া যায়। আর ঈমানের হাকিকত হলো মহব্বত। সুতরাং তা মহব্বতে আকলি।

৩। এই মহব্বতকে যখন মানুষ চর্চা করবে, বৃদ্ধি করবে এবং ইশ্‌কের দরজায় পৌছবে, তখন তাকে মহব্বতে ইশ্‌কি বলা হবে। যেমন- কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

আর যারা ঈমানদার, তারা আল্লাহকে অধিক ভালোবাসে।

এই আশাদ্দ হুব্ব তথা অধিক মহব্বতকেই ইশ্‌ক বলে।

মহব্বতে তবয়ী হলো গায়রে ইখতিয়ারী জিনিস। যেমন- পিতামাতার সন্তানের প্রতি মহব্বত। তাতে ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের দখল নেই। এমনিতেই মানুষ মহব্বত করতে বাধ্য। কিন্তু আকলি মহব্বত ইখতিয়ারী বস্তু। অর্থাৎ তার উপকরণ ইখতিয়ারী বস্তু। যখন তার উপকরণ গ্রহণ করবে, তখন মহব্বত সৃষ্টি হবে। আর যখন এই মহব্বতকে চর্চা করবে, মশ্‌ক ও অনুশীলন করবে এবং সেই মোতাবেক আমল আঞ্জাম দেবে, সম্পাদন করবে, তখন সেই মহব্বত বৃদ্ধি পেয়ে ইশ্‌কের পর্যায়ে পৌছে যাবে। যেমন মুজাহাদা ও রিয়াজতকারীর অবস্থা হয়ে থাকে। ঈমানের মূল হলো মহব্বতে আকলি। যখন মুজাহাদা, রিয়াজত করা হলো, তখন মহব্বত হালের মাকামে পৌছে যায় আর তাকেই ইশ্‌ক বলে।

কেয়ামত দিবসে মানুষ তার সাথে থাকবে, যার সাথে মহব্বত ছিল। এটি আসলে মহব্বতে আকলি, তথা ঈমানের কারণে যার সাথে মহব্বত হবে, তার সাথে তার হাশর হবে। উদাহরণস্বরূপ ইমাম আবু হানিফা রহ.কে আপনারা মহব্বত করেন। তা তবয়ী মহব্বত নয়; বরং আকলি মহব্বত, যা তাঁর ইলম ও কামালাত দেখে করে থাকেন। যেহেতু আপনাদের ইলম ও কামালাতের প্রতি মহব্বত ছিল, তাই সাহেবে কামালের প্রতি মহব্বত হলো।

অতএব, সকল নবী, সকল অলী ও আহলুল্লাহর প্রতি মহব্বত মহব্বতে আকলি। পরকালের সম্পর্ক অধিকতর ঐ মহব্বতের সাথে হয়, যা ইখতিয়ারী

বস্তু। আর গায়রে ইখতিয়ারী বস্তুতে নবসৃষ্টিগত প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সংকলিত হয় তা দ্বিতীয় পর্যায়ের। আর ইখতিয়ারী মহব্বতে শরয়ী প্রভাব সংকলিত হবে, প্রকাশ পাবে। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে–

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

এবং এই সম্পর্কেই বলা হয়েছে–

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ

যে মহব্বত করে আল্লাহর জন্য, দুশমনি করে আল্লাহর জন্য, দান করে আল্লাহর জন্য, কাউকে ফিরিয়ে দেয় তাও আল্লাহর জন্য, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করে নিল।

এখানে হুব্বু ফিল্লাহ এবং বুগযু ফিল্লাহ তথা ভালোবাসা বা শত্রুতা উভয়টাই আল্লাহর জন্য এই বিষয়টি পরিপূর্ণ হলে ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। আর তা হলো ইখতিয়ারী মহব্বত, যা আমল দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং আমল ছাড়া ঘাটতি হয়।

মিলাদ, কিয়াম ও ওরসের প্রমাণ

এ সময়ে এগুলো আমার যেহেনে নেই। কিন্তু এতটুকু জানা আছে যে, প্রথমে এ মাসয়ালাগুলোর ব্যাপারে থানুভী রহ.-এর অভিমত ছিল জায়েযের। মিলাদ, কিয়াম ও ওরস এ বিষয়গুলোতে প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা ছিল। পরবর্তীতে যখন প্রকৃত রূপ পাল্টে গেল, তখন জটিলতা ও সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়েছে। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব রহ., যিনি সারা দেওবন্দি জামাতের পবিত্র ও সম্মানিত শায়েখ ছিলেন এবং তাঁর বাইয়াতের সিলসিলায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁর দরবারে এগুলোর ব্যাপকতা ছিল। কিন্তু দেওবন্দি জামাতের আমল ছিল ফুকাহাদের অভিমত, শরয়ী নস এবং কিতাব ও সুন্নাহর উপরে।

আর ঐ হযরতদের মধ্যে বিশেষ করে হাজী সাহেব রহ. ও অন্যান্যদের মধ্যে প্রশস্ততা ছিল এবং কঠোরতার কমতি ছিল, তা তাঁর ব্যক্তিগত হালের উপর ছেড়ে দিতেন আর নিজে ফিকহী নস গ্রহণ করতেন, ফিকহী মাসয়ালার উপর আমল করতেন।

মিলাদে কিয়ামের মূল ভিত্তি হলো এই কিয়াম একটি হরকতে ওয়াজদি তথা সুফিদের বিশেষ হাল। আর হরকতে ওয়াজদি স্রেফ ঐ সূরতে গ্রহণযোগ্য, যখন কেউ কোনো হালের তাবে হয়। যদি প্রথা বা অনুকরণকারীর তাবে হলে তাকে হরকতে ওয়াজদি বলে না। তার নির্যাস কথা হলো, যদি কারো উপর নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রুহানিয়্যাত ভেসে ওঠে আর সে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায়; তারপর এটি যেহেতু তরিকতের মাসয়ালা তাই সেখানে তরিকতওয়ালা যত সদস্য উপস্থিত থাকবে, সবার দাঁড়ানো চাই। অন্যথায় ধরপাকড় হতে পারে।

এখন কথা হলো, মূলত এটি শরয়ী মাসয়ালা নয়, বরং যাউকি ও বিশেষ হালসংক্রান্ত মাসয়ালা এবং তরিকত লাইনের একটি চিকিৎসা। তাই এটি জায়েয বা না জায়েযের হুকুমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। এটি একটি ওয়াজদি হরকত। আর নাজায়েয বলা হয় ঐ ব্যক্তিদের কিয়ামকে, যারা ওয়াজদি নয় এবং তারা বিশেষ হালের অনুসারীও নয়। স্রেফ নকলকারী এবং প্রথা পালনকারী। তারা কোনো প্রকার সাহেবে হাল নন। সুতরাং রসমের ইত্তেবা করতে হলে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসমের এর ইত্তেবা করা উত্তম।

হ্যাঁ, কেউ যদি হালওয়ালা হয় এবং মাগলুবুল হাল হয়, তাহলে সে আল্লাহর নিকট অপারগ। তাকে না আপনারা কিছু বলতে পারবেন, না আমরা বলতে পারব। কিন্তু যার এমন হাল হয় না বরং সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে এবং ইন্দ্রিয়শক্তি ঠিক থাকে, তাকে অবশ্যই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত এবং তাঁর আনীত কানুনের ইত্তেবা করতে হবে। এমতাবস্থায় কেউ যদি প্রথা পালন করে, তাহলে অবশ্যই তাকে নকলকারী মনে করা হবে। হাল হলো, হৃদয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহানিয়াত ও সূরত-আকৃতি ভেসে ওঠা। আর তা স্বপ্নের মাধ্যমেও হতে পারে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ رَآنِيْ فَقَدْ رَآنِيْ

যে স্বপ্নে আমাকে দেখল, সে সত্যিকারে আমাকেই দেখল।

তেমনি স্বপ্ন হলো প্রাথমিক পর্যায়ের কাশফ, যা সকলের জন্য সম্ভব হতে পারে। কিন্তু মুজাহাদা ও রিয়াযত করার দ্বারা যে কাশফ অর্জন হয় তার মুর্তবা-মর্যাদা ভিন্ন। এ কারণে যদি কারো সামনে নবীজির রূহানিয়াত জাহের হয় আর সে মাগলুবুল হাল হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে তাকে না আপনারা ধরপাকড় করতে পারবেন, না আমরা পারব। কারণ সে নিজের হালের উপর নেই, নিজের আয়ত্তে নেই।

মুসলিম মিল্লাতের পুরাতন ক্ষত, দূষিত ক্ষত

জামেয়া আযহারে শিয়া জাতির ব্যাপারে আলোচনা চলছিল। জামেয়া আযহার কর্তৃপক্ষের চিন্তাধারা ছিল শিয়া ও সুন্নীদের মাঝে দূরত্ব ও ঘৃণাভাব নিঃশেষ করবে এবং জামিয়া আযহারে তাদের ভর্তির অনুমতি দেবে। এ সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। ওখানকার শায়েখদের মধ্য হতে এক শায়েখ ছিলেন শায়েখ আব্দুল ওয়াহেদ ওয়াছিলী রহ.। কোনো এক দাওয়াতে আমার সাথে তাঁর মুলাকাত হয়। তখন শিয়াদের ব্যাপারে কথা উঠল। তিনি বললেন, শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটি গ্রুপ আছে, যারা উসূলে ইসলামের বিদ্রোহী এবং সম্পূর্ণ বিরোধী। যেমন– কোনো গ্রুপ কুরআনুল কারীমকে পরিবর্তনযোগ্য মনে করে, হুলুলে খোদাওয়ান্দীর প্রবক্তা। অর্থাৎ খোদায়িত্বের মধ্যে মিশ্রণ মানে। তাদের ব্যাপারে কোনো আলোচনা নেই। তারা ইসলাম হতে খারিজ। তারা ধর্মের গণ্ডিতে নেই। কিন্তু যারা শুধু হযরত আলী রা.কে প্রাধান্য দেয়, তাদের সাথে যদি ঘৃণা না রাখা হয়, তাহলে অসুবিধা কী? খামাখা একটি বিশাল মুসলিম জামাত আলাদা ও দূরে সরে আছে।

আমি তাকে বললাম, শুধু এতটুকু বিষয় হলে কোনো অসুবিধা ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা হলো, যেহেতু ফযিলতে শায়খাইন রা.-এর উপর এবং তাঁদের খিলাফতের হকদারের উপর উম্মতের মুসলিমার ইজমা রয়েছে এবং এ ব্যাপারে সবাই একমত, এখন উক্ত ইজমা ছিড়ে ফেলা এবং ভেঙ্গে ফেলা এ বিষয়টিও তো কম গুরুত্ববহ নয়। কিন্তু যদি এতটুকু সহ্য করে নেওয়া হয় যে, একটি বিষয়ে ইজমা হয়েছে আর তার বিপরীতে যে বিষয়টি রয়েছে, তা কোনো হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তু নয়; হ্যাঁ যদি একটি মাত্র মাসয়ালা হত, তাহলে মেনে নেওয়া যেত, সহ্য করা যেত।

কিন্তু তাদের সকলগুলো ফেরকা মাসয়ালায়ে ইমামতে একমত। তারা ইমামতকে নবুওয়াতের উপর প্রাধান্য দেয়। তারা ইমামকে মাসুম মনে করে, তারা বিশ্বাস করে, ইমাম কোনো ভুল করতে পারেন না। তো তাদের এই বিষয়টি সামনে এলে আপনি কী তা সহ্য করবেন? সুস্পষ্ট কথা হলো, যখন বুনিয়াদের মধ্যে মতানৈক্য হয়ে গেল যে, আমরা সকল মুসলমান এ ব্যাপারে একমত যে, নবুওয়াতের চেয়ে উঁচু কোনো মর্যাদার মাকাম নেই; ইমামত হলো নবুওয়াতের অনগামী বা শাখা। যখন নবুওয়াত খতম হয়ে গেছে, তখন অঙ্গীকার করা হয়েছে–

اَلْاَئِمَّةُ مِنَ الْقُرَيْشِ

ইমাম কুরাইশ বংশ থেকে হবে।

বারজন ইমাম হবেন অথবা এখানে মুজতাহিদীন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। সুতরাং তার অর্থ নবুওয়াত খতম হয়ে যাওয়ার পর নবুওয়াতের খেলাফত অবশিষ্ট থাকবে। আর ঐ খেলাফত চাই ইমামতের সূরতে প্রকাশ হোক বা ইলমের সূরতে প্রকাশ হোক বা অন্য কোনো কামালের সূরতে জাহের হোক। সর্বাবস্থায় তা নবুওয়াতের অনুগামী হবে। এটি হলো উম্মাতের ইজতেমায়ী বিষয়। এখন যদি কোনো ফেরকা এসে দাবি করে, নবুওয়াত উত্তম নয়; বরং ইমামত উত্তম, তাহলে এটি প্রথমত ইজমা ভেঙ্গে ফেলা হবে।

তাদের নিকট ইমামের জন্য ইসমত আবশ্যক। যেমনভাবে নবীর জন্য ইসমত আবশ্যক। তাহলে এখানে তারা নবুওয়াতের সমপর্যায় ও সমান্তরাল অপর একটি মাকাম দাঁড় করাল। আমরা তাকে শিরক ফিন নবুওয়াত বলে ব্যাখ্যা করব। যেমন আল্লাহর সাথে শিরক করা নিষেধ, তেমনি নবীর সাথে শিরক করাও নিষেধ। বিশেষ করে সর্বশেষ নবীর মোবারক যুগে। কারণ, অন্য নবীদের যুগে যেহেতু নবুওয়াত খতম হত না, তাদের আগমনের সিলসিলা জারি ছিল, তাই তখন যদি কেউ নবুওয়াত করত বা ইসমতের দাবি করত, কিছু মেনে নেওয়া যেত।

কিন্তু খতমে নবুওয়াতের পর কেউ যদি ইসমতের দাবি করে অথবা নবুওয়াত থেকে উত্তম হওয়ার দাবি করে, তাহলে তা অবশ্যই খতমে নবুওয়াতের বিপরীত হবে। অতএব একদিকে উম্মতের ইজমা ভেঙ্গে ফেলা এবং অপর দিকে উম্মতের ইজমায়ী মাসয়ালা খতমে নবুয়াত, তারও বিরোধী হওয়া; তাও কি সহ্য করবেন?

ঐতিহাসিক ধ্বংসাত্মক ফেরকা

দ্বিতীয় কথা হলো, উপরে বর্ণিত সব কিছু বাদ দিলাম। তবে এ বিষয়টি লক্ষ্য করুন যে, প্রত্যেক ফেরকার পৃথক একটা মেজাজ থাকে। শিয়া নামক ফেরকার মেজাজ হলো ধ্বংসাত্মক নীতি। ইতিহাস তাতে সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলিম জাতি যত লাইনে কষ্ট করছে- রাজনীতি বলেন, খেলাফত বা রাষ্ট্রক্ষমতার লাইনে বলেন, যেখানে-যেখানে ধ্বংস হয়েয়ে, তার মূলে ছিল শিয়া জাতির ষড়যন্ত্র বা যোগসাজস। অতএব ইতিহাসের আলোকে তারা একটি ধ্বংসাত্মক ফেরকা। যেহেতু তাদের মেজাজ এমন তাহলে হতে পারে আজ তারা তোষামোদী করে আপনাদের সাথে শামিল হয়ে যাবে কিন্তু ভবিষ্যতে আপনাদের পরাজিত

করবেন। আপনাদের উপর প্রাধান্যতা লাভ করবে। আপনারা তা দেখতেও পাচ্ছেন আর ইতিহাসও তা সাক্ষ্য দেয়। তো এখন আপনারা কী করবেন?

দীনি রুচির অভাব

আপনি শুধু শিয়াদের একটি আকিদাকে সামনে এনেছেন। অর্থাৎ হযরত আলী রা.-এর উত্তম হওয়ার আকিদাকে। এটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যদি শুধু এতটুকু কথা হত, তাহলে মেনে নিতে কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা ভ্রান্ত আকিদা রয়েছে। আবার তাদের নিজস্ব মেজাজ রয়েছে। এগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা তো ঠিক নয়। তার সাথে এদের ব্যাপারে এ ধরনের কথা চলছিল। পরিশেষে তিনি বললেন, আমিও তো বিষয়গুলোর প্রবক্তা, আমি তো প্রতিনিধিত্ব করছিলাম যে, এগুলো তাদের খেয়াল। আমি বললাম, আল্লাহর শুকরিয়া! আলহামদুলিল্লাহ! এখন আপনি তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তবে এমন খেয়াল না হওয়া চাই।

উক্ত আলোচনা দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো যে, তাদের একীভূত করার আলোচনা চলছে এবং কিছু ব্যক্তির তবিয়ত একতার দিকে যাচ্ছে। আর যখন খালেস দীনি রুচিবোধ কমে যায়, তখন এরকম স্বাধীন চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি হয়।

ঈমানের প্রকাশভঙ্গি

মূলত এ ব্যাপারে কোনো নিয়ম বা উসূল নেই, যা দ্বারা আমি এ বিষয়টিকে নিরীক্ষণ করব বরং সহি বোখারী শরীফে যে হাদিস এসেছে, তাতে এমন একটি বাক্য রয়েছে। যখন বাদশাহ হেরাক্লিয়ার্স আবু সুফিয়ানকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছিল, তার একটা প্রশ্ন এমন ছিল–

هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ سُخْطَةً لِدِيْنِهٖ

ঐ নবীর উপর ঈমান এনে তাঁর দীনকে খারাপ মনে করে কেউ কি মুরতাদ হয়ে যায়?

তিনি বললেন, না, এমন কখনো হয়নি যে, কেউ মুরতাদ হয়ে গেছে। তখন হেরাক্লিয়ার্স বলেছিল–

ذَالِكَ اِذَا خَالَطَ بَشَاشَةُ الْقُلُوْبُ

এ অবস্থা তখনই হয়, যখন অন্তরের স্বতস্ফূর্ততা নিরেট হয়ে যায়।

তারপর মুরতাদ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। সুতরাং হাদিসের মধ্যে ঈমানের পরিপূর্ণ প্রকাশকে বাশাশত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ ধরনের বিভিন্ন শব্দ হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে হালাওয়াতুল ঈমান। যেমন– হাদিস শরীফে রয়েছে–

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّجِدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ فَلْيَلْبِسِ الصُّوْفَ تَذَلُّلًا لِرَبِّهٖ عَزَّوَجَلَّ

যে ব্যক্তি পছন্দ করে, আমি ঈমানের মিষ্টতা আস্বাদন করব, তার জন্য উচিত আল্লাহর সামনে জিল্লতি ইখতিয়ার করার জন্য পশমের কাপড় পরিধান করা।

অর্থাৎ অহংকারের কাপড় পরিধান করবে না। তাহলে সে ঈমানে হালাওয়াত বা মিষ্টতা উপভোগ করতে পারবে। এটি একটি কাইফিয়াত। তাকে আমি নির্ধারিত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করতে পারব না। এই কাইফিয়াতকে কুরআনুল কারীমে 'শরহে সদর' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে–

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ

আল্লাহ যখন কারো সিনাকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং শারহে ছদর নাসিব হয়, তখন তাকে বিশেষ এক আলো দান করা হয়। *[সূরা আয-যুমার ২২]*

সিনা উন্মুক্ত হওয়ার ফলে এখন কলবের ভিতর অন্ধকার তথা গোমরাহী আসতে পারবে না। অতএব ঈমানের এই অবস্থাকে কোথাও হালাওয়াতে ঈমান, কোথাও বাশাশাতে ঈমান, কোথাও শারহে ছদর ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এগুলোর মর্মার্থ অভিন্ন আর তা হলো দীনের জন্য সিনা উন্মুক্ত হওয়া, খুলে যাওয়া এবং প্রশান্তি ও স্থিরতা অর্জন হওয়া ও পূর্ণ রেজামন্দি লাভ হওয়া। তারপর মুরতাদ বা গোমরাহ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

মাকামি কাইফিয়াত

কিন্তু এই অবস্থা উপলব্ধি করার পদ্ধতি কী। এটি আইনগত কোনো জিনিস নয়। এটি একটি মাকাম। যখন মানুষ ঐ মাকামে পৌঁছে যাবে, তখন তার অন্তরে কাইফিয়াত সৃষ্টি হবে। ফলে ঐ ব্যক্তি নিজেই অনুভব করতে পারবে, আমি কোন মাকামে পৌঁছেছি। শব্দ বা বাক্য দ্বারা কাইফিয়াত বোঝানো সম্ভব নয়। এ তো ঈমানি ও রূহানী কাইফিয়াত। মানুষ মাদ্দি বা জন্মগত কাইফিয়াত বুঝতে পারে না। চাই যতই সাবলীল ও প্রাঞ্জল শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হোক-না কেন?

আমি যদি আপনাদের বলি, আমাকে আপেলের স্বাদ বুঝিয়ে দিন, তাহলে আপনি যতই সাবলীল, শুদ্ধ ও সাহিত্যপূর্ণ শব্দ চয়ন করে বর্ণনা করবেন বুঝাতে পারবেন না। কারণ, কায়য়্যিাত শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তখন আপনি বলবেন, সাহেব! দু'পয়সা ব্যয় করে খরিদ করে খেয়ে নাও; তাহলেই বুঝতে পারবে। এ হলো মাদ্দি কায়ফিয়াত। অথবা উদাহরণস্বরূপ নফ্সানি কাইফিয়াত। যেমন– মানুষের বয়সের তিনটি পর্যায় রয়েছে। (১) শিশুকাল (২) যৌবনকাল (৩) বৃদ্ধকাল। কোনো শিশু যদি আপনার নিকট জিজ্ঞেস করে, যৌবনের কী কাইফিয়াত আমাকে বলে দিন, আমাকে বুঝিয়ে দিন, তাহলে আপনি কি সক্ষম, তাকে যৌবন বুঝাতে? কখনো বুঝাতে পারবেন না। তখন তাকে বলবেন, বেটা আট-দশটা বছর অপেক্ষা করো। যখন যুবক হবে, তখন নিজেই বুঝতে পারবে যৌবনের কাইফিয়াত কী।

অথবা কোনো যুবক বলল, আমাকে বার্ধক্যের কাইফিয়াত বুঝিয়ে দিন। সম্ভব হবে না তাকে বুঝানো। যতক্ষণ-না তার উপর দিয়ে ঐ কাইফিয়াত অতিবাহিত হবে এবং সে নিজে ঐ মাকামে না পৌঁছে। অথবা বৃদ্ধ মানুষ যদি বলে, আমাকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও, অন্তিম অবস্থা কেমন হয়, তাহলে এ ছাড়া আর কোনো উত্তর নেই যে, ভাই! যখন এই অবস্থা সামনে আসবে, তখন বুঝতে পারবেন। এগুলো শব্দ বা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যাবে না। সুতরাং যখন মাদ্দি বা জন্মগত কাইফিয়াতকে শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না এবং নফ্সানী কাইফিয়াতকে বুঝানো যাবে না, তাহলে রূহানী কাইফিয়াত যা কলবের মাকামসমূহের সাথে তায়াল্লুক রাখে তা এত লতিফ বা সূক্ষ্ম যে, তা শব্দ দ্বারা বুঝানো সম্ভব নয়। আর যতটুকু ব্যক্ত করা যায়, তা নবীদের থেকে বেশি কেউ বর্ণনা করতে পারে না। তার আলামত বা নিদর্শন বলে দেওয়া হয়েছে যে, যখন যে মাকামে পৌঁছে যাবে, তাহলে বুঝতে পারবে, তুমি সাহেবে মাকাম হয়েছ।

বরযখের কাইফিয়াত

কোনো এক বুযুর্গের ঘটনা। তিনি বলেন, হাজার-হাজার মানুষ ইন্তেকাল করেছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ বলল না, আমার এমন অবস্থা হয়েছে। তিনি বললেন, আমার যখন ইন্তেকাল হবে, তখন তোমরা আমার সাথে কাগজ-কলম ও দোয়াত দিয়ে দেবে; তাহলে আমি তোমাদের কবরের সব কাইফিয়াত লিখে জানাব। তোমরা তিন দিন পর এসে কাগজ নিয়ে যাবে।

তিনি আরো বলেন, তিন দিনের শর্ত লাগালাম এজন্য যে, তিন দিনে আমার আন্দাজ হয়ে যাবে, আমার কাইফিয়াত কেমন হবে। আমি মাকবুল হব, কি হব

না। যখন নিজের পক্ষ হতে নিশ্চিত হব, তখন অন্যদের জানাব, এই কাইফিয়াত আমার হয়েছে।

তাঁর ইন্তেকালের পর তৃতীয় দিন মানুষর তার কবরে গেল। তখন যে কাগজ কবরে রাখা হয়েছিল, তা কবরের উপরে দেখতে পেল এবং তাতে লেখাও রয়েছে। আর এমন কিছু অক্ষর লেখা ছিল, যা কালি দ্বারা ছিল না, কিছু অক্ষর বুঝে আসছিল। মোটকথা, লোকেরা খুশিতে দৌড়াতে লাগল যে, শায়েখ বরযখের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেছেন। তিনি ওয়াদা করে গিয়েছিলেন। তিনি এক লাইনে বরযখের সারা কাইফিয়াত লিখে দিলেন। আর তা ছিল এই–

یہاں کی حالت دیدنی ہے، شنیدنی نہیں ہے

বরযখের অবস্থা দেখার বস্তু, শ্রবণের বস্তু নয়।

স্বচোখে দেখা এবং উপর দিয়ে অতিক্রম করার সাথে সম্পর্ক। শ্রবণের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তার কাইফিয়াত শব্দে-বাক্যে ব্যক্ত করা যাবে না। যতটুকু ব্যক্ত করা যায়, তা নবীদের ছাড়া অন্য কেউ সক্ষম নয়। অতএব, হাদিসে আলমে বরযখ সম্পর্কে যতটুকু কাইফিয়াত ও ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে বেশি কেউ বর্ণনা করতে পারবে না। এটি নবীগণের বয়ান করার শক্তি যে, তাঁরা বরযখের কাইফিয়াতকে যথাসম্ভব বাক্য ও শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। তাদের চেয়ে বেশি কেউ শক্তি-সামর্থ্য রাখে না। অতএব, তিনি উত্তর দিলেন, এখানের হালত দেখার বস্তু, শোনানোর জিনিস নয়। শ্রবণের উপযুক্ত নয়, দেখার উপযুক্ত। মোটকথা, প্রত্যেক বস্তুর কাইফিয়াত বা অবস্থা এমনই যে, আপনি তা শব্দ বাক্য দ্বারা পুরেপুরি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। চাই, নফ্সানি মাকাম হোক, জন্মগত কাইফিয়াত হোক অথবা রূহানী কাইফিয়াত হোক। যতক্ষণ-না সাহেবে মাকাম এবং সাহেবে কাইফিয়াত হবে। সেই কামাম ও কাইফিয়াতে পৌঁছতে পারলে নিজেই অনুভব করতে পারবে।

কাইফিয়াতের ব্যাখ্যা অসম্ভব

কাইফিয়াত ব্যাখ্যা করা এ কারণে অসম্ভব যে, যত ধরনের কাইফিয়াত রয়েছে, সেগুলো সমষ্টিগত বিষয় নয়। সেগুলো ব্যক্তিগত বিষয়। যদি সমষ্টিগত বিষয় হয়, তাহলে আপনি সেগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারবেন, যেগুলো সম্পর্ক সমগ্র মানুষের সাথে। কাইফিয়াত ব্যক্তিগত বিষয়। কারো এমন কাইফিয়াত, কারো আবার ভিন্ন ধরনের। কেউ বিশেষ কোনো অবস্থায় আছে। আবার অপরজন অন্য অবস্থায় আছে, আবার কেউ অন্য মাকামে আছে। একজনের

মাকাম অন্যজনের জন্য দলিল হতে পারে না। মানুষ নিজেই বুঝতে পারে, নিজেই অনুভব করতে পারে। যদি তা সমষ্টিগত বিষয় হতো, তাহলে তার ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল। কিন্তু যেহেতু সেগুলো ব্যক্তিগত ও বস্তুগত, তাই তার কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা রাখা হয়নি। যতটুকু ব্যাখ্যা হতে পারে, সেগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করে দিয়েছেন। তার চেয়ে বেশি কারো ক্ষমতা নেই।

در دنیا بد حالِ بُختہ ہیچ خام

بس سخن کوتاہ باید والسلام

অনভিজ্ঞ কখনো বিজ্ঞের কাইফিয়াত অনুভব করতে পারে না। তাহলে প্রথমে বিজ্ঞ হতে হবে। তবে নিজেই বুঝতে পারবে, অনুভব করতে পারবে। কেউ জিজ্ঞেস করল, আশিক বা প্রেমিক কী জিনিস?

پرسیدیکے کہ عاشقی چیست

گفتم کہ چوں ماشوی بدانی

বললাম, তুমিও আমার ন্যায় আশিক হয়ে যাও, তাহলে বুঝতে পারবে আশিকী কী জিনিস। শব্দ ও বাক্য দ্বারা কী বোঝাব, কী বলব।

মানুষের বর্ণনাশক্তির দুর্বলতা ও অক্ষমতা

কাইফিয়াত হলো বাতেনী বস্তু। মানুষের চেহারায় এক ধরনের ভঙ্গি ও শান থাকে। এগুলো বাক্যে-শব্দে প্রকাশ করা যায়– ব্যক্ত করা যায় না। অর্থা– আপনি চেহারার ছবি অংকন করতে পারবেন; কিন্তু তার লাবণ্য ও প্রকৃতি অংকন করতে পারবেন না। তা যখন সামনে থাকবে, তখন তার লাবণ্যতা ভেসে উঠবে । ফলে আপনি বুঝতে পারবেন, এটি সুন্দর ও প্রিয়। কিন্তু শব্দ ও বাক্য দ্বারা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। যেমন কবি বলেন–

گر مصوّر صورت اِن دلستاں خواھد کشید

لیک حیرانم کہ نازش راچاں خواھد کشید

মানুষের অবয়ব অংকন করা যায়; কিন্তু তার লাবণ্য ও মনমাতানো মিষ্টি ভাষা কিভাবে অংকন করবে? শব্দে কিভাবে প্রকাশ করবে? কাগজের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তার সম্পর্ক দৃষ্টি, জ্ঞান ও অনুভতির সাথে। আর তা হলো

বাতেনী বস্তু। অতএব, অনেক লাবণ্য ও নিদর্শন রয়েছে, যা চোখ দ্বারা প্রত্যক্ষ্য করা যায়, বর্ণনা করা যায় না। আর রূহানী ও নফ্সানী কাইফিয়াত হলো বাতেনী বস্তু, যা চোখে দেখা যায় না, তা মানুষ কিভাবে বর্ণনা করবে? মানুষ তো চোখে দেখা যায় এমন জিনিস নিজ ভাষায় বয়ান করতে পারে না। সারকথা, মানুষকে বয়ান করার শক্তি অনেক সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে যে জিনিস দেহবিশিষ্ট, সেগুলো শব্দ দ্বারাও বর্ণনা করা যায়, ভাষার ধ্বনি দ্বারাও ব্যক্ত করা যায়। সেগুলো আমরা বয়ান করতে পারব। আর যা ভাষার ধ্বনিতেও আসে না, শব্দ-বাক্য দ্বারাও প্রকাশ করা যায় না, সেগুলো কিভাবে বর্ণনা করব? এছাড়া আর কী বলব, ভাই! যিনি ঐ মাকামে পৌঁছেছেন, তিনি যা বলেন তা-ই সঠিক।

আল্লাহর প্রশংসা শেষ না হওয়ার কারণ

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হক তায়ালার প্রশংসা ও ছানাকে এত পরিমাণ উঁচুতে পৌঁছিয়েছেন যে, পৃথিবীতে এত পরিমাণ প্রশংসা ও স্তুতিকারী দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তিনি আল্লাহ তায়ালা যতটুকু প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, এতটুকু কেউ করতে পারেনি। কিন্তু তিনি পরিশেষে বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِیْ ثَنَاءً عَلَیْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَیْتَ عَلٰی نَفْسِكَ

> হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা ও গুণাবলির সীমান্ত পায় না। সুতরাং সংক্ষিপ্ত কথা হলো তুমি ঠিক তেমন যেমন তুমি নিজেই বলেছ।

সারকথা, ছানা ও সিফাত হয়ে থাকে কামিল মাকামসমূহের আর আল্লাহর কামালাত নবীগণ যতটুকু দেখতে পারেন, ততটুকু প্রশংসা ও ছানা করতে পারেন। বাকি কথা হলো, কামালাতে উলুহিয়্যাহ তথা আল্লাহ তায়ালার পূর্ণতা ও গুণাবলি কি শব্দে ও ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব? যখন বান্দার মাকামাতগুলো বান্দার আয়ত্তে নেই, তাহলে উলুহিয়্যাতের মাকামগুলো কিভাবে বান্দার আয়ত্তে আসতে পারে। অতএব, অক্ষমতা স্বীকার এবং হার মেনে নেওয়া ব্যতীত অন্য কিছু হতে পারে না।

نہ ہر جا مرکب تواں تاختن

کہ جاہا سپر باید انداختن

সব স্থানে সব রাস্তায় ঘোড়া দৌড়ানো যায় না। অনেক স্থান এমন আসে, যেখানে লাগাম টেনে ধরতে হয় এবং আরোহী হার মানে যে, এই কাঁটাদার জঙ্গলে আমি প্রবেশ করব না। ঘোড়া এমন স্থানে দৌড়াবে, যেখানে ঘাস ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এবং রাস্তা সোজা। যেখানে উচু-নিচু পথ, পাহাড়ি পথ, উপত্যকা, নিম্নাঞ্চল এবং উঁচু অঞ্চল, সে পথে ঘোড়া বেচারা দৌড়াবে না। এমন পথে তো খেয়ালও দৌড়াতে পারবে না, ঘোড়া কিভাবে দৌড়াবে?

আমার একটি দীর্ঘ কবিতা ছিল। কিন্তু এখন পুরোটা স্মরণ নেই। তার একটা চরণ মনে আছে। আর তা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণাবলি সম্পর্কে–

خدا کی ثناء کامل یہی ہے

کہ ہم سے کچھ ثناء ممکن نہیں

আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ প্রশংসা এই যে, আমাদের দ্বারা কোনো প্রশংসা সম্ভব নয়। যে একথা বলে দিল, আমি তোমার প্রশংসা করার যোগ্য নই, তোমার প্রশংসা করতে পারব না, তাহলে সে তাঁর প্রশংসা করল। আর যে ব্যক্তি প্রশংসা করার দাবি করে বসল, তার জন্য প্রশংসা করা সম্ভব নয়। অতএব দাবি না করার নামই প্রশংসা করা।

অপারগতা ও অক্ষমতা মেনে নেওয়াই শুকরিয়া জ্ঞাপন

এ বিষয়টি এমন যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ আ.কে আদেশ করলেন–

اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا

হে দাউদ! তুমি আমার শুকরিয়া আদায় করো।

হযরত দাউদ আ.-এর গুণাগুণ ও শুকরিয়া জ্ঞাপনের সুঅভ্যাস নবীদের মাঝে উত্তম ও উন্নত। অর্থাৎ হযরত দাউদ আ.-এর মাঝে শুকরিয়া প্রবল ছিল। তারপরও তাঁকে আদেশ করা হলো শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে।

ঘটনা হলো, আল্লাহর আদেশ ও হুকুম নবীদের থেকে বেশি অন্য কে বোঝে না। একমাত্র তারা-ই বুঝতে পারে আল্লাহর আদেশের উদ্দেশ্য ও মাকসাদ কী। অতএব তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহ! শুকরিয়া আদায় করা তো আমার উপর ফরজ আবশ্যকীয় কর্তব্য। আর যখন আদেশ হয়েছে তো শুকরিয়া আমি জ্ঞাপন করবই। কিন্তু আমি এই ভেবে চিন্তিত যে, কিভাবে শুকরিয়া আদায় করব।

কারণ, যখন আপনার দেওয়া নেয়ামতরাজির উপর শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে বসব আর তা তখনই করতে পারব, যখন আপনি তাওফিক দেবেন। আর তাওফিক প্রদান করাও তো একটি নেয়ামত, তাহলে এই নেয়ামতের শুকরিয়া তো আমাকে আদায় করতে হবে। আর যখন এই নেয়ামতের শুকরিয়া করতে বসব, তখনও তো আপনিই তাওফিক দেবেন। তাহলে তো এটিও তো আরেকটি নেয়ামত হয়ে গেল। তাহলে প্রথমে তাওফিকের শুকর আদায় করবে তারপর নেয়ামতের শুকর। আর যখন এই নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে বসব, তারও তাওফিক তো আপনিই দেবেন। তারপর তাও একটি নেয়ামত হলো। তাহলে প্রথমে তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে হবে।

অতএব প্রত্যেক শুকরের পূর্বেই শুকর রয়েছে। তাই আমি তো শুকরের শুরুই করতে পারছি। সুতরাং আমি তো শুকর জ্ঞাপন করতে অক্ষম ও অপারগ। আপনার শুকর আদায় করার ক্ষমতা তো আমার আয়ত্তে নেই। তাহলে আমি আদায় করব কিভাবে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়া হলো, হে দাউদ! যদি তুমি বুঝে থাক, তুমি শুকরিয়া আদায় করতে অপারগ-অক্ষম এ কথা স্বীকার করার নামই শুকরিয়া জ্ঞাপন। অতএব অক্ষমতা মেনে নেওয়াই শুকরিয়া আদায় করা। কেননা, কোনো ব্যক্তিই কামালাতে ইলাহীর হক আদায় করতে পারবে না। সবাই এ কথা বলবে যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার হক আদায় করতে অক্ষম। এমন অক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়াই হক আদায় করা। অন্যথায় বাস্তবে যদি হক আদায় করা জরুরি হত, তাহলে আল্লাহর হক তো সীমাহীন ও অসংখ্য; আর বান্দারা সসীম। সে কিভাবে তাঁর হক আদায় করবে? অসীমের হক সসীম আদায় করতে পারে না। তাই দয়ালু আল্লাহ ফজল করেছেন যে, অসীম শুকরিয়া আদায় করার সূরত হলো, বান্দা নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নেবে যে, আমি অক্ষম-অপারগ। তখন আমি বুঝে নেব, সে শুকর আদায় করেছে। আর প্রশংসা ও গুণেরর হালত হলো–

لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে বেশি প্রশংসাকারী ও ছানাকারী পৃথিবীতে নেই এবং তাঁর চেয়ে বড় কোনো আরেফ বিল্লাহও নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মারেফত এমন মাকামে পৌঁছেছিল যে, সে পর্যন্ত কোনো নবী-রাসূল-ফেরেশতাও পৌঁছতে পারেননি। পরিশেষে তিনিও বলেছেন–

لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

ইয়াজুজু-মাজুজের আসল পরিচয়

বিশুদ্ধ কথা হলো, কুরআনুল কারীম ইরশাদ করেছে, ইয়াজুজ-মাজুজ একটা সম্প্রদায়, যারা কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে বের হবে, আত্মপ্রকাশ করবে। আর তাদের গুণাবলি বর্ণনা করেছে যে, তারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, সাগরে পানি পান করতে গেলে সাগরের পানি শুকিয়ে ফেলবে, মানুষের সম্পদ এমনহারে আত্মসাত করবে যে, সকল সম্পদ তাদের হাতে চলে আসবে। ইয়াজুজ-মাজুজের এমন আরো অনেক আলামত বর্ণনা করেছে।

কিন্তু বেশি বিশ্লেষণ করেনি যে, তারা কারা হবে? তবে এতটুকু জানা যায় যে, তারা মানুষদের মধ্য হতে হবে, কোনো জিন্নাত হবে না। সহি বর্ণনা এবং কুরআনুল কারীমে তাদের সম্পর্কে যতটুকু এসেছে, তা এতটুকু যে, তারা একটি জাতি বা সম্প্রদায়, যারা অনেক শক্তিশালী হবে, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, সারা পৃথিবীর ধনভাণ্ডার ও খনিজ সম্পদ হস্তগত করবে এবং সকল মানুষকে কাবু করে ফেলবে। কাউকে বাঁচিয়ে রাখবে, কাউকে খতম করে দেবে। সারা বিশ্বে তাদের একচেটিয়া নেতৃত্ব কায়েম হবে। সারা বিশ্বের সকল খনিজ সম্পদ ও ধনভাণ্ডার তাদের আয়ত্তে চলে আসবে। তারপর যাকে ইচ্ছা দেবে, যাকে ইচ্ছা দেবে না। সুতরাং বর্ণনাসমূহে তাদের এরকম অবস্থা ও গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে। আর যত কথা রয়েছে; যেমন তারা এক বিগত পরিমাণ বড় হবে ইত্যাদি; এগুলো সব ইসরাঈলী বর্ণনা।

ইউরোপিয়ানদেরকে কি ইয়াজুজ-মাজুজ বলা যাবে

এ ব্যাপারে আলেমদের অনেক আলোচনা ও অভিমত রয়েছে। কিছু গবেষক আলেমের অভিমত হলো ইউরোপিয়ানরা ইয়াজুজু-মাজুজ। তারা বলেন, যতগুলো নিদর্শন বলা হয়েছে, সবগুলো তাদের সাথে মিলে যায়। আবার সারা মুসলিম জাহানের উপর তাদের কর্তৃত্বও আছে এবং সারা বিশ্বের খনিজ সম্পদ ও ধনভাণ্ডার প্রায় সবগুলো তাদের হাতে এসে পড়েছে। পৃথিবীর সকল জাতি তাদের আয়ত্তে; যাকে চায় নিচু করে খতম করে ফেলে আবার যাকে চায় উন্নতি করে দেয়। এমনিভাবে সারা বিশ্বে তাদের কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব ছড়িয়ে পড়েছে।

সিকান্দার বাদশাহর বাধ

আরো যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে, তাহলো, তারা সিকান্দারী বাঁধের পাদদেশে অবস্থান করছে। তারা সেই বাঁধ প্রতিদিন জিহ্বা দ্বারা চাটে এবং চেটে চেটে প্রায় শেষ করে ফেলে। কেয়ামতের পূর্বে একদিন ইনশাআল্লাহ বলে ভেঙ্গে ফেলবে এবং তারপর বের হয়ে যাবে। এগুলোতে পরবর্তীতে তাবিল ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এগুলোর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের উপর এক ধরনের প্রতিবন্ধক আরোপ করা আছে। তা কেয়ামতের পূর্বে তুলে ফেলা হবে। এখানে এটি জরুরি নয় যে, দেওয়াল বা বাঁধটি সৃষ্টিগত হতে হবে এবং পাহাড়ের ভিতর নির্মাণ করা হয়েছে।

কতক আলেমের অভিমত হলো, বাস্তবে দেওয়াল রয়েছে আর তারা সেই দেওয়ালটা প্রতিদিন চাটে। চাটে কথাটার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রতিদিন ভেঙ্গে ফেলার ফিকির করে; কিন্তু সক্ষম হয় না। যখন বের হওয়ার সময় হবে, তখন আল্লাহর পক্ষ হতে শক্তি দেওয়া হবে; তারা দেওয়াল ভেঙ্গে বের হয়ে যাবে।

আর যারা বলেন, বর্তমান ইউরোপিয়ান জাতিই ইয়াজুম-মাজুজ, তারা দেওয়াল বলতে রূপকার্থে দেওয়াল মনে করেন– বাস্তব অর্থে দেওয়াল মনে করেন না।

কুদরতের নিদর্শন

কুরআন ও হাদিস দ্বারা যতটুকু জানা যায়, এতে প্রতীয়মান হয়, যতক্ষণ পর্যন্তআসল অর্থ নেওয়া যায়, ততক্ষণ রূপক অর্থ গ্রহণ করা উসূলের খেলাফ। এতে তো কোনো যুক্তিগত জটিলতা নেই যে, কোনো একটি জাতি রয়েছে, যারা পাহাড়ের পিছনে বন্দি এবং বাস্তবে সেটি সিকান্দারী বাঁধ, যেখানে আজ পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিশক্তি পৌঁছেনি, তারা সেই বাঁধকে ভাঙ্গতে থাকে। পরিশেষে শেষ জমানায় কেয়ামতের পূর্বে তারা বের হবে। কুরআন ও হাদিস দ্বারা জানা যায়, তারা কোনো অসাধারণ জাতি, সাধারণ মানুষের মতো নয়। চাই তারা মানুষই হোক; কিন্তু অস্বাভাবিক বা অসাধারণ। এতে একটা ফলাফল এমন বের হয় যে, তারা ভিন্ন জাতের মানুষ আর আল্লাহ তায়ালা তাদের বন্দি করে রেখেছেন। এটি আল্লাহ তায়ালার অগণিত নিদর্শন হতে একটি নিদর্শন। যেমন– দাজ্জাল প্রকাশ হওয়া তাঁর একটা কুদরতের নিদর্শন। কেয়ামতের পূর্বে আগুন প্রকাশ হওয়া তাঁর কুদরতের নিদর্শন। তেমনিভাবে ইয়াজুজ-মাজুজ প্রকাশ হওয়াও কুদরতের একটি নিদর্শন; তবে অস্বাভাবিক বস্তু। তবে এটি একটি কেয়ামতের নিদর্শন।

যেখানে হাজারো অস্বাভাবিক নিদর্শন প্রকাশ পাবে। তাদের মধ্য হতে এটিও একটি নিদর্শন।

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ

যে পর্যন্ত-না ইয়াজুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চ ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। *[সূরা আম্বিয়া ৯৬]*

এদিক-সেদিক সব ঘাঁটি হতে বের হচ্ছে মনে হবে। ইউরোপিয়ানদের তো এমন ব্যবস্থা নেই। তাদের তো ভিন্ন একটা রাষ্ট্র রয়েছে। তারা একস্থান হতে আরেক স্থানে যাতায়াত করে। তারা ব্যবসায়িকভাবে সারা পৃথিবী আয়ত্ত করে রেখেছে। কিন্তু তারা অস্বাভাবিকভাবে এমন অবস্থায় বের হবে যে, পৃথিবীর সকল ঘাঁটি হতে বের হয়ে একটি নতুন জাতির আগমন হতে চলেছে এমন হয় না।

সুতরাং কুরআন-হাদিসের শব্দ দ্বারা বোঝা যায়, তারা কুদরতের অস্বাভাবিক নিদর্শন, যা কেয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাবে। তারা এক বিগত লম্বা হবে, তাদের কান লম্বা-লম্বা হবে ইত্যাদি সবই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত।

হযরত কাশ্মীরি রহ.-এর অভিমত

আমাদের হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ সাহেব রহ.-এর রায় কিছুটা এদিকে মায়েল ছিল যে, হতে পারে ইউরোপিয়ানরা ইয়াজুজ-মাজুজ। তিনি অকাট্যভাবে বলেননি; তবে খেয়াল পেশ করেছেন। কারণ, অনেক আলামত তাদের মধ্যে পাওয়া যায়।

ইউরোপিয়ান জাতির মূল ব্যক্তির নাম

গতকাল আলোচনা হচ্ছিল, ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ভবনটি অনেক পুরাতন ও প্রাচীন। তার গেটে পাথর খোদাই করে লেখা রয়েছে, 'ইয়াগুগ ও মাগুগ'। এ শব্দ দুটিকে আরবী ভাষায় রূপান্তর করলে ইয়াজুজ ও মাজুজ হয়। তারা নিজেরাই নিজেদের ইয়াজুজ-মাজুজ বলে। জনাব হাশেমী সাহেব বর্ণনা করেন, রাশিয়ানরা বলে, আমি মূল ব্যক্তি; আমরা যার সন্তান, তার নাম ছিল 'মাগুগ'। এই সকল নিদর্শন দেখে কতক আলেম বলেন, মনে হয়, ওরাই ইয়াজুজ-মাজুজ।

খাতামুদ্দাজ্জাল প্রকাশ হওয়ার নিদর্শন

যেমনভাবে সূর্য উদিত হওয়ার অনেক পূর্বে তার নিদর্শন প্রকাশ হতে থাকে; তারপর উদিত হয়, তেমনি নবুওয়াতের সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে মানবাত্মায় তার নিদর্শন প্রকাশ হতে শুরু করে। সুতরাং যেমনভাবে খাতামুন নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে, যাতে দীন গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে দাজ্জাল প্রকাশ হওয়ার পূর্বে মানব-অন্তরে দাজ্জাল ও ফাসাদ, ধোঁকাবাজি ও চালবাজি এবং দাগাবাজি ইত্যাদির নিদর্শন এবং এগুলো গ্রহণ করার যোগ্য সৃষ্টি হতে থাকবে। এই অবস্থা প্রতিটি মানুষ নিজ-নিজ সামর্থ্য মোতাবেক অনুভব করতে পারবে যে, অন্তরের মধ্যে কিছু অন্ধকার, ময়লা এবং কিছু ধোঁকা দুনিয়ার তামাদ্দুনের বুনিয়াদ হিসেবে দেখা দেবে। সুতরাং উল্লিখিত খারাপ বস্তুগুলো প্রকাশ পাবে যে, যখন দাজ্জাল জাহির হবে, তখন হাজারো আত্মা প্রস্তুত হয়ে যাবে তার অনুসরণের জন্য। শুধু ঐ মানুষগুলো ব্যতীত, যাদের অন্তরে ঈমানের যোগ্যতা শক্তিশালী হবে। তারা মাথা নত করবে না। কিন্তু ব্যাপকভাবে প্রভাব সৃষ্টি হবে। সুতরাং যেমনভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমণের পূর্বে নেক কবুল করার যোগ্যতার আলামত প্রকাশ হতে শুরু করে ছিল, তেমনিভাবে দাজ্জাল প্রকাশ হওয়ার পূর্বে অন্তর দজল, ফাসাদ, ধোঁকা ও ষড়যন্ত্রকে কবুল করবে। দুনিয়া হতে ইখলাস নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং ধোঁকাবাজি দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করবে। তখন দাজ্জাল প্রকাশ পাবে।

খাতামুল আম্বিয়া সা. -এর সাথে দাজ্জালের মোকাবেলা

যেমনভাবে খাতামুল আম্বিয়া কামালাতে ভরপুর এবং সমস্ত কামালের খতমকারী ছিলেন, তেমনিভাবে দাজ্জাল তাঁর বিপরীতে সকল ফাসাদের খতমকারী তথা সর্বোচ্চ দরজায় পৌঁছবে। যেমনভাবে খাতামুল আম্বিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাঁর বাম কাঁধের পাশে মহরে নবুওয়াত ছিল, যাতে লেখা ছিল কতক বর্ণনা অনুযায়ী–

سِرْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَنْصُوْرٌ

তুমি যেথা যাও আল্লাহর সাহায্য সাথে থাকবে।

আর কিছু বর্ণনায় এসেছে, তাতে লেখা ছিল 'খাতামুন নাবিয়্যীন' অথবা 'মুহাম্মাদ' শব্দ। অথবা এমন কিছু ব্যাখ্যা হয়, যার অবস্থা হাদিস শরীফে এসেছে। এ থেকে এই নির্যাস কথা বের হলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এ পরিমাণ কামালাতে ভরপর ছিলেন যে, তার ঝলক উপরে জাহের হয়ে পড়ে এবং দেখতে পাওয়া যায়। তেমনিভাবে খাতামুদ্দাজ্জালীনে দজল ও ধোঁকা এত পরিমাণ ভরপুর থাকবে যে, তার কপালে লেখা থাকবে ك، ف، ر অর্থাৎ কুফরি দেহওয়ালা। তার আলামত উপরে জাহের হবে। সবাই দেখতে পারবে। মোটকথা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একেবারে মোকাবেলা।

বিপরীত বস্তু রাখার রহস্য

এ উম্মাতের মাঝে যে পরিমাণ কামালাত প্রকাশ হয়েছে, সে পরিমাণ ফাসাদাতও অবশ্যই প্রকাশ পাবে। প্রথমে কামালের সাথে ফাসাদের মোকাবেলা হয়। প্রত্যেক কামালের ভাল গুণ তখনই জাহের হয়, যখন তার বিপরীত ক্ষতি আসে। ঈমানের শক্তি তখনই প্রকাশ পায়, যখন তার মোকাবেলায় কুফর আসে।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

আমি সত্যকে টক্কর দেই বাতিলের সাথে। আর যখন বাতিল হকের সাথে টক্কর খেয়ে চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তখন হকের শক্তি জাহির হয় আর মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। *[সূরা আম্বিয়া : ১৮]*

যদি বাতিল না থাকত, তাহলে হকের শক্তি প্রকাশ হত না। তাই বিপরীত জিনিস রাখা হয়েছে। এজন্যই নবীদের মোকাবেলায় দাজ্জালকে রাখা হয়েছে। যে পর্যায়ের নবী সেই পর্যায়ের দাজ্জাল। মোটকথা, আমার উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো যে, যেমনভাবে শয়তানের মোকাবেলা ফেরেশতাদের সাথে, তেমনিভাবে দাজ্জালের মোকাবেলা নবীদের সাথে। নবীদের অনুসারীদের মধ্যে যারা প্রদীপতুল্য, তাদেরকে 'আইম্মায়ে হেদায়েত, বলে। অপরদিকে কাফেরদের মধ্যে যারা নেতৃত্ব দেয়, তারা হলো আইম্মাতুল কুফ্‌র। অতএব আইম্মায়ে হেদায়েতের মোকাবেলা আইম্মায়ে দালালাতের সাথে। এমনিভাবে মুত্তাকীদের মোকাবেলা ফুজ্জারদের সাথে। এমনিভাবে সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত মোকাবেলা চলে আসছে। অতএব নবীদের সাথে দাজ্জালদের মোকাবেলা। এজন্যই খাতামুল আম্বিয়ার সাথে খাতামুদ্দাজ্জালের মোকাবেলা হবে।

দাজ্জালের অস্বাভাবিক কর্ম

প্রকাশ থাকে যে, যার উপর দজলের চূড়ান্ত পর্যায় শেষ হবে, সাধারণ রূহানিয়াত (আধ্যাত্মিকতা) তার মোকাবেলা করতে পারবে না। বড়-বড় কামিল অলীগণ তার মোকাবেলা করতে অক্ষম হবে। এ কারণে হাদিস শরীফে হুকুম করা হয়েছে, দাজ্জাল প্রকাশ হওয়ার পর বিচরণ ও তামাশা দেখার জন্যও বের হবে না। সে ঈমানিয়াত এমনভাবে বিলুপ্ত করবে, যেমন চুম্বক লৌহজাতীয় জিনিসকে টেনে নেয়। অতএব তামাশা দেখার জন্যও যেয়ো না। বরং তালাবদ্ধ গৃহে বন্দী হয়ে যাও। তার সামনে কখনো যাবে না। এতে বোঝা যায়, কেউ যত বড় সালেক হোক, রূহানিয়াতওয়ালা হোক; কিন্তু তার দজল ও ফেরেববাজি এবং তার হাতে যে কারিশমা ইসতিদরাজ হিসেবে প্রকাশ পাবে, তা এত বড় হবে যে, কোনো বেলায়েতে কাজ হবে না। যত বড় অলী হোক তার মোকাবেলা করতে পারবে না। যতক্ষণ-না নবুওয়াতশক্তি তার মোকাবেলায় আসে। কেননা, আসল দাজ্জালের মোকাবেলা হবে নবুওয়াতের সাথে।

দাজ্জাল হত্যার পদ্ধতি

তাকে হত্যা করার একটি সূরত ছিল এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মোকাবেলা হত আর তিনি তাকে পরাজিত করতেন। ফলে সে নিহত হতো। সাধারণ বেলায়েত তাকে মোকাবেলা করতে পারবে না। মোটকথা, তাকে হত্যা করার একটি পদ্ধতি এই ছিল যে, তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে প্রকাশ করে দেওয়া আর তিনি তাকে হত্যা করে ফেলবেন। তাতে সে নিহত হয়ে যেত। কিন্তু যদি সে সেই যুগে প্রকাশ হয়ে কতল হয়ে যেত, তাহলে তার দজল ও ধোঁকাবাজীর যে পর্যায় রয়েছে, সেগুলো প্রকাশ পেত না আর তার মোকাবেলা করে ঈমানের শক্তি প্রকাশ পেত না। বরং একদম সামনে এসে যেত আর নিহত হয়ে যেত।

আর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, দাজ্জাল প্রকাশ পাবে। তার কারণে বাতিলকে গ্রহণ করে নেওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। আর বাতিলের সাথে হকের মোকাবেলা হবে। তখন হকের শক্তি সুস্পষ্ট হবে, প্রকাশ পাবে। যদি সে সময় প্রকাশ হত, তাহলে মোকাবেলা হত না। সে হাতে-হাতে নিহত হত। এই কারণে তার প্রকাশকাল রাখা হয়েছে শেষ যুগে, যাতে তার প্রভাবে উম্মতের মাঝে বাতিল প্রকাশ হতে থাকে এবং ইসলাম তার মোকাবেলা করতে থাকে।

দাজ্জাল হত্যার দ্বিতীয় সূরত ছিল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাজ্জাল প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত জীবিত রাখা হবে এবং তিনি তাকে হত্যা করতেন। এটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে নিম্নস্তরের কাজ যে, শুধু দাজ্জালের জন্য তাঁকে জীবিত রাখা হবে।

আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি জীবিত রাখা হত, তাহলে দজল ও ফাসাদকর্ম প্রকাশ হতেই পারত না। নবুওয়াতের শক্তি এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত, যে, দজল ও ফাসাদ কিছুই করতে পারত না। তই তাকে সুযোগ দেওয়া হলো, দজল প্রকাশ হবে। তারপর পরাজিত হবে। ফলে দজলের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে হকের সামনে।

হযরত মসীহ আ.কে দাজ্জালের হত্যাকারী বানানোর হিকমত

উক্ত আলোচনার দ্বারা কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেল। দাজ্জালহত্যা নবুওয়াতি শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। আর নবুওয়াতও সাধারণ নবুওয়াত নয় বরং খতমে নবুওয়াতের শক্তির প্রয়োজন হবে। তাহলে তাকে হত্যা করা সম্ভব। কোনো বেলায়েত তাকে হত্যা করতে পারবে না। আর খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবিত রাখাও তাঁর শানের বিপরীত ছিল যে, শুধু দাজ্জাল হত্যার জন্য তাঁকে জীবিত রাখা হবে।

এখন এগুলোকে একত্র করার সূরত আল্লাহ তায়ালা এমনভাবে করলেন যে, হযরত মসীহ আ.কে দাজ্জাল হত্যাকারী স্থির করলেন। কারণ, তাঁর মধ্যে আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য রয়েছে, যেগুলো অন্যান্য নবীদের মধ্যে নেই।

খাতিমিয়্যাত গুণে সাদৃশ্য

প্রথম কথা হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন খাতামুন নাবিয়্যীন। তথা সর্বশেষ নবী। খাতামিয়্যাতের মাকাম একমাত্র তাঁকেই দান করা হয়েছে। তেমনিভাবে কিছুটা খাতামিয়্যাত গুণ হযরত ঈসা আ.-এর মধ্যেও বিদ্যমান। তিনি হলেন বনী ইসরাঈল নবীদের খাতামুল আম্বিয়া। নবুওয়াতের সবচেয়ে বড় যুগ অতিবাহিত হয়েছে। বনী ইসরাঈলে হাজার হাজার নবী-রাসূল তাদের থেকে হয়েছে। তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

আমি বনী ইসরাঈলকে সারা বিশ্বে মর্যাদাশালী বানিয়েছি এবং এ বংশে নবুওয়াত ও বাদশাহী উভয়টি এক সাথে প্রদান করেছি। ইরশাদ হয়েছে–

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّ اٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۞

যখন মূসা স্বীয় কওমকে বলল, হে আমার কওম, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করো যখন তিনি তোমাদের মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে বাদশাহী দান করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা বিশ্বের অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। *[সূরা মায়েদা : ২০]*

আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে নবুওয়াতের দৌলত দান করেন। রাজ্যধিপতির দৌলত প্রদান করেন এবং আরো অনেক নেয়ামত প্রদান করেন, যা তাদের পূর্বে বিশ্বের অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। বনী ইসরাঈল একটি আজিমুশ্বান মানববংশ, যাদের মধ্যে হাজার-হাজার নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। তাদের খাতিম হলেন হযরত ঈসা আ.। তাঁর উপর এসে ইসরাঈলী নবুওয়াতের ধারা নিঃশেষ হয়ে যায়। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনভাবে সম্পূর্ণ নবুওয়াতের খাতিম, তেমনিভাবে হযরত মসীহ আ. হলেন বনী ইসরাঈল নবীদের খাতিম। অতএব খাতিমিয়্যাতের মাকামে সামান্য সদৃশ্য রয়েছে।

রহমতগুণে সাদৃশ্য

তারপর যেমনভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শান রহমাতে মুজাস্সাম বলা হয়েছে–

وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۞

আপনাকে পাঠিয়েছি বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ।

একই রহমতে মুজাস্সাম হযরত মসীহ আ.-এর শান বলা হয়েছে। কুরআনের যে স্থানে তাঁর জন্মের কথা এসেছে, সেখানে বলা হয়েছে–

وَ لِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِّنَّا ۚ

যখন হযরত মরিয়ম বললেন–

اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّ لَمْ اَكُ بَغِيًّا ۞

আমার ছেলে কিভাবে হবে, আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি আর আমি ব্যভিচারী ও ভ্রষ্টাও নই!

قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَ كَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

তিনি বললেন, এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। *[সূরা মারিয়াম : ২১]*

অর্থাৎ তিনি বললেন, এমনিই হবে, আল্লাহর হুকুম হয়েছে। আর তা এ জন্য হবে যে, আমি মসীহ আ.কে আমার কুদরতের নিদর্শন বানাতে চাই। আমি বিশ্ববাসীকে দেখাব, জানাব, আমি পিতা ছাড়াও সৃষ্টি করতে পারি। আর এটি পূর্ব হতে সিদ্ধান্তকৃত; তাই হবেই।

সুতরাং যে রহমতে মুজাস্সাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে, সেই রহমতে মুজাস্সাম হযরত মসীহ আ.-এর শানেও বলা হয়েছে।

তারবিয়াতে আতবায়ের সাদৃশ্য

যেমনভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের শানে বলা হয়েছে–

رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

স্বয়ং তাঁর সাহাবাদের মাঝে 'রহমত' প্রবল ছিল, একই শান হযরত মাসীহ আ.-এর অনুসারীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَ قَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَ جَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّ رَحْمَةً ۬

তারপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি আমার রাসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছি মরিয়মতনয় ঈসাকে এবং তাকে দিয়েছি ইঞ্জীল। আমি তাঁর অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। *[সূরা হাদীদ : ২৭]*

হযরত মসীস আ.-এর অনুসারীদের মধ্যে গজবের প্রাধান্যতা ছিল না, রহমতের প্রাধান্যতা ছিল। অতএব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাই হযরত মসীহ আ.-এরসাহাবীর সম্পর্কে বলা হয়েছে।

সারকথা হল, উভয়ের তারবিয়াতে সাদৃশ্যতা রয়েছে। যে শানে তারবিয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে ছিল। যে শানে রহমত রাসূলের মধ্যে ছিল তাঁর নিকটতর শানে রহমত হযরত মাসীহ আ.-এর মধ্যে ছিল।

যুহুদ ও শওকতের জীবনীতে সাদৃশ্য

এগুলোর পাশাপাশি আরো একটি শক্তিশালী সাদৃশ্য রয়েছে। আর তা হলো এই যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'ধরনের জীবন দান করা হয়েছিল। একটিকে মক্কী জীবন বলে, অপরটিকে মাদানী জীবন বলে। মক্কী জীবন ছিল ১৩ বৎসরের আর মাদানী জীবন ১০ বছরের। এভাবে নবুয়াতের ২৩ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। মক্কার তের বছরের জীবন ছিল অত্যন্ত যুহুদ ও কনায়াতের তথা অল্পেতুষ্ঠির। এ সময় তাশাদ্দুদ বা কঠোরতার অনুমতি ছিল না। কারো হাতে মার খেলেও সহ্য করো, জবাব দেওয়া যাবে না, প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না।

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلِ

হে নবী! ক্ষমা ও মার্জনা অবলম্বন করুন।

কোথাও বলা হয়েছে–

اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ • اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ •

যদি তারা বকবক করতে থাকে, তবুও তাদের পরওয়া করবেন না। তাদের মার্জনা করুন, অজ্ঞদের কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। তারা যদি আপনাকে বিদ্রূপ করে, তাহলে তাদেরকে আমার উপর ন্যস্ত করে দিন; আমি তাদের নিস্পত্তি করে দেব। আপনি তাদের বিদ্রূপের উত্তর দেবেন না। [সূরা আলহিজ্র ৯৪-৯৫]

কোথাও বলেছেন–

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا • اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا • وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا •

যদি তারা কষ্ট পৌঁছায়, তাহলে আপনি সবর করুন, সবরে জামিল ইখতিয়ার করুন। তারা কি মনে করেছে তাদের পরিণাম কিছু দূরে? অথচ তা অনেক নিকটে এসে পড়েছে। তারা অচিরেই জানতে পারবে, তাদের পরিণতি কী হবে। *[সূরা আল মাআরিজ : ৫-৬]*

মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন স্থানে আদেশ করেছেন, তলোয়ার উঠাবে না, যবানও খুলবে না, হাতও প্রসারিত করবে না, মারলে মার খাবে, গালি দিলে চুপ থাকবে। তবে হ্যাঁ কী করবে–

وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

তাদের সাথে বড় জিহাদ করতে থাকো। তাঁর পথে মার খেতে হলে মার খাও, পিটুনী খেতে হলে খেয়ে নাও।

এখানে তলোয়ারের জিহাদকে ছোট জিহাদ বলা হয়েছে। আর যবানের মাধ্যমে ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহকে বলা হয়েছে বড় জিহাদ। এমন জিহাদ করতে থাকো; কিন্তু মার খাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকো। মোকাবেলায় আহ্-উহ্ করো না।

দীর্ঘ তেরটি বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে অতিবাহিত করেছেন।

যখন জুলুম-অত্যাচার সীমা অতিক্রম করল, গালিও দিত, জাদুকরও বলত, মিথ্যাবাদী, পাগলও বলা হত, উটের ভূড়ি মাথায় রেখে দিত, রাস্তায় কাটা বিছানো হত, কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হত, পাথর মারা হত আর পরিশেষে দেশ ত্যাগে বাধ্য করল। অতএব দেশছাড়াও করল ইত্যাদি। যখন জুলুমের সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন এ আয়াত নাযিল হলো–

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰي نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ

জিহাদের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে, যাদের উপর সীমাতীত জুলুম করা হয়েছে। এখন তারা মোকাবেলা করবে, প্রতিউত্তর দেবে আর আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। *[সূরা হজ : ৩৯]*

অতএব, রাসূলের দশ বৎসরের জীবন ছিল দাপট ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আর ১৩ বছর জীবন ছিল দরবেশী ও অল্পেতুষ্টির। দীর্ঘ তেরটি বছর হাত উঠানোর অনুমতি ছিল না, মদীনার জীবনে হাত উঠানোর অনুমতি পাওয়া গেল। কিন্তু দাপট ও শওকত জীবনের পূর্বে প্রস্তুতি ছিল মক্কার তের বছরের জীবন। কারণ,

১৩ বছর জীবনে তিনি তাঁর সাহাবীদের তারবিয়াত ও দীক্ষা দিয়েছেন। যুহ্দ ও অল্পেতুষ্টি, সবর ও লজ্জা, বীরত্ব ও দানশীলতা, ইত্যাদি গুণে ভরে দিলেন, যাতে তের বছর পর যখন তারা জিহাদের জন্য ময়দানে যাবে, তখন যেন নিজ খ্যাতির জন্য জিহাদ না করে। নফ্সানিয়াত তথা অহংকারের কারণে যেন না করে বরং একমাত্র খালেস আল্লাহর জন্য যেন ময়দানে আসে।

তো প্রথমে তের বৎসর তারবিয়াত দেওয়া হলো, যাতে নিষ্ঠাবান মুজাহিদ তৈরি হয়। পরিশেষে তারাই তলোয়ার উঠাবে এবং জিহাদ করবে। তারপর মক্কাবিজয় হলো, প্রভাব প্রতিপত্তির সূচনা হলো। আরো অনেক কাজ হলো। মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন ছিল দুভাগে বিভক্ত। আর এই উভয় বস্তু হযরত মসীহ আ.-এর মধ্যে বিদ্যমান। প্রথমত হযরত ঈসা আ.-এর নবুওয়াতের চল্লিশ বৎসরকাল তাঁর অবস্থা ছিল, ইতিহাস ছিল এমন যে, যদি তোমার বাম গালে কেউ পাথরাঘাত করে, তাহলে ডান গালকে এগিয়ে দাও, দুঃখ প্রকাশ করবে না, জবাব দেবে না, প্রতিশোধ নিবে না। হযরত মসীহ আ.-এর ধর্মে প্রতিশোধ নেওয়া জায়েয ছিল না; বরং ক্ষমা করা ওয়াজিব ছিল।

মোটকথা, তাঁর ধর্মে শিক্ষা ছিল এমন যে, যদি কেউ আঘাত করে, তাহলে মাথা পেতে মেনে নাও এবং বলো ভাই! আরেকবার আঘাত করে যাও, আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন। তাঁর এ জীবন ছিল কেমন যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কী জীবনের মতো, যাতে না ছিল হাত উঠানোর অনুমতি, না ছিল যবান খোলার অনুমতি। কিন্তু যখন জুলুম-অত্যাচার সীমালঙ্ঘন করল, ইয়াহুদীরা বলতে শুরু করল, ঈসা আ. কে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দাও, তখন আল্লাহ তায়ালা অন্য ব্যবস্থা করলেন। যে অভিশপ্ত লোকটি হযরত ঈসা আ.কে ফাঁসি দেওয়ার জন্য তাঁর রুমের ভিতর গেল, তাকে হযরত ঈসা আ.-এর সাদৃশ্য দিয়ে দিলেন। ফলে সেই ফাঁসিতে ঝুলল। তারপর হযরত ঈসা আ.কে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে আকাশে জীবিত উঠিয়ে নিলেন। দুনিয়বাসী চেয়েছিল, তাকে সর্বনিম্ন বেইজ্জতি করবে, যাতে দুনিয়াতে তাঁর অস্তিত্ব না থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি তাঁকে এত ইজ্জত সম্মান দিন যে, তাকে আকাশে অবস্থান করাব আর সে জীবিত থাকবে; তোমাদের হাতে মারা সম্ভব নয়।

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۞ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۞

> আর তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, না শূলীতে চড়িয়েছে। বরং তারা এরূপ ধাঁধাঁয় পতিত হয়েছিল। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধু মাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোনো খবরই রাখে না। আজ নিশ্চয় তারা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা নিজের কাছে। *[সূরা আন নিসা : ১৫৭-১৫৮]*

আল্লাহ তায়ালা এখানে দৃঢ়ভাবে এবং নিশ্চিতভাবে বলে দিলেন, তারা ঈসাকে ফাঁসীকে ঝোলাতে পারেনি, হত্যা করতে পারেনি বরং তারা তাদের সাথীকে ফাঁসীতে ঝুলিয়েছে হত্যা করেছে। অতএব, যেহেতু তিনি নিহত হননি এবং ফাঁসীতেও ঝুলেননি, তাই উঠিয়ে নেওয়ার অর্থ হবে, তাঁকে স্বশরীরে জীবিত উঠিয়ে নিয়েছেন। যদি হত্যা করা হত এবং ফাঁসী দেওয়া হত, তাহলে শুধু রুহ উঠিয়ে নেওয়া হত। কিন্তু হত্যা ও ফাঁসীকে নাকচ করে বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর উক্ত উঠানোটা জীবিতও হতে পারে, স্বশরীরেও হতে পারে।

সবকথার নির্যাস হলো, যেমনভাবে চূড়ান্ত জুলুম-অত্যাচারের প্রাক্কালে খাতিমুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, হিজরত করুন, দেশ ত্যাগ করুন, তেমনিভাবে হযরত ঈসা আ.কেও আদেশ দেওয়া হলো, তুমি জমিন থেকে আকাশে হিজরত করো। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জাতি চেয়েছিল, তিনি যেন মক্কায় না থাকেন, তাই তাঁকে এক দেশ হতে আরেক দেশে হিজরত করালেন আর ইয়াহুদিরা চেয়েছিল, হযরত মসীহ যেন দুনিয়াতে না থাকেন। এজন্য তাঁকে দুনিয়া হতে আকাশে হিজরত করালেন। অতএব, একজনের হিজরত ইয়াসরিব তথা মদিনার আর আরেকজনের হিজরত হয়েছিল আকাশে।

যেমনভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরতের পর পুনরায় জন্মভূমি মক্কায় ফিরিয়ে আনেন এবং দাপট ও প্রভাবের জীবন দান করেন; তাতে তাঁর হাতে তলোয়ার ছিল আর ফাসিক ও মুনাফিকদের জন্য এবং দুষ্কৃতিকারীদের জন্য তলোয়ার ছিল, কেসাস ছিল, তেমনিভাবে হযরত ঈসা আ.কে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আনা হবে, যাতে তাঁর যুহ্দ ও অল্পেতুষ্টির জীবনের পরিবর্তে তখন তাঁর হাতে তলোয়ার থাকবে, দাজ্জালের সাথে মোকাবেলা হবে, দাজ্জালের অনুসারীদের সাথে তলোয়ার দ্বারা যুদ্ধ হবে; হতাহত হবে। তিনি নিজে জিহাদ করবেন এবং দাজ্জালকে সমূলে ধ্বংস করবেন।

যেমনভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মক্কার মুশরিকদের জন্য জিযিয়া গ্রহণ করা হতো না, তাদের জন্য দুটি পথ খোলা ছিল। হয়তো মুসলমান, না হয় হত্যা। তেমনিভাবে যখন হযরত ঈসা আ. আগমন করবেন, তখন দুনিয়াবাসীর জন্য হয়তো ইসলাম, না হয় হত্যা, জিযিয়ার নিয়ম থাকবে না। অর্থাৎ জিযিয়া দিয়ে কেউ বাঁচতে পারবে না বরং জিযিয়া রহিত করে দেওয়া হবে। অতএব, এক্ষেত্রেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হযরত ঈসা আ.-এর সাদৃশ্য রয়ে গেছে। শানে রহমতে আছে, আছে খাতিমিয়্যাত গুণে, রয়েছে অনুসারীদের শানে রহমতে, হিজরতে এবং উভয়ের জীবনে। তাদের উভয়ের শুরু জীবন ছিল কঠোরতাহীন আর শেষ জীবন ছিল কঠোরতাপূর্ণ ও দাপটের সাথে। উক্ত সকল বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে।

হযরত ঈসা আ.-এর জন্মে মুহাম্মাদী সাদৃশ্যর দখল

আর তার মধ্যে উত্তম ও নেক হিসেবে আরো একটি বস্তু রয়েছে যে, হযরত শায়েখ গণি নাবলিসী রহ. কিছু তাবীঈর অভিমত বর্ণনা করেছেন। সেটি মাত্র একটি আছার ও তাবেঈদের কথা। তাকে বড় মাপের শরয়ী কোনো হুজ্জত বা দলিল মনে করা যাবে না। কিন্তু লতিফা পর্যায়ের এবং কোনো কিছুকে মজবুত ও দৃঢ়করণের জন্য পেশ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, হযরত ঈসা আ. যখন হযরত মরিয়ম আ.-এর পেটে এলেন, যার কাহিনী কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল আ. মানুষরূপে প্রকাশ হলেন–

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

> হযরত জিবরাঈল আ. একজন পূর্ণ মানুষের আকৃতিতে পুরা নওজোয়ানের সূরতে, অত্যন্ত সুন্দর ও সুঠাম দেহ নিয়ে আত্মপকাশ করলেন। তাঁকে দেখে হযরত মরিয়ম আ. ভয় পেয়ে গেলেন এবং বললেন–
>
> اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا•
>
> আমি তোমার থেকে দয়াময় আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। যদি তুমি মুত্তাকী ও আল্লাহভীরু হও, তাহলে তুমি কেন একজন যুবতী মহিলার নিকট একাকিত্বে এলে?

হযরত জিবরাঈল আ. বললেন–

قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ۝

ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি তোমার পরওয়ারদেগারের প্রেরিত পুরুষ এবং দূত হিসেবে এসেছি। আমি তোমাকে একজন পবিত্র ছেলে দান করে যাব।

হযরত মরিয়াম আ. বললেন–

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ۝

কিভাবে আমার ছেলে হবে; কোনো মানব তো আজ পর্যন্ত আমাকে স্পর্শই করেনি?

এক ব্যক্তির অভিমত অনুযায়ী তার অর্থ হলো, আজ পর্যন্ত কোনো মানবের সূরতকে আমি দেখিনি। আর আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো ব্যভিচারিণী ও ভ্রষ্টা নই। আমি পবিত্র এবং সতী নারী। সততার বিপরীত কোনো একটি কাজও কখনো আমার থেকে সংঘটিত হয়নি। মোটকথা, আমি সত্তাগতভাবে পবিত্র। আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি, যিনার সম্ভাবনা নেই। তারপরও কিভাবে ছেলে হবে? হযরত মরিয়ম আ. সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কথা বললেন। কিন্তু হযরত ঈসা আ. যিনি আগমনকারী ছিলেন অলৌকিক হিসেবে, সাধারণ নিয়ম মোতাবেক ছিলেন না। হযরত জিবরাইল আ. তখন বললেন–

قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۚ

এমনিতেই হবে, তোমার রব বলেছেন, তা আমার জন্য সহজসাধ্য। *[সূরা মরিয়ম : ২১, ১৭, ১৮, ১৯, ২০]*

যে আল্লাহ নর-নারীকে মিলিয়ে সন্তান দিতে পারেন, তিনি স্রেফ নর দ্বারাও সন্তান দিতে পারেন, শুধু নারী দ্বারাও দিতে পারেন অথবা উভয়ের ছাড়াও দিতে পারেন। হাওয়া-বাতাস থেকে সৃষ্টি করতে পারেন। এখন আমি বলি, হাজারো ধ্বংসাত্মক প্রাণী এবং মশা-বিচ্ছু রয়েছে। তাদের মাঝে নর-নারীর কোনো আলোচনা নেই; বাতাস থেকে জন্মে যায়। অতএব যে পরওয়ারদেগার নর-নারী ব্যতীত প্রাণী সৃষ্টি করতে পারেন, যিনি হযরত আদম আ.কে মাতাপিতাবিহীন সৃষ্টি করতে পারেন, যিনি হযরত হাওয়া আ.কে নারীর মাধ্যম ছাড়া পয়দা করতে পারেন, তিনি হযরত ঈসা আ.কে পিতা ব্যতীত কেন সৃষ্টি করতে পারবেন না?

যেহেতু তাঁকে অলৌকিকভাবে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন আর হযরত মরিয়ম আ. নিয়ম মোতাবেক প্রশ্ন তুললেন, তাই তিনি তা দূর করলেন। বলে দিলেন–

قَالَ كَذٰلِكَ

তোমার রবের উপর তা সহজসাধ্য; এতে প্রশ্ন উত্থাপনের কোনো কারণ নেই।

তিনি ফুঁ দিয়ে দিলেন আর হযরত মরিয়ম আ. গর্ভবতী হয়ে গেলেন। এখানে হযরত শায়েখ গনি নাবলিসী রহ. লিখেছেন, হযরত জিবরাঈল আ. যে পূর্ণ মানুষের আকৃতি ধারণ করলেন, এ ব্যাপারে কতক তাবেয়ীদের অভিমত হলো, হযরত জিবরাঈল আ. তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাদৃশ্য গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আকৃতি প্রকাশ হয়েছিলেন। তিনি বাস্তবে তো জিবরাঈল আ. ছিলেন; কিন্তু আকৃতিতে ছিলেন মুহাম্মাদী। ফু তো জিবরাঈল আ. দিয়েছেন; কিন্তু মুহাম্মাদী দিয়েছেন সূরত ধারণ করে।

সারকথা হলো, ঈসা আ.-এর জন্মে মুহাম্মাদী আকৃতির কিছুটা দখল ছিল এবং কিছুটা সাদৃশ্য অবশ্যই ছিল। এ কারণে গুণাবলিতে সাদৃশ্য, খাতিমিয়াতগুণে সাদৃশ্য, রহমতগুণে, অনুসারীদের তারবিয়াতে এবং জীবন যাপনে সাদৃশ্য। ঐ মোবারক সাদৃশ্যের প্রভাবে সর্বক্ষেত্রে সাদৃশ্য প্রকাশ পাচ্ছে।

হযরত মরিয়ম আ.-এর বৈবাহিক সম্পর্ক

এই কারণেই হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন হযরত মরিয়ম আ.কে স্ত্রী হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হবে। এতে পারস্পারিক সম্পর্ক বের হয়ে আসে যে, মুহাম্মাদী আকৃতির সামনে হযরত মরিয়ম আ. স্ত্রী হিসেবে ছিলেন। এখন ঐ সাদৃশ্যের সাথে হাকিকত এবং জাতকেও পেশ করা হলো যে, তিনি তাঁর স্ত্রী হয়ে যাবেন।

এই বিষয়গুলোকে লতিফা হিসেবে আরজ করেছি। এতে প্রমাণিত হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বামী বানিয়ে তাঁর আকৃতি পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু যে তাবেয়ীদের আসার আমি বর্ণনা করেছি, এটি এত শক্তিশালী দলিল ও হুজ্জত নয়। কিন্তু লতিফা এবং ঘটনা শক্তিশালীকরণের পর্যায়ে পেশ করা যায়। তবে এতে সদৃশ্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক প্রমাণিত হয়।

হযরত ঈসা আ.-এর সংস্কারক মাকাম

যখন এতটুকু পারস্পারিক সম্পর্ক রয়েছে এবং সম্পর্ক রয়েছে খাতিমিয়্যাত গুণে, তাহলে ঈসা আ. দাজ্জালকে হত্যা করার হকদার সবচেয়ে বেশি। যেহেতু

তিনি সন্তানতুল্য হলেন, তাহলে, পিতার মিশনে ও দীনে যখন কোনো বিপদাপদ আসবে, তখন ছেলেই বেশি হকদার হয়। বাপের পক্ষ হতে সেগুলো প্রতিরোধ করবে ও তত্ত্বাবধান করবে।

দাজ্জাল দীনে মুহাম্মাদীর ভিতর বিপদ ও ফেতনা সৃষ্টি করবে। তখন হযরত ঈসা আ. সবচেয়ে বেশি হকদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং দীনের সহায়তার জন্য সংস্কারক হিসেবে আগে বাড়বেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তিনি দীনে মুহাম্মাদীকে দুনিয়াতে পুনরায় দাঁড় করাবেন। সুতরাং তিনিই দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

ইসলামের বিজয়

হাদিস শরীফে এসেছে, দাজ্জালের সাথে অনেক ইয়াহুদী থাকবে। তাদের কিছুসংখ্যক নেককার থাকবে। তারা হযরত মাহদীর হাতে ঈমান গ্রহণ করে মুসলমান হবে। কারণ, হযরত মাহদী ঐ বরকতময় জিনিস বের করবেন, যা 'তাবুতে সাকিনাতে' রয়েছে। তাবুতে সাকিনার বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, তাতে হযরত মূসা আ.-এর মোবারক পাগড়ি থাকবে এবং আলওয়াহে তাওরাত (তাওরাতের কাষ্ঠফলক) থাকবে। তাবুতকে দাফন করা হয়েছে তার সন্ধান কেউ জানে না; কিন্তু হযরত মাহদীর জন্য তাকে প্রকাশ করা হবে। তখন যে সমস্ত ইয়াহুদীর মধ্যে সামান্য সৌভাগ্যও থাকবে, তারা ঈমান গ্রহণ করবে। তেমনিভাবে যে সকল খ্রিষ্টানের মধ্য সৌভাগ্য থাকবে, তারাও হযরত মাহদী আ.-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হবে।

পৃথিবীতে তিনটি সম্প্রদায় সবচেয়ে বড়। (১) মুসলিম (২) ইয়াহুদি (৩) খ্রিষ্টান। এ তিনটি জাতি বড় হিসেবে স্বীকৃত। তাদের মধ্য হতে ইয়াহুদী জাতি এভাবে খতম ও নিঃশেষ হয়ে যাবে যে, যাদের মধ্যে সামান্য কল্যাণ থাকবে, তারা ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করবে আর অবশিষ্টরা দাজ্জালের সাথী ও অনুসারী হবে এবং নিহত হবে। এভাবে একটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলীন হবে।

আর নাসারা জাতির ব্যাপারে এসেছে, তারা হযরত মসীহ আ.-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাবে। এভাবে নাসারা সম্প্রদায় বিলীন হবে। তারপর পৃথিবীতে শুধু একটি জাতি থাকবে। তারা হলো মুসলিম।

فَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

সারা বিশ্বে তখন একমাত্র দীন থাকবে ইসলাম।

সমগ্র পৃথিবী এক ধর্ম, এক মাযহাব এবং এক প্লাটফর্মে এসে যাবে। আর সারা বিশ্ববাসীর দৃষ্টিভঙ্গি এক হয়ে যাবে।

মোদ্দাকথা, যেমনভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় দশ বছর মুসলমানদের প্রভাব সর্বত্র কায়েম হয়েছিল এবং হিজাজ সম্পর্কে বলা হয়েছিল–

يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا

দলে-দলে মানুষ ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে, তেমনি হযরত মাসীহ আ.-এর সময়েও সারা পৃথিবীর চিত্র এমন হবে যে, মানুষ দলে-দলে ইসলাম গ্রহণ করবে। সবাই মুসলমান হয়ে যাবে।

পরিপূর্ণ দীনের প্রকৃত অবস্থান

কিরূপ পার্থক্য থাকবে?

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

দীনকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে।

তাকমিলে দীনের দুটি সূরত। একটি কাইফিয়াত হিসেবে পরিপূর্ণ, আরেকটি কামমিয়্যাত হিসেবে পরিপূর্ণ। একটি কাইফিয়াত বা অবস্থাগতভাবে এমন মুকাম্মাল ও পরিপূর্ণ হবে যে, প্রতিটি ব্যক্তি ব্যক্তি একেকজন দীনের মুজাস্সাম হয়ে যাবে। কেমন যেন প্রত্যেকেই দীনের বাতিতুল্য। আর সংখার দিক থেকে এমন মুকাম্মাল হবে যে, পৃথিবীতে অমুসলিম একজনও থাকবে না। সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। তখন বলা হবে, এখন সংখ্যার দিক থেকে দীন পরিপূর্ণ হলো। আর কাইফিয়াত হিসেবে এমন মর্তবায় পরিপূর্ণ যে, যদিও সংখ্যায় অল্প হয়; কিন্তু প্রত্যেকেই ইসলামি মুজাস্সাম হবে। অথএব নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমলিভাবে ইসলামকে পূর্ণতায় পৌঁছিয়েছেন। তিনি প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছেন, যারা তাঁর জাতের নমুনা ছিলেন এবং প্রতিজন ব্যক্তি ইসলামি মুজাস্সাম ছিলেন। এ কারণে উম্মতে মুসলিমার ঐকমত্য সিদ্ধান্ত হলো, নিয়ত, আদল ও ইনসাফ, কামালাত ও আখলাক এবং ইলম ও মারেফত হিসেবে اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ সাহাবারা সবাই সত্যের মাপকাঠি। তাদের চেয়ে বেশি মুত্তাকী ও পবিত্র মানুষ দুনিয়াতে নেই, হবেও না।

উম্মতে মুসলিমার মাঝে বড়-বড় গাউস-কুতুব পয়দা হবে; কিন্তু তাঁরা সাহাবাদের ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারবেন না। কেননা, স্বয়ং নবুওয়াতের সূর্য তাঁদেরকে নিজ হাতে তারবিয়াত দিয়েছেন এবং মাধ্যম ছাড়া সরাসরি নবুয়াতের সূর্যের আলো তাঁদের অন্তরে পড়েছে। অতএব নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের তাকমিল করেছেন কাইফিয়াত হিসেবে। সংখ্যা তো অল্পই ছিল, সারা পৃথিবীতে মাত্র এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পবিত্র আত্মাধারী লোক। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকে একেকজন উম্মতের সমতুল্য ছিলেন। তবে সংখ্যার তাকমিল বাকি ছিল, সংখ্যা হিসেবে দুনিয়াতে ইসলাম এমনভাবে প্রচার-প্রসার হবে যে, কোনো অমুসলিম থাকবে না। এ তাকমিল সর্বশেষ মুজাদ্দেদ হযরত ঈসা আ.-এর যুগে হবে। সব জাতি নিঃশেষ হয়ে একটি জাতি রয়ে যাবে,। তারা হলো মুসলিম জাতি। তখন সারা বিশ্বে এক ধর্ম ইসলাম কায়েম হবে।

ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয়

ইসলাম বিজয়ী হবে। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীম ইরশাদে হয়েছে–

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

আল্লাহ তায়ালা রাসূল পাঠালেন; হিদায়েত পাঠালেন, যাতে তারা ইসলামকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করেন, জয়যুক্ত করেন। *[সূরা তাওবা : ৩৩]*

পরিপূর্ণ বিজয়ের অর্থ হলো, পরাজিত বস্তুকে অস্তিত্বহীন এবং জিরো পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, যাতে শুধু বিজয়ীর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। সুতরাং একটি মাত্র দীন বাকি থাকবে। আর তা হলো হযরত খাতিমুল আম্বিয়ার দীন। এতে অনুমান করা যায়, হযরত মসীহ আ.-এর গুণাগুণ পারস্পারিক সম্পর্ক ও সাদৃশ্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পেয়েছেন- গুণাবলীতে, কর্মসমূহে, জীবন-যাপনে এবং জাত ও সত্তাতে এক কথায় সর্বক্ষেত্রে। আর সময়ের দিক থেকে সবচেয়ে কাছের নবী হলেন হযরত ঈসা আ.। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ঈসা আ.-এর মাঝে অন্য কোনো নবী আসেননি। সুতরাং যুগ হিসেবেও তিনি সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ রাসূলের সাথে। অতএব, তিনিই বেশি হকদার ছিলেন দীনে মুহাম্মাদীর খেদমত করার এবং বড় দাজ্জালকে হত্যা করার। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে হত্যা না করিয়ে, হত্যা করানো হবে তাঁর সাথে সাদৃশ্য রাখেন এমন ব্যক্তির দ্বারা, যার মধ্যে একই শক্তি তথা নবুওয়াত রয়েছে।

হযরত ঈসা আ.কে আকাশে তুলে নেওয়ার রহস্য

পাশাপাশি একটি উপকারিতা এও অর্জিত হলো যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন–

لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِيْ

বর্তমান সময়ে যদি মূসা জীবিত থাকতেন, তাহলে তাঁরও আমার দীন পালন করা ছাড়া উপায় ছিল না।

আমার দীনে প্রবেশ করে থাকতে হতো। আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একথাকে কার্যকরী রূপ দান করলেন। যে জাতির শুরু হয়েছিল হযরত মূসা আ.-এর আর শেষ নির্যাস হলেন হযরত ঈসা আ., তাঁকে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মত বানিয়ে পাঠাবেন, যাতে বনী ইসরাঈলের সকল নবী উম্মাতে মুহাম্মাদীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ, সর্বশেষ থেকে যে জিনিস প্রকাশ পায়, তা সারা মজলিসের পক্ষ থেকে মনে করা হয়। অতএব আল্লাহ তায়ালা তাকে আকাশে তুলে নিয়ে রাসূলের কথাকে বাস্তব রূপ দান করলেন। মোটকথা, খাতিমুদ্দাজ্জালের আবির্ভাব খাতিমুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেই হওয়া উচিত, অন্যান্য নবীদের যুগে নয়। কারণ, তার হাকিকী মোকাবেলা নবীজির সাথেই। বেলায়েতের রূহানিয়াত তার মোকাবেলায় যথেষ্ট নয়। নবুওয়াতের রূহানিয়াত জরুরি ছিল। আর তাতেও খতমে নবুওয়াতের কিছু না কিছু শান ও সাদৃশ্যর প্রয়োজন ছিল, যাতে তিনি খাতিমুল আম্বিয়ার পক্ষ হতে হত্যাকারী হতে পারেন। এ কারণেই হযরত ঈসা আ.কে জীবিত আকাশে উঠিয়ে নিলেন।

আরেকটি কারণ ছিল, ইয়াহুদী জাতি তাঁকে সর্বোনিম্ন বেইজ্জতি ও অপদস্থ করতে চেয়েছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সর্বোচ্চ ইজ্জত দিলেন যে, তোমরা তাঁকে জমিনে রাখতে চাচ্ছ না; আমি তাঁকে আকাশে হেফাজত করব। তোমরা তাঁর মৃত্যু কামনা করেছ, আমি তাঁকে জীবিত আকাশে বাঁচিয়ে রাখব।

এখন পরবর্তী যত বর্ণিত মাসায়েল রয়েছে, এ ব্যাপারে হাদিসসমূহে অনেক বিষয়বস্তু উল্লেখ রয়েছে। আর উপরের বিষয়টি লতিফা এবং গোপন রহস্য পর্যায়ের জিনিস। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, উঠিয়ে নেওয়ার উপকারিতা কী ছিল, তখন উত্তরে বলা হবে, এই এই উপকারিতা ছিল। কিন্তু মুয়ামালার ভিত্তি মাসলেহাতের উপর নয় বরং রেওয়ায়েতের উপর, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তার মধ্য হতে যদি একটিরও উপকারিতা আমরা না জানি, তাহলেও হুকুম নিজ-নিজ স্থানে সঠিক।

ইসলামের শানে খাতিমিয়্যাত

কিন্তু ইসলাম ধর্মের একটি শানা হলো খাতিমিয়্যাত তথা শেষ পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, পরিণাম বুঝে কাজ করা। ইসলামে যত আদেশ রয়েছে, তাতে অবশ্যই হিকমত আছে। যত হুকুম এসেছে, তাতে কোনো-না-কোনো কারণ অবশ্যই আছে। যতগুলো হেদায়েত দেওয়া হয়েছে, সেগুলোতে কোনো-না-কোনো উপকারিতা অবশ্যই আছে।

عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ. وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

খাতিমিয়্যাত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি ও আমার সাহাবীরা অন্ধ ও বধিনের ন্যায় না জেনে, না শুনে কোনো কিছু করেন না। বরং জেনে, বুঝে ও শুনে দলিল ও প্রমাণসহ গ্রহণ করেন। দীনে ইসলাম হলো দীনে বসীরত তথা ধীশক্তিসম্পন্ন। দীনে ইসলাম কিছু প্রথার সমষ্টিগত নাম নয় যে, কিছু রেওয়াজ-রীতি একত্র হয়েছে, যেগুলোর কোনো উপকারিতা জানা নেই, কোনো কারণ জানা নেই, কোনো হিকমত জানা নেই। শুধু বাপ-দাদা হতে শুনেই আমল করে ফেলেছি। যেমনভাবে অন্যান্য ধর্মে রসুম-রেওয়াজের আধিক্য রয়েছে। তাদের রসুমের উপকারিতা জিজ্ঞেস করলে বলবে–

اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَآءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ

> আমার আমাদের বাপ-দাদাকে এমনভাবে করতে দেখে এসেছি। আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত কোনো হিকমত ও কারণ নেই।

অতএব, ইসলাম এমন ধর্ম নয়, ইসলামে যত হুকুম আছে সবগুলোতে হিকমত আছে, সবগুলোতে হিকমত আছে, যত আমর আছে, যত হেদায়েত আছে সেগুলোতে কোনো-না-কোনো উপকারিতা অবশ্যই আছে। এমনিভাবে প্রতিটি কাজের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন আরেফগণ। কিন্তু হুকুমের বুনিয়াদ উপকারিতার উপর নয়। আমরা যদি একটি উপকারিতাও না জানতে পারি, তাহলেও আমরা তার উপর ঈমান আনব, বিশ্বাস রাখব, যা আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেছেন। এতে এক প্রকার প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ হয়। আর যখন

উপকারিতা জানা হয়ে যাবে, তখন তা আরো বৃদ্ধি পাবে যে, উপকারিতা জানা হয়ে গেল। কিন্তু স্বয়ং ঈমান উপকারিতার উপর নির্ভরশীল নয়।

দাজ্জাল থেকে বাঁচার দোয়া করার হিকমত

যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জমানায় যদি দাজ্জালের আবির্ভাব হয়ে যেত, তাহলে তার ফেতনা নাউযুবিল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কিছুটা প্রভাব ফেলত। রাসূলের দোয়ার ভিতর দাজ্জাল প্রকাশ হওয়া না হওয়ার উল্লেখ নেই। শুধু দাজ্জাল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

হে আল্লাহ! আমি দাজ্জালের ফেতনা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।

এই দোয়া দ্বারা উম্মতকে তালিম দেওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যাদেরকে দাজ্জালের সাথে মোকাবেলা করতে হবে, তাদের উপর ফরজ হলো এই দোয়া করা, আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া। অথবা জুমআর দিন সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করবে। যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করবে, সে দাজ্জালের ফেতনা হতে বেঁচে থাকবে।

দ্বিতীয়ত দাজ্জাল দু-ধরনের (১) আসল বা জাতি দাজ্জাল (২) দজল গুণে গুণান্বিত ফেতনা। তার গুণাগুণ ও ফেতনা তার প্রকাশের উপর মওকুফ নয়। তার আগমনের নিকটবর্ত সময়ে দজল ও ফাসাদের নিদর্শন-প্রভাব শুরু হয়ে যাবে। সেগুলো হবে তার প্রকাশ পাওয়ার আলামত। যেমনভাবে সূর্য উদিত হওয়ার প্রায় দুঘন্টা পূর্বে কিছু-কিছু সাদা রং এবং আলো প্রাকশ পেতে শুরু করে অথবা যেমনভাবে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে–

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ شَيْئًا هَيَّاَ لَهٗ اَسْبَابَهٗ

যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো জিনিসের ইচ্ছা করেন, তখন তার পূর্বে সেই জিনিসের উপায়-উপকরণ ছড়িয়ে দেন যে, আস্তে-আস্তে একসময় তা প্রকাশ করবেন। কিন্তু পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ আসবাব বিছিয়ে দেন। তেমনিভাবে দাজ্জাল প্রকাশ হওয়ার পূর্বেও তার উপায়-উপকরণ প্রস্তুত হবে। মানব অন্তরে তার কথা গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। অতএব দজল ও ফাসাদাত হলো তার নিদর্শন বা আলামত। তবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া করা

নমুনাস্বরূপ, যাতে পরবর্তীরা জানতে পারে যে, দাজ্জাল প্রকাশ হলে এই দোয়া করতে হবে।

হযরত ঈসা আ.-এর আবদিয়াত বা দাসত্ব

হাদিসসমূহে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ঈসা আ. ফেরেশতাদের কাঁধে ভর করে মসজিদে আকসার ছাদে অবতরণ করবেন। তাঁর পোশাক সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর গায়ে দুটি চাদর থাকবে। একটি হলদে রংয়ের আর অপরটি গেরুয়া রঙের। অর্থাৎ যুহ্দ ও অল্পেতুষ্টি প্রকাশ পাবে এমন রঙের কাপড় পরিহিত থাকবে। তিনি ছাদে এসে বলবেন, সিঁড়ি লাগাও। আকাশ ও মধ্যখানে ফাঁকা স্থানটুকু তো ফেরেশতাদের মাধ্যমে আসবেন। অর্থাৎ বাতেনী উপকরণের মাধ্যমে আসবেন। আর যখন ছাদের উপর অবতরণ করবেন, তখন মাদ্দী দুনিয়ার উপকরণ শুরু হয়ে যাবে। তখন তিনি জন্মগত বা মাদ্দী আসবাব তালাশ করবেন, বলবেন সিঁড়ি লাগাও, যাতে আমি নিচে নেমে আসতে পারি। অন্যথায় তিনি ফেরেশতাদের মাধ্যমে নিচে নেমে আসতে পারতেন। কিন্তু ফেরেশতারা তো এমন স্থান পর্যন্ত পৌঁছলেন, যেখানে পৌঁছার জন্য দুনিয়ার কোনো উপকরণ ছিল না। আর যেখান থেকে উপকরণ শুরু হলো, সেখান থেকে উপকরণ গ্রহণ করলেন। কেননা, আবদিয়াতের প্রকাশ এখানেই যে, উপকরণ ত্যাগ করা যাবে না; বরং গ্রহণ করতে হবে।

তিনি যখন আগমণ করবেন, তখন নামাযের সময় হবে, তখন হযরত মাহ্দী বিনয় ও সম্মান দেখিয়ে বলবেন, হযরত! আপনি নামায পড়ান। তিনি বলবেন, না, এই উম্মত আল্লাহর কাছে বড়ই সম্মানিত; তোমাদের ইমাম তোমাদেরই মধ্য হতে একজন হবে, নামায পড়ানোর হকদার আপনিই। তখন হযরত মাহ্দী নামায পড়াবেন। উক্ত ঘটনাটি অনেক বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ঈসা আ.-এর সমাধি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. তাঁদের উভয়ের কবর মোবারকের মাঝে একটি কবরের স্থান খালি রয়েছে। হাদিস শরীফে এসেছে, হযরত ঈসা আ. ওখানে কবরস্থ হবেন। তাঁর সন্তানাদিও হবে। যখন তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তখন অবিবাহিত ছিলেন। পুনরায় যখন পৃথিবীতে আগমন করবেন, তখন বিবাহ করনেব, সন্তানাদি হবে। তারপর ইন্তেকাল হবে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর মোবারকের পার্শ্বে কবরস্থ হবেন।

উদাহরণস্বরূপ এটি এমন হতে পারে যে, কারো সন্তান কোনো বড় কীর্তি করে বাপের উপর হতে বিপদকে দূর করে এবং বিজয়ী বেশে ফিরে আসে যে, আমি আপনার মিশনকে সম্পূর্ণরূপে হেফাজত করেছি। তখন পিতা শাবাশ প্রদান করে নিজ বগলে টেনে নেন। সন্তান বলে, আমি দাজ্জালকে হত্যা করেছি, পৃথিবীতে দীনের প্রসার-প্রচার ঘটিয়েছি। তখন পিতা বলেন, এখন আমার সকাশে এসে যাও; এ তোমার হক ও অধিকার।

হযরত মাহদীর আত্মপ্রকাশের আলামত

হযরত ঈসা আ.-এর আগমণের ব্যাপারে যেরূপ বিস্তারিত তাফসীর রয়েছে, তেমনিভাবে হযরত ইমাম মাহদী আ.-এর প্রকাশের ব্যাপারেও বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. এ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। তাতে এ সম্পর্কিত হাদিসসমূহ রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু সহি, কিছু হাসান, কিছু দুর্বল হাদিস রয়েছে। কিন্তু সবগুলোই দলিল গ্রহণ করার যোগ্য সেসব হাদিস এনেছেন এবং সকল আলামত উল্লেখ করেছেন। হযরত মাহদী আ.-এর বংশধারা, তাঁর হুলিয়া এবং তাঁর জাহির হওয়ার বৈশিষ্ট্য। আবার তাতে নিকটবর্তী আলামত ও দূরবর্তী আলামত উভয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। কিছু এমন আলামত থাকবে, যেগুলো একেবারে প্রকাশ পাওয়ার নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে।

উদাহরণস্বরূপ সবচেয়ে নিকটবর্তী নিদর্শন সম্পর্কে বলা হয়েছে, হেজাযে স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ পাবে। হেজাযে স্বর্ণের খনি প্রকাশ পেয়েছে। আরো বলা হয়েছে, ভূমি নিজের ধনভাণ্ডার ও খনিজ সম্পদ উগড়ে ফেলতে শুরু করবে। সুতরাং আজ হেজাযে গিয়ে দেখুন সেখানে পানি রয়েছে, সব ধরনের সবজি উৎপন্ন হচ্ছে। এমনিভাবে ধাতব পদার্থের আলামতও প্রকাশ পাচ্ছে।

ঘটনা হলো, হেজায ভূমি আজ স্বর্ণ উগড়ে ফেলতে শুরু করেছে। দুনিয়ার কোনো দেশে এত সম্পদ নেই, যা রয়েছে আরব দেশে। আল্লাহ তাদের স্বচ্ছল করে দিচ্ছেন। এগুলো হযরত মাহদী আ.-এর আগমনের নিদর্শন।

মিনায় ঘোরতর যুদ্ধ

কিন্তু সবচেয়ে নিকবর্তী নিদর্শন হলো, তিনি যে বৎসর প্রকাশ পাবেন, সেই বৎসর মিনার ময়দানে, হেজাযে পরস্পর ভয়াবহ যুদ্ধ হবে। তিনি প্রকাশ পাবেন মক্কায়। মিনা ময়দানে এমন ভয়াবহ ও তুমুল যুদ্ধ হবে যে, জামরায়ে আকাবা

তথা শয়তানকে পাথর মারার স্থান রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে এবং হাজার-হাজার মানুষ পরস্পর একজনের হাতে অপরজন নিহত হবে। যুদ্ধের শেষে দেখা যাবে, শুধু ৩১৩ জন জীবিত রয়েছে আর অবশিষ্ট সবাই নিহত হয়েছে। তখন তাদের মনে চিন্তা জাগ্রত হবে যে, আমাদের তো একজন নেতা বা সর্দার প্রয়োজন; অন্যথায় আমরাও নিঃশেষ হয়ে যাব। এখন আমরা কোথায় যাব? তারপর তারা মক্কায় ফিরে আসবে। তারা জানতে পারবে, মিনায় যুদ্ধ হওয়া এবং জামরায়ে আকাবা রক্তাক্ত হওয়া হযরত মাহদীর প্রকাশ হওয়ার আলামত। তখন তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে, হযরত মাহদী প্রকাশ হবেন, তিনি মক্কায় থাকবেন।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা সবাই হযরত মাহদীর নিকট যাবে। তখন তিনি মদিনার পথ ধরবেন। তারা সেখানেও যাবে এবং নেতা হওয়ার প্রস্তাব দেবে। কিন্তু তিনি নীরব থেকে আবার মক্কার পথ ধরবেন। তারা সেখানেও যাবে এবং নেতা হওয়ার প্রস্তাব দেবে। কিন্তু নীরব থেকে আবার মক্কার পথ ধরবেন। তারা তাঁকে মাতাফের নিকট ঘিরে ধরবে। তখন তিনি বলবেন, আমি এমন জাতির জিম্মাদারী গ্রহণ করি না, যারা পরস্পরে এমন ভয়াবহ ও জঘন্য রক্তাক্তে মেতে ওঠে। তোমাদের উপর কী ভরসা আছে? তিনি তাদের ধমকাতে শুরু করবেন। তারপর অনেক অনুনয়-বিনয় করে রাজি করাবেন, তারা তাঁর হাতে বাইয়াত হবে। এ সম্পর্কে সহি বোখারী শরীফে একটি বর্ণনা এসেছে, তখন গায়েব থেকে একটি আওয়াজ ভেসে আসবে–

هٰذَا خَلِيْفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ. فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَطِيْعُوْهُ

তিনি আল্লাহর খলিফা মাহদী। তার কথা কোনো এবং আনুগত্য করো।

শামের বিশ্বযুদ্ধ

যখন মাহদী আ. তাদের থেকে বাইয়াত নিবেন, তখন তাঁর আবির্ভাবের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং প্রসিদ্ধি লাভ করবে। তখন ইরাকের বুযুর্গগণ, আবদাল ও হিন্দুস্তানে কুতুবগণ সারা বিশ্বে যে সকল মুসলমান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে এবং একেবারে সর্বনিম্ন ঈমানও দুর্বল অবস্থায় থাকবে। তারা সবাই কালো পতাকার নিচে সমাবেত হয়ে খোরাসান হতে রওনা হয়ে শামের দিকে এগুতে থাকবে, যাতে হযরত মাহদীর দলে মিলিত হতে পারে। হযরত মাহদী শামকে নিজের কেন্দ্র বানাবেন। সেখানেই মালহামায়ে কুবরা তথা ভয়াবহ রক্তাক্ত যুদ্ধ হবে, যার সম্পর্কে হাদিস শরীফে এসেছে, রণাঙ্গনের এরিয়া এত

বিস্তৃত হবে যে, কাক যে প্রাণী সবচেয়ে উড়ে সে সারা দিন উড়ে চলবে এবং তার নিচে শুধু লাশ আর লাশ পড়ে থাকবে আর কাক দেখতে দেখতে উড়ে চলবে। এত বড় হবে যুদ্ধের ময়দান।

এতে বোঝা যায়, এ যুদ্ধ শুধু তলোয়ার আর তোপ-কামান দ্বারা হবে না, যেহেতু হাজার-হাজার মাইলব্যাপী যুদ্ধের ময়দান হবে, তাই তাতে যান্ত্রিক অস্ত্রও থাকবে। অন্যথায় যদি এক মাইল ময়দানে যুদ্ধ হত, তাহলে হয়তো এক লাখ বা দু'লাখ মানুষের যুদ্ধ হবে। না হয় দুই বা দশ মাইল এরিয়া হবে। কিন্তু যেহেতু হাজার হাজার মাইল এলাকা জুড়ে নিহতরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে; এতে প্রতীয়মান হয়, যুদ্ধের ময়দান হবে বিশাল অঞ্চল জুড়ে এবং যুদ্ধ হবে বিশ্বব্যাপী।

পশ্চিমা শক্তির পরাজয়

আলেমগণ লিখেছেন, সেই বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমা শক্তি পরাস্ত হবে, ভেঙ্গে যাবে। তখন থেকে মুসলমানদের উন্নতি শুরু হবে এবং সারা বিশ্বে দীন হবে একটি আর তা হলো ইসলাম। তখন বিশ্বে পরাশক্তি থাকবে নাসারা তথা খ্রিস্টবাদ। হযরত মাহদী আ. তাদের শক্তি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবেন। এতে প্রমাণিত হয়, মুসমি জাতির যদি কারো সাথে সারাক্ষণ মোকাবেলা হয়, তাহলে তারা হবে খ্রিষ্টান জাতি।

মুশরিকদের সাথে ইসলামের মোকাবেলা

ইসলামের সর্বপ্রথম মোকাবেলা হয়েছে আরব মুশরিকদের সাথে; কিন্তু তা নিঃশেষ হয়ে যায় এভাবে যে যখন মক্কা বিজয় হয় বা তারা ইসলামে প্রবেশ করে ফেলে অথবা নিহত হয়ে যায় অথবা দেশ ত্যাগ করে ফেলে ইত্যাদি। হাদিস শরীফে এসেছে, তখন বলা হলো, আজ শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে যে, আজ থেকে আরব উপদ্বীপে তার উপাসনা হবে না। আজ থেকে এখানে আর দ্বিতীয় দীন আসবে না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর ফেরকা ও দলাদলি সৃষ্টি হবে। তবে এখানে অন্য কোনো ধর্ম ইসলামের মোকাবেলায় আসতে পারবে না। অর্থাৎ হেজাযে মুশরিকদের সাথে মোকাবেলা আজ থেকে চিরতরে খতম হয়ে গেল।

অগ্নিপূজারিদের ইসলামের মোকাবেলা

ইসলামের দ্বিতীয় মোকাবেলা হয় অগ্নিপূজারিদের সাথে। তাদের বিরাট দাপট ও প্রভাব ছিল। কিসরার রাজত্ব তাদের ছিল। সারা ইরান ও খুরাসান তাদের হাতে ছিল। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসারার নামে ফরমান লিখে দাওয়াত দিয়েছিলেন। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দাওয়া নামাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সেই সংবাদ পান, তখন বলেছিলেন, 'কিসরা আমার পত্রকে টুকরো-টুকরো করেছে; আল্লাহ তার দেশকে টুকরো-টুকরো করবেন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত ওমর ফারুক রা.-এর যুগে বাস্তবায়িত হয়েছে। আর তা এভাবে যে, তখনকার সম্রাট কিসার পারভেজ ইরানের সম্রাট ছিল।

একদিন শক্তিবর্ধক ঔষধ পান করার জন্য দাওয়াখানায় প্রবেশ করল। সে ভুলে উত্তেজক ঔষধ খেয়ে ফেলল, যা ছিল বিষজাতীয়। ফলে সে সেখানেই মারা যায়। তার মৃত্যুর পর তার মা হুকুমত দাবি করল। বিভিন্ন সর্দাররা পৃথক পৃথকভাবে সম্রাট হওয়ার দাবি করে বসল। ফলে সারা দেশ সম্রাটে ভরে যায় এবং রাষ্ট্র টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী, যা হযরত ওমর ফারুক রা.-এর আমলে বাস্তবায়িত হয়েছিল। সারা ইরান ও খুরাসান বিজয় হলো। এমনিভাবে অগ্নিপূজারিদের সাথে মোকাবেলার পরিসমাপ্তি ঘটল। তারাও নিঃশেষ হয়ে যায়।

ইয়াহুদিদের সাথে ইসলামের মোকাবেলা

তৃতীয় মোকাবেলা হয় ইয়াহুদীদের সাথে। হেজাযে তাদের সাথে মোকাবেলা হয় মদিনা ও খায়বারে। সেখানে তাদের বসতি ছিল। তাদের দুটি বড় কবিলা ও গোত্র ছিল। একটি বনু কুরাইজা, অপরটি বনু নজির। যখন তারা একের পর এক গাদ্দারি ও ওয়াদা ভঙ্গ করল, তখন পরিশেষে তাদের পরিণতি এমন হয়েছিল যে, বনু কুরাইজাকে হত্যা করা হলো আর বনু নজিরকে নির্বাসন করা হলো। পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন দেশে গিয়ে বসবাস করেছে। সুতরাং হেজাযে ইয়াহুদীদের সাথে মোকাবেলা আজীবনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

খ্রিস্টবাদের সাথে সর্বকালীন মোকাবেলা এবং তার পরিণাম

এখন রয়ে গেল নাসারা-খ্রিস্টান জাতি। তাদের রোম ইত্যাদি স্থানে পৃথক দাপট ও প্রভাব ছিল। আর কায়সার ছিল তাদের সম্রাট। তাদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি, তাদের সাথে আমাদের মোকাবেলা খতম ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বরং তিনি বলেছেন–

اَلرُّوْمُ ذَوَاتُ الْقُرُوْنِ اِذَا هَلَكَ قَرْنٌ خَلَفَهٗ قَرْنٌ اَلْحَرْبُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سِجَالٌ يَنَالُوْنَ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُمْ

রোমানদের বংশপরম্পরার দীর্ঘ যুগ ও স্তর রয়েছে। তাদের মাঝে ও আমাদের মাঝে যুদ্ধের অবস্থা এমন থাকবে, যেমন বালতির রশির ন্যায় কখনো নিচে যায়, কখনো উপরে ওঠে। কখনো তারা বিজয়ী হবে, কখনো আমরা বিজয়ী হব, কখনো তারা পরাজিত হবে, কখনো আমরা।

হাজার বছর পর্যন্ত মুসলমানরা বিজয়ী ছিল। তারপর থেকে তাদের বিজয় ও প্রাধান্য শুরু হয়। তিন-চারশো বৎসর ধরে তারা বিজয়ী আর মুসলিমরা পরাজিত। হযরত মাহদী আ. যখন প্রকাশ পাবেন, তখন মুসিলমরা বিজয়ী হবে আর নাসারারা পরাজিত হবে। আর এমনভাবে বিজয়ী হবে যে, নাসারা জাতি ঈমান গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাবে। তারপর নাসারা জাতি মুছে যাবে।

মোটকথা, তাদের ব্যাপারে সর্বকালীন মোকাবেলার কথা বলা হয়েছে। অন্য কোনো জাতির ব্যাপারে সর্বকালীন মোকাবেলার কথা বলা হয়নি। অন্যদের সাথে সাময়িক মোকাবেলা হবে। তার অবস্থা এমন যে, তারা কখনো বিজয়ী হবে, কখনো আংশিকভাবে, কোনো স্থানে তারা বিজয়ী হবে, কোনো স্থানে আমরা বিজয়ী হব। কোনো এলাকায় তারা পরাজিত হবে, কোনো স্থানে আমরা পরাজিত হব। কাগানে কখনো আমরা বিজয়ী, তারা পরাজিত। কখনো তারা বিজয়ী, আমরা পরাজিত।

তুর্কিস্তানে একই অবস্থা ছিল। হিন্দুস্তানেও একই পরিস্থিতি। ইরাকেও একই হালত। জয় পরাজয় চলছেই। পরিশেষে হযরত মাহদী আত্মপ্রকাশ করলে তাদের দাপট নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন তাদের সাথে মোকাবেলারও সমাপ্তি ঘটবে। যেমনভাবে ইতোমধ্যে অন্যান্য জাতির সাথে পরিসমাপ্তি হয়ে গেছে।

হযরত মাহদী আ.-এর মুজাদ্দিদী মাকাম

যিনি মুজাদ্দিদ হবেন, তারা জানা থাকার প্রয়োজন নেই যে, আমি একজন মুজাদ্দিদ। কিন্তু তার ভিতর সংস্কারের জযবা-আগ্রহ থাকে এবং আমলও তা-ই করেন, যা একজন মুজাদ্দিদ করে থাকেন। পরবর্তীতে তার আমল ও সংস্কারমূলক কার্যাবলির দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে, তিনি একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন, সংস্কারক ছিলেন। অতএব মুজাদ্দিদের জন্য জরুরি নয় যে, তার নিজের ব্যাপারে জানতে হবে, তিনি একজন মুজাদ্দিদ। আবার মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি করাও অত্যাবশ্যক নয়। বরং তার আমল তাজদীদি বা সংস্কারমূলক হলে নিজে নিজেই মনে উদয় হয় যে, তিনি সংস্কারমূলক কাজ করছেন। তবে এমন ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত যাঁরা আল্লাহর পক্ষ হতে হুকুমপ্রাপ্ত এবং তাঁদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে দাবি করার জন্য, তাঁরা দাবি করতে পারেন। কিন্তু স্বয়ং মাকামে তাজদীদের জন্য জরুরি নয় একথা জানা যে, আমি একজন মুজাদ্দিদ। তবে তার থেকে তেমনি কাজ সম্পাদন হবে, যেমনটি হয়ে থাকে একজন মুজাদ্দিদের কর্ম।

হযরত ঈসা আ.-এর ন্যায়পরায়ণতা

হযরত মাহদী আ. বিশাল যুদ্ধে লিপ্ত হবেন তার বিস্তারিত আলোচনা সামনে হবে, তিনটি যুদ্ধ হবে, তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় যুদ্ধটির নাম হল, 'মালহামায়ে কুবরা' সেই যুদ্ধে এত পরিমাণ লোক নিহত হবে যে, মুসলমানদের বিজয় তো হবে কিন্তু বিজয়ে খুশি ও আনন্দ থাকবে না। এই যুদ্ধের পর পুনরায় মুসলমানদের উন্নতি শুরু হবে। হাদিস শরীফে এসেছে হযরত ঈসা আ. ষাঠ বৎসর রাজত্ব করবেন, বিশ্ব পরিচালনা করবেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও পূর্ণ ইনসাফের ফলে সারা বিশ্বে এমন শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে যে, হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মানুষ ও সাপের বাচ্চারা এক সঙ্গে খেলাধুলা করবে। সাপের বাচ্চার মনে এমন আশঙ্কা থাকবে না যে, আমাকে মেরে ফেলবে আর মানুষের বাচ্চার মনেও আশঙ্কা থাকবে না, আমাকে কামড় দেবে। আর ছাগল ও বাঘ এক ঘাটে পানি পান করবে। তাদে মধ্যেও শান্তি বিরাজ করবে। ছাগলও নিজের মধ্যে আমান অনুভব করবে। ইনসাফের ফলে এমন বরকত হবে যে, হাদিস শরীফে এসেছে, আঙ্গুরের একটি ছড়ায় এত পরিমাণ আঙ্গুর ধরবে, যা একটি পরিবার এবং একটি গোষ্ঠীর জন্য যথেষ্ট হবে। সবাই পেট ভরে খেতে পারবে। একটি বকরি এত পরিমাণ দুধ দেবে যে, তার দুধ দ্বারা একটি কবিলা

পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। এত বেশি বরকত হবে যে, একজন ধনবান ব্যক্তি যাকাত ও সাদকার মাল দেওয়ার জন্য বের হবে। সে যাকেই দিতে চাইবে, সবাই বলবে, আমাদের ঘরে সম্পদের স্তূপ পড়ে রয়েছে, তুমি সামনে নিয়ে যাও। যাকেই দেবে কেউ গ্রহণ করবে না। সবাই বলবে, আমার ঘরে অনেক মজুদ রয়েছে। এত পরিমাণ উন্নতি ও বরকত হবে। হযরত ঈসা আ.-এর ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের কারণে।

কেননা, ইনসাফের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হলো শান্তি ও আরাম। আর মনে যখন শান্তি বিরাজ করে, তখন মানুষ প্রতিটি বস্তুতে বরকত অনুভব করে। এ কারণে যে বাদশাহ ও সম্রাট ন্যায়বিচারক হন, তার নিদর্শন এরূপ যে, তার মাঝে প্রশান্তি বিরাজ করে। অন্যথায় অস্থিরতা বিরাজ করে। কারণ, জুলুম-অনাচারে কখনো নিরাপত্তা ও শান্তি আসে না। প্রশান্তি ইনসাফে রয়েছে। তাই কোনো রাষ্ট্রের মানুষেরা যদি মনে প্রশান্তি ও স্থিরতা অনুভব করে, তাহলে বুঝতে হবে, বাদশাহর নিয়ত ভাল এবং তিনি ন্যায়বিচার করছেন।

ইনসাফের বাহ্যিক বরকত

বাহ্যিকভাবে ইনসাফের বরকত প্রকাশ পায়। বাদশা হারুন রশীদ একবার শিকার করার জন্য জঙ্গলে গেলেন। তিনি শিকারের পিছে দৌড়তে দৌড়তে তাঁর সৈন্যবাহিনী হতে অনেক দূরে চলে যান। তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে যান। তার অনেক তৃষ্ণা লাগে। তিনি দেখতে পান, একটি সুন্দর বাগান। তাতে তিনি প্রবেশ করেন। বাগানের মালিক ছিলেন একজন বৃদ্ধ মানুষ। তিনি তার নিকট গিয়ে বললেন, হে ভাই! পানি থাকলে আমাকে পান করতে দিন। বাগানের মালিক তার অবয়ব ও সাজ-পোশাক দেখে বুঝতে পারলেন, তিনি কোনো সাধারণ ব্যক্তিত্ব নন; বরং বড় কোনো ব্যক্তিত্ব হবেন, আমীর হবেন।

মালিক তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বসালেন। তারপর একটা আনার ভেঙ্গে তা নিংড়িয়ে রস বের করলেন। একট আনারের রসে পূর্ণ গ্লাস ভরে গেল। তা তিনি বাদশাকে পান করালেন। আনারটি অত্যন্ত মিষ্টি ছিল। বাদশাহ হারুন রশিদ মনে মনে ভাবলেন, এত বড় বাগান আমার নিকট নেই। ইনি কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি, যার এই বাগান। আমি ফিরে যাওয়ার পর এই বাগানটিতে হস্তগত করব। এ বাগানটি একজন বাদশাহর জন্য মানানসই, অন্যদের জন্য নয়। চাই টাকা ও মূল্য দিতে হয় দেব নতুবা জবরদখল করব। কিন্তু বাগান আমার হতে হবে যে কোনো উপায়ে। তারপর কিছুক্ষণ আরাম করলেন, বিশ্রাম নিলেন। তিনি যখন উঠতে যাবেন। সেই সময় মালিককে বললেন, হে ভাই! আরো কিছু

পানি পান করা পুনরায় একটি আনার ভাঙ্গলেন। এবার তিনি আনারাকে অনেক নিংড়ালেন; কিন্তু আধা গ্লাসের বেশি হলো না। তখন হারুন রশিদ বললেন, একই বৃক্ষ্য একই ফল; এখন গ্লাস হলো না কেন?

বৃদ্ধ মালিক বললেন, মনে হয় বর্তমান বাদশাহর নিয়তে গরমিল হয়ে গেছে। হারুন রশিদ ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। কারণ, বাদশা তো তিনি নিজেই ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মনে মনে তাওবা করলেন, ইস্তিগফার পড়লেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমি পাপী; আমি এ বাগানকে কখনো হস্তগত করব না; যার বাগান তারই থাকবে। কিছুক্ষণ পর যে রস বের হওয়ার বাকি ছিল, তাও বের হয়ে এল এবং গ্লাস ভরে গেল। তখন বৃদ্ধ মালিক বললেন, মনে হয়, বর্তমান বাদশাহর নিয়ত ভাল হয়ে গেছে।

মোটকথা, নিয়তের এমন প্রভাব-প্রতিক্রিয়া হতে পারে। সুতরাং হযরত ঈসা আ.-এর যুগে এত পরিমাণ সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা এবং বরকত প্রকাশ পাবে, যাদের মধ্যে জন্মগতভাবে দুশমনি ছিল, তাদের মধ্যেও দুশমনির চিন্তা-চেতনা অবশিষ্ট থাকবে না।

হযরত ঈসা আ.-এর সাতজন খলিফা

এ খায়ের ও বরকত সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত থাকবে। এ সময় হযরত ঈসা আ.-এর সাতজন খলিফা রাজত্ব করবেন। কিন্তু তারপর মানুষ আস্তে আস্তে অন্যায় কাজে লিপ্ত হবে, মন্দ-ফাসাদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যখন সপ্তম খলিফা প্রকাশ হয়ে মরে যাবেন, তখন থেকে ফাসাদের প্রাধান্য শুরু হয়ে যাবে এবং এত পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যে, শুধু খারাপ মানুষই দেখা যাবে। নেককার মানুষ হাতেগোণা কয়েকজন অবশিষ্ট থাকবে, যারা নিজেদের ঈমান বাঁচানোর তাগিদে পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নিবেন। তাদের শহরে বসবাসের সুযোগ হবে না। আর এমন অবস্থা একবারে কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হবে। তখন পৃথিবী নামক তাঁবুর ধ্বংস শুরু হয়ে যাবে।

দাব্বাতুল আরদ বা বিশেষ প্রজাতির প্রাণী

তখন দাব্বাতুল আরদ প্রকাশ পাবে অথবা নারে হেজায বা হেজাযের আগুন প্রকাশ পাবে, যা মুমিনদের বিভিন্ন স্থান থেকে হাঁকিয়ে এক দিকে নিয়ে যাবে। দাব্বাতুল আরদ একটি আশ্চর্য প্রকৃতির প্রাণী। তার চেহারা হবে মানুষের চেহারার ন্যায়। তার শরীরে প্রতিটি প্রাণীর সাদৃশ্য থাকবে, যে শনাক্তি চিহ্ন

লাগাবে মুমিনের চেহারায় মুমিন আর কাফিরের চেহারায় কাফির। তারপর একধরনের মহামারী পাঠানো হবে। ফলে দুদিনের মধ্যে সকল ঈমানদার মুসলমান খতম হয়ে যাবে, মৃত্যুবরণ করবে।

যাদের উপর কেয়ামত সংঘটিত হবে

তখন শুধু খারাপ প্রকৃতির মানুষগুলো বেঁচে থাকবে, যাদের মধ্যে স্রেফ খারাবিই থাকবে। তাদের মধ্যে কোনো ধর্ম-কর্ম থাকবে না–

لَا يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا

তাদের মধ্যে ভাল মন্দের পার্থক্য থাকবে না। গাধা ও কুকুরের মত রাস্তা-ঘাটে প্রকাশ্যে খারাপ কাজে লিপ্ত হবে। তাদের মাঝে মনুষ্যত্বের অনুভূতি অবশিষ্ট থাকবে না। প্রত্যেকে শুধু নিজের খায়েশ পুরা করবে। এহেন প্রকৃতির মানুষের উপর কেয়ামত সংঘটিত হবে, পৃথিবী ধ্বংস হবে।

পৃথিবীর বুনিয়াদ বা ভিত্তি

এজন্য উলামায়ে কেরাম বলেন, পৃথিবী যিকরুল্লাহর দ্বারা অটল রয়েছে, ঠিক আছে। যতক্ষণ আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা একজন লোক পৃথিবীতে থাকবে, ততক্ষণ কিয়ামত হবে না, পৃথিবী ধ্বংস হবে না। সারকথা, রূহ বা আত্মা হলো যিকরুল্লাহ। যখন রূহ বের হয়ে যাবে, তখন পৃথিবী লাশের মতো ফুলে যাবে, ফেটে যাবে, মিশে যাবে। তার পূর্বে ধ্বংস হবে না। হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَالَ فِى الْاَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

পৃথিবীতে যতকাল আল্লাহ বলনেওয়ালা একজন থাকবে, ততকাল পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, কেয়ামত হবে না। যখন একজনও থাকবে না, শুধু খারাপ মানুষ থাকবে, তখন কেয়ামত কায়েম হবে।

সংখ্যার গ্রহণযোগ্যতা

কতক বর্ণনায় আছে, যেখানে চল্লিশজন মানুষ একত্রিক হয়, সেখানে অবশ্যই একজন মকবুল ব্যক্তি থাকবে। চাই যেকোনো স্তরের মাকবুল হোক। অতএব

যেখানে লাখ-কোটি মুসলমান থাকবে, সেখানে কেমন করে সম্ভব হতে পারে যে, কোনো মকবুল ব্যক্তি থাকবে না। হাজার হাজার মকবুল ব্যক্তি থাকবে।

দুনিয়াবাসী কি আকাশেরও উপরে যেতে পারবে

দেখুন, আকাশে যাওয়ার কোনো পন্থা-পদ্ধতি তো নেই। এ সম্পর্কে শরয়ী কোনো উসূল অনুমতি প্রদান করে না এবং তা বাস্তবেও সম্ভব নয়। আসমানের নিচে খালি স্থান এটি এ পৃথিবীর এলাকা, সীমানা। অতএব পৃথিবীবাসী নিজেদের সীমানায় থাকতে পারবে, সীমানার বাহিরে যেতে পারবে না। আসমানের এলাকাগুলো মানবজাতির এলাকা নয়। সেগুলো ফেরেশতাদের এলাকা। সেখানে ফেরেশতারা বসবাস করে। হাদিস শরীফে এসেছে, আসমানসমূহে চার আঙ্গুল পরিমাণ স্থানও খালি নেই, যেখানে কোনো-না-কোনো ফেরেশতা ইবাদাতে লিপ্ত নেই।

তারপর শরীয়তে আসমানসমূহের দরজা রয়েছে বলা হয়েছে। প্রতিটি দরজায় সুদক্ষ দারোয়ানও আছে। যেখানে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বও অনুমতি ব্যতীত যাওয়ার কোনো সূরত নেই।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজে গমন করছিলেন, তখন আসমানের দরজা বন্ধ ছিল। হযরত জিব্রাঈল আ. দরজার কড়া নাড়লেন। তখন দারোয়ানের পক্ষ হতে জবাব এল- তুমি কে? অথচ হযরত জিবরাঈল আ. হলেন ফেরেশতাকুলের সরদার। তাহলে কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, ফেরেশতা তাঁর আওয়াজ ভুলে গেছে? তিনি তো সর্বদা আসা-যাওয়া করেন।

সুতরাং জিজ্ঞেস করা এ কথার দলিল যে, তারা এত পরিমাণ কঠিন ডিউটি করেন যে, যত বড়ই ব্যক্তি আসুক না কেন তারা তাদের দায়িত্ব আদায় করেন। এ কারণে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তুমি কে? উত্তর দেওয়া হলো, আমি জিবরাঈল। তারপর জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার সাথে কে? এতে প্রমাণিত হয়, তাঁরা জানতেন, হযরত জিবরাঈলের সাথে কেউ এসেছে আর তিনি হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু ডিউটির কর্তব্য আদায় করতে গিয়ে বললেন, তোমার সাথে কে? জিবরাঈল আ. বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তারপরও দরজা খুলেননি বরং তৃতীয় প্রশ্ন করলেন, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে নাকি তিনি নিজে নিজেই এসে পড়েছেন? তখন হযরত জিবরাঈল উত্তর দিলেন-

আমাকে তাঁর নিকট পাঠানো হয়েছিল। তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তখন দরজা খোলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে–

مَرْحَبًا بِكُمْ نِعْمَ الْمَجِيْئُ جَاءَ

আপনাদের আগমন শুভ হোক। আপনাদের জন্য খোশ আমদেদ।

অতএব যখন মকবুলদের আসমানে যাওয়ার ব্যাপারে এত কড়াকড়ি এবং নিয়মানুবর্তিতা, তাহলে মরদুদ ও অভিশপ্তরা সেখানে কীভাবে যাবে? তারা কি নিজে নিজেই পৌঁছে যাবে?

গ্রহ-উপগ্রহের সম্পর্ক দুনিয়াবাসীর সাথে

এ বিষয়টির বুনিয়াদ হলো, পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষ পৃথিবীর গণ্ডির ভিতরই থাকে। পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনো নতুন পৃথিবীতে তারা দখল দিতে পারে না। কিন্তু তারকা পৃথিবীর ভিতরের বস্তু। এজন্যই কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِالْكَوَاكِبِ

আমি পৃথিবীর আসমানকে তারকা দ্বারা সাজিয়ে রেখেছি।

তারকারাজি হলো আসমানের সৌন্দর্য। আর সৌন্দর্য আমাদের জন্য বানানো হয়েছে। আর সৌন্দর্য তখনই হবে, যখন সেগুলো আসমানের নিচের স্তরের নিচে হবে। যদি উপরের সমতল ভূমিতে থাকত, তাহলে আমাদের জন্য তথা দুনিয়াবাসীর জন্য সৌন্দর্য হতো না।

এতে প্রতীয়মান হয়, তারকারাজির সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে। চন্দ্র ও সূর্যের আবর্তন-বিবর্তন বা রাত-দিনের পরিবর্তন দুনিয়ার জন্য। আসমানসমূহ ও জান্নাতসমূহের জন্য রাত-দিন নেই। আর রাত-দিনের বিবর্তন এ দুনিয়ার গণ্ডির ভিতরই হচ্ছে। আর তার সম্পর্ক গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে অথবা উদাহরণস্বরূপ গাছের শিকড় ও পাতা-ফুল, যা ঔষধের কাজে লাগে। প্রতিটি জড়ি-বুটিতে কোনো-না-কোনো তারকার প্রভাব রয়েছে, যার দ্বারা তার মধ্যে প্রতিশেধক শক্তির প্রভাব পড়ে। গুলেবনফ্শাতে অমুক তারকার প্রভাব পড়ে। মুলহাটি (এক প্রকার প্রসিদ্ধ ঔষধি) তে অমুক তারকার প্রভাব পড়ে। তারকার আলোতে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো যখন জড়ি-বুটির মধ্যে পড়ে, তখন সেরকম বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় এবং সেরকম রোগের প্রতিশেধক হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং সকল তারকা আমাদের জন্য বানানো হয়েছে। তাদের সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ

তারকার দ্বারাই মানুষ রাস্তা নির্ণয় করে।

জাহাজ পরিচালনার বিষয়টি তারকার সাথে সম্পর্কিত। কেননা, বড়-বড় নদী ও সাগরে তো নির্ধারিত সড়ক নেই। নাবিকগণ তারকার দ্বারা দিক নির্ণয় করে জাহাজ চালান। এতেও বোঝা যায়, তারকা আমাদের জন্য বানানো হয়েছে। আর এগুলো দুনিয়ার এরিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে– আসমানের সাথে নয়। এগুলোকে আসমানের ছাদে ঝুলানো হয়েছে। মোটকথা, যেহেতু এগুলোর সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে, তাই দুনিয়াবাসী তাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এটি অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু নিজ পৃথিবীর গণ্ডি ছেড়ে অন্য পৃথিবীতে যাওয়ার শক্তি মানুষের নেই। যে যতটুকু দাবি করুক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না।

এ কারণে চাঁদ-সূর্য ও বৃহস্পতি গ্রহে পৌঁছা কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। বরং আমরা তো এ কথা বলি যে, যত দ্রুত যাওয়া যায়, যাতে দুনিয়াতে কিছুটা অন্যায়-ফাসাদ কমে যায়। এতে আমাদের অসুবিধা বা ক্ষতির কী আছে?

যখন তাওবার দরজা বন্ধ হবে

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং অর্ধ দিন পর্যন্ত আসবে, তারপর পুনরায় পশ্চিমে ফিরে যাবে আর স্বাভাবিক নিয়মে উদিত হবে। যখন উক্ত বড় নিদর্শন প্রকাশ পাবে, তখন থেকে তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, ঈমান গ্রহণের মাকসাদ অন্তরকে পরীক্ষা করা। আর যখন এতটুকু অলৌকিক বস্তু প্রকাশ হয়ে যাবে, তারপর অন্তর পরীক্ষার সুযোগ থাকে না। এখন তো ঐ বস্তু প্রকাশ পেয়ে গেছে, যার সংবাদ পূর্বে দেওয়া হয়েছিল। যেগুলোকে শুধু নবী-রাসূলদের সংবাদের ভিত্তিতে বিশ্বাস করার প্রয়োজন ছিল, সেগুলো প্রকাশ হয়ে গেছে। আর স্বচোখে দেখে বিশ্বাস করা বা মানার নাম ঈমান নয়। ঈমান নবীদের উপর ভরস করে যা মানা হয়, তার নাম। চাই বুঝে আসুক বা না আসুক, দেখা যাক বা না যাক এ কথা মানতে হবে যে, নবীগণ মিথ্যা ও ভুল বলতে পারেন না। তারই নাম ঈমান। নিজের আকল-বুদ্ধি দ্বারা কোনো বিষয় বুঝে ফেলার নাম ঈমান নয়। যেমন– কেউ যদি বলে, আমি ঈমান আনলাম, দুয়ে দুয়ে চার হয়। একে ঈমান বলবে না। এটি হল আকলগত বর্ণনামাত্র।

হাকিকতের প্রতি মনোযোগী হওয়া ইসলামের আলোচ্য বিষয়

ইসলামের আলোচ্য বিষয় হলো, সূরত ও বাহ্যিকতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না, হাকিকত ও মূলের প্রতি করো, যা দায়েমী ও কায়েমী বস্তু। একারণে ফটোকে নিষেধ করা হয়েছে। হতে পারত ঐ যুগেও কোনো ফটোগ্রাফার থাকত। আর সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো ছবি তুলে রাখতে পারত। এ কারণে নিষিদ্ধ করা হয় যে, ফটো বিকৃত হয়ে যায় আর হাকিকত অবিকৃত থাকে। এ কারণেই মুসলমানদেরকে সূরত হতে দূরে রাখা হয়েছে। বর্তমান সময়ে সবকিছুই প্রকাশ্যে এসে গেছে; ফলে হাকিকত হারিয়ে গেছে।

ভারতে মুসলিমদের একতায় ধর্মীয় উপকারিতা

হিন্দুস্তানের সকল মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হলো এবং সিদ্ধান্ত নিল, সম্মিলিত কর্মগুলো সম্পর্কে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের নিকট দাবি জানাব। যেগুলো নিজের বৈশিষ্ট্য, সেগুলো নিজ-নিজ ঘরে আঞ্জাম দিব। তাতে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কিন্তু সরকারের নিকট গেলে সবাই মিলে যাবে এবং সবার আওয়াজ হবে, ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক আইনে কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না। না গভর্নরের, না এসেম্বেলির, না সংসদের। একথার উপর সবাই ঐক্যবদ্ধ হলো।

এই একতার ফলে ভারত সরকার ইন্দিরাগান্ধীর ঘোষণা করতে হলো, আমরা কোনো হস্তক্ষেপ করতে চাই না। মুসলমানরা চাইলে হস্তক্ষেপ করব, না চাইলে করব না। আমরা বললাম, ঐ মুসলমান কারা, যারা চাইবে? সবাই তো এখানে এসেছে? সকল জাতি-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা এখানে উপস্থিত। শিয়া, সুন্নী, আহলে হাদিসসহ সকলের প্রতিনিধিগণ এখানে উপস্থিত। এখন তারা আবার কোন মুসলমান, যারা হস্তক্ষেপ কামনা করবে? এতে ফলাফল এই হলো যে, সরকার প্রভাবিত হলো এবং যারা এই আওয়াজ উঁচু করেছিল যে, আরো কিছু সংযোজন হবে, তারা সবাই চুপ হয়ে গেল। নীরব হয়ে বসে গেল।

দেওবন্দি ও বেরলভীদের মধ্যকার সম্পর্কের উপকারিতা

সবগুলো মুসলিম গ্রুপকে ঐক্যবদ্ধ করার সময় আমি বেরলভী হযরতদের নিকট খায়েশ পেশ করলাম, আপনারাও এতে অংশগ্রহণ করুন। সাধারণত তারা আমাদের ধর্মীয় মুয়ামালাতে অংশ গ্রহণ করে না। কিন্তু তারা এবার অংশ গ্রহণ

করল। কারণ, তারা দেখল, সকল মুসলমান এক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমরা অংশগ্রহণ না করলে সবাই আমাদের অকর্মা বলবে এবং আমাদের মূল্যায়ন থাকবে না। তাই তারাও একজন প্রতিনিধি পাঠাল। তাদের সবচেয়ে বড় মুফতি মুফতি বুরহানুদ্দীন সাহেব এলেন। তিনি জাবালপুরের বাসিন্দা ছিলেন। তখন আমাকে সদর বানানো হয়েছিল। আমি তাকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে অর্ভ্যথনা জানালাম। যখন তিনি আগমণ করলেন, তখন তাকে বিশ কদম আগে বেড়ে স্বাগতম জানালাম। প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর চা ও পান পেশ করলাম আর তার কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শ্রবণ করলাম, যাতে সঠিক হলে মানা যায়। এহেন ব্যবহারের ফলে সে অনেক প্রভাবিত হলো। মজলিস শেষ হওয়ার পর সে বলল, শুনেছি, আপনি হজের উদ্দেশ্য রওনা হবেন?

আমি বললাম, ইচ্ছাতো আছে। তিনি বললেন, রওযাযে আকদাসে আমার সালাম পেশ করবেন। আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ অবশ্যই পেশ করব। আমি ভাবলাম, ভাল! কুফরি তাহলে খতম হলো। কারণ, কোনো কাফের কখনো রওজাযে আকদাসে সালাম পাঠায় না।

মোটকথা, একতার দ্বারা হাজারো সন্দেহ দূর হয় এবং অনেক উপকার সাধিত হয়। যা তাদের মধ্যে রয়েছে, তা হতে আমরা বঞ্চিত হই। আর অনেক কিছু আমাদের মধ্যে রয়েছে; তা হতে তারা বঞ্চিত হয়। অতএব, মেলামেশা দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হয়।

পরস্পর ঘৃণা ইসলামের রুচিবোধ নয়

পরস্পর ঘৃণা ও দুশমনি সৃষ্টি করা ইসলামি রুচিবোধ নয়। ইসলাম তা সমর্থন করে না।

এজন্যই ইসলাম ঘোষণা করেছে–

لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

কাফের সম্প্রদায় যাদের উপাসনা করে, তাদের বদনাম করো না; তাহলে তারা বিরক্ত হয়ে তোমাদের বড়দের মন্দ বলা শুরু করবে। তাই তাদের গালি দেবে না।

অতএব গাল-মন্দ করা, অমুক কাফের, তমুক কাফের, অমুক এই, তমুক এই, এগুলো ইসলাম পছন্দ করে না। এটি একটি মসিবত বা বিপদ। স্রেফ মূর্খতাই

নয়, মানুষ দীনি কিছু পড়া-লেখা করলে রুচি সৃষ্টি হবে, জানতে পারবে আর এমনটা নিতান্তই কুসংস্কার যে, কোনো কিছু রসুম ও রেওয়াজ করে কিছু দিন পর তাকে দীনের অংশ বানিয়ে নেওয়া।

রসূমের প্রাধান্য

একবার আমি আমেরিকা গিয়েছিলাম। তখন সেখানকার কয়েকজন নেতাগোছের লোক– যারা নেক প্রকৃতির ও নওমুসলিম ছিলেন– সাক্ষাত করতে এলেন। তখন অভ্যাস মোতাবেক আমি তাদের সামনে পান খেলাম। তাতে তারা বুঝে নিল, পান খাওয়া কোনো দীনি কর্ম। তারা বলতে শুরু করল, এখন থেকে আমরাও পান খাব এবং পানের ডিব্বা-কৌটা সাথে রাখব। আমি তাদের বললাম, পান খাওয়া কোনো দীনি বিষয় নয়। বরং তা মানুষের অভ্যাস মাত্র। এমন অভ্যাস করা যাবে না। তারা এতই সহজর-সরল যে, যদি তারা পান খেত এবং পানের ডিব্বা-কৌটা সাথে রাখত আর তা দীনি কর্ম বলে প্রচার করত, তাহলে প্রচার হয়ে যেত যে, পান খাওয়া ইসলামের রুকন। যে পানের কৌটা রাখবে না, সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, সে ইসলাম হতে বের হয়ে গেছে। বর্তমান সমাজের হালত হলো এমন।

ইখতেলাফী মাসায়েলের সহজ সমাধান

অন্যথায় যদি মাসায়েল দেখতে হয়, তাহলে এ ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে–

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ

যদি তোমরা কোনো মাসয়ালার ব্যাপারে মতানৈক্যে লিপ্ত হও তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ কর। যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর ঈমান এনে থাক।
[সূরা নিসা : ৫৯]

সাহাবাদের আমল যেদিকে রয়েছে, সেদিকে প্রত্যার্পন করো। যখন তাদের নিকট সাহাবাদের আমল পেশ করা হয়, তখন তারা বলে, সাহেব! তা তো খুশির কথা; কিন্তু রেওয়াজ তো এমন। তো তোমরা রেওয়াজের উপর চলবে–

নবীর আমলের উপর নয়, সাহাবাদের আমলের উপর নয়। এ কর্মের কোনো চিকিৎসা নেই। তা স্রেফ মূর্খতা ও অজ্ঞতা। ইসলাম তা পছন্দ করে না।

বেরলভী আলেমদের মানহানি করা উচিত নয়

আহমাদ রেজা খান সাহেব সম্পর্কে একদিন হযরত থানুভী রহ.-এর মজলিসে সম্ভবত হযরত খানা আজিজুল হাসান মজযুব সাহেব রহ. অথবা অন্য কেউ এই বাক্য উচ্চারণ করল যে, 'আহমাদ রেজায়ী বলে'...। তখন হযরত থানুভী রহ.-এর চেহারা বিগড়ে যায়। তিনি বললেন, সে তো একজন আলেম; তাকে অবজ্ঞা করার আমাদের কী অধিকার আছে? তুমি কেন 'মাওলানা' শব্দ ব্যবহার করনি? মোটকথা, তিনি অনেক ধমকালেন এবং সতর্ক করলেন। অতএব আমরা তো এ মতের উপর ও পথের উপর রয়েছি যে, তাদের অবজ্ঞা ও মানহানি করাকে জায়েয মনে করি না, তাদের কাফের ও ফাসিক বলা তো দূরের কথা। আর যেগুলো সুন্নাতপরিপন্থী, সেগুলো তো অবশ্যই বিদ'আত। আমরা খেলাফে সুন্নত অবশ্যই পরিত্যাগ করব; কিন্তু যারা করবে তাদের অবজ্ঞা করব না।

মাওলানা আহমদ রেজা খান রহ. দেওবন্দিদের ফয়েজপ্রাপ্ত আলেম ছিলেন

মাওলানা আহমদ রেজা খান কারো মাধ্যমে দেওবন্দের শাগরেদ। আর তা এভাবে যে, হযরত মাওলানা ইয়াসীন সাহেব রহ. বেরলীতে মাদরাসায়ে ইশায়াতে উলুম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাওলানা বেরলভী হলেন তাঁর শাগরেদ আর হলেন হযরত শাইখুল হিন্দের শাগরেদ। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করতেন না। প্রথম-প্রথম মাওলানা আহমাদ রেজা খান সাহেব যখন হযরত মাওলানা ইয়াসীন সাহেব রহ.-এর নিকট পত্র লিখতেন, তখন খুব তাযিম ও সম্মানের সাথে লিখতেন। যেমনভাবে কেউ নিজের পীর ও শায়েখের নিকট লিখে থাকে। পরবর্তীতে তার চিন্তা-ধারা পাল্টে পায়। সে কী বুঝে এমন করে তা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। তারপরও কুফরির মতো জঘন্য কোনো কর্ম ছিল না।

নিজ-নিজ কাজে ব্যস্ত

আমরা তো মাওলানা আহমাদ রেজা খানকে ভাল-মন্দ বলা জায়েয মনে করি না এবং কখনো বলিও না। দারুল উলুমে এসে দেখবেন, ওখানে তার আলোচনাই নেই। ওখানে কে বেরলভী, কে অমুক তার কোনো নাম-গন্ধ নেই। সবাই নিজ

নিজ কাজে ব্যস্ত। আর বেরলভীদের প্রতি লক্ষ্য করেন, তাদের ওখানে সর্বদা চর্চা হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে অমুক কাফের অমুক কাফের, অমুক বিদয়াতী অমুক ফাসিক। দারুল উলুমে কাফের ও ইসলামের কিস্‌সা নেই। এখানে সবাই তালিম নিয়ে ব্যস্ত। বছরের পর বছর নামই শোনা যায় না। প্রত্যেকেই নিজ-নিজ কাজে ব্যস্ত। সবারই এত ব্যস্ততা যে, কখন ঝগড়ায় লিপ্ত হবে যে, অমুক কাফের, অমুক ফাসিক। এগুলো আমাদের প্রয়োজন কী? এক কবি বলেছেন-

لَعُمْرِیْ اِنَّ فِیْ ذَنْبِیْ لَشُغْلًا بِنَفْسِیْ عَنْ ذُنُوْبِ بَنِیْ اُمَیَّةْ

আমার এত পরিমাণ পাপ আছে, যেগুলো গণনা করার সুযোগ আমি পাই না। তাহলে বনি উমায়্যার পাপ কখন ও কিভাবে গণনা করব?

ভাল মানুষের নামই শুনতে পাবেন না তো কোথায় বেরলভী, কোথায় রাফেজী?

মসজিদ ধৌত করার ঘটনা

এক সময় বোম্বেতে এমন পরিস্থিতি ছিল যে, কোনো দেওবন্দি মসজিদে প্রবেশ করলে মসজিদ ধৌত করত। অথচ মসজিদে নববীতে কাফেররা প্রবেশ করে; তারপরও তা ধৌত করা হয় না। তারা বাস্তবে কাফির হওয়া সত্ত্বেও তা করে না। কারণ, তারা বিশ্বাসগত নাপাক, শারীরিক নাপাক না যে, মসজিদ নাপাক হয়ে যাবে। তারপর বোম্বে আরো অনেকবার গিয়েছি। এখন সেখানে একটি বিশাল জামাত তৈরি হয়ে গেছে, যারা মধ্যমপন্থী– উগ্রপন্থী নয়। তারা ঐ অহেতুক কাজকে বুঝে ফেলেছে।

উলামায়ে দেওবন্দ ও পীর মহর আলী সাহেব রহ.

পীর মহর আলী শাহ সাহেব রহ. দেওবন্দ মাদরাসা হতে কোনো প্রকার উপকার লাভ করেননি। কিন্তু দেওবন্দের অনেকে তার মুরিদ ও মুতাকিদ ছিল। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ সাহেব রহ. তার সাথে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে মুলাকাত করতেন।

তার মূল তথ্য হলো, তাদের মধ্যে কিছু রসুম রয়েছ। তারা তাদের পূর্ববুযুর্গদের থেকে কিছুর রসুম পেয়েছে; সেগুলো তারা পালন করে। কিন্তু তারা অন্যদের কাফের বলে না, ভাল-মন্দ বলে না। তাদের মধ্যে ইখলাস ছিল বলে দেওবন্দি আলেমগণ তাদের সাথে অত্যন্ত মনোবিশ্বাসের সাথে সাক্ষাত করতেন।

একজন বেরলভী বুযুর্গের সাথে সাক্ষাতের প্রতিক্রিয়া

মুলতান বিপ্লবের পূর্বে একবার সেখানে গিয়েছিলাম। হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ সাহেব রহ. খাইরুল মাদারিসে মাহফিল করিয়েছিলেন। আমি সেখানে পৌঁছে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে আরো কোনো বুযুর্গ রয়েছে কি, যার সাথে সাক্ষাত করতে পারব। তিনি বললেন, মাওলানা মুহাম্মাদ বখশ সাহেব আছেন বেরেলভী ফেরকার লোক। আমি বললাম, আমি ফেরকা-টেরকা বুঝি না, না আমাদের ফেরকা, না তাদের ফেরকা।

হযরত মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেব রহ. আমাকে অনেক বাধা দিলেন। তিনি বললেন, আমরা তার বিরুদ্ধে মাহফিল করছি আর আপনি তার সাথে মিলতে চাচ্ছেন! আমি বললাম, বিরোধিতা করার সময় হলে তা করব। আর তা হবে মাসয়ালাগত ব্যাপার। কিন্তু দেখা করতে অসুবিধা কী? আমি অত্যন্ত চুপিসারে হযরত খায়ের মুহাম্মাদ সাহেবের ছেলে হাফেজ শরিফ আহমাদকে সঙ্গে নিয়ে মাগরিবের সময় তার মসজিদে পৌঁছলাম। তিনি জায়নামাযে বসা ছিলেন। তার পার্শ্বে একটি পাত্রে বরফের পানি রাখা ছিল। কেউ তাকে আমার আগমনের সংবাদ অবগত করল। তিনি অত্যন্ত নম্রতা ও উদারতার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং পাত্রের পানি প্রথমে নিজে পান করলেন, তারপর আমাকে পান করতে বললেন। আমিও পান করলাম। তারপর তিনি বললেন, আমাকে দেওবন্দের কিছু বুযুর্গের অবস্থা শোনান। আমি তাকে কিছু বুযুর্গের হালত শোনালাম। এতে ফলাফল এই হলো যে, পরবর্তী বছর তার দুই ছেলেকে দারুল উলুমে পাঠালেন তালিমের জন্য। কিন্তু একজনের জন্য দেওবন্দের আবহাওয়া অনুকুল হয়নি; তাই সে চলে যায়। অপরজন সারা বছর থাকে; কিন্তু পরীক্ষার পূর্বে সেও চলে যায়। আল্লাহ তা'অলাই ভাল জানেন, সে কেমন অপারগতার সম্মুখীন হয়েছিল।

অতএব তার এতটুকু তো হয়েছে যে, তার ঘর হতে কুফরি চলে গেছে। এজন্য আমি সর্বদা চেষ্টা করে থাকি যে ভাই! ঘৃণা সৃষ্টি করো না। দীনদারী হিসেবে নিজের অভিমতকে সঠিক জানলে তার উপর আমল করো; কিন্তু ঘৃণা ও দূরত্ব সৃষ্টি করা ঠিক নয়।

সুন্নাত ও বিদয়াতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ভিন্ন-ভিন্ন

হাদিস শরীফে বিদয়াতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে–

مَا أُوْتِيَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا أُوْتُوا الْجَدَلَ

যে সম্প্রদায়ে বিদয়াত প্রবেশ করবে, তাদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঝগড়া-ফাসাদ অবশ্যই প্রবেশ করবে।

এটা বিদয়াতের বৈশিষ্ট্য। সুন্নাতে কোনো প্রকার ঝগড়া নেই। সুন্নাত সর্বত্রই এক রকম; যার মন চায় আমল করে নিবে। আর বিদয়াত সব স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন। বিদয়াতের বৈশিষ্ট্য হলো, তা দ্বারা আসল ও মূল দীন খতম হয়ে যায়, ঝগড়া-ফাসাদ দলাদলি দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়।

ভারত বিভক্তির ব্যাপারে উলামায়ে দেওবন্দের মতানৈক্য

হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. কংগ্রেসের সহযোগী ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের কট্টর সমর্থক ছিলেন। তিনি ভারত ভাগের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেছিলেন, এতে রক্তারক্তি হবে। হত্যাযজ্ঞ হবে। এখানকার মুসলমান ওখানে যাবে। তখন অনেক প্রাণনাশ হবে। তেমনিভাবে আরো অনেক উপকারিতা তাঁর সামনে ছিল। ভারত বিভক্তের ঘটনা আমার সামনে সংঘটিত হয়েছে। পাকিস্তান আলাদা হওয়ার পর তিনি বললেন, এখন আর ইখতেলাফ করার প্রয়োজন নেই। এখন আমাদের ইজ্জত-সম্মান তাতেই যে, পাকিস্তান শক্তিশালী হোক, মজবুত রাষ্ট্র হোক। এ ছিল ভারত বিভক্তির বিরোধিকারীদের চিন্তাধারা। আর মাওলানা শিব্বীর আহমাদ সাহেব দেওবন্দি ছিলেন না? হযরত থানুভী রহ. দেওবন্দি ছিলেন না? মাওলানা যফর আহমাদ সাহেব রহ. এবং মাওলানা মুফতি শফী সাহেব রহ. দেওবন্দি ছিলেন না? এরা সবাই পাকিস্তানের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুতরাং এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, দেওবন্দ ভারত বিভক্তির বিরোধী ছিল। কারো ব্যক্তিগত বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর বিরোধীদের অভিমত পাল্টে যায়। তখন তারাও বলতে থাকেন যে, এখন কোনো প্রকার মতানৈক্য নেই, ঝগড়া-বিবাদ নেই, এখন আমাদের ইজ্জত-আবরু তাতেই যে, পাকিস্তান একটি শক্তিশালী ও মজবুত রাষ্ট্র হোক। দেওবন্দে কোনো মতানৈক্য ছিল না। ব্যক্তিদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। দেওবন্দ একটি প্রতিষ্ঠান। দেওবন্দ লীগেরও নয়, কংগ্রেসেরও নয়, দেওবন্দ মর্যাদা সমর্থনকারী হিসেবে রয়েছে। সুতরাং দেওবন্দ এক বিষয় আর ব্যক্তি আলাদা বিষয়। দুটি এক বস্তু নয়।

হযরত শিব্বীর আহমাদ সাহেব রহ. পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার কারণ এই ছিল যে, তাঁদের স্লোগান ছিল একটি পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করা, যেখানে ইসলামি আইন জারি হবে। সকল মুসলমান তাঁর সহযোগী ছিল যে, তার চেয়ে উত্তম স্লোগান আর কী হতে পারে। অতএব যারা

পাকিস্তানের পক্ষে মত দিয়েছেন, তারা এই বুঝে দিয়েছেন যে, ওখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে। অপরদিকে অন্যান্য উলামাদের অভিমত ছিল, এমনটি কখনো হবে না। কারণ, যারা পাকিস্তান গঠন করে চলছে, তাদের মধ্যেই দীন নেই, দীনের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই। তারা যদি নেক নিয়তেও চায়, পাকিস্তানে ইসলামী আইন কায়েম হোক, তারপরও হবে না। কেননা, তাদের ভিতর ইসলামি রুচিবোধ নেই।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, যখন দেশ বিভক্ত হবে, তখন কিছু মানুষ ভারতে আসবে আর কিছু মানুষ পাকিস্তানে যাবে; এতে রক্তারক্তি হবে, হত্যাযজ্ঞ হবে। তাই তাঁরা বললেন, আমরা ভারত বিভক্তে রক্তের সাগর দেখতে পাচ্ছি। আর পরিশেষে হলোও তাই। লাখো মুসলমান নিহত হলো, শহীদ হলো। লাখ-লাখ মুসলিম নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন হলো । সম্পদের ক্ষতিও হলো প্রচুর। অতএব এ সকল বিষয় তাঁদের হৃদয়পটে ছিল; তাই তাঁদের অভিমত ছিল বিভক্ত না হোক। আর যাদের অভিমত ছিল হোক, তাঁদের চিন্তা-ধারা ছিল, যখন একটি পৃথক রাষ্ট্র হবে, তখন তাতে ইসলামি আইন জারি হবে। আর তা না হলে সারা হিন্দুস্তানে একটা স্থান এমন হবে, যেখানে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম হবে। তাঁদের চিন্তা-ধারা ছিল সেই দিকে।

আমরা রাত-দিন দোয়া করতাম, পাকিস্তান শক্তিশালী হোক। আমরা দোয়া ছাড়া আর কী করতে পারতাম? আর তো কিছু করার ছিল না। আর এমন আশা করি যে, পাকিস্তানের সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানকে হেফাজত করবে। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু একটি পৃথক রাষ্ট্র দান করেছেন, সেটিকে পরস্পর যুদ্ধ করে খতম করবে না এবং ঐ সকল দেশ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। যাদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধের ফলে তৃতীয় পক্ষ এসে বিজয়ী হয়েছে। দখল করে নিয়েছে। আফগানিস্তানের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তারা পরস্পর বিশ দলে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। তখন রুশবাহিনী এসে দেশটা দখল করে নিল। তেমনিভাবে আরো অন্যান্য দেশে এমন পরিস্থিতির স্বীকার হয়েছিল যে, তাদের নিজেদের ঝগড়া-বিবাদের ফলে তৃতীয় পক্ষ এসে দেশ দখল করে নিয়েছে।

মুসলমানদের পরস্পর মতানৈক্য অমুসলিমদের বিজয়ী করে

মালিক ইবনে সাউদের একটি অভিমত হলো, যখন তাকে বলা হলো, ইয়াহুদি জাতির শক্তি বেড়ে চলছে আর ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের ভয় ও শঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, সারা দুনিয়ার ইয়াহুদী জাতি এক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হোক এতে আমার সামান্য চিন্তা-ফিকির নেই। আমি তোমাদের চিন্তায়

মগ্ন; তোমরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং অন্যদের সুযোগ করে দেবে, তারা এসে বিজয়ী হবে এবং দেশ দখল করে নিবে।

সারকথা, বাস্তবতা হলো, যখনই কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের পতন হয়েছে, তখনই তার পিছনে কাজ করেছে মুসলিমদের পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ এবং পরস্পর শত্রুতা। এই সুযোগে তৃতীয় গোষ্ঠি এসে দেশ দখল করে নিয়েছে। তৃতীয় শক্তি সর্বদা একটা দলকে সাহায্য করে থাকে, যাতে অপর দলকে পরাস্ত করে পরিশেষে নিজেরা বিজয়ী হতে পারে।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রা.-এর রুমী কুকুরের প্রস্তাবের উত্তর

হযরত মুয়াবিয়া রা. ও হযরত আলী রা. উভয়ের মাঝে যুদ্ধ চলছিল। তখন রোমসম্রাটের পক্ষ হতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রা. নিকট পত্র পৌঁছল। তাতে লেখা ছিল, আমি জানতে পেরেছি, আলী আপনার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। আমি সার্বিকভাবে আপনার সাহায্য করতে প্রস্তুত। সৈন্য দিয়ে, অর্থ-সম্পদ ও অস্ত্র দিয়ে। তার উদ্দেশ্য ছিল আমীরে মুয়াবিয়া রা.-এর সঙ্গ নিয়ে হযরত আলী রা.কে পরাস্ত করা। আর যখন তিনি পরাজিত হবেন, নিঃশেষ হয়ে যাবেন, তখন মুআবিয়া রা.কেও পরাজিত করা সহজর হয়ে যাবে।

হযরত মুআবিয়া রা. তার পত্রের উত্তর লিখলেন। তাতে শিরোণামে তিনি রোমসম্রাটের উপাধি দিলেন اِلَى كَلْبِ الرُّوْمِ 'রুমী কুকুরের প্রতি...'।

তারপর লিখলেন, 'তুমি ভেবেছ, আমি আলীর দুশমন। আমার ও তাঁর মাঝে মতভেদ হলো মাসয়ালাসংক্রান্ত। আমাদের মাঝে মৌলিক কোনো মতানৈক্য নেই। তুমি যদি এ অঞ্চলে এসে পা রাখ, তাহলে আমি আলীর একজন সাধারণ সৈনিক হয়ে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।'

তিনি রোমসম্রাটের সকল দুরভিসন্ধি খতম করে দিলেন। আল্লাহ না করুন, যদি তিনি তার প্রস্তাবে সাড়া দিতেন, তাহলে সম্রাটই বিজয়ী হত। হুকুমত তার হাতে চলে যেত।

অমুসলিম জাতির পররাষ্ট্রনীতি

অমুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা প্রথমে দেশ ও জাতির মাঝে রাজা ও প্রজাদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি করে, হাজারো বিষয়ে মতপার্থক্য তৈরি করে।

আর ইসলাম ইসলামি ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়। ইসলাম শিক্ষা দেয়, পূর্ব ও পশ্চিম সকল মুসলমান এক ও অভিন্ন জাতি।

অমুসলিম জাতি কী কী করেছে? তারা দেশীয় সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলেছে। এখন মানচিত্র এরিয়া নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়েছে। বংশীয় সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলেছে। এখন শেতাঙ্গরা আলাদা, কৃষনাঙ্গরা আলাদা। মোটকথা, এমন হাজারো মতভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে। ফলে সবাই যুদ্ধে লিপ্ত। কেউ ভৌগোলিক সীমারেখা নিয়ে, কেউ রং ও বংশ বিষয়ে লড়াইয়ে লিপ্ত। কোথাও ভাষা নিয়ে যুদ্ধ লিপ্ত। সবাই একতার আসল ও মৌল বুনিয়াদকে ছুড়ে ফেলেছে, যা দ্বারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হতে পারত।

এ ধরনের মতভেদ হলো অভিমতের ভিন্নতা। আর হুজ্জত বা দলিলের ভিন্নতাও হয়। এগুলো উলামা ও বুদ্ধিজীবীদের মাঝে মতভেদ। এগুলো ক্ষতিকর নয়। এমন মতানৈক্যকে ঝগড়া-ফাসাদ ও বিবাদ সৃষ্টির মাধ্যম বানানো অনেক ক্ষতিকর জিনিস। এগুলো জযবা ও আগ্রহমূলক কর্মকাণ্ড, মাসয়ালার কর্ম নয়। মাসয়ালা কোনোদিন যুদ্ধ-বিগ্রহ শিক্ষা দেয় না। আমরা মাসয়ালাকে আড়াল বানাই এবং জযবা পেশ করি। তারপর যুদ্ধে লিপ্ত হই।

শতবর্ষ সম্মেলন

শতবর্ষ সম্মেলনকে উৎসব বলতে আমি সব স্থানে সাবধানতা অবলম্বন করেছি। অতএব তাকে 'জশন' নাম দেওয়া যাবে না। এটি একটি দস্তারবন্দি মাহফিল। আর জশন তো হলো একটি প্রথাগত জিনিস। দারুল উলুম দেওবন্দের শতবর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তানী মানুষের জন্য প্রথম কাজ হলো, দেশের প্রধান জেনারেল জিয়াউল হক-এর সাথে সাক্ষাত করা, মাহফিলের গুরুত্ব তাকে বুঝানো, তারপর তিনি যা বলেন, তা বাস্তবায়ন করা। পরে জানা গেল, একটি প্রতিনিধিদল তার সাথে সাক্ষাত করেছেন। তখন তিনি পাঁচশত মানুষকে অংশ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। ঐ পাঁচ শত মানুষ নির্বাচনের দায়িত্বও পাকিস্তানীদের উপর দিলেন।

গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য দাওয়াত দেওয়ার ক্ষতি

দাওয়াতেও ভিন্নতা ও মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। সবাই নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্যের লোকদের দাওয়াত করে এবং তাকে ইসলাম বলে। অথচ ইসলাম হলো সবচেয়ে বেশি উঁচু মর্যাদার বস্তু। ইসলাম দলগত বৈশিষ্ট্যের নাম। প্রত্যেক

ব্যক্তি নিজেদের গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যকে ইসলাম বলে ব্যাখ্যা করে। ইসলামের যত ভয় মুসলমানদের নিয়ে– অন্য জাতিদের নিয়ে নয়।

একতার উপায় ও মাধ্যম

দ্বিতীয়ত আমি সবস্থানে বলেছি, পাকিস্তানী লোকদের একতা ও ঐক্যবদ্ধতা অতি জরুরি বিষয়। তারা যেন সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের দেশকে মজবুত ও শক্তিশালী করে। আর এ কথা স্মরণ রাখবেন যে, একতা কায়েম হয় কখনো মনোবিশ্বাসও আত্মবিশ্বাস শক্তি দ্বারা। কোনো এক বুযুর্গ ব্যক্তিত্বের অধীনে সকল মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, ফলে পরস্পর একতা কায়েম হয়। কোনো আলেমে রাব্বানী বা তরিকার পীর তাঁর মাধ্যমেও ঐক্যবদ্ধাত সৃষ্টি হয়। তাঁর ছায়াতলে সাবই এক হয়। সবার কেন্দ্র এক ও অভিন্ন হলে একতা ও ঐক্যবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। আরেকটি মাধ্যম রাষ্ট্রীয় শক্তি। তা দ্বারা সবাই একই মারকাযে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

এজন্যই আমি বলেছি, সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যান, একতা সৃষ্টি করেন এবং হুকুমতকে শক্তিশালী বানান। আর বহিঃদেশের অনিষ্টের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন। কারণ, আপনাদের অনৈক্যের সুযোগে অন্যরা দেশদখলের সুযোগ পাবে। এজন্যই অতীব জরুরি হলো সকল মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজের দেশ এবং হুকুমতকে শক্তিশালী করা।

দশ রুপীর ফান্ড

একরাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমি মদীনা তায়্যেবাতে অবস্থান করছি আর উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর পক্ষ হতে একব্যক্তি আমার নিকট এল। সে দশ রুপী দিয়ে বলল, এগুলো হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. পাঠিয়েছেন। এগুলো দারুল উলুমের জন্য ব্যয় করুন। আমি তাঁর নিকট আরজ করলাম, এগুলো যাকাতের মাল, না সাধারণ দান? সে বলল, সাধারণ দান। আমি স্বপ্নের ভিতর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, এই বরকতপূর্ণ রুপীগুলো 'শতবর্ষ মাহফিল' ফান্ডে শামিল করব। সুতরাং সকাল বেলা আমি ঐ স্বপ্ন লিখে এবং একটি দশ রুপীর নোটকে নথি করে মাহফিল বাস্তবায়ন অফিসে পাঠিয়ে দিলাম। তখন ওখানে শহরের কিছু লোক বসা ছিল, তারা স্বপ্ন শ্রবণ করে অনেকে নিজের নামে, মাতা-পিতার নামে, স্ত্রী ও বোনের নামে দশ-দশ রুপী দান করলেন। এতে এক দেড়শত রুপী জমা হলো।

তারপর আমার বাড়িতে স্বপ্নে আলোচনা উঠলে আমি বললাম, হ্যাঁ স্বপ্নে এই এই দেখেছি। তখন আমার ছেলে সালেম, আসলাম ও আযম প্রত্যেকে নিজ নিজ বাচ্চা ও মহিলার পক্ষ হতে দশ-দশ রুপী দান করে প্রায় দুশো রুপীর অধিক একত্রিত করল। তারপর স্বপ্নের কথা ছাত্রদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের কয়েকজন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, এমন স্বপ্নের কথা আলোচনা হচ্ছে, তার ভিত্তি কী? তারা চাচ্ছিল, তাদের সামনেও যেন বর্ণনা করি। তারপর ছাত্রদের জলসা হলো ওখানে দেড়-দুহাজার ছাত্র একত্রি হলো। আমি তাদের সামনে স্বপ্ন বর্ণনা করলাম। তারপর পয়সার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তারা তো অধিকাংশই গরীব এবং গরীব দেশের বাসিন্দা। কিন্তু তারাও সেই মজলিসে চৌদ্দশত রুপী জমা করে ফেলল। যার নিকট কিছু ছিল না, সে নিজের হাতের ঘড়ি খুলে দিয়ে দিল।

তারপর সারা শহরে স্বপ্নের কথা ছড়িয়ে পড়লে যত মানুষ আসত সবাই দশ রুপী নিয়ে নিয়ে আসত। এই ছিল হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর বরকত। তাঁর নামের বরকতে লোকেরা উত্তেজিত হয়ে পড়ত। আর দশ রুপী ফান্ডে অনেক পয়সা জমা করত। তারপর আমি 'মাহফিল বাস্তবায়ন' অফিসকে লিখলাম, এখন থেকে যত পয়সা আসাবে, সবগুলো হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর নামে জমা করবেন এবং দাতার নাম মারফতের স্থানে লিখবেন যে, অমুক ব্যক্তি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর পক্ষ হতে দিয়েছেন। এভাবে অনেক রুপী জমা হলো।

উক্ত স্বপ্নের পর আমি মাদ্রাজ গেলাম। ওখানকার লোকেরা বলল, হুজুর ওখানেও স্বপ্নের আলোচনা হচ্ছে। আমি সেখানে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলাম তো কোথাও ছয়-সাত হাজার রুপী জমা হয়ে যেত দশ-দশ রুপী করে দিয়ে। আমি বললাম, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. ইচ্ছা করলে লক্ষ্য রুপী দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি দশ রুপী এজন্য দিলেন, যেন সবার জন্য দশ রুপী দেওয়া সহজ হয়। আর শত ও হাজার রুপী দেওয়া কষ্টসাধ্য। এজন্য তিনি দশ রুপী দান করলেন। আর তার নাম আমি নির্ধারণ করলাম 'দশ রুপী ফান্ড'।

উক্ত স্বপ্নের কথা পাকিস্তানের লাহোরে বর্ণনা করার পর উক্ত ফান্ডে দেওয়া শুরু হয়ে যায়। এখন উক্ত ফান্ডে পনের-ষোল হাজার রুপী জমা হয়েছে। এই ছিল উক্ত স্বপ্নের বাস্তবতা।

রাহমাতুল্লিল আলামীনের দান

তেমনিভাবে দুই রুপী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, ইলাহবাদের বাসিন্দা ডা. সালাহ উদ্দীন সাহেব স্বপ্নে দেখে আমার নিকট লিখেছেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে দুই রুপী দান করেছেন এবং আপনার নাম নিয়ে বলেছেন, অমুকের নিকট পাঠিয়ে দাও। এক রুপী দারুল উলুমে ব্যয় করবে আর অপর টাকা শতবর্ষ মাহফিলে ব্যয় করবে। তারপর তিনি নিজে দুই রুপী নিয়ে এলেন। আমি তার স্বপ্নের পর বললাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন। তাই তিনি এক রুপী এজন্য দিলেন, যাতে সকলেই শরিক হতে পারে।

প্রিয় বস্তু দান করার প্রয়োজনীয়তা

যদি খরচ কর, তাহলে প্রিয় বস্তু খরচ করো, দান করো প্রিয় বস্তু থাকলে। আর না থাকলে যাকে আপনি অকেজো ভাবছেন তাই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করুন। ভাল জিনিস নিজে রাখুন। মোটকথা, যা দিবেন তা যেন প্রিয় হয়। এ কথা বলা হয়নি যে, প্রিয় বস্তুই দিতে হবে। এ দ্বারা আবশ্যক হলো, যা দিবেন তা যেন প্রিয় হয়। আর প্রিয় বস্তু সব দিয়ে দিতে হবে তা নয়। কারো নিকট দশটি প্রিয় বস্তু থাকলে তা থেকে একটি দান করলেই যথেষ্ট। দশটি বস্তুর সব কটি দিয়ে দেওয়া জরুরি নয়। ইসলাম দানের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে– হুকুম করেনি। উৎসাহের উপর আমল করলে মর্যাদা পাবে। আর না দিলে গুনাহগার হবে না

জান্নাতের নেয়ামতরাজি

জান্নাতে যেসব নেয়ামত রয়েছে, সেগুলোর এমন যে لَا عَيْنٌ رَأَتْ কোনো চোখ দেখেনি, وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ কোনো কর্ণ শুনেনি, وَ لَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ কোনো অন্তর অনুভব করতে সক্ষম নয়। কারণ, মানুষ তা দেখেনি; তাই যা বুঝবে তা আকল দ্বারা বুঝবে। তারা বুঝবে দুনিয়াতে যেমন নেয়ামত রয়েছে, জান্নাতেও তেমনি নেয়ামত থাকবে। অথচ জান্নাতের নেয়ামত দুনিয়ার নেয়ামত হতে অনেক উর্ধ্বে।

এই বিষয়টি এমন ব্যক্তির-জন্য প্রযোজ্য, যারা শুধু আকল দ্বারা অনুভব করে, বোঝে। কিন্তু যারা ওহীর দ্বারা বোঝে, তারা এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাত দেখানো হয়েছে। তিনি

জান্নাতের সকল নেয়ামত স্বচোখে দেখেছেন। হযরত আদম আ. জান্নাতে ছিলেন। তিনি সকল নেয়ামত দেখেছেন। সুতরাং নবীগণ ও বিশেষ আল্লাহওয়ালাগণ শুধু আকল দ্বারা অনুভব করেন না; বরং ওহী এবং মুশাহাদার মাধ্যমেও দেখেন। অতএব উক্ত হুকুম সাধারণ মানুষের জন্য, যারা স্রেফ আকল দ্বারা অনুভব করে। তারা আকল দ্বারা যতটুকু অনুভব করবে, জান্নাতি নেয়ামত তা হতে অনেক উর্ধ্বে। এ কারণে নবীগণ উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নন।

মানুষ সর্বদিক থেকে নেতিবাচকে বেষ্টিত

মানবগুণাবলি অনেক সীমাবদ্ধ। মানুষকে সর্বদিক থেকে নাবাচকে ঘিরে রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ ইলমগুণের কথা বলা যেতে পারে। একজন মানুষের চারশো, পাঁচশো অথবা হাজার মাসয়ালার ইলম থাকল। তারপরও সে জানে না। তার চেয়ে বেশি তার ইলম নেই। তাহলে তাকে মূর্খতা ঘিরে রেখেছে। শুধু মাঝখানে তার কিছু ইলম রয়েছে। অথবা দেখা যাক, আমাদের শক্তি-সামর্থ্য। আমি আপনাদের বললাম, পানদানিটা নিয়ে আসেন। আপনি তা নিয়ে এলেন। আপনার শক্তি আছে। আপনাকে বললাম, চৌকিটা উঠিয়ে নিয়ে আসেন। তাও কষ্ট করে আনতে পারবেন। কিন্তু যখন বলব, ঘরটা উঠিয়ে নিয়ে আসনে, তখন আপনি বলবেন, আমার শক্তি নেই ঘর উঠিয়ে নিয়ে আসার। তাহলে ফলাফল কী হলো? আপনার ভিতর মধ্যস্থলে কিছু শক্তি রয়েছে আর চার পার্শ্বে শক্তিহীনতা। অনেক জিনিস আপনার শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে। কিছু জিনিস আপনার কুদরতের ভিতরে।

তেমনিভাবে অন্যান্য সিফাতেরও এই হালত। উদাহরস্বরূপ আপনি একজন সংরক্ষণকারী। আপনি হেফাজত করতে পারেন। একজন বাচ্চাকে করবেন, দুজনকে করবেন বা ঘরওয়ালার সাথে মিলে দশজনকে করবেন। আমি যদি বলি, সারা শহরকে হেফাজত করুন। তাহলে আপনি বলবেন, আমি সক্ষম নই। প্রেসিডেন্ট তা করতে পারবে। আমি প্রেসিডেন্টকে বলব, আপনি সারা পৃথিবী হেফাজত করুন। তাহলে সে বলবে, আমি সক্ষম নই, আমার মাঝে এমন শক্তি নেই যে, সারা বিশ্বকে হেফাজত করতে পারব। তাহলেও তো অক্ষমতা প্রকাশ হলো। অতএব মাঝখানে কিছু হেফাজত ও কুদরত রয়েছে আর সবদিকে খালি।

মোদ্দাকথা, প্রতিটি মানুষের প্রতিটি সিফাতে পূর্ণ গুণকে নাবাচক গুণে ঘিরে রেখেছে। নেতিবাচক চতুর্পার্শ্ব বেষ্টন করে আছে। মধ্যস্থলে কিছুটা দেওয়া

হয়েছে। স্বয়ং আমাদের ব্যক্তিসত্তা প্রথমে ছিল না, পরেও থাকবে না। শুধু মাঝখানে অল্প কদিন ছিল। তাকেও দুদিক থেকে নেতিবাচকে ঘিরে রেখেছে। অতএব আমাদের বিদ্যমানতা যেহেতু সামান্য; তাই সিফাতের বিদ্যমানতাও সামান্য হবে। সিফাত বা কামালে পৌঁছলেও সামান্যই হবে। সীমাহীন কামালাত হতে পারে না।

হাকিকী ওয়াজুদ : অনন্তকাল বিদ্যমান যে সত্তা

আন লিমিটেড কামালাত ঐ সত্তার হতে পারে, যার জাতের বিদ্যমানতা আন লিমিটেড বা সীমাহীন, যিনি আযাল থেকে আবাদ পর্যন্ত, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন। তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার বরকতময় সত্তা।

এটি একটি সহজ ও সুস্পষ্ট কথা যে, আল্লাহ তায়ালার ইলম মুহীত, তাঁর কুদরত মুহিত বা সকল কিছুকে বেষ্টনকারী। এজন্য বলা হয়েছে–

وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

সবকিছু তাঁর ইলমের গণ্ডির ভিতরে। সবকিছু সম্পর্কে তিনি অবগত।

তাঁর কুদরত সম্পর্কে বলা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

তিনি সর্ব বিষয়ের উপর শক্তিশালী। সবকিছু তাঁর শক্তির আয়ত্তে।

কোথাও বলা হয়েছে–

عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

তাঁর কর্তৃত্ব অন্য কারো কর্তৃত্বে নয়।

কোথাও বলা হয়েছে–

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ

তিনিই মালিকুল মূলক, যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দেন, যার থেকে চান কেড়ে নেন, যাকে চান বাদশাহ বানান, যাকে চান সিংহাসন থেকে অপসারণ করেন। মোটকথা, সকল বাদশার সীমানা আছে, নির্ধারিত সময় আছে। এক সময় তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যিনি অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবেন, তাঁর

হয়েছে। স্বয়ং আমাদের ব্যক্তিসত্তা প্রথমে ছিল না, পরেও থাকবে না। শুধু মাঝখানে অল্প কদিন ছিল। তাকেও দুদিক থেকে নেতিবাচকে ঘিরে রেখেছে। অতএব আমাদের বিদ্যমানতা যেহেতু সামান্য; তাই সিফাতের বিদ্যমানতাও সামান্য হবে। সিফাত বা কামালে পৌঁছলেও সামান্যই হবে। সীমাহীন কামালাত হতে পারে না।

হাকিকী ওয়াজুদ : অনন্তকাল বিদ্যমান যে সত্তা

আন লিমিটেড কামালাত ঐ সত্তার হতে পারে, যার জাতের বিদ্যমানতা আন লিমিটেড বা সীমাহীন, যিনি আযাল থেকে আবাদ পর্যন্ত, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন। তিনি হলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার বরকতময় সত্তা।

এটি একটি সহজ ও সুস্পষ্ট কথা যে, আল্লাহ তায়ালার ইলম মুহীত, তাঁর কুদরত মুহিত বা সকল কিছুকে বেষ্টনকারী। এজন্য বলা হয়েছে–

وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

সবকিছু তাঁর ইলমের গণ্ডির ভিতরে। সবকিছু সম্পর্কে তিনি অবগত।

তাঁর কুদরত সম্পর্কে বলা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

তিনি সর্ব বিষয়ের উপর শক্তিশালী। সবকিছু তাঁর শক্তির আয়ত্তে।

কোথাও বলা হয়েছে–

عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

তাঁর কর্তৃত্ব অন্য কারো কর্তৃত্বে নয়।

কোথাও বলা হয়েছে–

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ

তিনিই মালিকুল মূলক, যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দেন, যার থেকে চান কেড়ে নেন, যাকে চান বাদশাহ বানান, যাকে চান সিংহাসন থেকে অপসারণ করেন। মোটকথা, সকল বাদশার সীমানা আছে, নির্ধারিত সময় আছে। এক সময় তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যিনি অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবেন, তাঁর

রাজত্বও অনন্ত। যাঁর শুরুও নেই, তার শেষও নেই। সুতরাং তিনি বাদশাহদের বাদশাহ। তথা রাজাধিরাজ।

ইসলামে আমীর নির্বাচন করার পদ্ধতি

হযরত ওমর রা. শহীদ হওয়ার সময় ছয় ব্যক্তির নাম নির্বাচন করেন। তারপর বললেন, এই ছয়জনের মধ্য হতে কাউকে আমীর বানিয়ে নাও। তাঁরা হলেন হযরত আলী রা., হযরত উসমান রা., হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা., হযরত তালহা রা., হযরত যুবায়ের রা. এবং হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.। তিনি বললেন, খেলাফতের হকদার তাঁদের চেয়ে আর কেউ নেই। তাঁদের মধ্য হতে কাউকে নির্বাচন করে নাও। কিন্তু নির্বাচন করতে তিন দিনের বেশি সময় নিবে না।

তাঁরা একত্রে বসলেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. বললেন, ছয়জনের মধ্য হতে তিনজনকে সবাই নিজের ইখতিয়ার দিয়ে দেবে। তখন হযরত যুবায়ের রা. নিজ ইখতিয়ার হযরত আলী রা.কে দিলেন; হযরত তালহা রা. দিলেন হযরত উসমান রা.কে আর হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. নিজের ইখতিয়ার দিলেন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা.কে। তারপর হযরত আব্দুর রহমান রা. বললেন, হযরত উসমান রা. ও হযরত আলী রা. যিনি খেলাফত চাইবেন না, তাঁকেই খলিফা নির্বাচন করার ইখতিয়ার দেওয়া হোক। তখন তাঁরা উভয়ে নীরব রইনে। তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. বললেন, আমি নিজের জন্য খেলাফত চাই না। অতএব খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হোক। সুতরাং তাঁরা দুজনে তাঁকে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব সোপর্দ করলেন এবং তিন দিনের সুযোগ দিলেন।

তারপর তিনি বিভিন্নজনের নিকট হতে রায় নিলেন। অধিকাংশ রায় হযরত উসমানের পক্ষে দেওয়া হলো। তিনি উসমান রা.কে খলিফা নির্বাচন করলেন। আর এই নির্বাচন সবাই মেনে নিল। অতএব, ইসলামে আমীর নির্বাচনের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি সুপ্রসিদ্ধ। অপরটি হল নির্বাচন।

খলিফা নির্বাচনের পশ্চিমা নীতি

নির্বাচনের বর্তমান পদ্ধতি হলো, সকল বালেগ পুরুষ ও মহিলার ভোট নেওয়া হয়। সাধারণ জনগণ আমীর নির্বাচনে কী রায় প্রদান করবে? তাদের মধ্যে তো মূর্খ রয়েছে, অশিক্ষিত রয়েছে, যারা রাষ্ট্রপতি কাকে বলে তাও বোঝে না।

আমীর নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জ্ঞানীদের উপর, যাদের ইলম ও আমানতদারিতা সম্পর্কে জাতি অবগত এবং তাদের তাকওয়া ও পবিত্রতা-স্বচ্ছতার উপর জাতি নির্ভরশীল। তারা যাকে নির্বাচন করবে, জাতি তা মেনে নিবে। এটিই আমীর নির্বাচনে সহজ, গ্রহণযোগ্য ও বোধগম্য পদ্ধতি। কিন্তু গণতন্ত্রের মাঝে ক্ষতিকর দিক হলো, প্রত্যেক নেতা মনে করে, আমি খলিফা হব। সে নিজেই নিজের প্রশংসা বর্ণনা করে যে, আমি এই করেছি সেই করেছি; অতএব আমাকে খলিফা বানান। দায়িত্ব-কর্তৃত্ব অর্জন করার বস্তু। আর এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিই নিজে নিজের প্রশংসা বর্ণনা করেন যে, আমার কারগুজারি হলো এই, আমার সম্পর্কে অমুক এই বলেছে, আমি এমন পুরস্কার পেয়েছি ইত্যাদি। এ সম্পর্কে ইসলাম প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছে–

لَا نُوَلِّيْ اَمْرَنَا هٰذَا مَنْ طَلَبَهٗ

যে ব্যক্তি নিজেই কোনো দায়িত্বের প্রার্থনাকারী হয়, নিজেই তালাশকারী হয়, আমি তাকে দায়িত্বশীল বানাব না।

ইসলাম গোড়া থেকে শিকড় কেটে ফেলেছে। এখান থেকেই ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়। এখন কথা হলো, যারা নির্বাচন কমিটির সদস্য হবেন, তারা রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবেন এবং আমানতদার ও দীনদার হবেন। এক ধরনের রাজনীতিবিদ হলেন অন্ধ। অর্থাৎ তারা ভাঙ্গা-গড়ার রাজনীতি করেন। আর কিছু এমন রয়েছেন, যাদের অন্তর পবিত্র, সত্যবাদী, আমানতদার ও পরহেযগার। তারা যে রায় দিবেন, তাতে বরকত হবে এবং জাতি তা গ্রহণ করে নিবে। তাই বিশেষ কমিটিতে উক্ত গুণধারী মানুষ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ভিন্ন পন্থা গ্রহণকারী খলিফা

কখনো এমন হয় যে, কেউ জোর করে রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে যান। শক্তি প্রয়োগ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। তার সম্পর্কে কিতাবে এসেছে, তিনিও আমীর হবেন। কারণ, তাকে হটাতে গিয়ে ফেতনা হবে আর ফেতনা হতে বেঁচে থাকা জরুরি। ফেতনাকে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকেও কঠিন ও ভয়াবহ বলা হয়েছে। অতএব কেউ যদি নিজেই খলিফা হয়ে যান আর তার মাঝে খেলাফতের যোগ্যতা থাকে, তাহলে জাতির উপর ফরজ তাকে মেনে নেওয়া এবং বিবাদে লিপ্ত না হওয়া।

ক্ষমতার রশি টানাটানির কারণ

ক্ষমতা রদবদলে যে সমস্ত ঝগড়া-ফাসাদ মারামারি ও জ্বালাও-পোড়াও হয়, তা এই কারণে হয় না যে, বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান খারাপ। খারাপ গুণ হতে তো কেউই মুক্ত নয়। সবার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। অতএব এগুলো হয়ে থাকে একমাত্র এ কারণে যে, প্রত্যেকে চায় আমি ক্ষমতার মালিক হব। ক্ষমতাটা আমার চাই। মূলত ঝগড়ার কারণ এটিই। এ ব্যাপারে তো পূর্বেই বলে দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নিজে ক্ষমতার প্রার্থনাকারী হবে, আমি তাকে ক্ষমতা বা দায়িত্বে দেব না। কারণ, সে স্বার্থপর; তার মধ্যে স্বার্থপরতা রয়েছে। আর যারা নির্বাচন কমিটির সদস্য, যাদের হাতে জাতির লাগাম অথবা যাদের আমানতদারি ও তাকওয়ার উপর জাতির আস্থা রয়েছে, যারা স্বার্থপর নন, তাদের একত্র করে কাউকে নির্ধারণ করে দিলে তাতে সারা দেশের মানুষের মতামত নেওয়া জরুরি নয়। যারা দায়িত্বশীল রয়েছেন, তারাই সমগ্র জাতির নির্যাস। আর বাস্তবে তারাই জাতির প্রতিনিধি। সুতরাং তারা নির্ধারণ করলে সবাই মেনে নিবে।

জনতার রায়ের সমতা বিধান করা জরুরি

সর্বসাধারণের রায় নেওয়ার দ্বারা এতটুকু হয় যে, যার মাঝে বিরোধ ভাব থাকে, তা দূর করা সম্ভব হয়। তাকে বলা যায়, মিয়া! তুমি যা মনে করেছ আসলে বিষয়টি এমন নয়। এতে জাতি বিরোধিতা হতে বিরত থাকে। হযরত উসমান রা.কে খলিফা নিযুক্ত করা মোটামুটি ঐ ছয়জনের মজলিসেই সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. বাড়ি-বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কাকে খলিফা হিসেবে চাও। যেহেতু বনি উমামইয়ার লোকসংখ্যা বেশি ছিল এবং তাদের মাঝে নেতৃত্বেরও প্রবণতা ছিল এ কারণে হযরত আলী রা.-এর পরিবর্তে লোকেরা হযরত উসমান রা.কে পছন্দ করলেন এবং অধিকাংশ রায় তাঁর পক্ষে এল। ফলে তাঁকে খলিফা নির্বাচন করা হলো। তারপরও হযরত আব্দুর রহমান রা. সবার বাড়ি-বাড়ি গিয়ে রায় নেন।

উক্ত বিষয়ের নির্যাস হলো, জনসাধারণের রায় গ্রহণ করাও জরুরি। আর তা এভাবে যে, তাদের সামনে যাকে খলিফা বানানো হবে তার বাস্তব যোগ্যতা ও চরিত্র তুলে ধরবে। তার আমানতদারি ও তাকওয়া প্রকাশ করবে। যাতে তার সম্পর্কে বিপরীত ধারণা দূরীভূত হয়ে যায় এবং কারো মাঝে সংশয় না থাকে।

খলিফার ভুল-ভ্রান্তির বিধান

এখন সারা পৃথিবী খুঁজে এমন মানুষ পাওয়া যাবে না, যিনি একেবারে পুত-পবিত্র যার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তির চিহ্ন নেই। সবার মধ্যে কোনো-না-কোনো ভুল বা দোষ-ত্রুটি রয়েছে, এগুলো লক্ষ্যণীয় বিষয় নয়, গ্রহণযোগ্য বিষয় নয়।

এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, আমীর-খলিফা যদি কোনো ভুল করেন তাহলে যথাসম্ভব নসিহত ও উপদেশ প্রদান কর। এতে সংশোধন না হলেও তার আনুগত্য কর। ফেতনা সৃষ্টি করা যাবে না, যদিও তার রায় ভ্রান্ত হয়। সব কিছুর বুনিয়াদ হল, স্বার্থপর হওয়া যাবে না। আমানতদারী এবং তাকওয়া অন্তরে থাকতে হবে। তাহলে সবই সম্ভব। অন্যথায় ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হবে, গোলযোগ বাড়তে থাকবে। দেখতে হবে, যদি কারো ভিতর দেশ পরিচালনার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে তাহলে তার বিরোধিতা করা যাবে না। তাকে দেশ পরিচালনায় সুযোগ দিতে হবে। তিনি যদি ভুল করেন, তাহলে তার ভুল প্রচার করা যাবে না। তবে যদি ইসলামকে পরিবর্তনের জন্য কাজ করে, ইসলামি বিধানের বিপরীত কাজ করে তাহলে অবশ্যই তাকে অপসারণ করতে হবে।

বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি ফেরকাবন্দির বুনিয়াদ

মাওলানা আহমাদ রেজা খান ও বেরেলভী মতবাদের সাথে ইসলামের যতটুকু সম্পর্ক এতে আজ পর্যন্ত তাদের কেউ কাফের বলেনি; অতএব তারা মুসলমান। কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা, কঠোরতা করা, সীমালঙ্ঘন করা দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে পছন্দনীয় নয়, দীনিভাবেও পছন্দনীয় নয়।

দীনের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ

দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না।

সাদাসিধাভাবে চলো। যে সম্প্রদায়ের লোকেরা বাড়াবাড়ি করেছে, তারা হয়তো ইফরাত করেছে, না হয় তাফরীত করেছে। হযরত মসীহ আ. সম্পর্কে ইয়াহুদি জাতি এমন ইফরাত করেছে যে, তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ) যিনার সন্তান বলেছে, তাঁকে ব্যভিচারীর সন্তান বলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। আর নাসারা জাতি এমন তাফরীত করেছে যে; তাঁকে খোদা বলেছে এবং খোদার ছেলে বলেছে। তারা এক জাতি এদিকে বাড়াবাড়ি করেছে আর অপর দল ওদিকে বাড়াবাড়ি করেছে। যা আসল ও সঠিক, তাহলো তিনি আল্লাহ তায়ালার পবিত্র বান্দা এবং তাঁর

পবিত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিকে কেউ যায়নি। বরং তারা গিয়েছে ঐ দিকে যে, আল্লাহ জন্ম দিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ) এবং তিনি একজন বদকার মানুষ। এগুলো হলো ইফরাত ও তাফরীত, যা দ্বারা ফেরকা সৃষ্টি হয়। হযরত আলী রা. সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ فِيكَ مَثَلُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

তোমার মাঝে ঈসা ইবনে মরিয়মের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কিছু ফেরকা তোমার মহব্বতে পড়ে ধ্বংস হবে আর কিছু তোমার দুশমনি করে ধ্বংস হবে। অতএব খারেজীরা দুশমনির রাস্তা গ্রহণ করেছে এবং তারা হযরত আলী রা.কে হত্যা করার প্লান করেছে। অপরদিকে রাফেজী ফেরকার কিছু লোক বিশ্বাস করে, হযরত আলীর ভিতর খোদা হুলুল (প্রবেশ) হয়েছে এবং তাঁকে ইমাম মানে। আর ইমাম অর্থ মাসুম, যার কোনো গুনাহ নেই। তারা বলে, ইমাম শরীয়তের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে পারেন। তারা যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে তিন ওয়াক্ত করে ফেলেন। তাও তাদের অধিকার রয়েছে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও অধিকার নেই শরীয়তের মাঝে পরিবর্তন সাধন করা।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِىٓ

আমার কোনো অধিকার নেই, নিজের পক্ষ থেকে কুরআনুল কারীমে কিছু পরিবর্তন করব। পরিবর্তন করা আল্লাহর হাতে। আমি শুধু আনুগত্যকারী। *[সূরা ইউনুস : ১৫]*

মোটকথা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেখানে শরীয়তে রদবদলের অধিকার দেওয়া হয়নি আর তাদের ইমামকে রদবদলের অধিকার দেওয়া হয়েছে। অতএব রাফেজী ও খারেজী উভয়েই সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করেছে। আর তাদের থেকে ইসলামে ফেরকা সৃষ্টি হয়েছে।

একই সমস্যা এখানেও যে, কিছু মাসায়েল রয়েছে ইখতেলাফপূর্ণ। অর্থাৎ ইখতেলাফপূর্ণ মাসয়ালাগুলোতে যদি বাড়াবাড়ি না করা হয় বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা হয়, তাহলে আমি মনে করি, কিছুই ইখতেলাফ থাকবে না। এখন ঐ ইখতেলাফকে ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যম বানানো হয়েছে। এগুলো স্রেফ

জযবাগত ব্যাপার– মাসয়ালাগত ব্যাপার নয়। মাসয়ালা কখনো ঝগড়া সৃষ্টি করে না।

ওরসের মাসয়ালা

এ ব্যাপারে উলমায়ে দেওবন্দ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। তারা ওরসের মাসয়ালার ব্যাপারে বলেন, জাতিগতভাবে ওরস কোনো খারাপ বা মন্দ বস্তু নয়। ওরসের ভিত্তি বা বুনিয়াদ এমন ছিল যে, যখন কোনো আল্লাহওয়ালা শায়েখে তরিকতের ইন্তেকাল হত, তখন তার মুরিদ ও খলিফারা একত্রিত হত। এতে একটি উপকার তো এই ছিল যে, যাদের নিসবত দুর্বল হয়ে যেত, শক্তিশারী নিসবাদওয়ালাদের মাধ্যমে তাদের নিসবাত শক্তিশালী হত। তাদের নিসবাত মজবুত হত, সুদৃঢ় হত।

দ্বিতীয় ফায়দা হলো, তাদেরকে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হত যে, তোমরা ওখানে গিয়ে ইসলাহী কর্ম করো; তুমি অমুক রাজ্যে যাও, তুমি অমুক দেশে গিয়ে ইসলাম প্রচার করো।

বাস্তব ও সত্য কথা হলো, সুফিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে হিন্দুস্তানে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। তাদের কাছে ওরসের মূল বিষয় ছিল এমন যে, বছরে একবার একত্রিত হয়ে হিদায়েত ও তাবলিগের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিধিদল পাঠাত। এ কারণেই প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে এবং জেলায় শাহে বেলায়েতের মাজার রয়েছে। সাহারানপুরে শাহে বেলায়েতের কবর রয়েছে, দেওবন্দে শাহে বেলায়েতের কবর রয়েছে, তেমনিভাবে আরো অনেক স্থানের কথা শুনেছি।

তার আসল কারণ ছিল এমন যে, যে প্রতিনিধিদলকে পাঠানো হত, তাদের মধ্যে একজনকে আমীর বানানো হত। আর তার নাম দেওয়া হত শাহে বেলায়েত। তারা যেখান ইন্তেকাল করতেন, সেখানেই কবরস্থ হতেন। তারা শাহে বেলায়েত নামে দাফন হতেন। ফলে এতসংখ্যক শাহে বেলায়েতের কবর হয়েছে।

মোটকথা, ওরসসমূহে বেলায়েত বণ্টন হত যে, দীনের তাবলিগ করো, মুসলমানদের ইসলাহ করো। হযরত খাজা মঈনুদ্দীন আজমিরী রহ.-এর সম্পর্কে খ্রিষ্টবাদের সাক্ষ্য রয়েছে। মিষ্টার অরন্যাল্ড, 'প্রেচিং অব ইসলা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত কিভাবে প্রচার লাভ করল। তিনি তাতে লিখেছেন–

'হিন্দুস্তানে হযরত খাজা আজমিরী রহ. ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর মাধ্যমে সে দেশে ইসলাম প্রসার লাভ করে। নিরানব্বই লক্ষ হিন্দু কোনো মাধ্যম ছাড়া

সরাসরি তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়। আর যারা তাঁর খলিফাদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, তাদের হিসাব ভিন্ন।'

হযরত সুলতানুল আউলিয়া নিযামুদ্দীন দেহলবী রহ.-এর নয়শত খলিফা দাক্ষিণাত্যে পৌঁছে সেখানে ইসলাম প্রচার করেন। তারা হাজার হাজার মানুষকে ইসলামের গ-ির ভিতর প্রবেশ করান। সেই এলাকায় গিয়ে দেখা যাবে, পাহাড়ে এমন সংকীর্ণ স্থান, যেখানে মানুষদের যাওয়া কষ্টসাধ্য; কিন্তু কোনো-না-কোনো মসজিদ অথবা মাজার রয়েছে। তারা সেই সমস্ত স্থানেও পৌঁছেছেন। তিনি সেই এলাকায় তাঁর নয়শত খলিফা প্রেরণ করেন ইসলাম প্রচারের জন্য।

সুতরাং ওরসমূহের উদ্দেশ্য ছিল ঐ সকল কর্ম। কিন্তু তা আস্তে-আস্তে এমন হয়ে গেছে যে, প্রসিদ্ধি আছে–

الولایۃ سردہ آمد رفتہ رفتہ کجرہ شُد

বেলায়েত প্রথমে পাকা মিষ্টি ছিল, এখন কাচা ও পানসে হয়ে গেল।

তেমনিভাবে এখন ওরস অর্থ মেলা। তাতে মহিলা থাকে, নৃত্য তাকে, দোকান-পাট থাকে, থাকে সব ধরনের বাজে কর্ম। এহেন ওরসকে যদি কেউ প্রতিহত করে, তাহলে বলে যে, উরসে বাধা প্রদান করছে। আসলে এখানে ওরসকে বাধা দেওয়া হয়নি। এখানে বাধা দেওয়া হচ্ছে বাজে ও অহেতুক কর্মকে, যা শুধু সুন্নাতপরিপন্থীই নয়; বরং বিদয়াতও বটে, যাতে প্রথাগত কাজ ভরপুর, যাকে আবিস্কার করেছে মূর্খরা। আমি বলি, যদি ওরস উক্ত বস্তু হতে পবিত্র হয়, উরসে তাবলিগের জন্য প্রতিনিধি পাঠানো হয়, ওয়াজ হয়, নসিহত হয়, তেলাওয়াত হয়, জিকির হয়, তাহলে এমন ওরসকে কেউ বাধা দেবে না।

আমাদের দারুল উলুমের সবচেয়ে বড় মুফতি মুফতি আযীযুর রহমান সাহেব রহ.। তিনি নকশবন্দী সিলসিলার বুযুর্গ ছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর সারহিন্দ শরীফের উরসে অংশগ্রহণ করতেন। কোনো দেওবন্দি তাকে বাধা দিতেন না। কেননা, ওখানে কোনো বাজে ও অহেতুক কর্ম হত না। ওখানে তেলাওয়াত হত, তাবলিগ হত, ওয়াজ নসিহত হত।

মোটকথা, আসলে ওরসকে বাধা প্রদান করা হয় না বরং বাধা দেওয়া হয় বাজে কর্মকে। সাধারণ মানুষ বাজে কাজে অভ্যস্ত; তাই তারা একে আড়াল করে বলে, সাহেব! অমুকে ওরসে বাধা দিচ্ছে; অথচ বুযুর্গরা তা করে গেছেন। প্রশ্ন হলো, বুযুর্গরা কি নাচ-গান জারি করেছিলেন? তাদের উদ্দেশ্য ছিল ওরস দ্বারা তাবলিগ করা, ওয়াজ করা, সত্য দীনের প্রচার-প্রসার করা। এখন ঐ সকল কাজ তো

নেই। শুধু নাচ-গান আছে। সুতরাং অনেক বস্তু মূর্খতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু তাদের শরীয়তের জ্ঞান নেই, তাই বাজে ও অন্যায় কাজই হবে।

ইসলামের নামে প্রচলিত প্রথা

এগুলো প্রচলনের পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো, ঐ সকল বুযুর্গদের দীনদারী, তাকওয়া, পবিত্রতা ও ইখলাসপূর্ণ আমল দেখে গোটা জাতি মনোযোগী হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও অমুসলিম ইসলামের গণ্ডির ভিতরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু তাদের দীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে তাদের ঘরে হিন্দুয়ানী রসুম-প্রথা বানিয়ে নিয়েছে। যেমন হিন্দুরা গুগালের পতাকা বের করত। মুসলমান হওয়ার পর শায়েখ সাদ্দুর নিশান বের করে দিল। তারা চিতায় নযর-নিয়ায বা ভোগ ছড়াত। পরবর্তীতে তা মাজারে ছড়াতে লাগল। তাদের মাঝে সবগুলিই হিন্দুয়ানা প্রথা চালু হলো, যেগুলোর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু ইসলামের নামে পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমান ওরসগুলোতে যা হয়, তার কিছু হিন্দুদের প্রথা হতে আগত। কিছুটা এদিক-সেদিক করা হয়েছে মাত্র। মূলত তা হিন্দুয়ানী প্রথা। এখন যদি কেউ এমন ওসরকে বাধা দেয়, তাহলে তারা বলে থাকে, এরা বুযুর্গদের তাজিম-সম্মান করে না। বুযুর্গরা কি এমন বাজে ও অন্যায় কর্ম চালু করে গেছেন? তারা পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন।

যিকরে মিলাদ বা জশনে মিলাদ

তেমনিভাবে মিলাদ শরীফও। একথা সুস্পষ্ট যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম আলোচনা আনুগত্য ও ইবাদাতের কাজ। তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। কিন্তু আজ-কাল যিকরে মিলাদ জশনে মিলাদে (মিলাদ উৎস) রূপান্তর হয়ে গেছে। এখন জায়গায়-জায়গায় সবুজ মিনার নির্মাণ করা হচ্ছে। তাতে আলোকসজ্জা করা হচ্ছে। এ কি সীরাত প্রচার করা হচ্ছে? সীরাত তো এসেছিল এহেন কৃত্রিমতাকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। সেগুলোকে প্রচলেনর জন্য আসেনি, প্রদর্শনের জন্য আসেনি। অন্তরে সীরাতের নিশান নেই, নিশান উড়ছে বাজারে, মিনার ও বুর্যের উপর। সীরাত কি মানুষের জন্য এসেছিল, না পতাকা আর বিজলি বাতির জন্য? এখন সীরাত ব্যবহার হচ্ছে পতাকায়, আলোকসজ্জা প্রদর্শনে। এখন যদি এমন গর্হিত কর্মকে বাধা প্রদান করে, তাহলে তারা বলে, তাদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত নেই, ভালবাসা

নেই, ইশ্‌ক নেই। মহব্বত এর নাম যে, এমন বাজে ও অনর্থক কর্ম করবে, তাহলে মহব্বত করা হবে, না করলে মহব্বত করা হবে না। এখন তাদের কিভাবে বুঝানো সম্ভব? রাষ্ট্রীয়ভাবে তো বিচারের ব্যবস্থা নেই।

এখন উলামায়ে কেরাম যদি এহেন বাজে ও অনর্থক কাজে বাধা দেন, তাহলে তারা বলে, এই নতুন ইসলাম তারা কোথা হতে আমদানি করেছে। কারণ, তাদের নিকট তাদের ঘর থেকে আগত ইসলাম কুসংস্কার ও প্রথায় ভরপর ইসলাম। এখন যদি কেউ কুপ্রথাকে বাধা দেন, তাহলে তারা বলে, এরা কোথা হতে এসেছে প্রচলিত প্রথাকে বাধা দিতে? অথচ আলেমগণ এমন কুপ্রথাকে বাধা দেন, যেগুলো মূর্খতার আদলে প্রচলিত হয়ে গেছে। তারা মূল বস্তুকে তো বাধা দেন না। এ কথাটুকু কেউ বোঝে না, বোঝার চেষ্টাও করে না।

আল্লামা হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহ. নিজ অভিজ্ঞতার আলাকে লিখেছেন, 'যারা কবর-মাজার তওয়াফ করতে এবং সিজদা করতে যায়, তাদের হজের তাওফিক কম হয়। কারণ, যে জযবা-উৎসাহ ব্যয় করতে হতো হজে, তা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে মাজারে, কবরে। আরা যারা গান-বাজনায় লিপ্ত থাকে, তাদের কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতের তাওফিক কম হয়। কেননা, তেলাওয়াতের জযবা গানে ব্যয় হয়ে যায়। জযবা এসেছিল ইসলামের জন্য যে, তা দীনের তরে ব্যয় হবে, কুরআন ও হাদিসের জন্য ব্যয় হবে। তা ব্যয় হয়ে গেছে গান-বাজনার জন্য। তার কারণ, সেই শিক্ষা নেই, যা দ্বারা সীরাতের হাকিকত জানতে পারবে, বুঝতে পারবে, তার উপর আমল করতে পারবে। না আছে চর্চা ও ট্রেনিং। তাই যে কোনো কুপ্রথা চালু করে, যে কেউ তা আবিস্কার করে, এক বাক্যে বলে ফেলে এগুলো খুব উত্তম, খুব ভাল। কিছু দিন পর সেগুলো দীনের কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়। উলামায়ে কেরাম এমন বাজে ও কুপ্রথাকে বাধা দেন। আসল দীনকে বাধা দেন না।

দেওবন্দি, বেরলভী কোনো ফেরকার নাম নয়

এজন্যই আজ পর্যন্ত আমার বুঝে আসে না যে, ঐ ইখতেলাফ ও ঝগড়া-বিবাদ কী বস্তু, যাকে বেরলভী এবং দেওবন্দী নামে প্রকাশ করা হয়। দেওবন্দী তো কখনো কোনো ফেরকার নাম নয়। তারা তো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। দেওবন্দি একটা তালিমী সম্পর্কের নাম। যারা দেওবন্দে পড়ালেখা করেন, তারা দেওবন্দি নামে প্রসিদ্ধ হন। যারা আলিগড়ে পড়েন, তারা আলিগ নামে প্রসিদ্ধ হন, যারা নদওয়াতে পড়েন তারা নদভী নামে পরিচিত হন। বাকিয়াতে সালেহাত মাদরাসায় পড়লে তাকে বাকুভী ডাকা হয়। এখন সবাই বলবে, নদভী

একটি ফেরকা, বাকুভী একটা ফেরকা, দেওবন্দি একটি ফেরকা। অবশ্যই বলবে না। দেওবন্দি হলো মূলত তালিমী নিসবতের নাম। কিন্তু এখন ফেরকা বানিয়ে দিয়েছে।

ইংরেজদের প্রতিশোধ

সকল ফেরকা ও কুপ্রথার আসল বুনিয়াদ এই যে, দেওবন্দি জামাত ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, অস্ত্র হাতে জিহাদ করেছিল। তাই ইংরেজদের মনে দেওবন্দিদের প্রতি বিদ্বেষ ও দুশমনি ছিল। ইংরেজ জাতি খুব বুদ্ধিমান জাতি। তারা প্রকাশ্যে মোকাবেলা করত না। তারা এমন ষড়যন্ত্র করত, যাতে আমরা ফেঁসে যাই এবং নিজেদের মাঝে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি হয়। তারা মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করল যে, দেওবন্দিদের বদনাম করো। সুতরাং যারা বিদয়াত প্রতিহত করত, তাদের বিরুদ্ধে বিদাআতকারীরা সুযোগ পেয়ে গেল। তাদের বলা হলো, তোমরা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও; তারা দাঁড়িয়ে গেল। এখন যারাই বিদয়াত রদ করতে আসে, তাদের মোকাবেলায় বিদয়াতীরা প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। তারপর ফেরকার ধ্বনি বেজে ওঠে। লক্ষ্য করে না যে, বিদয়াত পরিত্যাজ্য বিষয়।

বিদয়াত পরিহার ও সুন্নাতের অনুসরণ

মুসলমানগণ দুনিয়াতে এসেছে সুন্নাতের ইত্তেবা করার জন্য যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, এই নমুনায় আমল করো আর তারা সেই নমুনায় আমল করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এ কথা বলেননি যে, صَلُّوْا নামায পড় নাও বরং তিনি বলেছেন–

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

নামায এমনভাবে পড়ো যেমনভাবে আমাকে পড়তে দেখ।

আমার নমুনায় নামায হলে গ্রহণযোগ্য, না হলে নয়।

হজ করো, যেভাবে আমাকে করতে দেখেছ। নিজ হাতে তৈরি করা পন্থায় করলে হজ হবে না। মোটকথা, আমরা তো সুন্নতের ইত্তেবা ও অনুসরণের জন্য এসেছি। কুরআন থেকে ইলম নেব, হাদিস হতে আমল নেব, ফিকহ্ হতে তার ব্যাখ্যা নেব। তার পর তার উপর করব। এগুলোর বিপরীত যা হবে, সেগুলো সুস্পষ্টতই আমলের যোগ্য নয়। যে ব্যক্তি বিদয়াতের বিরোধিতা করবে, তারা

তার বদনাম করে, দুর্নাম রটায়। কেননা, এগুলো তাদের কুপ্রথার বিপরীত। এখন মানুষর রসুমে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। দীনের হাকিকত অন্তরে নেই। এ সকল বস্তু বুনিয়াদি বস্তু। অন্যথায় আমার বুঝে আসে না যে, মূল ঝগড়া কী নিয়ে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে তোমরাও মান, আমরাও মানি, বাইয়াত ও তরিকত তোমাদের মাঝেও আছে, আমাদের মাঝেও আছে; তাহলে ঝগড়া কী নিয়ে? ওরস, মিলাদ এগুলো কী ঝগড়ার বিষয়? এগুলো তো মৌলিক বস্তু নয় বরং শাখাগত বস্তু। এগুলোতে যেসকল বাজে ও অহেতুক বস্তু অনুপ্রবেশ করেছে, সেগুলো মূর্খতার কারণে এসেছে; এমনটিই বাস্তব ও সত্য কথা। এগুলো তো আমরাও করতে বলি।

পূর্বপুরুষদের অনুসরণ

উদাহরণস্বরূপ জানাযার নামাযের সুন্নাত তরিকা হলো, নামায পড়ে মাইয়েতকে দাফন করে দাও। কিন্তু এখন জানাযার পর পৃথকভাবে দোয়া করা হয়, অথচ জানাযার নামাযই দোয়া। জানাযা তো রুকু, সিজদাওয়ালা নামায নয় বরং তা শাফায়েত, সুপারিশ ও দোয়া। এখন তারপরও দোয়া করা হয়। কোনো-কোনো স্থানে মানুষ কবরে আযান দেয়। এগুলো সুন্নাত নয়, কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

এখন যদি কেউ বলে, এগুলো বিদয়াত, তাহলে তারা বলবে, এগুলো তো আমাদের বাপ-দাদাদের থেকে পেয়েছি। তাহলে তাদের কথা আর মক্কার কাফিরদের কথা একই হলো–

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا

আমাদের বাপ-দাদাকে এমন করতে দেখেছি।

কুরআনুল কারীম তাদের দাবির উত্তর দিল–

أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

যদিও তোমাদের বাপ-দাদারা কিছুই না জানে এবং সরল সঠিক পথে না থাকে, তারপরও তোমরা তাদের পদাংক অনুসরণ করবে? *[সূরা বাকারা : ১৭০]*

সত্য প্রিয় মানুষ তো তারা যারা রাসূলের হুকুম পেলে মেনে নেয় এবং সুন্নাতের ইত্তেবাকে প্রাধান্য দেয়।

শরীয়তের আদবকে প্রাধান্য দেওয়া

আমি দেওবন্দি বুযুর্গদের দেখেছি, তাঁরা সাহেবে হাল ছিলেন, অন্তরে বাহ্যিক জ্বালাও ছিল, মর্মপীড়ায়ও ভুগতেন; কিন্তু তাঁরা শরীয়তের আদবকে প্রাধান্য দিতেন। শরীয়তের বাইরে যেতেন না। তাঁরা কোনো সুন্নাত পরিত্যাগ করতেন না চাই প্রাণ চলে যাক, তাও সুন্নাত ছাড়তেন না। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী সাহেব রহ. যিনি ইংরেজবিরোধী জিহাদে আমীরে জিহাদ ছিলেন। ইংরেজ সরকার ইনসাফগার ও ন্যায়বিচারক ছিল না। তারা সামান্য-সামান্য বাহানায় আলেমদের ফাঁসি দিয়ে দিত। হযরত রহ. প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি ছাত্তা মসজিদে অবস্থান করছিলেন। গোয়েন্দারা রিপোর্ট দিল, তিনি এখন ছাত্তা মসজিদে রয়েছেন। পুলিশ এসে মসজিদ ঘিরে ফেলল। একজন সার্জেন্ট মসজিদে প্রবেশ করল এবং নানুতবী রহ.-এর নিকট জিজ্ঞেস করল, মৌলভী মুহাম্মাদ কাসেম এখন কোথাও আছে?

তিনি দু-কদম পিছনে সরে বললেন, একটু পূর্বে তো এখানে ছিল, দেখুন এখন কোথায় আছে। তারা খুঁজছিল। এই সুযোগে তিনি শাহ রুকনুদ্দীন মসজিদে চলে গেলেন। সেখানে পুলিশ ঘেরাও করার পর তিনি শাহ বেলায়েত মসজিদে পৌঁছে গেলেন। তিনি এভাবে ঘুরছিলেন। তাঁর শ্যালক শায়েখ নেহাল আহমাদ সাহেব রহ.। দেওবন্দ থেকে আনুমানিক আট-দশ মাইল দূরে অবস্থিত ছাকওয়ালি গ্রাম ছিল তাদের। তিনি অনেক খোশামোদ করে বললেন, ঠিক আছে; আমি আপনাকে এখানে থাকতে বাধা দিব না। আমি আপনাকে নিয়ে গ্রামে রাখব; অন্যথায় গ্রেফতার হয়ে যেতে পারেন।

গোয়েন্দারা আবার রিপোর্ট করল, মৌলভী কাসেম নানুতবী ছাকওয়ালী অবস্থান করছেন। তারপর পুলিশ এসে সারা গ্রাম ঘেরাও করে ফেলল। একজন ইউরোপিয়ান অফিসার বাড়ির ভিতর প্রবেশ করল। হযরত রহ. তাকে ইস্তেকবাল করলেন এবং বললেন, আসুন, তাশরীফ রাখুন। ঘরে বলে দিলেন চা তৈরি করতে। তার জন্য চা বানানো হলো।

অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী সম্পর্কে অবগত আছেন।

হযরত বললেন, জি খুব ভালভাবে অবগত আছি।

তিনি বললেন, তিনি কেমন মানুষ?

হযরত বললেন, খুব নেককার মানুষ, শিক্ষিত মানুষ।

অফিসার বলল, আমি তাকে তালাশ করতে চাই।

হযরত বললেন, ভালভাবে করুন। আনন্দচিত্তে করুন।

সুতরাং যাকে তারা তালাশ করছে, তিনিই নিজেই তালাশ করাচ্ছেন। তারা প্রতিটি কামরা পৃথক-পৃথক তালাশ করল; কিন্তু পেল না। পুলিশ অফিসার হযরতের আপ্যায়নে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ফিরে গেলেন। অফিসার বাইরে গিয়ে শনাক্তি কার্ড বের করে দেখল এবং বলল, মৌলভী কাসেম এই লোক তো নয়? তারা আবার ফিরে আসছিল। এ সময় তিনি নানুতা চলে গেলেন। তারপর দেওবন্দ এলেন। পরিশেষে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন মিলে তাঁকে বাধ্য করলেন, অন্তত কিছু দিন আত্মগোপন করে ঘরে অবস্থান করুন।

হযরতের শশুরালয় দেওবন্দের দেওয়ান মহল্লায় ছিল। অনেক বড় মহল্লা। তাঁর শশুর অনেক বড়মাপের সর্দার ছিলেন। তিনি মাজবুর করে তার নিকট রাখলেন। তিন দিন পর ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। লোকেরা বলল, এখনও অবস্থা আশংকামুক্ত নয়। তিনি বললেন, তিন দিনের বেশি আত্মগোপনে থাকা সুন্নাতপরিপন্থী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করছিলেন, তখন তিনি গারে সাওরে তিন দিন আত্মগোপনে ছিলেন। আল্লাহর শুকরিয়া যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই সুন্নাতের উপর আমল করতে পেরেছি।

তাঁদের জানের পরওয়া ছিল না। তাঁদের নিকট ইত্তেবায়ে সুন্নাত প্রাধান্য ছিল। আমি হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.কে দেখেছি, তিনি দরস দিচ্ছিলেন। যতজন ছাত্র ইবারত পড়ছিল, এত পরিমাণ যিকরের হালকা-হালকা আওয়াজ আসছিল। কে জিকির করছে, তা বোঝা যাচ্ছিল না। তিনি নিজেই জিকির করছিলেন। ইবারত পাঠ শেষ হওয়ার পর তিনি ব্যাখ্যা পেশ করলেন। ইবারতের মর্ম বয়ান করলেন। ছাত্ররা পরবর্তী পৃষ্ঠা পাঠ শুরু করলে তিনি পুনরায় জিকির আরম্ভ করলেন। তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, যখন হৃদয় গলে অশ্রু বের হত, তখন তিনি তা এমনভাবে পান করে নিতেন, যাতে অন্য কেউ বুঝতে না পারে যে, হযরতের চোখ অশ্রুসজল হচ্ছে। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। শরীয়তের আদব এত পরিমাণ প্রাধান্য ছিল যে, তিনি নিজের হাল-কাল (অবস্থা আলোচনা)কে অগ্রে রাখেননি; বরং শরীয়তকে অগ্রে রাখতেন, ইমাম বানাতেন।

একই পদ্ধতি আমাদেরও গ্রহণ করতে হবে, হাল সৃষ্টি করতে হবে, হৃদয়ে জ্বালাও পয়দা করতে হবে। যিকরুল্লাহ সৃষ্টি করতে হবে। অন্তর বিগলিতও হবে, কিন্তু সর্বাবস্থায় শরীয়ত অগ্রে থাকবে।

হ্যাঁ; কেউ যদি একেবারেই মাগলুবুল হাল হয় তথা হালে ডুবে যায়, তাহলে সে অপারগ। তার কোনো ধর-পাকড় হবে না। কিন্তু যতটুকু সম্ভব হালকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং শরীয়তকে অগ্রে রাখতে হবে, প্রাধান্য দিতে হবে।

আবুলহাল ও ইবনুলহাল

হালওয়ালা আল্লাহওয়ালাদের মধ্যে দু-ধরনের উপাধি রয়েছে। একটি আবুলহাল, অপরটি ইবনুল হাল। আবুলহাল হলেন এমন ব্যক্তি, যিনি হালের উপরও বিজয়ী হন, শরীয়তের ওপরও বিজয়ী হন, সুন্নাতকে প্রাধান্য দেন। এমনটিই ছিল ঐ বুযুর্গদের তরিকা। আর ইবনুলহাল হলেন এমন ব্যক্তি, যারা হালাতের উপর পরাজিত হয়ে যায়। মোটকথা, তাদের মাঝে বাইয়াত ও ইরশাদাত উভয় ছিল। হাল ও কালও ছিল। সবকিছুই ছিল; কিন্তু ইত্তেবায়ে সুন্নাত বিজয়ী ছিল, সুন্নাতকে ইমাম বানাত। তাদের নিকট দীনের আযমত, দীনের আদব সবকিছু হতে অগ্রগামী ছিল।

আমি তো সংক্ষিপ্তাকারে একথা বলতে পারি যে, একটি হলো কানুনে আম, যা সবার জন্য। তাহলো কানুনে শরীয়ত, যা সকলের জন্য পয়গাম। আর অপরটি হল তরিকত। এটি ব্যক্তিগত অবস্থার নাম। একজনের হাল অন্যজনের জন্য দলিল হতে পারে না। এ কারণে এগুলোকে তুলনা হিসেবে পেশ করা যাবে না যে, অমুক এমন, অমুক এমন; তুমিও এমনটি করো। হাল সবার পৃথক-পৃথক। যে জিনিস সকলের জন্য অভিন্ন, তাহলো কানুনে শরীয়ত।

ত্বরিকত হলো ব্যক্তিগত অবস্থার নাম। কেউ অনেক উপর পর্যায়ে পৌঁছে যায়, কেউ অনেক নিম্নে থেকে যায়। নিচেরওয়ালা যদি চায়, আমি এক লাফে উপরে উঠে যাব, এটি জন্মগত নীতির খেলাফ। আপনাকে চেষ্টা করতে হবে; আল্লাহ পৌঁছালে পৌঁছতে পারবে। এতটুকুই পার্থক্য। অন্যথায় আমার বুঝে আসে না, কী ইখতেলাফ ও ভিন্নতা রয়েছে? সর্বত্র এক ধরনের ঝড় বইছে যে, অমুক কাফের, অমুক কাফের, অমুক ফাসিক। মানুষ নিজেদের বৈশিষ্ট্যাবলিকে ইসলাম বলে বেড়াচ্ছে। অথচ ইসলাম অনেক উঁচু ও উন্নত বস্তুর নাম।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللّٰهِ تَعَالٰى

সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত